অতঃ কিম্ !

বেদুইন

ATAAH KIM

by

Bedouin

Rs. 30.00

প্রথম প্রকাশ : জুলাই : ১৯৫৬

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : বিষ্ণু অশোক

মুদ্রাকর : ভোলানাথ পাল : তনুশ্রী প্রিণ্টার্স : ৪/১ই বিডন রো : কলিকাতা-৬

মূল্য : তিরিশ টাকা

উমাকে

—আমাদের প্রকাশিত লেখকের বই—

মাঝরাতে সূর্যোদয়

অপরাধ অপরাধী

সাত সকালে হাঁপাতে হাঁপাতে হরিশখুড়ো ঘরে ঢুকেই চেয়ার টেনে বসলেন। কিছুক্ষণ দম নিয়ে বললেন, কাল রাত দুটো থেকে কামারের হাপর টেনেছি রে দামু। শীতটাও বেড়েছে, হাঁপানীর টানও বেড়েছে। গেরো দেখ, হাঁপানীর সিগারেটও ফুরিয়ে গেছে। তাই ছুটে এলাম তোর কাছে। কটা সিগারেট এনে দে দামু।

বললাম, এখনও ওষুধের দোকান খোলেনি কাকা।

জানিস তো নবীনকিশোর দত্তগুপ্তের দোকান খোলা থাকে দিন রাত। তুই সেখানে গিয়ে গোটা কয়েক সিগারেট এনে দে।

বললাম, কাকা দত্তগুপ্তের দোকান তো দেড় মাইল দূরে। যেতে আসতে যতটা সময় দরকার হবে সে সময়ের মধ্যে আশেপাশের দোকান খুলে যাবে কাকা। আপনি বরং কয়েক কাপ গরম গরম চা খেয়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে নিন। সময় মত আপনার সিগারেট এনে দেব।

হরিশকাকা কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে পা মেলে দিয়ে বসলেন। আমিও গরম চায়ের ব্যবস্থায় ভেতর বাড়িতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি, হরিশকাকা চুপ করে বসে হাঁপাচ্ছেন।

আমি তাঁর সামনে বসতেই হরিশকাকা বললেন, শোন দামু আমার নাতনী মলয়ার কথা। কাল আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, দাদু তোমার ছোটবেলার গল্প বল। বললাম, সে সব ছিল সোনার দিন, সে সব দিন আর ফিরে আসবে না রে দিদি।

হরিশকাকা হাঁপাতে থাকেন।

বললাম, আপনার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে কাকা। ছোটবেলার গল্প আর আমাকে শোনাতে হবে না।

নারে না। কষ্ট তো চিরকালের। বয়স তো হয়েছে, কোন দিন পটল তুলব তা বলা যায় না, ছোটবেলার গল্পগুলো তো ইতিহাস। তাই না বলে পারিনি। আমার কথা শুনে মলয়া বলল, কি সব আবোল তাবোল বকছ দাদু। আজগুবি কথা শুনলে হাসি পায়। টাকায় ষোল সের চাল কিনেছ! বাপ্ রে! আজ ষোল টাকায় চার কেজি চাল কিনতে হয় তা তো জান।

বললাম, ঠিক বলেছিস দিদি। কিন্তু আমরা চার পয়সা সের চাল সত্যিই

অতঃ কিম্—১

কিনেছি। আজ যখন চার টাকায় এক কেজি চাল কিনি তখন মনে হয় টাকার দাম কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। চার পয়সা আর চার টাকার একই দাম।

বলতে বলতে হরিশকাকা থেমে গেলেন। হাঁপাতে থাকেন কিছুক্ষণ। আমাদের সার্বজনীন সহকারী ছোট্কু চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকতেই হরিশ-কাকাও নিশ্চিন্তে হাত বাড়িয়ে দিলেন চায়ের কাপের দিকে। কয়েক চুমুক চা খেয়ে বললেন, বাঁচলাম।

আমি কোন উত্তর দেবার আগেই হরিশকাকা বললেন, আমার নন্দো। তার ছেলে অভিরাম ডাক্তারী পড়ছে। তার কাছেই মলয়া শুনেছে, তার কলেজের অনেক ছেলেই নাকি ম্যানড্রেক খেয়ে আবোল তাবোল বকে। আমিও নাকি তাদের মত আবোল তাবোল আজগুবি গল্প শোনাই।

ছোট্কু-কে হরিশকাকার সিগারেট কেনার নির্দেশ দিয়ে আমি বললাম, ওসব কথায় কান দেবেন না কাকা। মলয়াকে আমি বুঝিয়ে বলব।

তা বলতে পারিস। কিন্তু জানিস দামু, কি সুখের দিন ছিল সেকালে, আর আজ! সারা জীবনে মানে, কর্মজীবনে আমি একটা মাত্র একশত টাকার নোট চোখে দেখেছিলাম, আর আজকাল একটা রিকস্যাওলার ট্যাঁকে দু-তিনটে একশ টাকার নোট থাকে। পঞ্চাশ টাকা উপায় করে সংসার চলত সুখে। আর আমার নন্দো, দেড় হাজার টাকা পায়, সংসার তবুও অচল। এসব তো ভাবতেও পারিনি কোনদিন। কি দিন এল রে দামু, এবার যেতে পারলে বাঁচি।

হরিশকাকা আরও কিছু বলতেন, বাধা পেলেন ইমানুর আর বিমলের আগমনে।

ইমানুর আর বিমল অন্তরঙ্গ বন্ধু, আবাল্য সহপাঠী। দু'জনেই বেকার, দু'জনেই ঘুরছে কাজের সন্ধানে মাঝে মাঝে তারা আসে মনের দুঃখ জানাতে কিন্তু অসহায় দামোদর তাদের কথা শোনে কিন্তু তাদের সমস্যার সামান্যতম সমাধান করতে পারে না। তবুও দামোদর তাদের বন্ধু যদিও বয়সে বড় এবং তাদের মতই অসহায় এবং কিছুটা ব্যতিক্রম হল দামোদর আংশিক সাকার। আংশিক এই কারণে, তার উপার্জন সংসার চালাবার মত নয়। সংসারের আংশিক দায় বহনও তার পক্ষে কষ্টকর।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি খবর ইমানুর?

আমরা আমাদের পাঠশালা দুটো বন্ধ করব স্থির করেছি। অথবা চাকরি ছেড়ে দেব।

কারণ?

বিমল বলল, দু'জনের দু' রকম। বল না ইমানুর, তুই কেন বন্ধ করতে চাস। আমারটা পরে বলব।

ইমানুর ইতস্তত করছিল। ছোট্কু হরিশকাকার সিগারেট এনে দিতেই বললাম, আর দু' কাপ।

ইমানুর বলল, আপনি জানেন দাদা প্রথম থেকে কত কাঁটা ছাড়াতে হয়েছে

শুনেছি। তোমার মুখে শুনিনি।

আমার পাঠশালার পড়ুয়ারা ছেলে ও মেয়ে। তাদের অধিক সংখ্যক হল মুসলমান। প্রথম বাধা এল আমাদের ইমাম সাহেবের কাছ থেকে। বলল, মেয়েদের বেপর্দা করছিস ইমানুর। তুই তো শরীয়তী কানুন মানিস না।

বলেছিলাম, পাঁচ থেকে দশ বছরের মেয়ের পর্দা তো কখনও শুনিনি। ওরা শিশু, ওদের পর্দা বেপর্দার অজুহাতে পড়াশোনা বন্ধ করা অন্যায় হবে ইমামসাহেব।

ইমামসাহেব দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলেছিল, তা বেশ। মেয়েরা দশ বছরেই সেয়ানা হয় রে বাচ্চু। তারপর কাউকে যেন রাখিস না। তোর মতলব ভাল নয়। আখেরে ওরা বেসামাল হবেই।

ভাবলাম, রেহাই পেলাম। কয়েক দিনের মধ্যে ইমামসাহেব ফতোয়া দিলেন, মুসলমানের মেয়েরা পাঠশালে ছেলের পাশে বসে লেখাপড়া করা নেক্ কাম নয়, বেপর্দা হতে পারে ভবিষ্যতে। যারা পাঠশালায় মেয়ে পাঠাবে তারা যেন হুঁশিয়ার হয়।

এর ফলে মুসলমান মেয়েদের আসা কমতে থাকে।

তবুও কিছু ছিল কিন্তু আমার চাচাজান মোকসেদ মিঞা আরও গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। আমাকে ডেকে বলেছিল, তুই তো পাঠশালা আরম্ভ করেছিস, তার চেয়ে মক্তব কর। মুসলমানের ছেলেমেয়ে হল আল্লাহতালার বান্দা। তাদের কিতাব পড়তে শেখা, ছোবাব হবে। জানিস তো কিতাব না পড়লে বে-হাদিসি কাম হবে, ওরা দোজকেও স্থান পাবেনা।

বলেছিলাম, ঠিকই বলেছেন চাচাজান, তবে জমানা বদল হয়েছে। আমরা ইংরেজি ইস্কুলে পড়েছি সেখানেও কিতাব পড়েছি। আপনারাও মাঝে মাঝে ওয়াজ করে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন ইসলামের মূল সূত্র। কোরাণ হাদিস, শরীয়ত, ফেকা সব কিছুই তো আপনারা শিখিয়েছেন, কিন্তু শিখতে দেননি বাঁচার রাস্তাটা।

চাচাজান হাই তুলে বলেছিলেন, বেটা তুই না পাক। আল্লাহতালা হলেন সর্বজ্ঞ, করুণাময়। তাঁর ইচ্ছাতেই দুনিয়া চলছে। তিনি কাউকে আমীর করেছেন কাউকে ফকির করেছেন। আবার লহমায় আমীরকে ফকির করতে পারেন, ফকিরকে আমীর করতে পারেন, সবই তাঁর ইচ্ছা। যাদের বাঁচাবার তাদের উনি বাঁচান, আর যাদের মবার তাদের মারেন। তুই দেখছি, আল্লাহ-তালার ইচ্ছাকে বিশ্বাস করিস না।

বলেছিলাম, আল্লাহতালার ইচ্ছাকে বিশ্বাস করি চাচাজান, তবে আল্লাহতালা তো নিজে সব কাজ করেন না, তাঁর পেয়াদা দিয়ে কাজ করান। আমরা হলাম পেয়াদা, আমাদের দরকার তদ্বির আর তগদীর। তগদীর নিয়ে তো বসে থাকা যায় না, তদ্বির করতে হয়। আজকের দিনের লেখাপড়া শেখাটা হল তদ্বির। এটাও আল্লাহতালার ইচ্ছা। তাই বাঁচার তাগাদায় বর্তমানের জমানাকে মেনে নিয়েছি চাচাজান।

চাচাজানের চোখ রাঙা হয়ে উঠল। ওয়াক্ থু করে একগাদা থুথু ফেলে কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। বাঁ হাত দিয়ে মুখটা মুছতে মুছতে বলেছিলেন, ছোটবেলা থেকে রেওয়াজ করাতে হয় রে বেটা। মুসলমানের ছেলেমেয়ে কিতাব পড়বে না, নমাজ পড়বে না, রোজা করবে না, জাকাত দেবে না, তাতো হতে পারে না। যারা তা করে না তারা তো খারিজ।

বলেছিলাম, চাচাজান, আপনার আব্বাজান তো টিপসই দিতেন। কিতাব পড়ার সৌভাগ্য তাঁর কখনও হয়নি। অন্যে কিতাব পড়েছে উনি শুধু শুনেছেন এবং অর্থও বোঝেন নি। তা হলে তিনি কি খারিজ? তিনি যদি খারিজ না হয়ে থাকেন তা হলে অন্যে কেন হবে?

মোকসেদ আলি কঠিন দৃষ্টিতে ইমানুয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছু বলার আগেই আমি পেছনের পথ ধরেছিলাম। বুঝলেন, দাদা কাঁটা কেমন?

ইমানুর থামতেই বললাম, কাজটা ভাল করনি ইমানুর।

তা জানি দাদা। গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে।

তোমার স্কুল চালাচ্ছে কে?

খোদাতালা। চলছে শুনেছি, এবার বন্ধ করে দেব দাদা।

ভালই। তবে ইমানুর যা বলেছ তা আর বল না। ইসলাম হল প্রেমের ধর্ম। কিন্তু যাদের হাতে ধর্ম ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব আছে, তারা দায়িত্ব পালনের অনুপযুক্ত বললেও ভুল হবে না। তোমার প্রগতিশীল কথা ওদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করবে। অবশ্য ধর্ম সম্বন্ধে ওরা যে ওয়াকিবহাল তাও মনে হয় না। আমাদের দেশের হাজার হাজার কমুনিষ্টপন্থী আছেন যারা মার্কস-সাহেবের নামে বিগলিত প্রাণ তাদের শতকরা দুজনও কখনও মার্কসসাহেবের কেতাব পড়েনি, প্যামপ্লেট পড়ে কমুনিষ্ট হয়েছে। তোমাদের মোল্লা-মুছল্লিদের অধিকাংশই পবিত্র কোরাণ পাঠ করলেও তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে অপব্যাখ্যা করে অশিক্ষিত অজ্ঞ লোকদের বিপথে চালিত করে থাকে। আমি জানি, ঈদগাহে নমাজ পড়ার পর ইমামসাহেব এমন বক্তৃতা আরবী ভাষায় দিয়ে থাকেন যার অর্থ শ্রোতাদের প্রায় সর্বাংশ বুঝতে পারে না। অথচ তাঁর বক্তব্য থাকে অসহিষ্ণুতা এবং অপর ধর্মাবলম্বীদের ধ্বংসের কামনা। সেজন্য তোমাকে সংযত হতে বলছি।

ওরা ধর্মের নামে যে ভাঁওতা দেয় তার প্রতিবাদ দরকার।

না। মিশরের প্রেসিডেন্ট সাদাতকে হত্যা করেছিল তার অতি বশম্বদ রক্ষীবাহিনী। কেন? সাদাত প্রগতিশীল মুসলীম দুনিয়া দেখতে চেয়েছিলেন, অনেক সংস্কারসাধনও করেছিলেন। এটা তাঁর দেশের মোল্লাতন্ত্র সহ্য করতে পারেনি। তাদের উস্কানিতে এই ঘটনা ঘটিয়েছিল ধর্মান্ধ কয়েকজন যাদের বিশ্বাস করতেন সাদাত। পাশের বাড়ির মুজিবর চেয়েছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক দেশ গড়তে। পরিণতি তো আমাদের চোখের সামনে রয়েছে। আফগানিস্থানের আমানুল্লা মোল্লাতন্ত্রের দাপটে প্রগতির বুলি ভুলে দেশ ছেড়ে

পালাতে বাধ্য হয়েছিল মোল্লাতন্ত্রী বাচ্চাই সোকোর বিরুদ্ধাচারণে। এরকম আরও উদাহরণ আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণকে বন্দীজীবন কাটাতে হয়েছে, কয়েক সহস্র মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে কমুনিষ্ট মতাবলম্বী এই অজুহাতে। তুমি সাবধান হও ইমানুর। আমাদের দেশ এত অগ্রসর হয়নি যাতে তোমাদের সম্প্রদায় তোমার প্রগতিশীল যুক্তিকে মেনে নেবে। হয়ত তোমাকে কঠিন মূল্য দিতে হবে এর জন্য।

ইমানুর কোন জবাব না দিলেও আমার বক্তব্যকে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি সেদিন।

বিমল বলল, আমার কথা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। ইমানুরের পাঠশালা অনুমোদন পায়নি কিন্তু আমার স্কুল সরকারী অনুমোদন পেয়েছিল। বাগড়া দিল বর্তমান সরকার। হুকুমজারি করল, ইংরেজি হটাও। ইংরেজি হটাবার পক্ষে আমি নই। এটা আমার অপরাধ। সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় আমার আস্থা নেই। মনে করুন, প্রাথমিক পাশ করা একটা ছেলে কোন সময় কলকাতা শহরে বেড়াতে এসে গাড়ি চাপা পড়ল অথচ মরল না। গাড়ির নম্বরটা দেখেছে কিন্তু পড়তে পারেনি। নম্বরটা ইংরেজিতে লেখা, সে তো ইংরেজি জানে না। আবার বালিগঞ্জের বাসের মাথায় কি লেখা আছে না পড়েই সে উঠে বসল বাসে, অথচ সে যাবে শ্যামবাজার। সেখানেও সেই ইংরেজি পড়তে না পারা। তার হয়রাণি।

হেসে বললাম, এতো গেল অতি সামান্য অসুবিধার কথা।

আরও আছে দাদা, আজকাল ইংরেজি হটাতে গিয়ে শহরে শহরে ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলের ব্যবসা চলছে রমরমা। যাদের পয়সা আছে তারা ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছে সেইসব স্কুলে আর গরীবগোবরার ছেলেরা মুখ থুবড়ে পড়ছে প্রাথমিক পাশ করে। ইংরেজি না জানলে বড় চাকরি পাওয়া যায় না। গরীবের ছেলের মেধা থাকলেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে উচ্চশিক্ষালাভের। ধরুণ মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যারা পড়ার যোগ্য ইংরেজি ভাল করে না জানার দরুণ মেধাবী ছাত্ররা সুযোগ পাচ্ছে না। তাই মনে হয় যারা এই আইন করেছে তাদের উচিত ছিল ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল বন্ধ করে দেওয়া। আর মন্ত্রীফন্ত্রীদের ছেলেদের ওই সব স্কুলে পড়া বন্ধ করা। এরা দুই শ্রেণীর নাগরিক সৃষ্টি করতে চায় প্রাথমিক স্তর থেকেই, এটা গণতন্ত্র সম্মত নয়, সমাজতন্ত্র সম্মত নয়, আইন-সম্মত নয়, নীতিসম্মত নয়। তাই বিরোধ। বিরোধের অবসান ঘটাব স্কুল বন্ধ করে অথবা চাকরি ছেড়ে।

হেসে বললাম, ওভাবে প্রতিকার পাবে না বিমল। চাকরি বজায় রেখে স্কুল চালিয়ে প্রতিবাদ জানাতে হবে। ওরা দুই শ্রেণীর নাগরিক তৈরী করতে বদ্ধপরিকর। ওদের ছেলেমেয়ে, ধনীর ছেলেমেয়ে সমাজ শাসন করবে, তারই প্রস্তুতি করছে। তোমরা যারা এই অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে চাও তাদের সক্রিয়ভাবে প্রতিবাদ জানাতে হবে। ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করার পথ কিন্তু

পলায়ন নয়, ওদের বলতে দাও, তোমরা যাও। তোমাদের বলতে হবে আমরা যাব না। আমাদের ছেলেমেয়েদের যুগোপযোগী করে তুলতে চাই। তুমি তো জান, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী। হিন্দী জানে না অথবা বোঝে না ভারতের শতকরা পঞ্চান্নজন, অথচ জোর করে হিন্দী চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হিন্দীর হাত থেকে বাঁচতে হলে সর্বভারতীয় মাধ্যম ইংরেজি শ্রেয়। সে কথাটা বুঝিয়ে দিতে হবে জনসাধারণকে। নইলে আজ যারা ইংরেজি হটাচ্ছে কাল তারা হিন্দীকে সাদরে ডেকে নেবে। আমি বলছি না হিন্দী শেখা অন্যায় তবে তার মান রাষ্ট্রভাষা হবার উপযুক্ত নয়। সবার বোধগম্যও নয়।

বিমল বাধা দিয়ে বলল, জাতীয় সংহতি রক্ষায় হিন্দীর উপযোগিতা বেশি।

ওটা হিন্দীপ্রেমীদের কথা। জাতীয় সংহতি রক্ষা হবে প্রশাসনের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে। সকল নাগরিকের মর্যাদাকে সম্মান দেখিয়ে। হিন্দী চাপিয়ে উত্তর ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী নিরপেক্ষতার লক্ষণ নয়। অবিচার হবে অন্যান্য ভাষা-ভাষীদের ওপর, জাতীয় সংহতির মূলে কুঠারাঘাত করে সংহতির চিন্তা বাতুলতা মাত্র। শিক্ষাব্যবস্থাকে কোণঠাসা করে রাখতে চায় শাসক দল, শিক্ষার প্রসার ঘটলে অবিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠবে। তাতে আজকের সুলতানীতে বিঘ্ন ঘটবে। দেশের মানুষ এই সব স্বার্থপর হীনমনা সুলতানদের টেনে নামাবে গদী থেকে। এটা ওরা চায় না। এর জন্য দিল্লীওলারা হিন্দী চাপাতে চায়, আর আমাদের শাসকরা ইংরেজি হটাতে চায়। তুমি স্কুল বন্ধ করে অথবা চাকরি ছেড়ে এর প্রতিকার করতে পারবে না বিমল। তোমার কথা সবাইকে শোনাও, তাদের সম্মতি নাও তোমার যুক্তিতে। তবে প্রতিকার হবে। এটাই হবে প্রকৃত সক্রিয় প্রতিবাদ।

ছোটকু চায়ের কাপ এনে রাখল সামনে।

হরিশকাকা পর পর দুটো সিগারেট টেনে সুস্থির হয়ে বসেছিলেন। হঠাৎ উঠে বললেন, আজ চলি রে দামু।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বললাম, মলয়াকে একবার পাঠিয়ে দেবেন কাকা।

আচ্ছা, বলে হরিশকাকা বেরিয়ে গেলেন।

বিমল বলল, আপনার কাকার খুব হাঁপানী। শুনেছি করমচাঁদ বাবার দৈব মাদুলিতে নাকি রোগ নিরাময় হয়। দিয়ে দেখতে পারেন।

বিমলকে নিরুৎসাহিত করতে বললাম, দেখ ভাই, আজ বিজ্ঞানের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের যুগে তাবিজ কবজ অচল। তাই যদি হত তা হলে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে কেউ কি ডাক্তারী পড়তে যেত। আমাদের দেশের প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসাকেও আধুনিক যুগের উপযোগী করতে সরকার সচেষ্ট। এমন কি হাঁপানি চিকিৎসার উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, এযুগের কিছু মানুষ যতই মূর্খ হোক, তারা তাবিজ কবজকে মেনে নিতে পারেনি বলেই তারা বহু অর্থ ব্যয় করে নেমেছে ছেলেদের চিকিৎসা বিজ্ঞান শেখাতে। অর্থ

অপব্যয় করতে নয়। দৈব মাদুলি আর বাবাদুলি দিয়ে কারও চিকিৎসা হয় হয় না বিমল। তুমি বর্তমান যুগের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত তবুও তোমার এই বিশ্বাস কি করে জন্মালো তা বুঝতে পারছি না।

শুনেছি অনেকে নাকি নিরোগ হয়েছে।

মাদুলি ধারণ না করলেও ওরা নিরোগ হত। অন্য কোন চিকিৎসার হয়ত প্রয়োজন ছিল না।

ইমানুর বাধা দিয়ে বলল, আমাদের সমাজের পীর মুৎসুদ্দিরা নানা ভাবে লোক ঠকিয়ে যায়। কেউ পাণিপড়া দেয়, কেউ তাবিজ দেয় আর অজ্ঞ, অল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত ধর্মভীরু মুসলমানরা বিশ্বাস করে এই সব তুকতাকে তাদের রোগ সারবে, দুঃখ দূর হবে, নসীব খোলতাই হবে। শুনুন দাদা, ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র হল বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব। এই মহান উদ্দেশ্যকে যেমন কলঙ্কিত করে থাকে কতকগুলো কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তি, তেমনি তারা মানুষকে ঠকাচ্ছে এই সব বুজরুকি করে অথচ ইসলাম ধর্মে এই সব বুজরুকি বিশেষ-ভাবে নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে আল্লাহতালার পর আর কোন দৈব বিশ্বাসের স্থান নেই ইসলামে তবুও তা হয়ে থাকে। আজ বিজ্ঞান যা বলছে, ইসলাম তাই বলেছে দেড় হাজার বছর আগে। তুই কি করে বললি বিমলী, দৈব মাদুলিতে হাঁপানী নিরাময় হয় ?

বিমল মাথা নীচু করে বসে রইল। ইমানুর বোধহয় আরও কিছু বলত কিন্তু আমাকে উদাসভাবে চেয়ে থাকতে দেখে সে থেমে গেল।

ভাবছি বুজরুকিটা আমাদের দেশে কি ভাবে হিন্দু-মুসলমান খৃশ্চান সমাজে শক্ত ভিত্ তৈরী করেছে। এবং তা সম্ভব হল কি ভাবে! অশিক্ষাই কি এর মূল? মূলে অশিক্ষার প্রভাব নিশ্চিত আছে কিন্তু যারা শিক্ষিত বলে দাবী করে তারাই বা এ[illegible] বিশ্বাস করে কেন? মনে হয়, শিক্ষা যাকে বলে তা কাউকেই দেওয়া হয় না। কায়েমী স্বার্থের লোক জানে ধর্ম-বিশ্বাসে সুড়সুড়ি দিতে হলে শিক্ষার নামে কুশিক্ষা দেওয়া প্রশস্ত, এবং তা করে মানুষের যুক্তিবাদী মনটাকে বধ করত। এই তো সেদিন একজন রাজনৈতিক নেতা বললেন, আমাদের দেশের মনীষীদের ভুলে মার্কস-লেনিন চর্চা মূর্খতা। শ্রোতাও হাততালি দিয়েছিল কিন্তু তারা প্রশ্ন করেনি, আমাদের দেশে এত আইন কলেজ থাকতে উনি কেন বিলাতে গিয়েছিলেন ব্যারিষ্টারি পড়তে। আইনের শিক্ষা ব্যক্তিগত যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে, এখানেও তা শেখা যায়, বিলাতেও তা শেখা যায়। অথচ আইন পড়তে বিলেত গিয়ে অর্থ নষ্ট করাটা কি মূর্খতা নয়। এই সব হাততালি পাওয়া নেতারা মনে করে, তারা যা বলেন তাই বেদবাক্য। মানুষের জানার ইচ্ছা ও ক্ষমতা হাততালিতে ঢাকা পড়ে না। জানতে হবে। সমালোচনা করতে হবে, যুক্তিবাদী হতে হবে তবেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা।

ইমানুর জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছেন দাদা?

ভাবছি না, পেছনে তাকিয়ে দেখছি। মানুষের যুক্তিবাদী মনটাকে গলা টিপে স্তব্ধ করে দিতে ধর্মের ব্যাপারী আর রাজনীতির হাততালি পাওয়া নেতারা কি ভাবে আদাজল খেয়ে নেমেছে। যুক্তি স্তব্ধ হলে বিবেকের মৃত্যু ঘটে এটা কি কেউ জানেন না!

ইমানুর বিমলের হাত ধরে টানতে টানতে বলল, চল বিমল, আজ আবার গাঁয়ে যেতে হবে। অনেক কাজ।

হেসে বললাম, কাজ তো অনেক। হিমালয় পর্বতকে দিবারাত্র ঠেলাঠেলি করাও কাজ। তাতে ফায়দা কিছু আছে!

বিমল বলল, ইমানুর চায় অসম্ভবকে সম্ভব করতে। আমি ওর দোসর কিন্তু শঙ্কিত।

ইমানুর হেসে বলল, অসম্ভব আছে বলেই তো সম্ভবের মূল্যায়ন করা যায়। আঁধার না থাকলে আলোর মহিমা জানতে পারতাম কি আমরা। বিমল বলে, ওটা হবে না। আমি বলি, হবে। হওয়া না-হওয়াটা বড় কথা নয়। আজ যা হয়নি, কাল তা হতে পারে, আজ যা অসম্ভব হয়ত একশ বছর পর তা সম্ভব হতে পারে। আমরা মরলেই সম্ভব অসম্ভবের সমস্যা শেষ হয় না। উত্তর পুরুষরাও তো তা করতে পারে।

বললাম, ইমানুর নেহাৎ অযৌক্তিক কিছু বলেনি। মানুষ চাঁদে যাবে এটা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল পঞ্চাশ বছর আগে। আমরা তো মাটির বুকে লড়াই দেখেছি, এখন আকাশের বুকে লড়াই হবে, সে লড়াই করবে যন্ত্র আর ধ্বংস হবে এই পৃথিবী, এটা এখন আর কল্পনা নয়। রামায়ণে পুষ্পকরথ আকাশে উড়েছিল, হাজার হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ভেবেছে, তা কি সম্ভব! তাও তো সম্ভব হয়েছে। উত্তর পুরুষ আমাদের অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করবে না কে বলতে পারে। আঁধারে আছি বলে আলোর সন্ধান করব না, এতো যুক্তি নয়। আজ আকাশ যুদ্ধ, বায়ু যুদ্ধ, তারকা যুদ্ধ শুনে অবাক হইনা, এতদিন এটা মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি। অথচ তাও হচ্ছে।

ইমানুর বলল, বিমল একটা কাওয়ার্ড, সমাজ সেবায় সবকিছু সহ্য করে এগোতে হয়।

বললাম, সব ঠিক কিন্তু তুমি মুখটা একটু বন্ধ করে চলবে ইমানুর। তোমার যুক্তিবাদী মনকে সহ্য করবে না কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মোল্লারা। তারাও তোমার প্রবল প্রতিপক্ষ। ভারতের ইতিহাস বড়ই গোলমেলে।

ইমানুর বলল, আপনার উপদেশ মনে থাকবে দাদা।

বিমল আর ইমানুর সেদিন চলে যেতেই কত কথা মনে পড়তে থাকে। ভাবলাম, ইমানুর পারবে কি তাদের সমাজ-ব্যবস্থা পবিত্র কোরাণের পথে পরিচালনা করতে!

এক বছর পর বিমল হঠাৎ এসে হাজির। তাকে দেখে উদভ্রান্ত মনে

হল। কোন দুঃসংবাদ বহন করে এনেছে মনে হল। তাকে বসতে বললাম। সে বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলল, সর্বনাশ হয়ে গেছে দাদা।

আমার জিজ্ঞাসু চোখের দিকে তাকিয়ে বিমল বলল, পরশুদিন ইমান্নুর গাঁয়ে ফিরছিল।

তারপর?

নন্দীপাড়ার ঝোপে কে বা কারা তাকে খুন করেছে।

আমি চমকে উঠলাম। এই পরিণতি আশঙ্কা করেছিলাম। তাই সহজে সামলে নিয়ে বললাম, তার দেহ তো মর্গে। কোন ব্যবস্থা করেছ?

বলে এসেছি। কিন্তু গোলমাল বেশ পাকিয়ে উঠেছে। ব্লকের কংগ্রেসীরা বলছে, ইমান্নুর তাদের চারআনা পয়সার সদস্য, তাকে বামপন্থীরা মেরেছে। আবার মার্কসবাদীরা বলেছে, ইমান্নুর তাদের সমর্থক, কংগ্রেসী গুণ্ডারা তাকে মেরেছে।

তা হলে ইমান্নুর মরেনি।

বিমল অবাক হয়ে বলল, মানে?

বললাম, আজকাল মানুষ মরেনা বিমল, আজকাল কংগ্রেসীরা মরে নইলে বিরুদ্ধবাদীরা মরে। যে মরল সে যে একটা মানুষ ছিল একথা কেউ স্বীকার করে না। এই তো কদিন আগে ইমান্নুর এসেছিল, তাকে ওবারও সতর্ক করেছি কিন্তু নিষ্ফল!

কিন্তু দাদা, আমি আর ইমান্নুর কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যও নই। সমর্থক নই।

এখন সে কথা কেউ শুনবে না। বিশ্বাসও করবে না। গাঁয়ে গিয়ে দেখে এস হয়ত দুই চাষা লড়াইতে নেমেছে, আর দু'চারজন খুনও হতে পারে, আবার অনেকের ঘরবাড়ি হয়ত পুড়েছে। আর ইমান্নুরের লাশ বোধহয় মর্গে পচতে আরম্ভ করেছে।

বিমল মাথা চুলকে বলল, তাও সম্ভব। আমিও ইমান্নুরকে বলতাম, ধর্ম নিয়ে কারবার বন্ধ কর। ও শুনত না, বলত দূর ভারতবর্ষের মত দেশে সমাজ সংস্কার না করলে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকবে কি করে। আমরা তো ভোটের দালাল নই। আমরা কেন ধর্মের নামে অনাচার সহ্য করব। আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ, আমাদের দেশের আইনে সবার অধিকার সমান কিন্তু কাজের বেলায় এটা সব সময়ই অকেজো। আজ মনে হচ্ছে ইমান্নুর ঠিক কথাই বলেছিল।

বললাম, শোনো বিমল, যেখানে অধিকার থাকে সেখানে দায়িত্বও থাকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ শুনতে খুবই ভাল কিন্তু আমাদের পরবে যেমন দুর্গাপুজা, কালীপুজায়, যা হয় তাতে সবার সমান অধিকার যেমন স্বীকার করা হয় না তেমনি ধর্মনিরপেক্ষতাও বজায় থাকে না।

বিমল বাধা দিয়ে বলল, তার জন্য দায়ী প্রশাসন। আইনকে সম্মান যারা করে না তাদের বাধ্য করতে হয় আইন মানতে।

বললাম, প্রশাসন বড় দুর্বল। দেশে অশিক্ষা, বেকার সমস্যা যেমন ব্যাপক তেমনি যুবশক্তি বিপথগামী। দুর্বল প্রশাসন বজায় রাখতে চায়, বজায় রাখতে উৎসাহ দেয়, সমর্থন জানায়। এরা যেদিন প্রশাসনের অন্যায়গুলো বুঝবে, সক্রিয়ভাবে বাধা দেবে সেদিন প্রশাসনের তাসের ঘর ভেঙ্গে পড়বে, ভণ্ডামী ধরা পড়বে। ইমানুর এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছিল। সে সামাল দিতে পারেনি। আরও অপেক্ষা করতে হবে বিমল। শুভ-শক্তির আবির্ভাব ঘটবেই। অন্যায়কারীদেরও শুভবুদ্ধি জাগবে। লড়াইয়ের ময়দানে হার আছে জিত আছে। সত্যের জয় একদিন হবেই।

বিমল বলল, আজ তো পরাজয় ঘটল। ইমানুর বলত, এদেশের মুসলমানদের অধিকাংশই হিন্দুদের উত্তর পুরুষ। মনে কর কোন ব্রাহ্মণ ইসলামের শান্তির-ছায়াতে এল কিন্তু বহু পুরুষের আচারিত অভ্যাস তো ছাড়তে পারেনি। সে শিষ্যসাবুদের মাথায় ঘাল ঢেলেছে। এবার সে শিষ্যসাবুদ জোগাড় করতে পীর সেজে বসল। অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী কাজে প্রথম থেকেই নামল। ইসলাম পীর, তাবিজ এসবে বিশ্বাস করে না। এগুলো শাস্ত্রবিরোধী। যারা এদের বাধা দেয় তারা হল মোল্লাদের মহাশত্রু।

বললাম, ইমানুর একটু রয়ে সয়ে এগোলে ভাল হত। যুবশক্তি তাকে একটু বেশি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

বিমল খেদের সঙ্গে বলল, ইমানুর আপনার মত ভবিষ্যতকে বিশ্বাস করত বর্তমানকে স্বীকার করে। আমি বহুবার মনে করিয়ে দিয়েছি আপনার উপদেশ। ইমানুর বলত, জানিস বিমল, তোদের সমাজ ব্যবস্থা আর আমাদের সমাজ ব্যবস্থা তো এক নয়। সরকার আইন করে তোদের বহুবিবাহ বন্ধ করেছে, আমাদের করতে সাহস পায়নি। কারণ কিন্তু ভোট। ভোটের লোভে মুসলমান সমাজের মোল্লাদের তোষামদ করেছে। আমার কাজ হল, জনমত গড়ে বহুবিবাহের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। আমি বলেছিলাম, বহুবিবাহ তো সর্ত সাপেক্ষ।

ইমানুর হেসে বলল, তোরা ওসব বুঝবি না কেউ কেউ বলে মুসলমান মেয়েরা অন্যান্য মেয়েদের চেয়ে স্বাধীন ও আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী। কি রকম স্বাধীন জানিস, মুসলমান মেয়েদের সম্মতি না পেলে বিয়ে হয় না। সত্যিই তাই। উকিল-মওলবীরা পাত্রীকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি অমুক-কে বিয়ে করতে চাও? মেয়ে থাকে পর্দার ওপারে। তার হয়ে উত্তর দেয় অন্যমহিলা। তারা জানিয়ে দেয়, হাঁ পাত্রী বিবাহে রাজি। অর্থাৎ বিয়ে মঞ্জুর কিন্তু সত্যি সত্যি মেয়ে সম্মতি জানায় কিনা তা আজও সবক্ষেত্রেই ঘোরালো। এটাই শেষ কথা নয়, মৌলবাদীদের চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করতেও তারা বাধ্য হয়। অর্থাৎ মেয়েদের মা হওয়া ভিন্ন অন্য কোন সত্ত্বা আছে এটা পুরুষ প্রধান মুসলমান সমাজ স্বীকার করে না।

আমি বললাম, তোর এত মাথাব্যথা কেন!

আমার ফুফাতো বোনকে বিয়ে করেছিল আসগর আলি। সে জোতদার। কোথাও অভাব নেই। তিনটে বছর কাটতে না কাটতে আসগর আরও দুটো বিয়ে করল। আমাদের আইন বলছে, প্রতিটি স্ত্রীর প্রতি সমআচরণ করতে। কিন্তু আমার বোন বাস্তবত পরিত্যক্তা হয়েই দিন কাটাতো। সে আমাকে বলেছিল, আমার বিয়ে যদি আমার সম্মতিতে হত তা হলে এমনটা হত না ইমানুরভাই। আসগর যাদের বিয়ে করে এনেছে তারা অতি দরিদ্র ঘরের মেয়ে। নিরুপায় পিতামাতা মেয়েদের সম্মতি না নিয়েই সতীনের ঘর করতে পাঠিয়েছে। কোন মেয়ে কি চায় সতীন নিয়ে ঘর করতে, তবুও তা করতে বাধ্য করে ধর্মের নামে। মনুষ্যত্ববোধকেও জবাই করে থাকে ধর্মের অজুহাতে। সেই ধর্মীয় ব্যবস্থা আমাদের জানতে হয় মোল্লাদের কাছ থেকে, যারা অপব্যাখ্যা করার বাদশাহ, নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে।

ইমানুরের কথা শুনে ভীত হয়ে পড়েছিলাম। আমি আপনার কাছে অনেক দিন আসতে পারিনি। ইমানুর মাঝে মাঝেই এসেছে। সমাজ-সমাজ করে পাগল হয়ে উঠেছিল ইমানুর। তার পাগলামীর অবসান ঘটল।

আমি ভেবেই পেলাম না ইমানুরের অপরাধ কোথায় কিন্তু মৌলবাদী এক শ্রেণীর মুসলমান পুরুষদের চোখে সে ছিল মহাশত্রু। ওরা শত্রু নিপাত ঘটিয়েছে। যুক্তিবাদী মনকে তারা বধ করতে চেয়েছে কিন্তু যুক্তির মৃত্যু ঘটেনা। উত্তর পুরুষ এর প্রতিকার চাইবে এবং আদায় করতে মোটেই ভুল করবে না।

বিমল চুপ করে রইল।

আমি ভাবছিলাম পুরানো দিনের কথা।

ঘাগমারির চরে ছিলেন মওলানা ভাসানী। জীবনের পড়ন্ত বেলায় প্রথমা স্ত্রীকে তাঁর আর পছন্দ হচ্ছিল না। জনসাধারণে উনি ছিলেন পীর বা ধর্মগুরু। ওঁর ছিল বহু মুরাদ বা শিষ্য। এই শিষ্যদের কোন এক ষোড়শী কন্যাকে যখন বিবাহ করলেন তখন তাঁর প্রথমা স্ত্রীর কন্যা রাজিয়া বিবাহ যোগ্য অর্থাৎ অষ্টাদশী। রা জয়ার মা যিনি পীরমা নামে সবার শ্রদ্ধা পেতেন তাঁর মানসিক অবস্থা এবং সামাজিক উচ্চস্থান কিভাবে আহত হয়েছিল তা ভাসানীর মওলানাই জানেন। মওলানা এন্তেকালের পর বেহেস্তে অথবা দোজকে তাও সবারই অজ্ঞাত।

বিমল জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছেন দাদা?

বললাম, ইমানুর ধর্মীয় অনুশাসনকে যুক্তিবাদী করতে সচেষ্ট ছিল। সে বলত, আমাদের দেশের মোল্লারা শরীয়ত শব্দের ব্যাখ্যা করতে বলে থাকে Muslim personal law. কত বড় মিথ্যা যে এটা যা আপনাকে বোঝাতে পারব না। মুসলমানদের কোন personal law ছিল না এখনও নেই। ইসলাম যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রেম ও সারল্যের প্রতীক তাতে রয়েছে যৌথ চিন্তা, কোন ব্যক্তির চিন্তা নেই। তাই মনে হয় কি জানেন দাদা, আমাদের প্রয়োজন শিক্ষার বিস্তার। যত দিন মুসলমান মেয়েরা শিক্ষিত না হবে, সামগ্রিক ভাবে

আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পন্ন না হয়, যতদিন তারা মানুষ হিসাবে নিজেদের দাবী আদায় করতে না শিখবে তত দিন তাদের রেহাই নেই। পুরুষ প্রধান সমাজে মোল্লাদের কায়েমী স্বার্থের কাছে তাদের জবাই হতে হবে। তাই স্কুল স্থাপন করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছি, কিন্তু আমার বিরোধীরা খুবই সংগঠিত সেজন্য অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হবে। ইমানুর বোধহয় সঠিক কথাই বলেছে, তার জন্য তাকে ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হয়েছে।

বিমল হঠাৎ কেঁদে উঠল।

কাঁদছ কেন বিমল? মৃত্যুই তো একমাত্র সত্য। সেই সত্যের কাছে ইমানুর নিজের অস্তিত্ব নিঃশেষ করেছে।

সেজন্য নয় দাদা। প্রায় তিরিশটা বছর একই আদর্শ নিয়ে দুজন এগিয়ে চলেছিলাম। হঠাৎ ছেদ পড়ল। ছোটবেলায় ইমানুরের বাড়িতে গেলে তার মা কত যত্ন করে আমাদের দু'জনকে খাওয়াতেন। বলতেন, তোরা আমার দুটো বেটা। আমার দুই বেটা'র মঙ্গলের জন্য রোজই দোওয়া প্রার্থনা করি। ইমানুরের মা যখন নমাজ পড়তেন তখন আমি তাকিয়ে থাকতাম ভাবতাম ঈশ্বরের উপর অগাধ বিশ্বাস নিয়ে এই ভক্তিমতী বিধবা যেন স্বর্গীয় সুষমায় জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠেছেন। আমরা দুজন একেলে তাঁর কাছে গেলেই আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতেন, তোর মুখটা বড় শুকনো। খেয়েছিস কিছু বিমু। আমি কিছু বলবার আগেই উনি খাবার নিয়ে আসতেন। এই মহীয়সী বিধবা এতিমা একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছেন

আমার কোনই বক্তব্য ছিল না। ভাবছিলাম, কে মরল? বিধবার একটি মাত্র সন্তান?—উহু। কংগ্রেসের চার আনা পয়সার সদস্য?—উহু, মার্কসবাদী কমুনিষ্টদের সমর্থক?—উহু, মরেছে মনুষ্যত্ববোধ, তার কোন ডেফিনেশন কোন অভিধানে নেই। আছে শুধু জীবন্ত মানুষের হৃদয়ে।

বিমল বলল, একবার মাত্র আমার ধর্মমায়ের সামনে গেছি, আর যেতে সাহস পাইনি।

তোমাকেই বার বার যেতে হবে বিমল। তুমি তো ওর সন্তান তুল্য। ইমানুরের অভাব তোমাকেই পূর্ণ করতে হবে। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান ধর্মে আলাদা হলে জাত তাদের এক ও অভিন্ন। তাদের বড় পরিচয় বাঙ্গালী।

বিমল ফিরে গেল সেদিন।

কয়েকদিন পর আবার এসে ধপাস্ করে আমার বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল সব শেষ।

নির্বিঘ্নেতো?

মোটামুটি। এই শহরের বাইরের ঘটনা। এখানে ঘটলে অনেক সাহায্য পেতাম। তবুও ইমানুরের আত্মীয়স্বজনেরা কফিন নিয়ে সময় মতই হাজির হয়েছিল মর্গে। তাদের গ্রামের সাধারণের কবরখানায় তার শেষ কাজ করেছিল তারা। জানজা নমাজ শেষে তাকে শুইয়ে দেওয়া হল চিরবিশ্রামে।

আমিও এক মুঠো মাটি ছড়িয়ে দিলাম তার কবরে। সেদিন কিন্তু কোন কংগ্রেসী অথবা মার্কসবাদী কোন স্লোগান দেয়নি। নীরব শোক যাত্রায় তাদের কেউ কেউ না ছিল এমন নয় কিন্তু পুলিশ পাহারায় সমাহিত করা হল একটা মানুষের লাশ। আমার মত কয়েকজন মানুষেরা তখন নীরবে দাঁড়িয়ে।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

বিমল বলল, ইমানুরের মায়ের কাছে গিয়েছিলাম সেদিন তার চোখে জল ছিল না। আমায় পাশে বসিয়ে বললেন, আমাদের এই দেশে সবার সমান অধিকার, কিন্তু এই মেয়েদের অধিকার যারা অস্বীকার করে ফতোয়া দেয় তাদের কেন সরকার তোষাজ করে বলতে পারিস বিমু! তোদের ঘরের মেয়েদের ধর্মচর্চার যে অধিকার আছে, আমাদের তা নেই। তোর মা-বোনেরা মন্দিরে যায়, কৃশ্চান মেয়েরা গির্জায় যায় কিন্তু আমাদের মসজিদে প্রবেশ নিষেধ। কই, এর প্রতিবাদ তো কেউ করে না, কোথায় আইনের সমান অধিকার। এই সব অধিকার আদায় করতে জহ্লাদের খপ্পরে ইমানুরকে জান দিতে হয়েছে। এটাই ভুলতে পারছি না। কোন মা তা ভুলতে পারে না। আমি নীরবে শুনলাম। আমার কিছু বলার অধিকার যে নেই? ক্ষমতাও ছিল না।

বিমলের চোখ ঝাপসা হয়েছে অশ্রুতে। সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। মনে মনে ইমানুরকে শ্রদ্ধা জানিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

হরিশকাকা মলয়াকে সেদিনই পাঠিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল অপর নাতনী শ্যামলী।

নাম মলয়া যার সবাইকে বাঁচিয়ে রাখতে অক্সিজেন বিতরণ-করা তার কাজ আচার আচরণ দিয়ে। কার্যক্ষেত্রে মলয়া উল্টো, আঠার বছরের মেয়ে যেমন তার বাক্যবাণ তেমনি তার ঝঙ্কার। তবে মলয়া কেন বা তার দামুকাকাকে কিছুটা সমীহ করে। কেন, তা জানিনা।

এসেই বলল, হুকুম ফরমাইয়ে।

আমি হেসে বললাম, উর্দু'টা রপ্ত করছিস বুঝি?

চেষ্টা করছি। বাংলাদেশে উর্দু'কে রাষ্ট্রভাষা করতে চেষ্টা করেছিল কায়েদে আজম জিন্নাহ। তখন তো ছোট ছিলাম কিছুই জানিনা। বড় হয়ে টেলিভিসনের সুইচ দিলেই যে ভাষা কানে ঢোকে তাকে ওরা মানে হুজুররা বলে হিন্দী, আমি বলি কস্মিন কালেও তা নয়। হিন্দী'র উর্দু'র সংমিশ্রনে খিচুড়ি। তাই রাষ্ট্রভাষা শেখার তাগিদে উর্দু'টা শিখছি।

এটা বেশ মনগড়া যুক্তি বটে।

তুমি তো তা বলবেই। তোমরা আমরা ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে খিঁচুড়ি ভাষা ব্যবহার করি, দিল্লীর বাদশাহেরাও তাই করে। তুমি লক্ষ্য করেছ একটা অদ্ভুদ সংযোজনা। পশ্চিম বাংলার শতকরা পাঁচজন মুসলমান উর্দু'তে কথা বলে। দূরদর্শনে মুসলমানদের কোন পরবে যে অনুষ্ঠান হয় তা আগে হতো

চোস্ত উর্দুতে। সম্প্রতি কিছুটা কমেছে। যে রাজ্যের শতকরা—পঁচানব্বই জন উর্দু জানেনা বোঝেনা তাদের উর্দু অনুষ্ঠান যখন শোনায় তখন মনে হয় জিন্নাহ ছিল খাঁটি মুসলমান যে বলত মুসলমানদের মাতৃভাষা হবে উর্দু। দিল্লীর বাদশাহেরা যে জিন্নাহকে কতটা সম্মান করেন তাতো বুঝতেই পারছ। একে হিন্দীর অত্যাচারে আমরা নাজেহাল, তার ওপর উর্দু চাপিয়ে দিলে জীবন যাবে কাকা। তাই অভ্যাস করছি।

সাবাস বেটি। পশ্চিম বাংলায় একমাত্র তুই-ই বোধহয় প্রথম প্রতিবাদ জানালি।

হাঁ। দূরদর্শনকে পত্রাঘাত করেছি। এতেই কি জ্বালার অবসান। যে শতকরা পাঁচজন উর্দুভাষী এ রাজ্যে বাস করে তার অর্ধেক লোক লেখাপড়া জানেনা। বাকি অর্ধেকের একাংশ সামান্য লেখাপড়া জানে অথচ এখানে উর্দু এ্যাকাডেমির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়ে গেল। ভোটের দালালরা কেমন অদ্ভুদ নজীর সৃষ্টি করল! এখানে ওড়িষাভাষী ও হিন্দীভাষীর সংখ্যাও কম নয়। তাদের জন্য কোন এ্যাকাডেমির প্রস্তাব নেই। কেন, ওদের ভোট কি ভোট নয়। আসলে শাসকদের দুষ্ট বুদ্ধি ওরা বুঝতে পারে নি, অথবা বুঝতে চায় না। মহাকরণের সুলতানরা এই ভাবে কতদিন ভোট সংগ্রহ করবে? ওদের আসল উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক বিভেদটা বজায় রেখে ফায়দা তোলা। এটা নাকি গণতন্ত্র। এই পাপ করেছে কংগ্রেস, সেই পাপকে বজায় রেখেছে মার্কসবাদীরা।

বললাম, বাহোবা, বাহোবা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিভেদটা বজায় না রেখে উপায় নেই। তিরিশ লক্ষ বেকার যুবশক্তিকে সুপথে চালিত করতে না পারলেও বিপথে পরিচালনার চক্রান্তটা ওরা জমিয়ে রেখেছে। যারা উর্দুকে অযাচিতভাবে মর্যাদা দিতে ব্যস্ত তারা কিন্তু ভারতীয় সর্বাধিক ভাষার জননী সংস্কৃতকে শুধুমাত্র অবহেলা করছে না, বরং অমর্যাদার আস্তাকুঁড়েতে ফেলে দিতে ব্যস্ত। টুলো পণ্ডিতেরা টোল বন্ধ করছেন, বোধহয় আনন্দমঠের সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দৃশ্য তাঁরা দেখেছেন। এরা না পাচ্ছেন বৃত্তি, না হচ্ছে যথাযথ পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা। এই বৈষম্য আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে তা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে একদল উর্দুভাষী মিছিল করে মহাকরণ অভিযান করে। তাদের কথা উর্দুকে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। এরপর যদি ওরা উর্দুভাষীদের জন্য একটি উর্দুস্থান রাষ্ট্রের দাবী করে তা হলে আমরা চমকে উঠব না। ভোটের দালাল ও কাঙ্গাল রাজনৈতিক দলগুলো এই ভাবে সাম্প্রদায়িকতা জিইয়ে রেখে দেশের ও দশের সর্বনাশের পথ খুলে দিচ্ছে আমরা নীরবে তা সহ্য করছি। প্রশ্ন করলে, ওরা বলবে সংহতি রক্ষার জন্য এটা অপরিহার্য। অথচ এই সব উর্দুভাষীরা যে সব রাজ্য থেকে এসেছে সে সব রাজ্যের অন্যতম সরকারী ভাষা আজও উর্দু করতে কেউ পারেনি। বর্তমান প্রশাসককে জিন্নাহের উত্তর-পুরুষ বললে খুব ভুল হবে কি?

মলয়া বাধা দিয়ে বলল, ঠিক বলেছ কাকা, আর শিক্ষার প্রণালী আরও

চমৎকার। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ইংরেজি হটিয়ে ওরা কর্তব্য শেষ করেনি। ক্লাশ পরীক্ষাও বর্জন করা হয়েছে। আগে প্রতি বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার মত প্রাথমিক পরীক্ষা হত। তাতে প্রতিযোগিতা ছিল, ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ত, শিখত এখন তা বন্ধ অর্থাৎ পড়ুয়ারা কি পড়ল অথবা শিখল তার মান স্থির করা হয় না। বছর পেরোলেই ওপর ক্লাশে তুলে দেয়। শিক্ষকদেরও পোয়াবারো। তাদের আর কষ্ট করে পড়াতে হয় না। বছর শেষে ক্লাশ প্রমোশন নিরাপদে দিয়ে চলেছে। বেতনটি মাসে মাসে পেতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। শিক্ষা ব্যবস্থা মাতৃ-ভাষায় দেওয়ার উৎকট চেষ্টার পরিণতি কত ভয়ঙ্কর তা জানা যাচ্ছে এইসব ছাত্ররা যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির পরীক্ষায় গাদা গাদা ফেল করছে। এসবের ব্যবস্থা না করে আমাদের সুলতানরা উর্দুর ঊর্দ্ধগতি করতে আদাজল খেয়ে নেমেছে।

আমি অবাক হয়ে মলয়ার কথা শুনছিলাম। তার পালা শেষ হতেই বললাম, তোর দাদা অভিরাম কেমন পড়াশুনা করছে ?

দাদা! তা মন্দ নয়। আসছে বছরেই ডাক্তার হবে। মানুষ মারার লাইসেন্স পাবে।

মানুষ তো অমর নয়। কোন না কোন চিকিৎসকের হাতে মরতেই হবে যদি তার চিকিৎসা করার সঙ্গতি থাকে।

মলয়া হেসে বলল, চিকিৎসা। তা বটে! কলেজগুলোর হাসপাতালে চিকিৎসা হবে কি করে ? যারা স্থায়ী চিকিৎসক এবং অধ্যাপক তারা তো ব্যস্ত তাদের চেম্বার নিয়ে। সবার কথা না বললেও অধিকাংশই চেম্বার আর নার্সিংহোম নিয়ে ব্যস্ত। তাদের বেসিক যে ডিউটি যার জন্য জনসাধারণের পকেট কেটে অতি উচ্চমূল্যে সরকার তাদের পোষণ করছে সেটাই ওরা করেন না। নৈতিক চরিত্র তাদের কতটা দুর্বল তা তো সবাই জানেন কাকা। হাসপাতালে বেড পেতে হলে সবার আগে রুগী নিয়ে চেম্বারে যান, দক্ষিণা দিন, তারপর হাসপাতালের বেড এবং চিকিৎসা। এটাই নাকি গণতন্ত্র সম্মত পদ্ধতি। চিকিৎসা যারা করেন তারা হাউস-স্টাফ্। তাদের বেতন যা দেওয়া হয় তা একজন রিক্সাওয়ালার মাসিক উপার্জনের চেয়েও কম। অথচ এরাই সমগ্র হাসপাতালের প্রাণপুরুষ রোগীর প্রাণরক্ষক। অর্থাৎ সরকার অতি সামান্য ব্যয়ে এদের দিয়ে কাজ করায়, রোগীর সঙ্গে Public relation বজায় রাখে। সামান্য ত্রুটিতে এরাই মারধোর খায়।

মলয়াকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এসব বুঝি অভিরাম বলেছে।

দাদা বলে, দাদার বন্ধুরা বলে। আরও বলে, কলেজের হাসপাতালে যে সব যন্ত্রপাতি দরকার তা থাকে না। রোগীকে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ, অভিভাবকদের কিনে আনতে হয় সকলপ্রকার জীবনদায়ী ওষুধ। অধ্যাপকরা যা পড়ান তাতে শিক্ষার্থীদের কতটা উপকার হয় তা

বলা কঠিন কিন্তু হাউস স্টাফ্‌রা অতি হৃদ্যতার ও আন্তরিকতার সঙ্গে অধ্যাপকদের পড়াবার বিষয়গুলো পড়ান। তাতেই শিক্ষার্থীরা ভাল শেখেন অথচ প্রত্যেক হাউস স্টাফ্‌কে যুক্ত থাকতে হয় তাদের স্যারের সঙ্গে। অবশ্য বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের সবাই সমান নয়। আগ্রহী দরদী অধ্যাপকও থাকেন। তাঁরা সম্মানিত এবং ছাত্রছাত্রীদের অতি প্রিয়।

তোমার দাদা তো কলেজ ও হাসপাতালকে গভীরভাবে চর্চা করেছে মনে হয়।

বোধহয় তাই। কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার যা চেহারা তাতো শুনলে। দাদা বলে, এগুলো ব্যাধি যা সরকারী কলেজ ও হাসপাতালকে ক্রমেই রুগ্ন করে তুলতে সাহায্য করে। আর তার উপসর্গ হয়েছে জি-ডি-এ, আর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। রুগীর রক্ত দরকার। ব্লাড ব্যাঙ্কে গেলেই শুনতে পাবে, রক্ত নেই। পাশে এসে কানে কানে বলবে, কত টাকা দিতে পারবেন? বিরাট একটি অঙ্ক দাবী করে বলবে, এখুনিই রক্তের ব্যবস্থা হবে, টাকা দিলেই। এরা হল জি-ডি-এ, এরা সরকারী বেতন পায় তাতে উদর ভর্তি ওদের হয় না। মৃত্যুপথযাত্রী রুগীর অভিভাবকদের গলা কাটতে হাসপাতাল চত্বরে ঘোরে নিজের কাজ না করে।

বললাম, আর শুনতে চাই না।

কেন শুনবে না কাকা। মেথর, ইত্যাদি যারা সেবা করার লোক তারা পয়সা না পেল কোন কাজ করে না। রুগীর পকেট কেটে তারপর সেবা, চমৎকার ব্যবস্থা। দাদা বলছে, ওদের কি দোষ। যারা অধ্যাপনা করেন তারা যদি চেম্বারগুলোতে রুগীর পকেট কাটেন, তা হলে এদের দোষ কোথায়। রুগী যদি কখনও ছুটি পায় তখন দরজায় দরজায় দক্ষিণা দিয়ে তবেই মুক্তি। হাসপাতালের সেবা? আরও চমৎকার কলেজ হাসপাতালগুলো চলছে শিক্ষার্থী নার্স দিয়ে, স্টাফ নার্সের সংখ্যা এত কম যে একটা ওয়ার্ডে একটা করে স্টাফ নার্সও থাকেনা, থাকে শিক্ষার্থীরা। গোটা কলেজ হাসপাতালগুলো চলছে হাউস স্টাফ, আর শিক্ষার্থী নার্স দিয়ে। সরকারের খরচ কম কিন্তু রুগী নিরাময়ে এটা কতটা উপযোগী ব্যবস্থা তা ভুক্তভোগীরাই জানে। দাদা বলে, ডাক্তারী পড়তে না গেলে এসব তো জানতে পারতাম না। হাসপাতালের খাবার? আহার্য সাধারণে কুকুরের ভোজ্য কিনা তা বলা কঠিন, আর খাবারের পরিমাণ এত কম যাতে রুগীদের শতকরা পঞ্চাশজনই বাড়ি থেকে খাবার এনে খায় অথচ বাকি পঞ্চাশজনকেও পেট ভর্তি খাবার দেওয়া হয় না। কোথায় যায় খাবারের বাকি অংশ?

বললাম, সরকার এ [illegible] না।

জানে কাকা জানে। সরকারের উপর[illegible]য় কেমন ঘুণ ধরেছে তাতো জান, তাই নীচের [illegible]য় নজর দেবার সাহস তাদের নেই। গরীব মানুষরা হাসপাতালে যায় [illegible]পায় হয়ে। আর যাদের [illegible] করার সামর্থ্য আছে তারা যায় বিশেষজ্ঞদের সা[illegible] পেতে যা অর্জন করে[illegible] চেম্বারে বিশেষ প্রণামী দিয়ে।

হাসপাতালের এই দুরবস্থার জন্যই নার্সিংহোমগুলো ফেঁপে ফুলে উঠছে আর এইসব নার্সিংহোমের ছত্রছায়ায় বসে তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত সরকারী ডাক্তার অধ্যাপকরা পকেট ভর্তি করছে।

বললাম, এসবই নেতিবাচক কথা, ইতিবাচক কিছু বল।

যদি কারুর কোন জানাশোনা লোক থাকে হাসপাতালে, কেউ যদি প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা হলে তারা সুচিকিৎসা পায় নিজ খরচে এবং বিশেষজ্ঞদের সাহায্য পায় বিনামূল্যে।

মলয়াকে বাধা দিয়ে বললাম, কে যেন ডাকছে। দেখতো।

বাইরে গিয়েই মলয়া ফিরে এসে বলল, একটা ফকির। বোধহয় ভিক্ষা চায়।

মলয়ার কথা শেষ হবার আগেই দরজায় যার চেহারা দেখা গেল সে আমার পরিচিত, বাল্যের সহপাঠী আখতার আলি। তার চেহারার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে বেশভূষা সমেত কিন্তু এক দৃষ্টিতে তাকে চিনতে কষ্ট হয়নি। মলয়া অবাক হয়ে দেখছিল। ভাবছিল, কে এক অদ্ভুদ দর্শন লোক সরাসরি তার দামুকাকার ঘরে ঢুকল। মলয়ার মনোভাব বুঝতে কষ্ট হল না। তার মনে সাহস জোগাতে বললাম, বস রে আখতার। কোথায় ছিলি এতদিন।

এতক্ষণে মলয়া বুঝল আগন্তুক আমার পূর্বপরিচিত।

বসতে বসতে বলল, তোরা কোথায় যাস রে দামু?

কাশী-বৃন্দাবন-মথুরা ইত্যাদি তীর্থস্থানে।

আমাদের তীর্থস্থানেও আমরা যাই। দরগায় দরগায়। কখনও শ্রীহট্ট, কখনও আজমীঢ়।

সিদ্ধিলাভ করলি?

ঠাট্টা করছিস দামু। আমরা অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী, সমাজ সংস্কারে বিশ্বাসী, আমরা কুসংস্কারমুক্ত। যারা কট্টর তারা আমাদের পছন্দ করে না, কেননা আমরা সুফী মতাবলম্বী। আমাদের নিজস্ব সম্প্রদায়কে তামাম দুনিয়ার মুসলমান না-পাক মনে করে। যারা অবিশ্বাসী, যারা ধর্মের শিক্ষা নিতে চায় না তাদের আত্মার মুক্তির জন্য সুফীবাদ। আমরা হলাম দরবেশ।

আমি তোর ধর্মকথা শুনতে চাই না। কদিন থাকবি তো? আমার বাড়িতে তসরীফ্ রাখলে খেদমতের কোন ত্রুটি হবে না। এই কটা দিন মোটামুটি শান্তিতে থাকতে পারবি।

মলয়াকে বললাম, কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে পাশের ঘরটা খুলে দে। আখতার কদিন থাকবে এখানে। বাড়িতে বলে দিস একজন বিশিষ্ট অতিথি এসেছেন।

মলয়া চলে যেতেই আখতার ঝোলাঝুলি নামিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলল, তোর খবর বল দামু।

হেসে বললাম, চল্লিশ বছর আগেও যা ছিলাম আজও তাই আছি। সেই ছোটবেলা থেকে গায়ে-গতরে বড় হলেও মনের দিক থেকে বড় হতে পারিনি।

বিশ বছর আগে তোর সঙ্গে যখন আমার শেষ দেখা তখন তো তোকে দেখেছি ঘোরতর সংসারী। একদিন তোদের গাঁযের বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা। সেই বলেছিল, আখতার হজ্জে গেছে। তোর বিবিজান ছেলেমেয়ে কোথায়?

আখতার বলল, বিবিকে তালাক দিযে ছেলেমেয়েকে ফুফুর (পিসীর) কাছে রেখে বেরিযে পড়লাম। হজ্জ করতে নয। গুরুর সন্ধানে।

অবাক হযে তার মুখের দিকে তাকিযে রইল ।

কি ভাবছিস?

ভাবছি, কি অপরাধে বিবিকে তালাক দিলি?

কোন অপরাধ নয দাদু। আমার অধ্যাত্ম জীবনে বিঘ্ন ঘটবার আশঙ্কা ছিল।

আজ পর্যন্ত বহু পীর মোল্লা মুশল্লীর সংসর্গে এসেছি কিন্তু সবারই ঘর সংসার ছিল বা আছে। তাদের মধ্যে অনেকেই সাধকও ছিলেন, কিন্তু তাদের তো বউ তালাক দিতে হযনি। এমন কি অনেকের দু তিনটে বিবিও রযেছে। শুনেছি ইসলাম ব্রহ্মচর্যকে স্বীকার করে না। সেটা আলাদা বিষয। তোর প্রায বিগত যৌবন, স্ত্রী কোথায যাবে, কি খাবে তার চিন্তা কি তুই করেছিস কখনও।

তা শাস্ত্রসম্মত অর্থাৎ নব্বই দিন তাকে খোরপোষ দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম, তার মোহরানা পুরো করে দিযেছিলাম। তারপর আর কোন দাযদাযিত্ব আমার নেই।

শুনেছি তালাকের পরও বিবি আবার বিযে না করা পর্যন্ত তাকে প্রতিপালন বাধ্যতামূলক।

তা করবে মেযের বাবা অথবা ভাইযেরা।

যার বাবা অথবা ভাই জীবিত থাকবে না?

আখতার বলল, আত্মীযস্বজন কেউ করবে।

বললাম, আমার মনে হয তোদের শাস্ত্রের পুরো ব্যাখ্যা এটা নয। অবশ্য এগুলো তোদের ব্যাপার আমাদের কিছু নয। তোদের কাজে নাক ঢোকানো উচিত নয তবে মানবতাবোধের গলা টিপে মেরে শাস্ত্রের দোহাই দিলে তোর সাধন মার্গের কতটা সাফল্য হবে তা খোদা মালুম।

আখতার মুখ নীচু করে শুনছিল। কোন জবাব না দিযে আঙুল দিযে চেয়ারের হাতলটা খুঁটতে থাকে। মলয়া এসে বলে গেল, কাকা, তোমার আদেশ প্রতিপালন করেছি।

আখতার মলযার দিকে উদাসভাবে তাকিযে আমাকে বলল, ব্যক্তিগত কথা আর বাড়িযে লাভ নেই।

ছোটকু চা ও খাবার নিযে হাজির। মলয়া সুযোগ বুঝে বেরিযে গেল।

বললাম, এবার কিছু জলযোগ করে নাও দরবেশ মিঞা। সাধন মার্গের কথা পরে হবে।

আখতার চাযে চুমুক দিতে দিতে বলল, আমাদের সাধন মার্গের মূলসূত্র হল আত্মোপলব্ধি আর সর্বজনে সমান চোখে দেখা। আমাদের কাছে হিন্দুও যা

মুসলমানও তা, খৃষ্টানও আলাদা কিছু নয়। আমরা মানবপ্রেমিক, সর্বধর্ম সমন্বয়ে আমাদের কর্ম জগত পরিব্যাপ্ত।

তাই বুঝি বিবিকে তালাক দিয়েছিস?

আখতার চুপ করে গেল। চা জলখাবার খেয়ে একটা বিড়ি ধরালো।

আমিও চুপ করে রইলাম।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল, ছোটবেলার কথা তোর নিশ্চয়ই মনে আছে! তখন আমরা কলেজে পড়তাম। মাঝে মাঝে ফুটবল মাঠে গোল হয়ে বসতাম আর বিশ্বজয় করতাম।

আমি হাসলাম।

হাসছিস কেন?

কোন বিষয় নিয়ে আজ বিশ্বজয় করবি তাই ভেবে হাসছি।

কথায় কথায় পুরানো কথা মনে পড়ল। সেদিন আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল বিবাহ। কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যে রক্ত আমাদের দেহে টগবগ করছে, বিবাহটা ছিল মুখরোচক এবং শ্রুতিরোচক আলোচ্য বিষয়। সেদিন তুই বলেছিলি, একটি পুরুষ আর একটি নারী যদি একত্র বসবাস করার সম্মতি দেয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মত আচরণ করে তা হলেই বিবাহ সিদ্ধ, বিবাহের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ। বল, তাই কিনা? অর্থাৎ তোর কথা হল আমাদের ধর্মশাস্ত্রের মতই। আমাদেরও স্ত্রী পুরুষের সম্মতি নিয়েই কাবিলখানা লেখা হয়, বিবাহ সিদ্ধ হয়। কিন্তু তোর মতানুযায়ী বিবাহে প্রয়োজন দুজনের বোঝাপড়া। তার বন্ধনসূত্র হল পরস্পরের প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালবাসা, যাকে বলা হয় প্রেম। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রেমের ক্ষীণ সুতোটি বোঝাপড়ার অভাবে সহজেই ছিঁড়ে যায়। তাতে বিবাহের উদ্দেশ্য বার্থ হয়।

পরীক্ষা করে দেখেছিস কি?

তার সুষ্ঠু পরীক্ষা করার সুযোগ কখনও পাইনি কিন্তু যে প্রেম দিয়ে চিরকালের বন্ধন সৃষ্টি হয় তা কোন ক্ষেত্রে পাওয়া যায় ভাই, কঠিন ধরণীর বুকে তা পাওয়া যায় না।

আমি আখতারকে বাধা দিলাম না। আখতার ম্লান হয়ে সে বলল, আমি রহিমাকে বিয়ে করেছিলাম তার সম্মতি নিয়ে। কিন্তু সংসার সাজাতে পারিনি, কেননা সে আমার কাছে যা চেয়েছিল তা দেবার ক্ষমতা আমার ছিল না। তার মনে জন্মেছিল হতাশা। তাই তাকে বন্ধনমুক্ত করতেই তালাক দেওয়া শ্রেয় মনে করেছিলাম। তোদের মত আদালতের আশ্রয় নিতে হয়নি, আমাদের মৌখিক তালাকই যথেষ্ট। তাই তাকে তালাক দিইনি ভাই, মুক্তি দিয়েছি, নিজেও মুক্তির পথ খুঁজছি। আমাকে দোষারোপ করতে পারিস কিন্তু আমি আমার বিবেকের কাছে পরিচ্ছন্ন রয়েছি। যদি রহিমাকে ছেড়ে ফাতেমার আঁচল ধরতাম তা হলে সব অভিযোগ মেনে নিতাম।

আখতার দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বললাম, এ বিষয় বাদ দিয়ে তোর সাধন মার্গের কথা বল আখতার।

কথাটা শেষ করতে দে। রহিমাকে বিয়ে করার পর মনে হয়েছিল রহিমাকে আমি খুবই ভালবাসি, ভালবাসাটা তার প্রাপ্য। আবার ভাবতাম রহিমাও আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। কিন্তু বাস্তবের কশাঘাতে কোথায় উবে গেল সেই ভালবাসা। তার প্রচণ্ড আক্রমণে রোজই রণে ভঙ্গ দিয়ে বসে থাকতাম নয়নজুলির বাঁধে, অনেক রাতে আসতাম। ঘুমন্ত রহিমার পাশে চুপ করে শুয়ে শুয়ে ভাবতাম, অর্দ্ধেক নারী আর অর্দ্ধেক নরের খোয়াব আর যেন দেখতে না হয়।

বাধা পড়ল ছোট্কুর আগমনে।

মেজকর্তা অনেক বেলা হয়েছে। মা বললেন, এবার স্নানাহার করতে।

ছোট্কু বেশ সাধুভাষা ব্যবহার করে তার বিরক্তি জানাতে। বুঝলাম, বেলাটা বেশি হওয়াতে বাড়ির সবাই বিরক্ত। এবার ভাল মানুষের মত গৃহস্থালী কাজ করতে হবে।

আখতারকে পাশে নিয়ে খেতে বসেছি। গৃহকর্ত্রী পরিবেশন করছেন। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করছেন, ভাত দেব ঠাকুরপো, ডাল দেব ঠাকুরপো।

আখতার জিজ্ঞাসা করল, তোর বউকে তো দেখলাম না।

হেসে বললাম, আমার বউ পর্দার ওপারে।

তোদের ঘরে তো পর্দানশিন কোন মেয়েই নয়। আমাদের খানদানী আমীর লোকের ঘরেই পর্দা, গরীব গুবরোরা পর্দার ধার ধারে না।

থাম থাম আখতার। বিয়ে করার সময় পাইনি, যাওবা সময় পেলাম তাও বৃথা গেল। মনের মতন বউ খুঁজে পেলাম না।

মানে ;

আমার থিওরি তো তুই বললি। কেউ রাজি নয়। আমি তার গলায় মালা দেব সে আমার গলায় মালা দেবে কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সামনে, আমরা স্বীকার করব যে আমরা স্বামী-স্ত্রী। এই প্রস্তাবে কেউ রাজি নয়। কারণ, ওটা বিয়ে নয়। ভণ্ডামী। অথচ ভণ্ডামী দিয়েই মনুষ্য সমাজের পত্তন, বলতে পারিস সৃষ্টি। আর মনের দিক থেকে আমরা হয়ে পড়েছি স্বার্থপর, কতকগুলো লোকাচার, ধর্মের নামে তঞ্চকতা দিয়ে বাঁধতে না পারলে তা নাকি বিয়ে নয়, ব্যভিচার। তাই বউ জোটেনি ভাই। বিয়ের পিঁড়িতেও বসতে পারিনি, রেজিস্টারের খাতাতেও সই করার সুযোগ পাইনি। বউদি, আখতারকে আরও দু-চার টুকরো মাছ দাও। ও সন্ন্যাসী লোক, ভালমন্দ সব সময় খেতে পায় না, ভাল করে ক'দিন খাইয়ে দাও।

আখতার হাত নেড়ে বলল, না না, আর দরকার নেই। তুই যে বললি সময় পাসনি, কেন রে ?

বললাম, বিশ বছর পর তোর সঙ্গে দেখা। বিশ বছরের ইতিহাস তোকে শোনাতে পারব না ভাই। তবে যাকে সময় বলে তা সত্যিই পাইনি। তাকিয়ে

যখন দেখলাম, তখন পঁয়ত্রিশটা দুরন্ত বসন্ত পেরিয়ে মনটাকে করে তুলেছিল বৃদ্ধ আর দেহটাকে অপটু। নে, এসব কথা পরে এবার হাতমুখ ধুয়ে একটা দিবা-নিদ্রা দে। সব কিছুরই পরিসমাপ্তি ঘটাতে দিবানিদ্রার মত দাওয়াই আর নেই।

আখতারকে সব কথা বলতে পারিনি। সে নিজে সংসারত্যাগী দরবেশ। আমাদের নিত্যকার জীবনধারার সঙ্গে তার পরিচয় অতি সামান্য। সে খুঁজছে মানবাত্মার মুক্তির পথ আর আমি ভেবেছি, সামনে যারা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, রুগ্ন দেহমন নিয়ে কঙ্কালের শোভাযাত্রা করে বেড়াচ্ছে তাদের মুক্তি কি করে হয়। তাই তার সঙ্গে আলোচনা অবান্তর। কিন্তু আখতারও তো একটা ঘর চেয়েছিল, পায়নি। তারও দেহে সকল ইন্দ্রিয় সক্রিয় ছিল, তাও ব্যর্থতায় দীর্ণ। আমার মতই তার মনটা ছিল, থেকেও সে ব্যর্থতার হা-হুতাশে আজ নিজেকে হারিয়ে খুঁজছে পরবর্তী জীবনের সুখ। এই অনুসন্ধান তো কাপুরুষের ধর্ম। আখতার তো বলিষ্ঠভাবে নিজের দাবীর সনদ লিখিয়ে নিতে পারেনি সংসারের কাছ থেকে তাই পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে তাকে পালাতে হয়েছে।

বিকেলবেলায় আখতারের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে নদীর ধারে গিয়ে বসলাম। বাড়ি থেকে নদীর কিনারা অবধি কেউ কোন কথা বলিনি। শুকনো বালির গাদায় বসে নদীর ঢেউয়ে নর্তনশীল নৌকার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আখতার বলল, ওই নৌকাগুলোর মত ঢেউয়ের মাথায় নাচতে নাচতে আমরা চলেছি, নৌকাডুবির যেমন ভয় আছে তেমনি তীরে ফিরে আসার আশ্বাসও আছে, সবই অনিশ্চিত। কথা বলছিস না কেন দামু? হাঁরে, তুই কলকাতায় যাস না আজকাল?

যাই মাঝে মাঝে।

কলকাতায় বুঝি ভাল লাগে না?

কলকাতার মাটি? কলকাতার মানুষ? কলকাতার জীবনযাত্রা? কোনটা? সব মিলিয়ে বলবি। আমি তো নদীর এপারে আর আসি না, তোর কাছে শুনতে চাইছি।

প্রথম কথাটা হল কলকাতার মাটি। সে মাটি কার, সে সমস্যাটা আজও মীমাংসা করতে পারিনি। কলকাতা ছিল বাংলার ও বাঙ্গালীর। সেটা হল অতীত। কলকাতার মাটি আর বাংলার মাটি নয়। মাড়োয়ারী, কালোয়ার, বহির্বঙ্গের উর্দুভাষীরা ধীরে ধীরে গ্রাস করে কলকাতার মাটি। অপরাধ তাদের নয়। যারা ছিল মাটির মালিক তারা গঠনমূলক কিছু না করে গৃহবিবাদ, ভাগাদারী, আলস্যের শিকার হয়ে তাদের মাটি যাকে বিক্রি করে অথৈ জলে ভাসছে। অ ক্ষয়িত সমাজের চেহারা এটাই। বেকার সংখ্যা তিরিশ লক্ষ, এদের কর্মসংস্থান করার মৃদু প্রয়াস শূন্যে বিলীন হয়েছে প্রশাসনের দুর্নীতি আর অযোগ্যতায়। কলকাতার মাটি ভালবাসি। ভালবাসাটাই তো সব নয়।

বাঙ্গালী অভিজাত শ্রেণী তৈরী করেছিল ইংরেজ। মুর্শিদকুলী খাঁ হিন্দু জমিদার তৈরী করলো, কারণ মুসলমান জায়গীরদাররা রাজস্ব আদায় করে নবাবের রাজকোষে জমা দিত না। সরকারী ফৌজ হাজির হবার আগেই তারা বিবি-বাচ্চা নিয়ে সটকে পড়ত উত্তর ভারতের কোন অখ্যাত অজ্ঞাত স্থানে, যাবার সময় রাজকীয় অর্থ যা কিছু হাতের কাছে থাকত তা নিয়ে যেতে ভুল করত না। একদিকে বাদশাহী তাগিদে মুর্শিদ অস্থির। বাদশাহ আওরঙ্গজীব তখন মারাঠা মুষিকের কামড়ে অস্থির, টাকার দরকার, টাকার বড় জোগানদার মুর্শিদকুলী খাঁ। এমত অবস্থায় মুসলমানদের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করে হিন্দুদের হাতে দিয়ে রাজস্ব বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল নবাব বাহাদুর। ইংরেজ বাংলা দখল করার আগেই বাঙ্গালী হিন্দুচরিত্র ভালভাবে অধ্যয়ন করেছিল। বাঙ্গালী হিন্দুরা মুসলমান নবাব দরবারে শেরওয়ানি চোগা চাপকান গায়ে জড়িয়ে সেলাম যেমন জানিয়েছে তেমনি ইংরেজ প্রভুর দরবারে হ্যাটকোট নেকটাই বেঁধে প্রভু ভক্তির পরকাষ্ঠা দেখাতে ত্রুটি করেনি। মুসলমানরা তখনও সুরমা চোখে দিয়ে বাদশাহীর স্বপ্ন দেখছিল, তাই ফিরিঙ্গী সঙ্গ পরিত্যাগ ছিল স্বাভাবিক। তৈরী হল বাঙ্গালী হিন্দু অভিজাত বা জেন্টু ক্লাশ।

জেন্টুদের পোয়াবারো ছিল ইংরেজ রাজত্বের প্রথম শতকে। ইংরেজ রাজ্য চালাতে দেশী ইংরেজি জানা লোকের দরকার ছিল। সে কাজ বিশেষ সেবকের মত হিন্দুরা করে রাজধানী কলকাতার বুকে অর্থসম্পদে নেটিভ সমাজে সম্মানীয় আসন দখল করেছিল। এর সঙ্গে ছিল মদ্যপান, বারবণিতা গৃহে হুল্লোর, অকারণে নিজেদের দম্ভ প্রকাশ করতে বিলাসবহুল উৎসব, কেউ বুলবুলির লড়াই দেখেছে, কেউ বিড়ালের বিয়ে দিয়েছে, কেউ আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ উপভোগ করেছে। এদিকে ফুটো কলসীর জল গড়িয়ে যখন তলানি পড়েছে তখনও তাঁদের হুঁস হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারী, আভিজাত্য, জেন্টু জীবন থেকে ধীরে ধীরে হস্তান্তরিত হয়েছে। প্রথম পুরুষ যা করেছে উত্তর-পুরুষ তা নিঃশেষ করেছে। এই হল কলকাতার অতীত ও বর্তমানের চিত্র। মাটি আর নেই আখতার। বাঙ্গালীর কবরখানার মাটিও এখন দুর্লভ।

তবে কলকাতার মানুষ সেকালেও ছিল, আজও আছে। কলকাতা হল শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতির পীঠস্থান। একে বজায় রাখতে আজও বহু মনিষী এবং দেশহিতৈষী নানা ভাবে কলকাতার মহিমা ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। বাধা আসছে। বিশেষ করে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীদের ধাক্কা সামলে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বজায় রাখা কঠিন হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে,অদূর ভবিষ্যতে যদি গোটা কলকাতার মানুষ অবক্ষয়ের মূর্ত প্রতীক হয়, এবং কলকাতা যদি হয় অতীত ঐতিহ্যের ফসিল তা হলে অনুশোচনা কেউ যেন না করে। কলকাতার যে চিত্র সেই চিত্র গোটা পশ্চিম বাংলার। অবক্ষয় আর অপসংস্কৃতি বাঙ্গালীর জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। যে যুবশক্তি দেশের গৌরব তাদের সামনে কোন ভবিষ্যতের প্রত্যয় না থাকায় তা ক্রমেই অধঃপতিত সমাজের প্রতীক হয়ে

উঠেছে। তবে এই মহাভারতের কথা গরল সমান। যিনি-ই বলুন তা বাংলার অপমান।

আখতার বলল, চল ফিরে যাই। সূর্য ডুবছে। নদীর জলে লালিমার ঢেউ। তারপর রূপোর ছটায় ভেসে বেড়াবে ঢেউয়ের মাথায় রূপোলি দশমীর চাঁদ।

ওহে দরবেশ, তুই যে কবি হয়ে উঠেছিস।

কবি তবে ছন্দহীন, মাত্রাহীন।

নে চল।

কদিন পর আখতার বলল, এবার ছুটি।

আবার কবে আসবি?

খোদা মালুম। বিশ বছর পর এসেছি নিজের ঘরে, আবার কবে আসব তা বলা কঠিন।

বিশ বছর পর যদি আসিস তখন কি বেঁচে থাকব রে আখতার। প্রতি বছর যদি আসিস তা হলে পুরানো দিনের স্মৃতি মন্থন করতে পারব। অপার আনন্দ পাব।

আমি যে দরবেশ। আমি প্রতিশ্রুতি দেব অথচ রক্ষা করব না তাতো হয় না ভাই। তবে সুযোগ পেলেই আসব। কখনও দু' মাস হতে পারে, কখনও দু'বছর হতে পারে।

বললাম, তথাস্তু।

দরবেশকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম।

বাড়িতে ফিরেই দেখি আমার জন্য অপেক্ষা করছে বিমল।

কি সংবাদ বিমলবাবু?

বাবুর কোন খবর থাকে না দাদা, খবর থাকে আমাদের মত অভাজনদের। আপনাকে নিতে এসেছি।

আমার সৌভাগ্য! কোথায় যেতে হবে?

কলকাতায়।

বাপরে। পারব না বিমল। ট্রেনে কেমন ভীড় তাতো জান। আমি দম বন্ধ হয়ে মরে যাব। অকারণে নরহত্যার দায় গ্রহণ করবে! ঠাট্টা নয় বিমল। কলকাতা ছিল আমার কাছে একটা স্বপ্নের রাজ্য। সেই স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে গেছে। এখন কলকাতা শুনলেই আতঙ্ক হয়।

ঠাট্টা করছেন দাদা!

না ভাই. ক'মাস আগে কলকাতায় গিয়েছিলাম। তিলোত্তমা কল্লোলিনীর কলকাতা দেখে এসেছি। তিল আছে উত্তমা নেই, কল্লোল আছে তবে সেটা আনন্দের নয়। রাস্তায় কল্লোল 'চলবে না, চলবে না'। ফুটপাতের জমিদারী নিয়ে ছন্নছাড়া গৃহহারা মানুষের যতিহীন কটুকাটব্য, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের কল্লোল অভাব অনটনের। উচ্চবিত্তের কল্লোল মদের দোকানে, অভিজাত হোটেল অন্ত

অর্থে রঙ্গালয়ে যেখানে সুরাসাকির প্রাচুর্য। পরিবহনে কল্লোল যন্ত্রণাদায়ক পরিবহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতায় তৎসহ মনুষ্যত্ববোধহীন কিছু লোকের তাণ্ডব, বাজার হাটে কল্লোল উচ্চমূল্যে অধিক লাভের আশায় নিকৃষ্ট বেসাতি বিক্রয় নামক পাচার করার চেষ্টায়। কল্লোল আদালতে শিক্ষিত মাননীয় করণিককুলের উৎকোচ গ্রহণে যদৃচ্ছ ব্যবহার, অফিস কাছারিতে কল্লোল কর্মীদের কর্ম না করার ঘোড়দৌড়ের মত রেসে। এমন একটা কল্লোলিনী শহরকে ভয় করে বিমল। আমার দেহাতি গরীবগুবরো, আমরা ওই কল্লোলে চেপ্টা হয়ে যাব। সেটাই কি চাও?

কিন্তু এর জন্য দায়ী কে?

দায়ী? কে দায়ী? সবাই বলবে আমরা দায়ী নই। ভগবান আর ভাগ্য দায়ী। রাস্তায় যারা কল্লোল করে 'চলবে না চলবে না' বলে তারা শ্রমিক, ছাত্র, কর্মচারী। এরা এখন রাজনীতির দাদাদের হাতের পুতুল। যেমন তারা খেলায় তেমনি ভাবে খেলছে। অভিযোগ আছে কিন্তু তার প্রতিবিধান করার পথ যে কি তা তারা খুঁজে না পেয়ে রাজনীতির দাদাদের খপ্পরে পড়ে রাস্তায় জিগীর দিচ্ছে। যিনি শ্রমিকদরদী তিনি স্বয়ং শ্রমিক নন, যিনি ছাত্রদের পরিচালনা করছেন তিনি কোন ত্রেতাযুগে হয়ত স্কুলে পড়েছেন, যিনি কর্মচারীদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি হয়ত এমন কোন লোক যার পৈতৃক ব্যবসায় কর্মচারীরা সবচেয়ে বেশি শোষিত। তাই ভাবছি দায়ী কে! উত্তর খুঁজে পাইনি বিমল। শ্রমিক দরদী রাজনীতির দাদারা একদিকে শ্রমিকদের উস্কে দেন অপর দিকে মালিকদের কাছ থেকে মাসহারা পেতে থাকেন যাতে শ্রমিক আন্দোলন দমনে তাকে হাতিয়ার করতে পারে মালিকরা। ছাত্ররা পড়ে না। পরীক্ষায় নকল করে। নকল করার গণতান্ত্রিক অধিকার কখনই তারা ছাড়তে চায় না। যে তার প্রতিবন্ধক তাদের জন্য হাসপাতালে বেড খালি রাখতে হয়। এবারকার মত আমায় ক্ষমা করিস বিমল। তোদের ফোরম্যান করতে যদি চাস তা হলে অবশ্য অন্য কোন দাদার বাড়িতে ধর্ণা দে।

বিমল ক্ষুন্নভাবে বলল, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি দাদা।

তোর কথা শেষ হবার আগেই আমি শেষ হয়ে যাব।

বিমল হাসল। আমিও।

বললাম, তুই তো নানা কল্লোলের কথা বললি, আমাদের মলয়া হাসপাতালের কল্লোল কিছুটা সংগ্রহ করেছে তার দাদার কাছ থেকে। সে সব শুনলে হকচকিয়ে যাবি।

ওসব কল্লোল কারও তো অজানা নয়। সর্বপ্রথম, খাবার চুরি। রুগীর পেট না ভড়লেও হাসপাতালের কর্মীদের পেট ভর্তি হয় কল কল্লোলে। রুগীকে অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ দেবার কোন ব্যবস্থা না থাকলেও অভিভাবকেরা যে ওষুধ কিনে দেয় তাও চলে যায় বাজারে, একেও বলে চুরি। আর যারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তারা প্রয়োজনেও হাসপাতালে পা দেন না, সরকারী টাকা পান এবং হাসপাতালে নাম লিখিয়ে চুটিয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিশ করেন, হাসপাতালের সব

কিছু নির্ভর করে হাউস স্টাফের ওপর যারা পারিশ্রমিক যা পান তার চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পান চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা। সরকার নির্বিকার। দাদা, হাসপাতাল বর্তমানে পাতালে রয়েছে। কোন সতী সীতার আহ্বানে রোগীরা পাতাল প্রবেশের অপেক্ষা করে। সাধারণ রোগভোগের জন্য রোগীরা হাসপাতালে যায় না, নিরুপায় হয়েই যায় অথচ তাদের জন্য উৎসাহজনক কোন ব্যবস্থা থাকে না। হাসপাতালের উপর তলার গলদ যতদিন না যাবে ততদিন নীচের তলায় শৃঙ্খলা আনা সম্ভব নয়, এটা তো কারও অজানা নয়। রাতের বেলায় রুগী জলের জন্য আর্তনাদ করলেও খুব কম ক্ষেত্রেই নার্স অথবা শিক্ষার্থী'রা এগিয়ে আসে সাহায্য করতে। চলচ্ছক্তিহীন রুগীর গলা শুকিয়ে কাঠ হলেও জল দেবার লোকের খুবই অভাব। রুগী বেড থেকে মেঝেতে যদি হঠাৎ পড়ে যায় তাকে বেডে তুলে দেবার লোক থাকে না। কোন ক্ষীণকায় নার্সের সাধ্য কি একটি লোককে তোলে বেডে। এই হল হাসপাতাল। বাস্তিঘর আছে, আবর্জনা আছে। নার্সও আছে। ডাক্তার আছে, নেই সেবার মনোভাব, নেই ওষুধ, নেই খাবার।

তুমি বোধহয় কোন হাসপাতালে থেকেছ।

থাকতে হয়েছিল দাদা। তবে গ্রাম্য হেলথ সেণ্টারে। হেলথ সেণ্টারের ডাক্তারকে হতে হয় সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। উনি হাড় কাটবেন, পা জোড়া দেবেন, প্রসব করাবেন, নিউমোনিয়া, টাইফয়েডের চিকিৎসা করবেন। তবে শহরের ডাক্তারদের মত কমিশন বেসিসে একজন বিশেষজ্ঞ বদলে আরেক জনের কাছে পাঠাবেন না। চিকিৎসকদের ওপর আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। যদি কেউ সমাজকে সেবা করতে পারে সে হল চিকিৎসক কিন্তু চিকিৎসা'বিদ্যা লাভ করে অধিকাংশ ডাক্তারই হয়ে পড়েন অর্থগৃধ্নু মনুষ্যত্ববোধ-হীন। তাই হাসপাতালে হাসপাতালে নানা অশান্তি, সেটাও হয়ত জনসাধারণ সহ্য করত কিন্তু রাজনীতি হাসপাতালে প্রবেশ করে হাসপাতালগুলোকে করে তুলেছে সত্যকার পাতাল। চিকিৎসকদের জনসাধারণ শ্রদ্ধা করেনা। নেহাত প্রাণের দায়ে ঘটি বাটি বিক্রয় করে তাদের কাছে যান কিন্তু শ্রদ্ধা বহন করে ঘরে ফেরেন না। এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

বললাম, রাজনীতি পঙ্কিল করে তুলেছে সমাজের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

হাসপাতালে গেলেই দেখতে পাবেন পোস্টারে পোস্টারে হাসপাতালগুলো ছয়লাপ। শুধু দাবী জানিয়ে চলেছে কর্মীরা, কাজ করার প্রতিশ্রুতি কোথাও তারা রাখেনি। এরা রাজনীতির দাদাদের অনুচর। হাসপাতাল চত্বরে মন্দির-মসজিদ তো আছেই, আছে চোলাইয়ের জমজমাট ব্যবস্থা। রয়েছে বম করেও কয়েকগণ্ডা চায়ের বে-আইনী দোকান। অকাজ-কুকাজ করার ঝুপড়ি আর একপাল বেওয়ারিশ কুকুর আর কর্মীদের শূয়োর-মুরগীর বিচরণের অবাধ অধিকার। হাসপাতালে শুধু ভয়, মৃত্যুর ও কর্মীদের হামলার। ডাক্তারদের ভয় জনসাধারণের ক্রোধের শিকার হওয়া এবং কর্মী'দের কাছে অযাচিত লাঞ্ছনা, নার্সদের ভয় অবমাননা, ধর্ষণ ও লাঞ্ছনা। ভীতির রাজ্য হল হাসপাতাল।

ছোটকু এসে দু'কাপ চা সামনে রেখে বলল, মেজবাবু, আপনি চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ুন। বড়-মা বললেন আজ নাকি অনেক কাজ!

বড়মা তথা আমার বড় বউদি আমাদের আলোচ্য বিষয়গুলো আড়াল থেকে শুনে অতি ভদ্রভাবে চা এগিয়ে ছেদ টানতে চান অপ্রিয় আলোচনার।

বিমল চা খেয়ে বেড়িয়ে যেতেই পর্দা নড়ে উঠল।

বড় বউদি এসে দাঁড়ালেন, আমার মুখের ওপর ভাল করে চোখ বুলিয়ে বললেন, তুমি যেমন বিশ্বনিন্দুক তেমনি তোমার বন্ধুবান্ধব। এসব বন্ধ কর ঠাকুরপো। কোনদিন তো ঠাকুর-দেবতার নাম করনি। এবার মতিগতি বদল করে সারাদিনে একবার অন্তত ঠাকুরের নাম নিও।

তোমার এই অমৃততুল্য উপদেশ অনেকবার শুনেছি এবং বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে মনে রেখেছি। তবে একটা কথা না বলে পারছি না কালীবাড়ীতে পাঁঠা বলী দিতে দেখেছ কখনও? গেলে দেখতে পেতে কালীর পাঁঠাকে সযত্নে স্নান করিয়ে একটা ফুলের মালা তার গলায় পড়িয়ে দেয় পুরোহিত, তারপর পাঁঠার পারলৌকিক মুক্তির মন্ত্রটি তার কানে কানে বলে দেয়। সেই মন্ত্র ছাগপুঙ্গবের হৃদয়স্পর্শ করে বলে কোন প্রমাণ নেই, তাই মন্ত্রের কোন অর্থ নেই। লাভ হল নধর ছাগ পুঙ্গবের মাংস ভক্ষণের জন্য অপেক্ষমান ব্যক্তিদের। তাই তোমার ওই মন্ত্রটি আমার কর্ণে প্রবেশ করলেও হৃদয়ে প্রবেশ করেনি এখনও। অপেক্ষা করছি। যদি পারলৌকিক মুক্তির লোভ আকাঙ্খা মনে হাঁচ-পাঁচর করে তখন তোমার অমৃততুল্য উপদেশটি স্মরণ করব।

দেখ ঠাকুরপো, এসব ঠাট্টার কথা নয়।

তোমার সঙ্গে আমার হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক যখন বিদ্যমান তখন কেন অযথা রাগ করছ বউদি। আমাদের শান্তি মাসীর কথা মনে আছে তো? আহা, বিধবা সন্তানহীন নিরাশ্রয়া সেই মহিলাটির কথা আজও মনে পড়ে বউদি।

ঠাট্টা রাখো।

ঠাট্টা নয়, জানো বউদি, শান্তিমাসীর মত সাত্ত্বিক, ধর্মপরায়ণা আমরা যাকে বলি অশিক্ষা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাজ, সে সব তিনি নিপুণভাবে করতেন। ছুঁত নিয়ে দিনে সাতবার নাইতে তার কোন বিরক্তি কখনোও দেখিনি। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এমন একটি মহিলা বর্তমান সমাজে বেমানান হলেও তার কণ্ঠস্বরে ভীত গৃহস্থ সকলে তাকে সমীহ ও ভয় করত।

জানি হে বাপু জানি। অত ব্যাখ্যান করতে হবে না।

পরিণতিটা নিশ্চয়ই জান।

জানি। অনেক ধর্মকর্ম করেছিলেন, যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছে তাদের কাজে-অকাজে নাক ঢুকিয়ে ঘোরতর অশান্তিও সৃষ্টি করেছেন।

বললাম, এক কথায় ঘুঘু চড়িয়ে দিয়েছেন। তারপর শান্তিমাসীর দেহ ক্রমেই অক্ষম হতে আরম্ভ করল কিন্তু মুখ-দোষটা মোটেই অক্ষম হল না। সময়ে-অসময়ে বাক্যবাণে অস্থির করতে থাকেন আশ্রয়দাতার সকল সদস্যদের।

তারপর একদিন শান্তিমাসী শয্যা নিলেন। বিছানায় মলমূত্র ত্যাগ করতে থাকেন। তাঁর মধ্যযুগীয় বামনীপনা আর রইল না। কেহই তাঁকে সেবা করতে এগিয়ে এল না। শান্তিমাসীকে পাঠানো হল হাসপাতালে সেখানেই ইহলোকের দায় মেটালেন।

বললাম, পরলোকের সঞ্চয়ের কথাটা বললে না বউদি। কিন্তু শান্তিমাসীর ছিল অদ্ভুত স্মরণশক্তি। কার কবে কোন সময় জন্ম, কার কত তারিখে কিবারে বিয়ে হয়েছিল, কে কবে কোথায় গিয়েছিল সব তার নখদর্পণে। এ-হেন শান্তিমাসী চিতার কাঠের তলায় শোবার পর চিত্রগুপ্তের খাতায় কি লেখা হল তা শান্তিমাসী এতদিনে বুঝে নিতে পেরেছেন।

বউদি শক্তগলায় বলল, ঠাকুরপো তোমার যত অনাসৃষ্টি, ঠাকুরদেবতা নিয়ে বড় বেশি ঠাট্টা কর। তোর আবার কি দরকার ছোটকু?

ছোটকুকে ঢুকতে দেখে বউদি বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন।

একজন ভদ্রলোক এসেছেন আপনার মেজমাসীমার বাড়ি থেকে। বললেন। অনুকে ডেকে দাও, খুবই দরকার। আমি তাকে বড়দার কাছে বসতে বলে তোমাকে খবর দিতে এলাম বড়মা।

বউদি যেন চমকে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে বললেন চল্।

সেদিন আর বউদির সঙ্গে দেখা হয়নি। প্রতিদিন খাবার সময় যিনি স্বয়ং তদ্বির করে খাওয়াতেন এবং যাকে বিগত তিরিশ বছরে দু'একদিনের জন্য নেহাৎ অনিচ্ছায় পিতৃগৃহে যেতে দেখেছি হঠাৎ তিনি বিনা নোটিশে নিরুদ্দেশ (?) হবেন তা মনেই করতে পারিনি। কোথাও যাওয়ার আগে অন্তত তিনবার আমাকে 'আসি' বলে বিদায় নিয়েছেন তিনি 'আসি' শব্দটা উচ্চারণও করার সময় পেলেন না কেন!

ছোটকুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বড় বউদি কোথায়রে ছোটকু?

ছোটকু মুখ বাঁকা করে বলেছিল, জানি না। সেই বাবুটার সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে গেছেন। বড়দা জানেন।

রাতের বেলায় পাশাপাশি খেতে বসে বড়দাকে জিজ্ঞেস করলাম, বউদিকে দেখছি না কেন?

অনু তার মেজমামার বাড়ী গেছে।

বড়দাকে খুবই গম্ভীর মনে হল। আর কিছু বলতে চান না বলেই অনুমান করে কয়েক গ্রাস ভাত মুখে দেবার পর আবার মৃদু গলায় বললাম, হঠাৎ কেন গেলেন?

তোর বউদির মেজমাসীর নাত্নী শ্যামার বিয়েতে গিয়েছিলি, মনে আছে?

সেতো তিন বছর আগের ঘটনা।

তারই যবনিকা নেমে এসেছে। শ্যামা কাল গায়ে আগুন দিয়ে পুড়ে মরেছে।

আমি চমকে উঠলাম। এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে তা ভাবতেও

পারিনি। ভাতের গ্রাস হাতেই রয়ে গেল। জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে রইলাম বড়দার দিকে। বড়দা বললেন, তোর বউদির মেজমাসীর মেয়ের দেওর এসেছিল। যা বললে তা বড়ই গোলমেলে বলে মনে হল শ্যামার শ্বশুর-বাড়ির কথা, শ্যামা আত্মহত্যা করেছে, আর শ্যামার বাবা বলেছে, শ্যামাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এবার থানা পুলিশের হাঙ্গামা।

আর শোনবার ইচ্ছা ছিল না। কোন রকমে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লাম।

নিজের ঘরে এসে মশারী টাঙ্গানো শেষ হবার আগেই বড়দা এসে ঢুকলেন। মশারি একপাশে ঠেলে দিয়ে বললেন, বড়ই দুঃখের কথা। কিন্তু কেন? ভেবে পাচ্ছি না।

বললাম, এর জবাব বউদি এলে তবেই জানা যাবে।

বিয়েতে আমার মত ছিল না। সমীর কারো কথা শুনলে না। রূপসী মেয়েকে দেখে ধনী পাত্রপক্ষ এক-কথায় বিয়েতে রাজি। বলেছিলাম, সমানে সমানে বন্ধুত্ব হয় চিরকাল, কিন্তু ওরা শুনল না। দ্রোণ দ্রুপদের গল্পটিও বলেছিলাম। গরীব ব্রাহ্মণ দ্রোণ পাঞ্চাল অধিপতি দ্রুপদকে বন্ধু মনে করত। দ্রুপদ এই বন্ধুত্বকে স্বীকার করেনি। তাতেই দ্রোণ অপমানিত হয়েছিল অ শ্য অর্জুন পাঞ্চাল জয় করে গুরুর অপমানের শোধ নিলেও ঘটনাটা তো মহাভারতের পাতা থেকে মুছে যায়নি। শ্যামার কথাও পুলিশের খাতা থেকে মুছে যাবে না কিন্তু অসমান লেনদেনের ভোগান্তি রইবে উভয় পক্ষের।

এটাতো সিনেমার গল্প নয়। বড়লোকের ছেলে গরীবের মেয়েকে বিয়ে করে। এতে অস্বাভাবিক তো কিছু নেই। বরং সিনেমার গল্পের মত ধনীর কন্যা বস্তির গরীবের ছেলের গলায় মালা দিলেই অস্বাভাবিক মনে হত। এরকম অনেক সময়ই হয়, তাতে বধূর আত্মহত্যা অথবা বধূহত্যা ঘটবে কেন? অন্য কোথাও কোন গোলমাল আছে। কোথায় গোলমাল সেটাই অনুধাবন করতে পারলে তবেই স্থির হবে এটা আত্মহত্যা অথবা হত্যা। তা যাই হোক তুমি এত অস্থির হয়ে উঠছ কেন!

আমার মেয়ের কথা ভেবে। নতুকে তো বছর ছয়েক আগে তোদের অমতে বিয়ে দিয়েছি। তার ভাগ্যে কি আছে, কে জানে।

সবাই তো কসাই নয়। শ্যামার পনর বছর বয়সে বিয়ে দেওয়াটাও ভুল। তার ব্যক্তিসত্তা ফুটে উঠবার আগে এভাবে পাচার করা ঠিক হয়নি। তোমার মেয়ে নতুর তো কচি বয়সে বিয়ে দাওনি। তার সঙ্গে যোগাযোগও রয়েছে। যথেষ্ট উচ্চ শিক্ষিত, চাকরি করে সরকারী দপ্তরে। সে নিজের টুকু বুঝে নিতে শিখেছে। তার জন্য অকারণে চিন্তা করে লাভ নেই।

তাই বলছিস!

হ্যাঁ, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়।

বউদি ফিরলেন চারদিন পরে।

বউদির মুখের হাসি উপে গেছে। যেমন ব্যথার প্রতিমূর্তি। সাহস করে তার সামনে যেতে পারিনি। ফিরে এসে বউদি আর বড়দা দরজা বন্ধ করে কি যে পরামর্শ করল তা বুঝতে পারিনি। আমার কিছু আগ্রহ থাকলেও কোন মতেই তা প্রকাশ করিনি। জানি বউদি তার স্নেহের ঠাকুরপোর কাছে সব কথা ব্যক্ত না করলে হতাশা রোগে ভুগবে।

সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে আসতেই ছোট্‌কু সংবাদ দিল, বড়মা আমার দর্শন প্রার্থী।

বিনা দ্বিধায় অতি ভাল মানুষের মত বউদির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, এত জোর তলব কেন?

তলব নয়। তোমার সাহায্য দরকার। শুনেছ বোধহয় শ্যামার ঘটনা।

কোন শ্যামা? ও তোমার সেই শ্যামা। সবটা শুনিনি তবে আন্দাজ করেছি, কারণ সংসার ছেড়ে তোমার মত লোক চারদিন যখন বাড়ির বাইরে তখন ঘটনাটা সহজ নয়।

বউদি গম্ভীরভাবে বলল, অনুমান ঠিক। তবে শোন।

সম্পূর্ণ ঘটনার সারাংশ হল:

সমীরের রূপসী কন্যাকে তার শ্বশুর পক্ষ দেখেছিল যখন সে স্কুল থেকে ফিরছিল। বোধহয় বনিয়াদি পড়তি বংশের তথাকথিত ধনী অনাথবাবু একটি সুরূপা কন্যার খোঁজ করছিল তার পুত্র দিবাকরের জন্য। সেজন্যই মনে হয়, মেয়েদের স্কুলের সামনে ঘোরাঘুরি করত অনাথবাবু, তার চোখে পড়ল শ্যামা। খোঁজ-খবর করে সমীরের কাছে প্রস্তাব পাঠাল। সমীর রাজি, অনাথবাবু রাজি এবার অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করল পরমপুরুষের সাক্ষাৎ এজেন্ট নিতাই ঠাকুর ওরফে নিত্যানন্দ বাঁড়ুজ্যে নামক পুরোহিত। চার হাত এক করে নেতাই ঠাকুর পাত্রপক্ষের পকেট হাল্কা করে এবং প্রশংসা অর্জন করে ফিরে গেল। এইরূপ একটি রাজযোটকের জোড় বেঁধে দেওয়া তো সহজ কাজ নয়!

শ্যামা অষ্টমঙ্গলে জোড়বেঁধে এল কিন্তু কি যেন একটা কালোছায়া তার মুখে-চোখে অথচ বলতে পারছিল না কাউকেই। অনাথবন্ধু পুত্রবধূকে তার পিতৃগৃহে পাঠাতে আগ্রহী নন। কারণ, তখন জানা যায়নি। উদ্দেশ্য তাঁর একেবারে যে অসৎ ছিল এমন নয়। তার মদ্যপ লম্পট পুত্র যদি রূপসী তরুণী স্ত্রীর আকর্ষণে সুপথে আসে তাই এই চেষ্টা ছিল। শ্যামার চিঠি থেকে জানা গিয়েছিল, শ্যামা শ্বশুরবাড়িতে পা দিয়েই তার স্বামীর আচার আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও মুখ খুলতে সাহস পায়নি। অল্পবয়স্কা শ্যামা তদুপরি স্বল্প শিক্ষিতা তার প্রতিবাদ কেউ শুনবে এমন ভরসা কেউ করত না। দেখতে দেখতে তিনটে বছর কেটে গেল। তিন বছরে একবারও তাকে না আসতে দেওয়া হল পিতৃগৃহে, না দেওয়া হল পিতৃগৃহের কারও সঙ্গে দেখা করতে। স্বামীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত শ্যামা পল্লীর একটা

মেয়ের হাত দিয়ে তিন চারটা বেয়ারিং চিঠি পাঠিয়েছিল তার মায়ের কাছে। মা নিরুপায়। সমীরকে বলেছে। সমীর ভেবেছে। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে কিন্তু কার্যকরী কোন পথই খুঁজে পায়নি। ভেবেছে তিনটে বছর যখন কেটেছে, কোলে একটি সন্তান এসেছে তখন ঘষেমেজে শ্যামা ধীরে ধীরে তার স্থান শক্ত করে নিতে পারবে।

পুলিশ তদন্তে অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। শ্যামার দেহে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। মৃত্যু তাকে বাঁচিয়েছে অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে। কোন নারী যখন সন্তানের প্রতি প্রবল আকর্ষণকে উপেক্ষা করে আগুনে পুড়ে মরে তখন অনুমান করে নেওয়া যায় কতটা অমানুষিক অত্যাচার তাকে সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু শ্যামার ক্ষেত্রে আত্মহত্যার স্বপক্ষে যুক্তি খুবই দুর্বল। হত্যাটাই যেন পারিপার্শ্বিক ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়।

পুলিশ এসেছে। দিবাকরকে গ্রেপ্তার করেছে। অনাথবন্ধু ও তার স্ত্রীকে আটক রেখে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণও পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বউদি ঘটনার বিশদ বিবরণ দেবার পর বললাম, এতে তোমার মন খারাপ করার কি আছে। আমাদের সামাজিক চরিত্র যেমন তাতে এ-ঘটনা বহু ঘটেছে, ভবিষ্যতে আরও ঘটবে। আমরা সবাই যদি সমাজ সচেতন না হই তা হলে এর প্রতিকার করা সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস, আমাদের সামাজিক ও প্রশাসনিক যে চেহারা তাতে কেউ সমাজ সচেতন হতে পারে না। আমাদের যুবশক্তি অবক্ষয়ের মূলে। পিতামাতা বয়স্কা কন্যার বিবাহে ব্যস্ত। যোগ্য পাত্রের অভাব। লেখাপড়া শিখে ছেলেরা কাজ পাচ্ছে না। তারাও তো কেউ মহর্ষি নয় বরং তারা সকল ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু তাদের ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করার কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে বিপথে পা দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন একে সংযত করতে অক্ষম এবং সে রকম সদিচ্ছারও অভাব। রাজনীতির প্রভাব সর্বত্র। ফলে; অসামাজিক কাজের ফিরিস্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরও পাবে।

কিন্তু অনাথবন্ধু অথবা দিবাকরের কথা আলাদা।

আলাদা নয় বউদি। ওরাও এই সমাজের অভিশাপ। পঙতি বনিয়াদি পরিবারের ঐতিহ্য হল অপকর্ম করা। নভেলে নিশ্চয়ই এইসব পড়তি পরিবারের কাহিনী পড়েছ। মনে করেছ, সেগুলো গালগল্প। হয়ত কিছুটা আধিক্য আছে কিন্তু ঘটনাগুলোর পেছনে বাস্তবের যথেষ্ট যোগ আছে।

বউদি উত্তপ্তভাবে বলল, সবই স্বীকার করলাম কিন্তু মূলত এর জন্য দায়ী পণপ্রথা।

আংশিক দায়ী। সর্বাধিক দায়ী প্রশাসন। যৌবনে যারা কর্ম-সংস্থান করতে পারে না, তাদের বাঁচার দাবী, সৃষ্টির আকাঙ্খা, অঙ্কুরেই লোপ পায় তাদের বেকারত্বের অভিশাপে। শতকরা দশ-বিশজন ছেলে যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এক একটি ছেলের পেছনে দুই তিনশত মেয়ের বাব।

ছোটাছুটি করেন। আমি জানি, কোন একজন ইনজিনিয়ার পাত্রের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার পর ছয়-শতাধিক আবেদনপত্র এসেছিল। চিন্তা করতে পার, সে ছেলেটি বিয়ে করবে মাত্র একটি মেয়েকে আর বাকিগুলোর কি হবে! তখন আরম্ভ হয় বেচা-কেনার দরাদরি। অধিক মূল্য যে দেবে তার জয়। আমাদের ঘরের ছেলেরা হল বিক্রয়ের সামগ্রী, আর ক্রেতারা হলেন অর্থবান মেয়েদের পিতা। পুত্র যখন পণ্য তখন অনাদৃতা মেয়েদের যদি দেহপণ্যজীবি হতে দেখি তখন শিউরে উঠা নিরর্থক। সমীর দিবাকরকে বহুমূল্যে কেনেনি কিন্তু দিবাকরের জন্য দেহপণ্যজীবি নারীর অনুসন্ধান করেছিল অনাথবন্ধু। উভয় ক্ষেত্রেই পাপের পরিধি সমান। তারই পরিণতি স্বীকার করে নেবে সমাজ কঠোর শাস্তি দেবে, হয়ত আইনের ছিদ্র পথে দিবাকর নিষ্কৃতি পাবে তাতেও শেষ হবে না নারীমেধ যজ্ঞের।

আমার কথাগুলো বোধহয় বউদির রুচিকে আঘাত করেছিল। আমি চুপ করতেই বউদি উঠে গেলেন নিজের কাজে।

পরদিন পথে বের হতেই মনে হল, অমিয়াকে কথা দিয়েছিলাম অথচ তার বাড়িতে যাওয়া হয়নি। আজ অমিয়ার সঙ্গে দেখা করে আসি।

বহু বৎসর আগের বান্ধবী হলেও মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করেছি। সেও মাঝে মাঝে আসে। আমার চেয়ে বউদিকে তার পছন্দ বেশি, তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করে ফেরার পথে জিজ্ঞেস করেছে, কেমন আছিস দামু, মাঝে মাঝে আমার ওখানে যাস।

বলতাম, যথা আজ্ঞা।

যেতাম কিন্তু সামান্যক্ষণের জন্য। অমিয়া সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকত। তার স্বামীর সঙ্গে দু'চারটা কথা বলে উঠে পড়তাম। আসার সময় অমিয়াকে বলতাম, চললাম রে আমি, এক আধবার আসিস আমাদের বাড়িতে।

কেমন যেন কমার্শিয়াল রিলেশন, কিছুটা মেকানিক্যাল।

অথচ পাঠ্যজীবনে আমরা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি সবচেয়ে বেশি। সবাই ওকে বলত tom-boy, মেয়ে হয়ে পুরুষের মত। পিংপং আর ভলি খেলতে অমিয়া ছিল ওস্তাদ। আমাদের সে সময়ে সমাজ বড়ই স্পর্শকাতর ছিল। মেয়েদের এসবকে বেলেল্লাপনা মনে করত। আবার আধুনিকের বাতাস তখন বইতে শুরু করেছে, তাই আমাদের মত যাদের মনের গঠন ছিল তারা প্রশংসা করত তাকে। শুধু তাকে নয়, তার মত আরও কয়েকটি ছাত্রীকে।

আমার সঙ্গে অমিয়ার কোন সম্পর্ক কখনও গড়ে উঠেনি। সহপাঠী ও সহপাঠিনীর যে তরল বন্ধুত্ব তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু আমাকে আশ্চর্য করে হাতে এসে পৌছাল একটি রঙীন পত্র সঙ্গে ছোট্ট একটি অনুরোধ পত্র অমিয়ার স্বহস্তে লেখা। "তুই আসিস। না এলে খুবই দুঃখিত হব।" বিয়ের নেমতন্ন পত্র উপেক্ষা করেছিলাম। আমি জানি, এই বিবাহের অঢেল আনন্দের

মাঝে আমার অনুপস্থিতি মোটেই দুঃখ পরিবেশন করবে না। মনে মনে বলেছিলাম, তুই সুখে থাক।

অমিয়া কিন্তু আমাকে সুখহীন করে তুলেছিল হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে। এমন চিৎকার আরম্ভ করেছিল যা বউদিকে পাশের ঘর থেকে টেনে এনেছিল। আমার অনুপস্থিতি তাকে দুঃখিত না করুক ক্রুদ্ধ করেছিল তা বুঝে চুপ করেইছিলাম। সেদিন কোন রকমে নিষ্কৃতি পেলেও অমিয়া মাঝে মাঝে এসে আমাকে উপেক্ষা করে বউদির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ক্রমাগত তার ক্রোধকে কার্যকরী করে তুলতে মোটেই কৃপণতা দেখায় নি। আমি হাসিমুখে সহ্য করেছি। আমি গিয়েছি তার বাড়িতে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নয় নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে।

সকালবেলায় অমিয়ার বাড়ি যাবার ইচ্ছাটা কেন মনে ধাক্কা মারছিল তা জানি না। তবে প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে পা দুটো তার বাড়ির দিকেই টেনে নিয়ে চলল।

আমাকে দেখেই অমিয়া মৃদু হেসে বলল, বস। আমি হাতের কাজ শেষ করে আসছি।

বাড়িতে কাউকে দেখছি না কেন ?

পরে শুনিস। তুই বোস। আমি চা নিয়ে আসছি।

অমিয়া অভিজাত পরিবারের মেয়ে, নিজেও অভিজাত। তার ঘর বাড়িও সেই ভাবে সাজানো। আমি তাকিয়ে দেখছিলাম। সব জিনিসই সাজানো কিন্তু একটি জিনিস দেখা গেল না তার ঘরে। বিয়ের সময় স্বামী-স্ত্রীর একত্রে যে ফটো তুলেছিল সেটা স্থানচ্যুত হয়েছে মনে হল। বোধহয় নতুন করে ফ্রেম বাঁধাতে দিয়েছে। চেয়ার টেনে নিয়ে বসে ভাবছিলাম। অমিয়া কেনই বা আমাকে আকর্ষণ করে! এবং সেই-বা কেন ছুটে যায় আমার বাড়িতে। সে না হয় শোধ নিতে যায়, আর আমি! শুধু কি ভদ্রতা ?—কি জানি। অমিয়ার সহপাঠীর তো অভাব ছিল না, তাদের কাউকেই তো কোন দিন তার বাড়িতে দেখিনি। কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় চা হাতে করে স্বয়ং অমিয়া উপস্থিত হল পাদপীঠে। চাকর-চাকরাণী নয়, স্বয়ং। আগে যখন এসেছি, তখন মিষ্টি হাসি বিনা কিছু তার কাছে পাইনি। আজ হাসির সঙ্গে চা।

অমিয়া হেসে বলল, নে চা খা। তোর গল্প করার লোক পাচ্ছিস না বুঝি ? আর পাবি না।

চা চুমুক দিতে দিতে বললাম, মানে ?

মানে অরিন্দম চলে গেছে।

কোথায় ?

জানি না। জাহান্নমেও হতে পারে।

আমি চুপ করে গেলাম। এটা ওদের পারিবারিক ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার আগ্রহ না থাকাই উচিত।

কি ভাবছিস? যে মেয়েটা পীরিত করে অরিন্দমকে বিয়ে করেছিল কি করে তাকে জাহান্নমে পাঠাচ্ছে, এই তো!

ওকথা ভাবছি না। কারণ, ওটা তোর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু তোর মেয়ে কোথায়?

আমাদের আইন প্রাপ্তেষু অষ্টমবর্ষেষু সন্তান পিতার সম্পত্তি। তার কাছে আছে। আমি এখন হাত-পা ঝাড়া। এসে ভালই করেছিস। ভাবছিলাম, তোকে চিঠি দেব। মনে হল, চিঠি দিলে তুই আসবি না। আমার চিঠি তোর কাছে ডাস্টবিনেই স্থান পাবে। তাই স্থির করেছিলাম, অফিস ফেরতা তোকে ধরে আনব। ভালই হল তুই এসে গেছিস।

আমার ওপর তোর হঠাৎ এত দয়া কেন বুঝছি না।

বুঝবি না। এবেলা তোর খাওয়া হয়নি। তোর খাবার ব্যবস্থা করি, তুই বস।

তুই আজ অফিস যাবি না?

না, রোজই তো অফিস যাই, আজ আর যাব না। মনের কথা বলার লোক খুঁজে এতদিনে পেয়েছি। এখন দশদিন অফিস কামাই করে তোর সঙ্গে গল্প করব। বরং তুই আমার বেডরুমে আয়। হাত পা ছড়িয়ে বিছানাতে বসতে পারবি।

বললাম, নারী ছলনাময়ী। ভয় হচ্ছে, তোর কোন মতলবে ফেঁসে না যাই।

ফেঁসে যাবি না দামু, ভেসে উঠবি। নারীর ছলনা শুধু ডোবায় না, কখনও কখনও পাঁক থেকে টেনে ভাসায়। চল, আর কথা নয়।

টিকটিকি যেমন রাতের আলোয় পোকাকে আকর্ষণ করে, উদরস্থ করে তেমনি আকর্ষণে অমিয়ার অকথিত প্ল্যানের উদরে প্রবেশ করার অপেক্ষায় তার পেছন পেছন তার বেডরুমে এসে বিছানায় বসলাম।

অমিয়া ডাকল, মাধুরী।

সকালবেলাটা পাঠ্যজীবনের নানা ঘটনা আলোচনা করে কেটে গেল। দুপুরে খাবার পর অমিয়া আমার মাথার কাছে বসে বলল, তোর খারাপ লাগছে, না রে?

বললাম, সব কিছু কি ভাললাগে।

আমি যা বলব তা কিন্তু ভাল লাগবে না। তোর মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জেগেছে। অরিন্দম কেন গেল?---এর উত্তরটা দেবার যেমন দায় নেই, তোর শুনবারও তেমনি দায় নেই। তবুও বলব শোন।

অরিন্দম প্রতারক। তাই তাকে বিদায় করেছি।

জানিস দামু, অর্থ আর ক্ষমতা—মানুষকে অমানুষ করে তোলে, ভারসাম্য রাখতে না পারলে ঘরসংসার পরিবেশ সবই দূষিত হয়। তুই মনে করবি, বিশ বছর অরিন্দমের সঙ্গে ঘর করেছি। তা নয়, কিটির জন্মটা আকস্মিক।

বোধহয় সাময়িক উত্তেজনায় ওকে গর্ভে স্থান দিয়েছিলাম। ওর জন্মের আগেই অরিন্দমকে কাছ থেকে সরিয়ে ছিলাম। তবে লোকলজ্জায় বহুকাল তাকে থাকতে দিয়েছিলাম এই বাড়িতে। অবশেষে আর সহ্য করতে পারছিলাম না। এবার বিদায় করেছি ঝাড়গুষ্টিতে।

কি ভাবছিস? নাটক! নারে নাটক নয়। অরিন্দম অফিসার। অফিসারদের ক্লাবে যেত। মাঝে মাঝে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। সেটা ক্লাব নয়, ব্রথেল। অমুক সাহেব তমুক সাহেব ইত্যাদি অভিজাত সাহেবরা আসে বউয়ের হাত ধরে, ফেরার সময় কার বউ কার কণ্ঠলগ্ন হয়ে বাড়ি ফেরে তা সঠিক বলা কঠিন। অরিন্দমও চাইতো আমিও ওই ভাবে চলি। অন্য নারীর কণ্ঠলগ্ন থেকে ছাড়িয়ে কোন রকমে বাড়ি ফিরিয়ে আনতাম। এরা হল বর্তমান সমাজের অভিজাত।

অরিন্দম ঠাট্টা করত। দেখিয়ে দেখিয়ে বলত, উনি হলেন জজসাহেব। উকিলবাবুর বউ নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। মামলা জেতার নেশায় উনি উকিলসাহেবের অঙ্কশায়িনী। আর উকিলবাবু স্বয়ং বোধহয় ক্লাবের চাকরাণীর গলা জড়িয়ে ধরবে। উনি এখন বড় সার্জন। উনি একটা অপারেশনে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে থাকেন। উনি হলেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক, নেশায় বুঁদ হয়ে আবৃত্তি করছেন, উনি হলেন সিনেমার বড় প্রযোজক, নায়িকা করার প্রলোভনে সঙ্গী হয়েছে তন্বী। বুঝলে। এটাই আমাদের ক্লাব।

আমি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিতাম।

বাড়ি ফিরে সংবাদপত্র খুঁজে প্রয়োজনীয় সংবাদ রেখে দিতাম সকালবেলায় শোনাতাম। প্রতিদিন সকালে শুরু হত কলহ। কলহের পরিণতি হত মারপিঠে। তবুও শোনাতাম। 'ভারত-পাক' উপমহাদেশ সহ দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে যুব ও কিশোরদের মধ্যে মদ্যপান, মাদক জাতীয় ঔষুধ সেবন ও নানাধরনের জুভেনাইল ক্রাইম ইদানীং ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। আজ থেকে পাঁচবছর আগেও এই সমস্ত অঞ্চলের যুবক কিশোরদের মধ্যে এই ধরনের নেশা ও অপরাধ প্রবণতা এত পরিমাণ ছিল না। এই সমস্যার জন্য দায়ী হল ওই দেশগুলির ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট, জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, পারিবারিক সংকট, সামাজিক ও নীতি নৈতিকতার অবক্ষয়। (Singapur Times.)

সংবাদ পড়ে শুনিয়ে বলেছিলাম, আমাদের সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী আমরা যারা নিজেদের উঁচুতে বসে নীচের মানুষদের চিরকাল অবজ্ঞা করে এসেছি। আমরা নীতিবোধ হারিয়ে উচ্চগ্রামে চিৎকার করে সমাজ সংস্কার করতে চাই অথচ নিজেরা সামান্য নীতিবোধ হত্যা করি স্বেচ্ছায়।

অরিন্দম বলল, বস্তির নোংরা মানুষদের সঙ্গে আমাদের তুলনা করতে চাও?

বলেছিলাম, ভুল বুঝ না অরিন্দম, আমরা অভিজাত কারণ আমাদের অর্থ

আছে, ক্ষমতা আছে কিন্তু মনের আভিজাত্য আমবা হাবিয়েছি কারণ শ্রেণী-বিন্যাস। তুমি ভাবছ, তোমাব স্থান সমাজেব উচুতলায় তাই তোমাব দায়িত্ব নেই নীচুতলার মানুষদেব কথা চিন্তা করার। অথচ ওবাই হল সমাজের গরিষ্ঠ সংখ্যা। ওরা যতই পেছনে পড়ে থাকবে, নীচে নামতে থাকবে ততই আমবা পায়েব তলাব মাটি হাবাব। ওবা হামলা কববে। সংগঠিত হযে বিক্ষোভ দেখাবে, সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, হযত বিপ্লব ঘটাবে না কিন্তু তাদেব বিক্ষোভ ক্রমেই বিপথে চালিত হয়ে রাহাজানি, চুবি, ডাকাতি, নবহত্যা, নারীধর্ষণ এইসব অপবাধ বৃদ্ধি পাবে। এসবের ওপর মুখোস পরে আমবা বইব সমাজকে সুপথে নিযে চলতে, বক্তৃতা দেব, কাগজে লিখব কিন্তু সবই হবে বৃথা। বঞ্চনার ব্যথা আমরা নিরাময করতে পাবব না, ওরাই কবে হিংস্রভাবে সমাজ ব্যবস্থাকে আঘাত। বিপর্যস্ত করবে আমাদেব আভিজাত্যের দম্ভ

তুমি কি বলতে চাও?

বলতে চাই তুমি এ ভাবিল জীপন যাপন করতে শেখ নইলে আমাদের সাজানো ঘব ভেঙ্গে পড়বে।

অরিন্দম সেদিন কোন উত্তব দেযনি, কিন্তু পবদিন থেকে সে কেমন ভারসাম্য হারিযে ছুটল ম্যাভিচারের পেছন পেছন। নিজেই বেরিযে যেত গাডি নিযে। কোন রাতে ফিরত, কোন রাতে ফিরত না। কলহ হত কিন্তু কলহেব মাত্রা রুচিব সীমা ছাড়িযে যেত মাঝে মাঝেই।

কিটি বড হচ্ছিল।

তাকে পাঠালাম দার্জিলিং এ হোস্টেলে। আমাদেব এই জীবন থেকে তাকে মুক্ত করতে তার ভবিষ্যতকে সুস্থ রাখতে কত না চেষ্টা করেছি।

তবুও দিন কেটে যাচ্ছিল।

কিটি ফিরে এল বাড়িতে। বন্ধুবান্ধব নিযে হুটোপুটি কবে দিন কাটাত। সেও কৈশোর অতিক্রম করে পূর্ণ যুবতী। ভাবছিলাম তার বিযের কথা। এমন সময একদিন দেখলাম, কিটি তার বাবার সঙ্গে গাড়ি থেকে নামছে এবং উভযের পদক্ষেপ খুবই আপত্তিজনক।

এর পবের ঘটনা অতি সহজভাবেই শেষ হয়েছিল।

অরিন্দম তাব মেযেকে সঙ্গে করে চলে গেছে, আমাকে মুক্তি দিয়েছে।

তুই ভাবছিস, আমার জীবনের পরিণতি এমন হবে তা কি আঁচ করতে পারিনি। না, পারিনি। আমি তো খেলাধুলা করে থাকতাম। খেলাব মাঠেই তার সঙ্গে পরিচয়। ঘনিষ্ঠ হতে বিলম্ব হয়নি। চাকরি পেলাম। ভাবলাম, আমি তো স্বাবলম্বী, কারও ওপর নির্ভরশীল নই, এবার ঘর বাঁধতে পারব। অরিন্দম পেযে গেল ভাল চাকরি। দু'জনে খেটে খাব, সুখে থাকব, সংসার গডব এই ছিল কামনা। অবিন্দমকে কোন সমযই অসভ্য বেচাল মনে হয়নি কিন্তু বিযের কিছুকাল পর থেকেই তার আসল চেহারা দেখে চমকে

উঠেছিলাম। তবুও তাকে খুশী ও সংযত করার আশায় তার সঙ্গে ক্লাবে পার্টিতে গিয়েছি কখনও কখনও কিন্তু অরিন্দমের পরিবর্তন আনতে পারিনি। যাক্, ওসব কথা।

অমিয়া তার কথা শেষ করতে করতে বেলা গড়িয়ে গেল।

প্রথম থেকে শেষ অবধি আমি কোন মন্তব্য করিনি, তার বক্তব্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা জানতে চাইনি। আমার নীরবতা লক্ষ্য করে অমিয়া বলল, তুই একদম চুপ করে আছিস কেন? অন্তত 'হুঁ' দিবি তো। ছোটবেলায় ঠাকুরমা পিসিমার কোলে মাথা রেখে গল্প শোনার সময় 'হুঁ' দিতে হত। যখন 'হুঁ' বন্ধ হয়ে যেত তখনই তাঁরা বুঝতেন, আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি। তুই-ও মাঝে মাঝে 'হুঁ' দিবি নইলে মনে করব তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস।

আজ আর 'হুঁ' দেবার সময় নেই অমু। আজ আমার ছুটি।

ছুটি! কেমন মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তার বক্তব্য বোধহয় তখনও শেষ হয়নি। চুপি চুপি বলল, কাল আসবি তো? আরও অনেক বলার ছিল।

আসতে চেষ্টা করব।

ঠিক ঠিক করে বল, তুই যদি আসিস না হলে অফিস যাব না। দিনে যদি আসতে না পারিস তা হলে সন্ধ্যের সময় আসিস। না এলে তোকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসব।

আমি ইতস্তত করে বললাম, বেশ সকালেই আসব।

অমিয়ার কাছ থেকে ছুটি পেলাম।

বাড়ি ফিরতেই বড়দা বললে, তোকে কাল কলকাতায় যেতে হবে বিশেষ কাজ।

বললাম, এমন করে নির্দেশ দেবার কি আছে দাদা। কলকাতা তো সাতসমুদ্র তেরনদী পার হয়ে যেতে হয় না। বিশমাইল পথও নয়। এখান থেকে হাজার হাজার লোক কলকাতায় গিয়ে চাকরি করে আবার বিকেলবেলায় বাড়ি ফিরে আসে।

দাদা বিরক্তির সঙ্গে বললেন, তোকে একটা কথা বললে পঁচিশটা কথা বলিস। যা বললি তা সবাই জানে। হরিশকাকা এসেছিলেন, মলয়ার বিয়ের সম্বন্ধ করছেন তুই একটু খোঁজখবর করে পাকা কথা দিয়ে দেনাপাওনা ঠিক করে আসবি। জানিস তো হরিশখুড়ো নিতাইকে ভরসা করে না। উনি বলেন, নিতাই মলয়ার বাবা, অথচ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোয়, মেয়ের বিয়ের কথা চিন্তাও করে না।

বললাম, তুমি যখন বলছ তখন যাব কিন্তু মলয়ার বিয়ে তাড়াতাড়ি না দিলেই কি নয়! তাকে পড়াশোনা শেষ করতে দাও। পড়াশোনা শেষ করার অর্থ হল তার অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে দেওয়া। কোন দিন বিপদে পড়লে সে নিজের পথ নিজেই দেখে নিতে পারবে। নিতাইদার এমন সম্পদ নেই যা মলয়ার বিপন্ন অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পারে।

বড়দা বললেন, ওটা ওদের বিবেচ্য। তোকে যা বললাম তা করে আসবি।

কাল অমিয়ার বাড়ি যাবার কথা মহা ফ্যাসাদ। পাশের বাড়িতে গিয়ে ফোন করলাম অমিয়াকে। বললাম দাদার আদেশ। অমিয়া বলল, তাতে কি, আমি তোকে গাড়িতে তুলে নেব তোর কাজ হয়ে গেলে কোথাও লানচ্ খেয়ে বাড়ি ফিরব।

বললাম অতটা দরকার হবে না, বাড়ি থেকে খেয়েদেয়ে দশটায় বের হব। তোর জন্য অপেক্ষা করব। কেমন?

অমিয়া সম্মতি জানাল।

পরদিন সকালবেলায় বিয়ে ঠিক করার প্রস্তুতি করতে হরিশখুড়োর কাছে গিয়ে বিশদ বিবরণ নিয়ে যখন ফিরছি তখন মলয়া এসে দাঁড়াল সামনে।

বলল, আমি সব শুনেছি। দাদুর মতলব ভাল নয়। বিয়ে ঠিক না করে ভাংচি দিতে হবে দামুকাকা।

হেসে বললাম, সে কিরে? তুই বিয়ে করবি না বুঝি?

করব এখন নয়।

মানে তোর পছন্দ হয়েছে কোথাও। গাঁট বেঁধে রেখেছিস বুঝি?

না দামুকাকা। গাঁট বাঁধতে পারিনি। কিন্তু এখন দাদুর ইচ্ছামত গাঁট বাঁধতেও রাজি নয়। তুমিই রক্ষা করতে পার। তাই বলছিলাম ভাংচি দিতে।

বুঝলাম। তুই যা দেখি কি করা যায়।

ঠিক দশটায় অমিয়া গাড়ি নিয়ে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে সোজা গেল বউদির কাছে। আমি প্রস্তুত ছিলাম। বউদির সামনেই বলল, তোর কাছে এলাম দামু। আমার সঙ্গে কলকাতায় চল। অফিসের পথে কটা কাজ করে দিবি। অফিস থেকে তা তোকে আবার পৌঁছে দেব।

আমরা যে পরিকল্পনা মত কাজ করছি তার কোন উল্লেখ না করে বেশ সহজভাবে আমাকে তার সঙ্গী হতে বলার মধ্যে চাতুরী থাকলেও মনে মনে আমি হেসেছিলাম। অমিয়ার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। যখন প্রার্থিত স্থানে পৌছালাম তখন এগারটা বেজে গেছে। পাত্রের পিতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সাদরে বসতে দিয়ে অমিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, ইনি?

বললাম, পাত্রীর মাসী।

অনেকক্ষণ অমিয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে গেলেন ভেতরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন সস্ত্রীক, কুশলাদি প্রশ্নের পর আরম্ভ হল বিবাহের বিষয়।

ভদ্রমহিলা বললেন, মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছে। এবার দেনাপাওনা কি হবে, বিয়ের দিন স্থির করা, এই সবই আমাদের আজকের কথা।

আপনি তো পাত্রীর কাকা, আপনাকেই পাকা কথা বলতে পাঠিয়েছেন হরিশবাবু। তা বলুন আপনারা কি কি দেবেন।

অবাক হয়ে ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এমন নির্লজ্জভাবে লেনদেনের প্রশ্ন কেউ তুলতে পারে তা ভাবতেও পারিনি। মুখ বুজে শুনছিলাম।

ভদ্রমহিলা বললেন, আমরা পণপ্রথার বিরোধী। নগদ কড়ি দিতে হবে না। তবে ষোলভরি সোনা, একটা ফ্রিজ আর একটা টেলিভিশান এই আমাদের নিম্নতম দাবী।

বললাম, অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকার মত। তা দেওয়া যাবে। আর কি কি দিতে হবে।

খাট বিছানা বাসনপত্র আর আঠারটা প্রণামী।

তার জন্য আমরা প্রস্তুত।

প্রণামীর কাপড়গুলো যেন ভাল হয়। পোর্সেলিন ডিনার সেট যেন বাদ না পড়ে।

ভদ্রলোক এই পর্যন্ত কোন কথা বলেননি।

বললাম আপনার ছেলে মহাকরণের করণিক, উপযুক্ত পাত্র। তার তো এগুলো প্রাপ্যই। তবে পাত্রী পছন্দ করার সময় একটা কথা বলা হয়নি। ছোটবেলা মলয়ার টিবি হয়েছিল।

ভদ্রলোক চমকে উঠে বললেন, টি-বি।

বললাম, আজ্ঞে হাঁ। আর হাঁপানিটা হল ওদের বংশগত রোগ। হরিশখুড়োকে তো দেখেছেন। এত দুরারোগ্য ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিয়েছে মলয়ার বুকেও।

ভদ্রলোক বললেন, বলেন-কি মশায়।

আজ্ঞে হাঁ। আর মলয়া তো কোন কাজ করতে পারে না। তার জন্য দুটো দাসী প্রয়োজন হবে বিশেষ করে রন্ধনশালায় ঢোকা তার নিষেধ। সুষম খাদ্য বিশেষ করে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য তার বেশি প্রয়োজন। আপনার উপযুক্ত পুত্র নিশ্চয়ই এগুলোর ব্যবস্থা করতে পারবেন।

অমিয়া আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপতে থাকে। অর্থাৎ আর বেশি বলা উচিত নয়।

ভদ্রমহিলা বললেন, আপনাদের পরে জানাব। ছেলের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

বিদায় নিয়ে অমিয়ার সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসলাম।

অমিয়া বলল, একটু বাড়াবাড়ি করে ফেললি।

উপায় ছিল না। দেনা পাওনার ফিরিস্তি তো পেলি। এ-বিনা আর কি বলার আছে।

বিয়েতে ভাংচি দিয়ে তো হরিশখুড়োকে কি বলবি?

বলব, পাড়ায় খবর নিয়ে জেনেছি. ছেলেটা অনেক মেয়ের সঙ্গে ঘোরে,

মাঝে মাঝে রাতের বেলায় মদ খেয়ে বাড়ি ফেরে। লোকে ওখানে বিয়ে দিতে নিষেধ করেছে।

অমিয়া শুধু হাসল।

তার অফিসের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল, তুই বস, আমি একটা কথা বলেই আসি।

অমিয়া উপরে উঠে যাবার পর চুপ করে বসেছিলাম। হঠাৎ চারিদিক থেকে গোলমালের শব্দ ভেসে আসতে থাকে, দোকানদাররা তাড়াতাড়ি দরজার সাটারগুলি টেনে নামাতে থাকে, গাড়ি পথ বদল করে ময়দানের দিকে দৌড়াচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য। মানুষ ছুটছে। সবার চোখেই ভয় আর জিজ্ঞাসা। কোথাও কোন অঘটন ঘটে গেছে অথচ কেউ মুখ ফুটে বলছে না।

অমিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল। এসেই বলল, চল, আর এখানে নয়।

কি ব্যাপার?

প্রধানমন্ত্রীকে গুলি করেছে, তার শিখ দেহরক্ষী।

চমকে উঠলাম।

তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসলাম। অমিয়া গাড়ি ছুটিয়ে দিল। কিন্তু বাড়িতে পৌছালাম বিকেল চারটায়। পথে অনেক হাঙ্গামা। কোন রকমে গাড়ি বের করে নিয়ে এসেছে অমিয়া। শিয়ালদহ এলাকা পেরিয়ে আসতে না পেরে ঘোরা পথে আমাদের আসতে হয়েছে।

কানে ভেসে আসছিল চিৎকার, ইন্দিরা গান্ধীকে মারল কে? সি-পি-এম, আবার কে?

ওদিকে ট্রাম বাসে আগুন দিয়েছে।

লোক ছুটে পালাচ্ছে।

অমিয়া বলল, আমরা শুনলাম শিখ দেহরক্ষী প্রধানমন্ত্রীকে গুলি করেছে। এখানে শুনছি সি-পি-এম মেরেছে, ঠিক বুঝতে পারছি না রাজনীতির এ কোন খেলা।

বললাম, গুণ্ডারা দুর্গাপূজার পর বেকার হয়েছিল, এবার লুটপাট করার সুযোগ পেল। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর পুলিশ মাইক নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোষণা করেছিল, আততায়ী হিন্দু। কারণ, তখনও সাম্প্রদায়িকতার বিষে পশ্চিম বাংলা জর্জরিত। যদি কোন মুসলমান মেরে থাকে গান্ধীজীকে তা হলে আর রক্ষা নেই। চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠবে। এবার তো এমন ঘটনা ঘটার আশঙ্কা নেই অথচ একটা সম্প্রদায়ের নাম ঘোষণা করা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। এতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। এমন ভুল কেন করল ভারত সরকার।

অমিয়া বলল, অতঃ কিম্? এরপর কি?

পরিণতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে। তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

বাড়ি ফেরার খবর পেয়েই ছুটে এল হরিশখুড়ো। অমিয়া তখন হাত পা ছেড়ে আমার বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছে। হরিশখুড়ো হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকেই বললেন, তাহলে তোরা এসে গেছিস দামু। তা কি হল বল।

আমি অমিয়াকে নির্দেশ করে বললাম, তুই বল অমিয়া।

হরিশকাকা অমিয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন, পাত্রপক্ষ কি বলল মা ?

বিশেষ কিছু নয়। বলেই অমিয়া ঢোক গিলে উঠে বসে বলল, ষোল ভরি সোনা। একটা ফ্রিজ, একটা টি-ভি, আসবাবপত্র আর পোর্সেলিনের ডাইনিং সেট, খাট দিতে হবে তবে নগদ নয়। নগদটা পণ, তাই আইন বিরোধী কিছু করতে বোধহয় রাজি নয়।

হরিশকাকা গম্ভীর হয়ে গেলেন। হাঁপানির টানটা যেন বৃদ্ধি পেল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বললে দামু ?

বললাম, দেব।

দেব বললে ! আশ্চর্য। এতো ষাট-সত্তর হাজার টাকা। কোথায় পাব। একটু ভেবে চিন্তে বলতে হয়।

ভেবে চিন্তেই বলেছি কাকা। এমন সুযোগ্য পাত্রকে হাতছাড়া করতে পারি না, তবে ওরা যদি পাত্রীকে হাতছাড়া করে তবে ত বলার কিছুই নেই।

হরিশকাকা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। প্রথম নাতনীর বিয়েতে অবশ্যই বাড়ি বিক্রি করতে হবে। পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য কিছুই আর রইবে না হরিশকাকা হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালেন। উনি চলে যাবার উপক্রম করতেই বললাম, এ বিয়ে হবে না কাকা।

কেন ?

ওদের পাত্রী পছন্দ হয়নি। আমরা সর্ব্বস্ব ব্যয় করে পাত্র ক্রয় করতে চাইলেই তো সব হয় না। পাত্রপক্ষেরও মতামত দরকার। আমরা বুঝে এসেছি, এ বিয়েতে তাদের সম্মতি নেই।

হরিশকাকা আবার ধপাস করে বসে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে সামলে নিয়ে বললেন, তা বেশ হয়েছে। তবে মলয়া তো ছ্যা-ছ্যা করার মেয়ে নয়। যাক্। চলি।

হরিশখুড়ো চলে যেতেই আমরা দু'জনেই হেসে উঠলাম। কখন যে দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল মলয়া তা টের পাইনি। হরিশখুড়ো বেরিয়ে যেতেই চুপি চুপি ঘরে ঢুকে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল।

ভেঙ্গে দিলাম রে মলয়া, বলে হাসতে থাকি।

সংক্ষেপে ঘটনাটা বলতেই মলয়া কেঁদে ফেলল।

কাঁদছিস কেন রে?

তুমি আমাকে বাঁচালে কাকা।

কথা শেষ করে মলয়া আমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল।

অমিয়া উঠে বসে বলল, এবার চল।

আমাকে যেতে হবে।

হাঁ। বাইরে অস্বাভাবিক কিছু ঘটনার আশঙ্কা আছে। তোকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

অগত্যা বের হতে হল।

পথে লোকজন নেই। রাস্তা যেমন ফাঁকা তেমনি চঞ্চল, শহরের দোকান-পাট বন্ধ। অমিয়া গাড়ি ছোটাল তীব্র বেগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বার-বাড়িতে পৌছালাম।

বললাম, এবার আমার ছুটি!

ছুটি মঞ্জুর তবে সাতদিনের ছুটি নিয়ে এসেছি। আমরা সাতদিন ভারত দর্শন করব।

আমরা মানে?

আমি আর তুই।

চেষ্টা করব। একাই তো এই দর্শন উপভোগ করতে পারিস। এই অভাজনকে আবার কেন!

কোন তর্ক বিতর্ক এনে লাভ নেই। কাল সকালে আসবি। আমরা একসঙ্গে খেয়ে বের হব।

অমিয়া বলল, কাল যা দেখলাম, শুনলাম তা অভিনব নয় তবুও চিন্তার বিষয়।

কোনটা চিন্তার বিষয়? বিয়ে ভাবা দেশের উন্মাদ লোকের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ?

দুই-ই। তবে অসঙ্গতিপূর্ণ উন্মাদ আচরণ দেখেছি জনসাধারণের একাংশের আবার প্রশাসনের। মনে আছে সত্তর দশকের কথা।

খুব মনে আছে। জনজীবন প্রায় স্তব্ধ করে দিয়ে ছিল নকশাল আন্দোলন।

প্রশাসন তাকে দমনও করেছিল।

হেসে বললাম, এটা তোমার ভ্রান্তি। নকশাল আন্দোলন হয়েছিল একটা রাজনৈতিক আদর্শ ভিত্তি করে। তাদের কর্মপন্থা সেই সময় অনেকেরই সমর্থন পায়নি কিন্তু তাদের রাজনৈতিক আদর্শের মৃত্যু হয়নি অমু। আজও তারা নানাভাগে বিভক্ত হয়ে তাদের আদর্শ প্রচার করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর বলেন, তিনি পনরদিনে নকশাল আন্দোলন দমন করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী মূর্খমন্ত্রী হবেন এটা তো মনে করা যায় না বিশেষ করে বিলিতি উকিল দেশবন্ধুর নাতি কিন্তু ঘটনাটা একদম উল্টো। নকশাল আন্দোলনে বহু তরুণ এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক যুবাদের নির্বিচারে হত্যা করে আন্দোলন স্তিমিত করা হয়েছিল, দমন করা হয়নি। সি পি-এম বলেছে তার এগারশত কর্মীকে সিদ্ধার্থশঙ্করের শাসন ব্যবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল, অপর পক্ষ নকশালরা বলেছে তাদের সাড়ে তিনহাজার কর্মীকে হত্যা করা হয়েছিল সেইসময়। আর নিহত সবাই কংগ্রেস অথবা পুলিশের হাতে মরেনি। সি-পি-এমও এদের হত্যা করেছে। সি-পি-এম এদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। সি-পি-এম নকশালদের মনে করে তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী তাই নির্বংশ করতে লেলিয়ে দিয়েছিল ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনীকে। কিন্তু ফলাফল দেখেছ? কংগ্রেস ছিন্নভিন্ন, সি-পি-এমও নীতিহীন ভগ্নদশায় সেজন্য কৃতিত্ব যদি কেউ দাবী করে এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের তা হলে তা কংগ্রেস ও সি-পি-এম উভয়েরই প্রাপ্য। কংগ্রেস নিন্দিত ও ঘৃণিত এই পশ্চিম বাংলায় আর সি-পি-এম অপাংক্তিত হয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে।

এখন তো আর রাস্তাঘাটে বোমাবাজি হয় না।

কে বলল হয় না। আগের চেয়ে বেশি। বরং নকশালদের ভয়ে সমাজ-বিরোধীরা প্রকাশ্যে আসতে সাহস পেত না। এখন সমাজবিরোধীরা তাদের রাজ্য কায়েম করেছে গোটা পশ্চিমবঙ্গে। সিদ্ধার্থশঙ্কর কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে গায়ে গা দিয়ে নির্বাচন বৈতরণী পার হবার পর রাজনীতির গতি পরিবর্তন ঘটল, চীনের সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষ আরম্ভ হল। সিদ্ধার্থও আত্মরক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে লণ্ডনে পাড়ি জমাল, যতদিন কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের তথা জওহরলালের কাছ থেকে আশ্বাস না পেয়েছিল ততদিন স্বেচ্ছা নির্বাসনে কাটিয়ে হঠাৎ কংগ্রেসের মহান সেবক হয়ে উঠল। একদিন যে কম্যুনিষ্ট-দের গাধাবোট হয়ে রাজনীতির দরিয়াতে নঙ্গর ফেলেছিল হঠাৎ কংগ্রেসী হয়ে সিদ্ধার্থ ইন্দিরা গান্ধীর স্নেহচ্ছায়ে ঘোরতর কম্যুনিষ্টবিরোধী হয়ে গেল। ক্ষমতা হাতে পেয়ে কম্যুনিষ্ট নিধন যদি সিদ্ধার্থ না করত তা হলে খাঁটি কংগ্রেসী হওয়া ছিল দুষ্কর। এরপর সিদ্ধার্থ হল সংখ্যালঘু মুসলমানদের ত্রাতা। ফেজটুপি মাথায় দিয়ে ঈদের জমায়েতে নিজকে জমিয়ে নেবার চেষ্টা, অতঃপর সদম্ভে প্রচার আমার অমুক আত্মীয়া মুসলমানকে বিয়ে করেছে। অমুক খৃশ্চানকে। অর্থাৎ আমি হলাম সর্ব ধর্মের সমন্বয়। দেশের মূর্খ লোকেরা সিদ্ধার্থ ভজনা আরম্ভ করল। নকশাল দমনে তার ডান হাত ছিল রঞ্জিত গুপ্ত আর দীপ্রসাদ রায়। এমন যোগাযোগ ভারতের ইতিহাসে কমই দেখা যায়।

অমিয়া কি ভাবছিল জানিনা। তার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল সে

খুশী হয়নি। তার নীরবতা ভঙ্গ করতে বললাম, সিদ্ধার্থ যদি বলত, আমি পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দারিদ্র নির্মূল করতে পেরেছি তা হলে তার কৃতিত্ব প্রমাণ হত। পনর দিনে অথবা পনর মাসে আমার পুলিশ বাহিনী, আমার কংগ্রেসী অনুচর অথবা আমার পৃষ্ঠপোষক সমাজবিরোধীরা পাঁচ হাজার মানুষ খুন করেছে একটা রাজনৈতিক আদর্শ ধ্বংস করতে, এটা সদম্ভে বলার অর্থ হল নিজেকে জনসমাজে ছোট করা। এহেন সিদ্ধার্থকে যারা সমর্থন করে তাদের আর যা কিছু থাক, আদর্শ বলে কিছু থাকতে পারে না।

অমিয়া বাধা দিয়ে বলল, একটু চুপ কর। দু'কাপ চায়ের ব্যবস্থা করতে বলি।

মাধুরীকে ডেকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বলে খবরের কাগজ টেনে নিয়ে চোখ বুলাতে বুলাতে বলল, দিল্লীর অবস্থা কি হয়েছে দেখ।

কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখে বললাম, বুমেরাং হয়েছে অমু। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখবে ভিন্দ্রেওয়ালা সঞ্জয় গান্ধীর সৃষ্টি। আকালি দল আর জনসঙ্ঘ তথা ভারতীয় জনতা পার্টিকে দমন করতে এই ব্যক্তিটির সাহায্য নিয়েছিল কংগ্রেস এবং অপরাজনীতির পুরোধা করে মনে করেছিল, এইভাবে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে পানজাবে।

এটাই কি সঠিক ইতিহাস?

নিশ্চয়। এর পেছনের ইতিহাস আরও দুঃখজনক আদর্শহীনতা। গান্ধীজি এবং কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের ন্যায্য দাবী থেকে হটে এসে স্বীকার করলেন, হিন্দু এবং মুসলমান আলাদা জাতি। এই দ্বিজাতির ভিত্তি হল ধর্ম। ধর্মকে রাজনীতিতে আনা এবং তা স্বীকার করা কত বড় আদর্শহীনতা তা বলে শেষ করা যায় না কিন্তু তাই করা হয়েছিল। কায়েমী স্বার্থের মুসলমানরা পেল তাদের দেশ, কিন্তু ভারত মুসলমানমুক্ত হল না। পাকিস্থান হল হিন্দুমুক্ত। ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানরা যদি আলাদা জাতির দাবী করে এবং তা আদায় করে তা হলে ধর্মের ভিত্তিতে শিখরা তাদের খালিস্তানের দাবী তুললে কোথায় দোষ বলতে পারিস? শিখরা যদি ভারতীয় হয় তা হলে মুসলমানদের কেন অভারতীয় চিন্তা করা হয়েছিল। এই পাপ প্রশ্রয় পেয়েছিল জওহরলাল তথা অন্যান্য কংগ্রেসী নেতাদের হঠকারিতায়। আজ খলিস্থানের বুলি তুলে ভারতের সংহতি বিপন্ন করে তুলছে শিখেরা। তাদের অনায্য দাবীর কাছে মাথা নোতে দিতে কংগ্রেস বাধ্য হয় তা হলে সাতচল্লিশ সালের পৈশাচিক ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটা আশ্চর্য নয়।

এই অন্যায়কে ইন্দিরা প্রশ্রয় দেয়নি বলেই আজ তাকে বুকের রক্ত দিতে হয়েছে। এমন সৎসাহস জওহরলালও দেখাতে পারেনি।

ইন্দিরার ভূমিকা ভারতের পক্ষে মহান বলা যায়। ভারতের সংহতি রক্ষা, দেশকে প্রতিরক্ষায় স্বনির্ভর করে তোলা তার অমিত মনোবল ও সংকল্প সূচনা করে।

এরজন্যই ইন্দিরা সামরিক অভিযান করেছিলেন। শিখ সন্ত্রাসবাদীরা

যখন নির্বিচারে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হত্যা করে চলছিল তখন আকালি দল অথবা শিখদের নেতৃবৃন্দ তার নিন্দা করেন নি, এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তা রোধ করতে জনমত গড়ে তোলেন নি। যখন হরমন্দির সাহেব প্রাঙ্গণে অস্ত্রশস্ত্রের ঘাঁটি তৈরী হয়েছিল তখন কোন ধর্মপ্রাণ শিখ তাতে বাধা দেয় নি কেন? যদি শিখসম্প্রদায়ের শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন নেতারা এগিয়ে আসতেন তা হলে সামরিক অভিযানের কোন প্রয়োজন হত না। শিখ নেতারা প্রাণ ভয়ে সন্ত্রাসবাদীদের অন্যায় কার্যের বিরুদ্ধাচারণ করেনি। এটা তো কোন কৃতিত্ব নয়।

তুই যা বলছিস অমু তাও ঠিক কিন্তু এর স্রষ্টা হলেন প্রয়াত জওহরলাল নেহেরু এবং তাকে সংশোধন করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন ইন্দিরা। নেহেরু পরিবারের স্বখাত সলিল ডুবেছে ইন্দিরা। এমন ঘৃণ্য কাজকে কেউ সমর্থন করবে না।

কিন্তু দিল্লীতে লুটপাট শিখহত্যা সমর্থন যোগ্য নয়। একজনের বা কয়েক-জনের অপরাধে বহুজনকে হত্যা ও নিপীড়ণ মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। তবে আবেগ মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য করে হিংস্র করে তোলে উপরন্তু তাতে যদি উস্কানি থাকে। কোথায় দিল্লীতে শিখ দেহরক্ষীর গুলিতে ইন্দিরা নিহত হলেন আর কলকাতার পথে ট্রাম-বাস পোড়াল কংগ্রেসী সমাজবিরোধীরা। তাদের উস্কানি দেওয়া হয়েছিল, হত্যাকারী সি-পি-এম সমর্থক শ্লোগান দিয়ে। আমাদের দেশের যুবশক্তি রাজনীতির দাবাখেলায় বিভ্রান্ত, অপকাজে তাদের অনীহা নেই, কেবল মাত্র সুযোগ সৃষ্টি করে দেবার অপেক্ষা।

এসব আলোচনার দরকার। তোর গাড়িটা বের কর। আমরা কলকাতার অবস্থা দেখে আসি। আমার মনে হয় কলকাতার মানুষ বিশেষ করে বাঙ্গালীরা কোন ক্রমেই এত অবিবেচনার ক্রীড়ণক হবে না।

বেশ তাই চল। কিন্তু সাবধান হাঙ্গামায় আমার গাড়িটা যেন নষ্ট না হয়। অসুবিধা বুঝলেই গাড়ি ফেরৎ আনব কেমন?

গাড়ি চলছে। পৌছলাম কলকাতায়।

আজও পথঘাট প্রায় জনশূণ্য। ট্রাম বাস ট্যাক্সি বিরল। খবর নিয়ে জানলাম ট্রেন চলছে। কিন্তু যাদের জন্য বের হলাম তাদের একজনও রাস্তায় নেই। বিচ্ছিন্নভাবে এদিক ওদিক যারা ছিল তারা আশ্রয় নিয়েছে নিকটবর্তী গুরুদ্বারে। কোথাও কোথাও তাদের দোকানপাট তখনও লুটপাট চলছে। পুলিশ ছুটে এলে এই গুণ্ডার দল গলিতে আত্মগোপন করছে। আমরা দূর থেকে লক্ষ্য করছি, মনে হল লুঠেরার দল কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়। যে এলাকায় গুরুদ্বার তার আশেপাশের গলিতে যারা বাস করে তার অধিকাংশ অবাঙ্গালী গুণ্ডা। তাদেরই কেউ কেউ এই অপকাজে হাত লাগিয়েছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয় নয়। তারা গুরুদ্বার রক্ষা করার সব ব্যবস্থা করেছে, যাতে কোনরূপ নরহত্যা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখছে, আর অবরুদ্ধ শিখ সম্প্রদায়কে আহার্য পানীয় দিয়ে সাহায্য করছে। সবাই আশা করছে এই উত্তেজনা

সাময়িক এবং অচিরেই আক্রান্ত শিখরা নিরাপদে নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে।

অমিয়া হেসে বলল, তুই তো বামফ্রণ্টের কঠিন সমালোচক। তাকিয়ে দেখ, কলকাতার মত শহরে যা হাঙ্গামা হয়েছে তা মোটেই ধতব্য নয়। দিল্লীর যে সংবাদ পড়লাম তাতে মাথা খারাপ হবার উপক্রম। তোর উচিত পশ্চিম বাংলার শাসকদের ধন্যবাদ দেওয়া।

অস্বীকার করছি না। পশ্চিমবাংলার মানুষ যারা বাঙ্গালী তারা সাম্প্রদায়িকতা মোটেই পছন্দ করে না। অতীতে যে সব হাঙ্গামা হয়েছে তার সূত্রপাত করেছে অবাঙ্গালীরা, বিশেষ করে উর্দুভাষী মুসলমানেরা। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানরা এর অংশীদার হয়েছে খুব কম ক্ষেত্রেই। যদি কৃতিত্ব থাকে কারও শান্তিতে বাস করার সে কৃতিত্ব বাঙ্গালীর জাতিয় চরিত্রের। চল এবার দক্ষিণ কলকাতাটা দেখে আসি।

অমিয়ার গাড়ি ঘুরিয়ে ময়দান পেরিয়ে ছুটলাম দক্ষিণ কলকাতার দিকে।

সামনে কালীপীঠ, প্রবেশ পথের ধারে গুরুদ্বার জগৎসুধার। কড়া পুলিশ পাহারা সেখানে। পরিবেশ শান্ত কিন্তু ফিরতি পথে ঢিনাসঘাঁটির কাছে আসতেই গাড়ি থামাতে হল। ওখানে ছিল একটা গুরুদ্বার, তার আশেপাশে ছিল কিছু শিখের দোকান। সেগুলো শুধু লুট হয়নি, ওগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল দুস্কৃতিকারীরা গতরাতে। পোড়া আসবাব পত্র তখনও রাস্তায়, ঘরগুলোর পোড়া চেহারা বিভৎসভাবে দাঁড়িয়ে। পুলিশ টহল দিচ্ছে। সময় মত পুলিশ নিশ্চয়ই আসতে পারেনি, অথচ নিকটেই এয়ারপোর্ট থানা। ঘটনা ঘটবার পর পুলিশ এসেছে। পথিকদের দু'হাত উঁচু করে গৌরাঙ্গ হয়ে রাস্তা অতিক্রম করতে হচ্ছে।

অমিয়া বলল, আর দর কার নেই। এবার ফিরে চল।

বললাম, তথাস্তু।

অমিয়ার বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। ঘড়ির কাঁটায় তখনও ছ'টা বাজতে দেরী। বললাম, এবার আমার ছুটি।

কেন? আমার সঙ্গ তোর বুঝি ভাল লাগছে না?

হাসলাম।

হাসছিস কেন?

যখন কলেজে পড়তাম তখন তোর সঙ্গ পেলে যাদের ভাল লাগত তাদের চেহারা আর কখনও দেখেছিস কি? দেখিসনি। আর এই অভাজন মেয়েদের মুখের দিকে তাকাতে বিড়ম্বণা বোধ করত। আজও তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি রে। তাই জোর করে ভাল না লাগালে মনে হয় ভাল লাগবে না।

ননসেন্স! বলে অমিয়া আমাকে ঘরে বসিয়ে মাধুরীর খোঁজে গেল।

আমি চুপ করে বসে ভাবছিলাম কত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা যায়।

অমিয়া ফিরে এল মাধুরীকে নিয়ে। মাধুরীর হাতে চা ও খাবার।

দেখ কেমন গেরো। আজ বাজারে বিশেষ কিছু মাল আসেনি তাই বাজারে দুনো দাম দিয়ে জিনিস কিনতে হয়েছে। তাও প্রয়োজন ও রুচিমত জিনিস আনতে পারেনি।

বললাম, এতো পুরানো ঘটনা। এরও একটা অঙ্ক আমার আছে। রাজনৈতিক দল যদি কোন তারিখে হরতাল বা বন্ধ ঘোষণা করে তখন তার প্রতিক্রিয়া হয় কম পক্ষে তিনটে দিন। যেদিন হরতাল তার আগের দিন বাজারে জিনিসের দাম দুনো হয়। হরতালের পরদিন কলকাতার সাপ্লাই বেসগুলো থেকে মাল এসে শহরে সময় মত পৌছায় না। যারা নিত্য প্রয়োজনীয় মাল লুকিয়ে রাখে তারা তিনগুণ দাম আদায় করে। হরতালে উপকৃত হয় কারা? যারা হরতাল করল তারা খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের একদিনের রুজিরোজগার পয়মাল হল, উপরন্তু দ্বিগুণ তিনগুণ দাম দিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে আরও ক্ষতিগ্রস্ত হল। আর তারা পেল অভিনন্দন। যারা হরতালের ডাক দিয়েছিল তারা অভিনন্দন জানাল হরতালের সাফল্যে আর যারা বিরোধী তারাও অভিনন্দন জানাল হরতাল বানচাল করার জন্য। বহুকাল থেকে এই অবস্থা চলে আসছে, আমার এই অঙ্কের ভুল কখনও হবে না রে অমু। তাই ইন্দিরা হত্যা দেশের অপরিসীম ক্ষতিসাধন যেমন করল, এই ঘটনার সুযোগে সমাজ-বিরোধীরা লুটপাট করে সম্পদ সঞ্চয় করল, আর শান্তিপ্রিয় মানুষরা গুণাগার দিল। সেই যে গোপালভাঁড়ের গল্প, আমাদের দেশের সমাজবিরোধীরা সেই গল্পের নায়ক। গোপালভাঁড় আলুর গুদাম পুড়ে যাবার পর পোড়া আলু নুন দিয়ে খেয়ে গুদামের মালিককে জিজ্ঞাসা করেছিল, আবার কবে আলুর গুদাম পুড়বে, তেমনি সমাজবিরোধীরা চায় আবার কখন কোন্ অঘটন ঘটবে তাহলে তারা লুটপাট করতে পারবে। অনেক প্রিয় ও অপ্রিয় আলোচনা হল, এবার ছুটি। বলে উঠে দাঁড়াতেই অমিয়া আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমার বিনা অনুমতিতে তুই যেতে পাবি না।

অগত্যা চেয়ারে আবার বসতে হল।

রাতের বেলায় মুখ বুজে খেয়ে চলেছি। দু'জনে পাশাপাশি বসেছি। ভাবছিলাম, অমিয়া এবার নিশ্চয়ই ছুটি দেবে। খাওয়া শেষ হলেই সটান বাড়ির দিকে পা বাড়াব।

অমিয়া নীরবতা ভঙ্গ করে বলল, কি ভাবছিস? ভাবছিস, আচ্ছা গেরো। তা বটে। বাড়িতে একটি দাসী ও দুটি চাকর ভিন্ন কেউ নেই, আর রয়েছি আমি আর তুই। নিভৃতে আলাপ করছি। বোধহয় সহ্য করতে পারছিস না। এ বয়সে তো কলঙ্কের ভয় নেই, লোকলজ্জাটা তোর বোধহয় বেশি।

মুখে গ্রাস তুলতে গিয়ে থেমে গেলাম।

বল না। কথা বলছিস না কেন?

হেসে বললাম, তোর কথা ঠিক বুঝতে পারছি না অমু। যদি লোকলজ্জা আর কলঙ্কের ভয় থাকত তা হলে কি আর তোর সঙ্গে তোর বাড়িতে আসতাম!

ওটা যতটা মেয়েদের অতটা পুরুষদের নয়। তবে কি জানিস, তোদের বিকৃত রুচি অনেক সময়ই অশান্তি সৃষ্টি করে অথচ দায়িত্বটা বর্তায় পুরুষের স্কন্ধে। যাক্ ওসব কথা। হঠাৎ তোর ওকথা মনে হল কেন?

হঠাৎ নয়। আমাদের, বিশেষ করে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ যা মনে করতে পারে তাই বলছিলাম।

এতে তোর যদি বিশ্বাস থাকে তা হলে ডেকে আনলি কেন। তামাসা দেখতে? অথবা ইংরেজিতে যাকে বলে ব্ল্যাকমেইল করতে? তবে কি জানিস, আমরা, মানে ভারতীয়রা আমাদের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছি। তোর কথাই বলছি, অরিন্দমকে তুই সহ্য করতে পারিসনি কেন? তার আভিজাত্যের অন্তরালে যে নৈতিক পাপগুলো বিকৃতভাবে ফুটে উঠেছিল তা দেখেই আঁতকে উঠেছিলি। তোর শিক্ষিত মন ওটা বরদাস্ত করতে পারেনি। নয় কি? অথচ সব জেনেশুনে তুই আমাকে আটকে রাখতে চাস তোর বাড়িতে। আমি পরপুরুষ। একটি নারী ও একটি পুরুষ, তাদের দেবার মত কোন পরিচয় নেই, অথচ তারা একত্র বাস করছে, এটা কখন সম্ভব সটাও তো তুই জানিস। ভাবছি, তুই তামাসা দেখতে চাস।

আমার মনে হচ্ছে, তুই মেয়েদের যথাযথ সম্মান দিতে পারিস না।

ভুল। আমার আচার আচরণে কোন সময়ই কি তুই এরকম কোন লক্ষণ দেখেছিস? বরং আমি যদি বলি, তোরা পুরুষদের কাছ থেকে সম্মান আদায় করতে জানিস না। সম্মান পাবার মত মানসিকতা মেয়েরা হারিয়ে ফেলেছে। আজ নয় রে, হাজার হাজার বছর আগে যখন মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল, যখন মানুষ তার বর্তমানকে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য শিলায়-গুহায় চিত্রিত করতে আরম্ভ করেছিল সেই যুগ থেকে আজ অবধি কোথাও দেখেছিস কতটা সম্মান আদায় করতে নারী এগিয়ে এসেছে। খাজুরাহোর মন্দির ভাস্কর্য, কোণারকের রথচক্রের ভাস্কর্য দেখে শিল্পের উৎকর্ষতা নিয়ে আমরা গৌরববোধ করি কিন্তু তাতে যেভাবে যৌন-উত্তেজক মূর্তি খোদাই করা হয়েছিল তার প্রতিবাদ কি সে সময় কোন নারী করেছিল অথবা করার সাহস ছিল তাদের। তারপর একদিন মেয়েরা সেই সব ভাস্কর্য দেখে মোহিত হয়েছে, তারা বলেছে অপূর্ব এই শিল্পকলা! আমি বলব, অবশ্যই অপূর্ব কিন্তু তোদের পুরুষদের ওপর দোষ চাপানও অযৌক্তিক।

অমিয়া বলল, সে রকম শিক্ষা তারা পায়নি। বিদেশী শত্রু এসে দেশ আক্রমণ করেছে। বিজিত দেশের নারীকে শত্রুরা অসম্মান করেছে, ধর্ষণ করেছে, কারণ তারা দুর্বল, প্রতিরোধ করতে অক্ষম। তাদের সম্মানরক্ষার একমাত্র পথ ছিল আত্মাহুতি যা করেছিল পদ্মিনী ও তার সহচরীরা।

এসব মধ্যযুগের কাহিনী। বর্তমান যুগে এরকম ঘটনা কমই ঘটে।

কে বলল? এই তো কয়েক বছর আগে পাকসৈন্যরা যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা লড়াইয়ের বিরুদ্ধে নেমেছিল তখন পাকসৈন্যরা বাংলাদেশের অসহায়

নারীদের ওপর কেমন বর্বর আচরণ করেছিল তা কি তোর অজানা! আজও সুযোগ পেলেই পুরুষরা নারীর মর্যাদাহানি করে থাকে। খোদ রাজধানী দিল্লীতে এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটে। পুলিশ এই অসদাচার দমনে হিমশিম খাচ্ছে। শুধু দিল্লী কেন ভারতের প্রধান প্রধান কোন শহরই এই পাপমুক্ত নয়, কমবেশি সর্বত্র এসব ঘটছে।

তুই বলতে চাস এর জন্য পুরুষরাই দায়ী।

আংশিক। সমাজে শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ বজায় রাখার দায়িত্ব প্রশাসনের। প্রশাসনের ব্যর্থতাই এর জন্য দায়ী। প্রশাসন বললে শুধুমাত্র পুলিশ-আদালত নয়। সার্বিক ব্যর্থতা। যুবশক্তিকে কর্মমুখী করার কোন ব্যবস্থা করতে পারেনি প্রশাসন, কর্মসংস্থানের সুযোগও নেই অথচ জাগ্রত যৌবনের স্রোত বাধা মানতে চাইছে না। নৈতিক শিক্ষা কেউ দেয় না, সভ্যতার নিম্নতম মান রক্ষা করে না কেউ। অথচ প্রশাসন নির্বিকার। পুলিশ দিয়ে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব নয়, সমাজ চেতনা প্রয়োজন কিন্তু সমাজ চেতনা কি করে জাগবে এই সব ভবিষ্যৎহীন যুবক যুবতীদের! তারা পথহারা। পথ হারিয়ে অবক্ষয়ের দিকে দ্রুত নেমে চলেছে।

অনেক রাত হয়ে গেছে। এবার আমার ছুটি। আবার যেদিন আসব সেদিন আলোচনা করব।

তুই তো জানিস, আমি সাতদিনের ছুটি নিয়েছি তোর সঙ্গে গল্প করতে, আলোচনা করতে।

রাত জেগে?

অবশ্যই নয়। এবার ঘরে বসে কথা বলব।

পেটে কিছু পড়লেই আমার চোখ ভেঙ্গে আসে ঘুমে।

অর্থাৎ তুই কথা বলতে রাজি নোস।

রাজি, রাজি, রাজি। হাজারবার রাজি। কিন্তু আমাদের আলোচনাটা ক্রমেই লড়াইয়ের চেহারা নিতে উপক্রম করেছে।

মোটেই না। আমি পুরুষকে দায়ী করেছি কিন্তু তার সহজ সত্য কারণগুলোও বলেছি অথবা বলছি।

তাহলে আমিও নারীদের দায়ী করব কারণগুলো বলব। সেই কারণগুলোও সহজ এবং সত্য।

অমিয়া বলল, তোকে বলার স্বাধীনতা দিলাম।

না দিলেও আমার অধিকার ক্ষুন্ন করার অধিকার তোর নেই। আমরা এখন বোম্বাইয়া সিনেমা কালচারে বুঁদ হয়ে আছি। তার প্রভাব নারী ও পুরুষকে কি ভাবে অবক্ষয়ের পথে নামিয়েছে তা আমরা সব সময় প্রত্যক্ষ করছি। অনেক সময় ভেবেছি পয়সা আমাদের মেয়েদের কোথায় নামায় তার ভয়াবহ উদাহরণ বোম্বাইয়া সিনেমা। যে নারীকে মা-বোন-স্ত্রী-কন্যা রূপে আমরা দেখি ও চিন্তা করি সেই দেখাকে ঝাপসা করে, চিন্তার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করে মেয়েদের

ওরা করে তুলেছে নর্মসহচরী। যৌন আবেগ সৃষ্টি করে তরুণ-তরুণীদের মনে যে অস্থিরতার তরঙ্গ তুলেছে, তা বর্তমান যুবক-যুবতীদের মধ্যে এনে দিয়েছে ভ্রষ্টাচারের প্রাবল্য। তুমি অস্বীকার করতে পার কি? কিন্তু ভারতীয় প্রশাসন এ বিষয়ে নীরব। কারণ, দিল্লীর বাদশাহরা হিন্দী প্রচারের মাধ্যম ঠিক করেছে, সিনেমা, দূরদর্শন ও বেতারকে। কুৎসিত ছবি দেখালে কি হবে, হিন্দী প্রচার তো হবে। কিন্তু বোম্বাইয়া হিন্দী কস্মিনকালেও হিন্দী নয়। 'হুক্কা হুয়া ক্যা হুয়া' বললে তা হিন্দী হয় না। রেঙ্গুন যাবার পথে জাহাজে শ্রীকান্ত কাবুলিওলার গান শুনে মোহিত হয়েছিলেন কিন্তু কেন, তা শরৎবাবু বিশদভাবে বলেন নি তবে কেন্দ্রের অন্ধ্রদেশীয় মন্ত্রীর হিন্দী ভাষণ শুনে আমরা মোহিত না হয়ে পারি না।

হিন্দীর প্রতি তোমার বিরাগ বেশি।

মোটেই নয়। হিন্দী একটি আঞ্চলিক ভাষা। তা গায়ে গড়বে বৃদ্ধি হোক অথচ হিন্দীর চাপে আমাদের নাভিশ্বাস উপস্থিত। দূরদর্শনের শতকরা পঁচাত্তর ভাগই হিন্দী, বেতারের একটা বিশেষ তরঙ্গ কলকাতা থেকে হিন্দী প্রচার করে বসেছে অবিরাম। কলকাতার দূরদর্শনের কতটা বাংলা তা হিসাব করলে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে হবে আমরা সত্যিই বাঙ্গালী কিনা। এটা হল বোম্বাইয়া সিনেমার একটা দিক। আরেকটা দিক হল, যুব সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করে তোলার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যম হল হিন্দী।

অমিয়া বাধা দিয়ে বলল, উচ্ছৃঙ্খলতা মানুষের সহজাত বৃত্তি। শিক্ষার ও পরিবেশের প্রভাবে মানুষ সভ্য ও শান্ত হয়।

হেসে বললাম, এবার তুমি ঠিক বলেছ। শিক্ষার অভাব। কে শিক্ষা দেবে? আর পরিবেশ? কে পরিবেশকে তৈরী করে। রাজনীতি আমাদের সমাজ জীবনে যে ভাবে পাপ প্রবেশ করিয়েছে তার প্রতিফলন। রাজনীতির যারা বিশেষ সেবক তাদের বর্তমান তথাকথিত গণতন্ত্রে আদর্শভ্রষ্ট দুরাচার ভিন্ন আর কি বলা যায়। কোন একজন বিশিষ্ট নেতা সদম্ভে ঘোষণা করেছিল, আমি আত্মহত্যা করব তবুও ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেব না। ভূত-প্রেতের গল্পতো শুনেছিস, এবার আমরা সেই ব্যক্তির প্রেতাত্মাকে দেখছি ইন্দিরা কংগ্রেসে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। রাজনীতি এদের পেশা, রুজিরোজগারের পথ। তাই যতই গলায় দড়ি দেবার দম্ভ প্রকাশ করুক, বেঁচে থাকার দায়ে এবং পেটের দায়ে তাকে সুবিধাবাদী হতে হয়েছে। অপর একজন বলেছিল, আমি যদি ইন্দিরা কংগ্রেসে যাই তা হলে আমি একটা কুকুর। দেখা যাচ্ছে ইন্দিরা কংগ্রেসের বকলস গলায় বেঁধে এই ব্যক্তি ঘুরছে, তার গলার লোহার শেকলটা বাদশাহের হাতে, এও সেই সুবিধাবাদ। একে রাজনীতি বলে না। তবুও আমাদের দেশের অশিক্ষিত মানুষরা এদের বাহবা দেয়। এরা আছে বলেই অপসংস্কৃতির এত দাপট। যদি মানুষ সুস্থ জীবনের সন্ধান পায় তা হলে এই আদর্শভ্রষ্ট ব্যক্তিদের ভোট কুড়িয়ে দেবে কে? তাই হিন্দীর প্রয়োজন। ওরা

নিজেরা হিন্দু কিন্তু মুসলমান ভোট আদায়ের আশায় ভণ্ডামি করে মুসলমান ভোটারের সামনে গিয়ে। বিনীতভাবে বলে থাকে, ইনশাল্লা, আপনাদের দয়ার ভিখারী আমি।

তুই তো সব কিছুতেই কয়েকজন আদর্শহীন কংগ্রেসীদের কথা বললি। কংগ্রেসের সবাই তো তা নয়।

কম্বলের লোম বাছলে কম্বল থাকবে কি ?

বিরোধীরা তো ধোয়া তুলসীপাতা নয়।

নয়। সেটাও ঠিক কিন্তু পাঠশালায় হাবুর মত কথা বললে তো নিজেদের অপকাজের কৈফিয়ৎ হয় না। হাবুকে শিক্ষক মশায় কয়েক ঘা বেত দিতে উদ্যত হলেন গাবুকে প্রহার করার অপরাধে। হাবু আত্মরক্ষার তাগিদে বলল, স্যার মধুও যদুকে আজ মেরেছে। হাবুর ধারণা, এতে তার দোষ লাঘব হবে। কংগ্রেস অন্যায় করেছে এর গায়ে মিষ্টি প্রলেপ দিতে বিরোধীদের অন্যায়গুলো তুলে ধরাই যথেষ্ট নয় ? নিজেদের সংশোধন করাটাই এর একমাত্র মিষ্টি মধুর প্রলেপ। তবে রাজনীতি বর্তমানে দাঁড়িয়েছে মিথ্যা ভাষণ, ব্যক্তি চরিত্রহনন ইত্যাদি নীতিবিরোধী কাজে। থাক্ অনেক রাত হয়ে গেল। এবার শয্যায় গা এলিয়ে দিতে চাই। তুই আমার শোবার জায়গাটা দেখিয়ে দে।

অমিয়া মাধুরীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, দক্ষিণের ঘরটায় বিছানা করে দিয়েছিস তো ?

মাধুরী সম্মতি জানাতেই অমিয়া আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল দক্ষিণের ঘরে। বলল, এখানে তোর স্থান। কাল সকালে আবার দেখা হবে। যদি কোন অসুবিধা হয় মাধুরীকে ডেকে বলিস।

আমার ব্যবস্থা পাকা করে অমিয়া নিজের ঘরে চলে গেল। আমি দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। ঘুম এল না চোখে। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম।

ভাবছিলাম অতীত ও বর্তমানকে।

সেই স্বাধীনতা ঘোষণার দিনটি মনে পড়ছিল বারবার। উঃ কি আনন্দ ? দাদা-বউদিকে বলেছিলাম, আর ভয় নেই দাদা, এবার আমাদের দুঃখ ঘুচবে। রুটিরুজি আশ্রয় সবই পাব আমরা।

দাদা গম্ভীর হয়ে শুনেছিলেন।

আজ ভাবছি, স্বাধীনতার স্বাদ এত তিক্ত হল কেন ? আমরা তো পেলাম না আমাদের প্রার্থিত স্বাধীনতা। কার জন্য স্বাধীনতা ? উত্তর খুঁজেছি।

কলকাতার ফুটপাতে চলাফেরা খুবই কষ্টকর। জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরের মানুষ ভীড় করেছে ফুটপাতে। ওরা স্বাধীনতা পেয়েছে। হাঁ, পেয়েছে বইকি। ওরা মাটির মায়া ছেড়ে ক্ষুধার তাড়ণায় শহরের নিষ্ঠুর পরিবেশে নিজেদের মর্যাদাটুকু হারাবার স্বাধীনতা পেয়েছে।

এই স্বাধীনতার অবদান কি ?

অনাহারী, আশ্রয়হারা, জীর্ণশীর্ণ অর্ধোলঙ্গ মানুষের দল ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে

মুক্তিপেতে ছুটে এসেছে শহরে। বিলিয়ে দিয়েছে ব্যভিচারে, সমাজবিরোধী কাজে, নিজেদের অজান্তে। কর্ম সংস্থানের পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে তাদের। যারা কায়িক পরিশ্রম দিয়ে নিজেদের বাঁচাবার কোন পথ পায় না, তারা চুরি, রাহাজানি, ডাকাতিতে মেতে ওঠে, আবার মেয়েরা পুরুষদের প্রলোভনের শিকার হয়, আবার কেউ কেউ পুরুষদের আকর্ষণ করতে নানা ছলাকলার আশ্রয় নেয়।

অতীত চিরকাল অতীত। ত'র ছায়া বর্তমানকে সচল করে। এযেন মোটর গাড়ির পেছনের দুটো চাকা। সামনের চাকাকে ঠেলতে থাকে, সামনের চাকা শুধু নির্দিষ্ট পথ ধরে চলে। অতীত এমন যা পেছন থেকে ঠেলে আর বর্তমান নির্দিষ্ট পথ ধরে চলে।

রামবতিয়ার কথা মনের কোণায় ভেসে উঠল।

জাতিতে চামার। বিহারে চামার অস্পৃশ্য। ওরা মরা গরু মোষের চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করে, গ্রামের প্রয়োজন মেটাতে নাগরা চটিজুতা তৈরী করে কাঁচা-পাকা চামড়ায়। মজুরী টুকুই ওদের উপার্জ্জন। মরা গরুর মালিক চামড়ার মালিক। চামড়ার ওপর কোন অধিকার তাদের নেই। তাদের কেউ ছোঁয় না, ছোঁয়া জল কেউ খায় না। এমন কি গ্রামের জলাশয়ে নামবার অধিকারও দেয় না। যুগযুগান্তর থেকে এই অবিচার তারা মুখ বুঁজে সহ্য করে আসছে। কর্ষণ-যোগ্য ভূমি ওদের সামান্য, ফসল সব সময় ঘরে তুলতেও পারে না। রহিস আদমী রাজপুত, ভূমিহার, কায়স্থরা তাদের নানাভাবে শোষণ করে। বেগার খাটায়, পারিশ্রমিক পায় না, ভাগচাষীরা ফসল তোলে রহিসদের খামারে। ভাগবাঁটোয়ারার তিনভাগের একভাগ ফসলও পায় না সব সময়। ঘরের যুবতী মেয়েরা কিন্তু কোন সময়ই উচ্চবর্ণ হিন্দুদের কাছে সময় বিশেষে ম্লেচ্ছ নয়। তাদের নানা প্রকারের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করবে। অন্তজ শ্রেণীর যুবতী মেয়েদের গর্ভস্থ সন্তানদের পিতৃত্ব স্বীকার করে না কখনও এহেন জাতি 'াতি দেশের মুচির মেয়ে রামবতিয়া।

রামবতিয়ার বয়সও মনে হয় আঠার পেরোয়নি। সে বিবাহিতা। স্বামী কলকাতায় কাজ করে। কলকাতা কোথায় তা জানে না। তবুও একদিন গাড়িতে উঠে বসেছিল রামবতিয়া তার স্বামী সুখনচাঁদের ডেরা খুঁজতে। কলকাতায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার আশাভরসা প্রায় উপে গেল। এই শহরে কোন এক সুখনচাঁদকে খুঁজে বের করবার সাধ্য তার নেই।

সদরের সিঁড়িতে বসে নীরবে অশ্রুপাত করছিল।

অনেকেই তাকে দেখছে। কেউ জানতেও চায়নি তার পরিচয়।

অঘোরবাবু সন্ধ্যার সময় মার্কেটিং করে ফেরার পথে রামবতিয়ার ওপর চোখ পড়ল। অঘোরবাবুর বাড়িতে বাইরের কাজ করার লোকের খুব দরকার। যদি সেই দরকারটা এই মেয়েটা করে তা হলে গৃহিনীর মুখঝামটা থেকে রেহাই পাবেন আশা করেই জিজ্ঞেস করলেন, তুই কে?

রামবতিয়া জবাব না দিয়ে ফুপিয়ে উঠল।

অঘোরবাবুর মুখে শুনেছি রামবতিয়ার ঘটনা। । হাজের মুঙ্গের জেলায় ওর ঘর। কয়েকদিন আগে গ্রামের রাজপুত আর কায়স্থরা ওদের বস্তি আক্রমণ করেছিল। পনর ঘর মুচির সাধ্য কি সশস্ত্র ওইসব উঁচুজাতের সঙ্গে লড়াই করে। ঘেন্টুরামের মেয়ে নিয়ে কেলেঙ্কারী। সখিয়া ঘেনুরামের মেয়ে, বিবাহিত। তার স্বামী গয়ার রাস্তায় রাস্তায় জুতো মেরামত করে। মাঝে মাঝে আসে, টাকা দিয়ে যায়। সংসারে সখিয়া আর তার তিনটে ছেলে আর তার বিধবা শাশুড়ি। সারাদিন কাজ করে সখিয়া। কদিন রাজপুত ঘরের ভীমরাজসিং তার পিছনে লেগেছিল, সে নীরবে প্রতিবাদ জানিয়েছে, শেষে সে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠতে বাধ্য হল।

সখিয়ার স্বামী গয়া থেকে বাড়িতে আসতেই সখিয়া ভীমরাজের কথা ইনিয়ে বিনিয়ে নিশ্চয়ই বলেছিল। পরদিন সখিয়ার স্বামীর সঙ্গে ভীমরাজের দেখা ময়দান করার সময়। দু'চারটে গরম কথাবার্তা হবার পর ভীমরাজ জানিয়ে দিল, সখিয়ার তিনটে ছেলেই গ্রামের মুখিয়ার। বুধনরাম গয়া থাকার সময় হরদম সখিয়া মুখিয়ার বাড়ি গেছে। বুধন আর ধৈর্য ধরতে পারেনি। হাতের লোটা দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করল ভীমরাজের মাথায়। আহত হয়ে ভীমরাজ পড়ে গেল মাটিতে। বুধন ছুটে পালাল। সকাল বেলায় অজ্ঞান অবস্থায় ভীমরাজকে দেখে ময়দান যাওয়া লোকেরা খবর দিল ভীমরাজের বাড়িতে লোক জড় হল। নানা গুজব শোনা গেল। কেউ-ই ভাবতে পারেনি ঘটনা কতদূর গড়াবে। ভীমরাজের জ্ঞান ফিরতেই বুধন যে তাকে মেরেছে সেটা জানিয়ে দিল সে জ্ঞাতী কুটম্বকে।

তিনদিন পর প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপুত পাড়ার রহিস আদমী জগদীশসিং-এর নেতৃত্বে বন্দুক, তীরধনুক, লাঠিসোটা নিয়ে শতাধিক লোক ঘিরে ফেলল মুচিবস্তি। নির্বিচারে তিরিশজন জওয়ান মরদ শিশু মহিলাকে হত্যা করল। তেত্রিশজনকে গুরুতর আহত করে মুচিবস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিল। যুবতীদের প্রকাশ্যে ধর্ষণ করে তাদের ফেলে রেখে যে যার মত ফিরে গেল। নিকটবর্তী গ্রামের লোক ছুটে এল আগুন নেভাতে। তাদের চোখে পড়ল এই নৃশংস ঘটনার চিহ্ন। একদল ছুটে গেল থানায়। থানাদার তখন বাড়িতে ভোজনপর্ব শেষ করছে। জমাদার সাহেব সংবাদবহনকারীদের আটক করে অপেক্ষা করছিল থানাদারের জন্য। এমন সুসংবাদ ডায়েরী করতে হলে অন্তত দুই প্যাকেট সিগারেট আর নগদ দশটা টাকা অবশ্যই দেয়, এটা বিহার পুলিশ থানার রেওয়াজ। পরের উপকার করতে এসে এমন বিভ্রাট হামেশাই হয়। সংবাদদাতাদের ট্যাঁক খুঁজে পাওয়া গেল দুই টাকা কুড়ি পয়সা। জমাদার সেটা পকেটে রেখে ডায়েরী লিখতে বসল। ইতিমধ্যে দিবানিদ্রা পরিহার করে থানাদার হাজির হলেন। উপবেশন করলেন তাঁর সিংহাসনে। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, এতেলার ফিস দিয়েছিস।

হাত জোড় করে সংবাদদাতা বললেন, হাঁ হুজুর।

ডায়েরী লিখায়া ?

হাঁ হুজুর।

আবি যাও, হামলোক ফোর্স লেকে জায়েগা। থোড়া দেরমে।

থানাদার সূর্যাস্তের আগেই কয়েকজন বন্দুকধারী সিপাহী নিয়ে হাজির হলেন অকুস্থলে। ততক্ষণ মুচিবস্তির একটা বাড়ির চিহ্নও নেই।

তাজ্জবকা বাত্। কোন আগ্ লাগায়া ?

উত্তর দেবার মত লোক তখন আর ছিল না। যারা জীবিত ছিল তারা পালিয়েছে। বেশির ভাগই আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলে।

থানাদার গেলেন মুখিয়ার বাড়িতে।

তদন্ত শেষ করে ওপরওলার কাছে রিপোর্ট পাঠালেন, নকশালরা গ্রামবাসীদের আক্রমণ করেছিল। তারা আশ্রয় নিয়েছিল মুচিবস্তিতে। গ্রামের লোক নকশালদের ঘিরে ফেলেছিল। উভয় পক্ষেই গুলি চলেছে। নকশালদের চারজন মরেছে, গ্রামের চারজন নিরীহ লোক মরেছে। এরা তামাসা দেখতে এসেছিল। এখন অবস্থা আয়ত্তে। জোর পুলিশ পোষ্টিং করে এসেছি।

রামবতিয়ার কাছ থেকে এইটুকু উদ্ধার করে অঘোরবাবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তু এলি কি করে ?

তিনদিন জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলাম। পড়ি গিয়ে ছিলাম সেথা রাতে। কিছু নেই। আমার বাবা মা কাউকে পেলাম না। সদর হাসপাতালে গেলাম, সেখানেও কেউ নেই। সব মরে গেছে বুজি। পাশের গাঁয়ের লোকের মুখে সব শুনে ঠিক করলাম, আমার স্বামীর কাছে যাব। কিন্তু আমার স্বামীর পাত্তা তো জানি না, শুধু জানি কলকাতায় থাকে। কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে কলকাতার গাড়িতে উঠে বসলাম। টিটিবাবুরা দুই দুইবার নামিয়ে দিল। তাও ভয় পাইনি বাবু। আজই বিহানে কলকাতা এসেছি। এখন সুখনচাঁদের পাত্তা করতে হবে।

অঘোরবাবু বললেন, কলকাতা শহরে হয়ত পাঁচহাজার সুখনচাঁদ আছে। তাও এক জায়গায় নয়। এভাবে তাকে খুঁজে পাবে কি করে ? তোমার স্বামী কি কাজ করে ?

কারখানায় যে জুতো বানায় বাবুজি।

অঘোরবাবু অনেক ভেবে চিন্তে বললেন, আমার বাড়িতে ক'দিন থাক। আমি জুতোর কারখানাগুলোতে খোঁজ করে দেখব, কেমন ?

রামবতিয়া ইতস্তত করছিল। অঘোরবাবু বললেন, আমার জানানার কাছে থাকবে। [illegible]ন ভয় নেই।

ভয় ছিল না ঠিকই, তবে সুখনচাঁদকে খুঁজে বের করার ভরসাও ছিল না।

তিনদিন ঘোরাঘুরির পর পাঁচটা সুখনচাঁদ আবিষ্কার হলেও কেউ-ই রামবতিয়ার গ্রামের লোক নয় এবং রামবতিয়াকে চেনেও না।

পাঁচদিন পর একটা গলির ছোট্ট এক কারখানায় দেখা পাওয়া গেল আরেক সুখনচাঁদ। সে রামবতিয়ার বর্ণিত ব্যক্তি বলেই মনে হল। তবুও রামবতিয়াকে দিয়ে সনাক্ত করানো দরকার। অঘোরবাবুর সঙ্গে সুখনচাঁদ এল তার বাড়িতে।

রামবতিয়া আর সুখনচাঁদের মিলন দৃশ্যটি উপভোগ করলেন অঘোরবাবু। তার জীবনে এমন দৃশ্য কখনও দেখেননি। রামবতিয়ার হাত ধরে সুখনচাঁদ যখন ফিরে গেল তার বস্তির বাড়িতে তখন সবার অলক্ষ্যে চোখ মুছে নিলেন। অনেক হারিয়ে এই ফিরে পাওয়া কত আনন্দের প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন কে জানবে!

অনেকদিন পর রামবতিয়ার ঘটনাটা মনকে আচ্ছন্ন করল।

আমাদের দেশের পুলিশবাহিনী কি ভাবে অর্থের প্রলোভনে দিনকে রাত করতে পারে আর রাতকে দিন করতে পারে তা কারও অজানা নয়। বিশেষ করে বিহারী পুলিশ যভাবে নকশাল এই অপবাদ দিয়ে হরিজন সম্প্রদায়ের জঙ্গী মানুষদের হত্যা করে থাকে তাও কারও অজানা নয়। বিহারের গ্রাম অঞ্চলে রহিস বর্ণহিন্দুরা নানা ভাবে হরিজনদের লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত করে তার ইতিহাস কারও না জানা থাকার কথা নয়। এই সব অত্যাচারিত মানুষ যখন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানায় অথবা দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করে তখনই তারা রহিসদের ও পুলিশদের গুলির শিকার হয়। বিশেষ করে ভূমি ও ফসলের ওপর দাবী জানালে আর রক্ষা নেই।

রামবতিয়ার সঙ্গে অঘোরবাবুর দেখা হয়েছে অনেকবার। রামবতিয়া তার বাবা, মা ও প্রিয়জন হারাবার ব্যথা ভুলে গেছে।

নিজেকে রক্ষার জন্য অতীতকে ভুলে বর্তমানকে নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। অঘোরবাবুকে দেখলেই গড় হয়ে প্রণাম করে। সুখনচাঁদ একবার একজোড়া দামী চটি তৈরী করেও দিয়েছিল।

রামবতিয়া একটা উদাহরণ মাত্র। এ রকম শয়ে শয়ে রামবতিয়া অর্থবান ব্যক্তির শিকার হয়েছে। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থরক্ষা করতে প্রশাসন অত্যাচারিত মানুষের দিকে ফিরে তাকায় না। এদের আবেদন নিষ্ফল, আন্দোলন দমন করে হিংস্র উপায়ে, অশ্রু মোছাবার প্রতিবাসীও পাওয়া যায় না। বিচিত্র এই দেশের বিচিত্র ব্যবস্থা। নকশাল অপবাদ দিয়ে বহু নিরীহ মানুষকে হত্যা শুধু বিহারেই ঘটেছে এমন নয়। পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্র, পঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যেও একই ঘটনা ঘটেছে ও ঘটছে। বিহার আরও সরস রাজ্য। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেওয়া গণতন্ত্রী দেশের অপূর্ব কীর্তি। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ তথাকথিত নকশাল দমনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। কেউ কেউ বিদেশে টাকা পাচার করেছে এমন অভিযোগও শোনা গেছে। সম্প্রতি পুলিশ প্রশাসন নিয়ে ভারতের আইনবিদ্ বুদ্ধিজীবি ও অবসর প্রাপ্ত

বিচারকরা যে সেমিনার করেছিলেন, তার ফলাফল একটি কথায় তাঁরা শেষ করেছেন, ভারতীয় দণ্ডবিধির এমন কোন ধারা নেই যে ধারায় পুলিশ অপরাধ করে না। এটা গৌরব, কি অগৌরব তা বিচার করবে জনসাধারণ কিন্তু সরল সহজ মানুষগুলো যে ভাবে পুলিশী অত্যাচার সহ্য করে তার নজির পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নেই।

রামবতিয়ার স্মৃতি ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে কিন্তু কলকাতার ফুটপাতে যে সব রামবতিয়া আশ্রয় নিয়েছে তাদের দিকে তাকালে শিউরে উঠতে হয়।

সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হল যারা ওই সব দুষ্কার্য করে থাকে তারাই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উপদেশমূলক প্রবন্ধ ছেপে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করে। তখন লেখক লজ্জিত না হলেও ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শীরা লজ্জিত হয়। অসত্য ভাষণে এরা কতটা পটু তা বলে শেষ করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের নকশাল দমনের ইতিহাস হল খুনের ইতিহাস। নির্বিচারে হত্যা করে যাদের ঘরে হাহাকার সৃষ্টি করেছিল তাদের স্বজনরা কংগ্রেসী দুঃশাসনকে কখনও ক্ষমা করতে পারে না। শুধু কংগ্রেসের কথা বললেই শেষ নয়, সি-পি-এমও কংগ্রেসী রাজত্ব কালে তাদের বহু কর্মী ও সমর্থককে নিযুক্ত করেছিল নকশালদের হত্যা করতে। বামপন্থীরা ক্ষমতা পাবার পর নকশালদের জন্য বিশেষ সেনী তৈরী করে কোন এক আত্মন্তরীর হাতে তার দায়িত্ব দিয়ে ইতিমধ্যে নকশাল অপবাদে বহুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের গ্রেপ্তারের পর থানায় কোন রেকর্ড রাখা হয় না, তাদের কোথায় আটক রাখা হয়েছে তাও বন্দীর আত্মীয়স্বজনদের জানতে দেওয়া হয় না। তারা জীবিত বা মৃত তা কেউ জানে না। বামফ্রন্ট ঘোষণা করেছিল, তারা বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখবে না অথচ নকশাল দমনের নামে গ্রেপ্তার করে মানুষগুলোকে আটক রেখে তাদের হদিস জানতে না দেওয়া মিসা ও ন্যাসার চেয়ে, উচ্চ শ্রেণীর কিছু ব্যবস্থা কি? ওরা আরও বলেছিল, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ পাঠিয়ে তা দমন করবে না। বাস্তবে তা কি হচ্ছে?

সব কথাই ফাঁকা কথা। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির পথে যে কোন বাধা অতিক্রম করতে মার্কামারা পুলিশ এবং সঙ্গে ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী নিয়োগ করতে বিন্দুমাত্র ভুল করেনি বামপন্থীরা।

আমবাগানের পাতার ঝোপে বসে সকালের প্রথম বায়স তার তীব্র কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে জানিয়ে দিল উষা সমাসন্ন প্রভাতের ফিকে আলো ষোল ঘোড়ার রথে চেপে পৃথিবী পরিক্রমায় উপস্থিত গা ঝাড়া দিয়ে উঠব মনে করেও কেমন আলস্যে নেতিয়ে ছিলাম। উঠে বাথরুমে গেলাম। দরজা খুলে রেখে আবার এসে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। ঘুম ভাঙ্গল অনিয়ার আহ্বানে।

সারা রাত দরজা খুলে শুয়েছিলি বুঝি?

তাকিয়ে দেখলাম বেশ বেলা হয়েছে। লজ্জিত ভাবে বললাম, সকাল

বেলায় বাথরুম থেকে এসে আর দরজা বন্ধ করিনি। শুয়ে থাকতে থাকতে কখন বা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

এবার ওঠ। মুখ ধুয়ে নে। সকালের ব্রেকফাষ্ট রেডি, মাধুরী তিনবার তাগাদা দিয়ে গেছে।

বললাম, খুব দুঃখিত। সারারাত একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে চোখে ঘুম আর আসেনি। জেগে বসে কখনও এপাশ ওপাশ করে রাত কেটে গেছে। পরে কথা হবে, মুখটা ধুয়ে আসি।

চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বসেছি। মাঝে মাঝে দু-এক চুমুক দিচ্ছি। অমিয়া পাশে বসে। তার দিকে নজর দেইনি সে কিন্তু বার বার আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখছিল। কেন তা জানি না।

তোর চোখ দুটোই লাল হয়েছে।

রাতে ঘুমাইনি তাই। তেমন কিছু নয়। আজ কি প্রোগ্রাম তাই বল। ঘরে বসে থাকবি না, নিশ্চয়ই ছুটির কটা দিন ঘুরবি ফিরবি।

আজ আদালত বসবে আমার বাড়িতে।

তোর বাড়িতে আদালত?

হাঁরে হাঁ। সাড়ে আটটা বাজলেই দেখবি আসামী ফরিয়াদীতে ঘর ভর্তি হয়ে যাবে। অবশ্য উকিলবাবুরা থাকবে না। বিচারক হবি তুই পারবি তো।

হেঁয়ালি মনে হচ্ছে।

নাবে না, হেঁয়ালি নয়। এই আদালতে বসে বাস্তবজীবনের পরিচয় পাবি।

সাড়ে আটটা বাজতেই অমিয়া টানতে টানতে আমাকে নিয়ে বসাল তার ড্রইংরুমে। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে বললাম, তোর আসামী ফরিয়াদী কোথায়?

হ্যাভ্ পেশেন্স। ওরা আসবে। সপ্তাহের এই দিনটি হল আমার আনন্দের দিন। কত মানুষ আসবে।

মাইজি? বাহির থেকে নারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

আয় ভেতরে আয়। মুনিয়া তুই একা এসেছিস। তোর মরদ আসেনি।

এসেছে।

তোদের ঝগড়া আর মিটছে না দেখছি।

কি করে মিটবে। হয় রাতে সরাব খেয়ে আসবে। ঝগড়া করবে, মারপিট করবে। মেয়েটা বাইরে যেতে পারে না। তার গা ঢাকার মত জামা নেই। ঘরে চাল ডাল থাকে না হপ্তায় তিনদিন। মরদটার হুঁস নেই। দিনের বেলায় খুব ভাল মানুষ, মিঠে মিঠে কথা বলে। কিরা কেটে ঘর থেকে কাজে বের হয়। বলে যায়, তোদের তরে হরেক জিনিস নিয়ে আসব। তারপর রাতের বেলায় ভুলে যায় সব কথা। সরাবের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। কোন কথা বললেই তেড়ে আসে খিস্তি করে। এই যে ঐ এসে গেছে।

বেলা বারটা অবধি মুনিয়া আর রামভকতের বিচার চলল। জবানবন্দী,

বয়ান, প্রতিবয়ান শুনেই চলেছি। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছি। ওরা উত্তর দিচ্ছে। মাঝে মাঝে দু'জনে ঝগড়াও করছে। সব কিছুর মাঝে মোদ্দা ঘটনা হল রামভকত ছাপড়া জেলার লোক। গাঁয়ে তার এক ফালি জমি নেই। বাপ-ঠাকুরদার কিছু ছিল, তারা কর্জা শোধ করে রামভকতকে আরও সাতটি উত্তরপুরুষ সমেত শুধুমাত্র নিজেদের বুড়ো আঙুল চোষার জন্য রেখে গিয়েছিল। বুড়ো আঙুল চুষলে পেট ভরে না তা জানতে কারও দেরী হয়নি। জাতিতে দোসাদ, তাই গ্রামের বর্ণহিন্দুরা পারিয়া মনে করে, কর্মসংস্থান হয় না। যদিও কখনও ক্ষেত মজুরের কাজ পাওয়া যায় তাতে তাদের পেট চলে না। একদিন গাঁয়ের মুখিয়ার পরামর্শে আরও দশজনের সঙ্গে রামভকত হাজির হল "বাঙালে"। কাজ আরম্ভ করল অদক্ষ শ্রমিক হয়ে। সপ্তাহে যা পায় তাতে পেটভাতা হয়। মুরুব্বী না থাকায় ভাল কাজ জোটাতেও পারে নি। কয়েক বছরের মধ্যেই সে শহরতলীতে তার স্থান পাকা করে নিয়েছিল। হুগলীর গ্রাম অঞ্চলের কুটিরশিল্প চোলাই মদের। এরা বলে চুল্লু। রামভকত রাতের বেলায় কারখানার বস্তিতে চুল্লুর ব্যবসা করতে আরম্ভ করল। দু' পয়সা হল, আর হল মদের নেশা। আনুসঙ্গিক আরও কিছু জুটল।

শুনতে পেল, মুঙ্গের থেকে খাপ সুরত একটা মেয়ে এসেছে রেড লাইট এলাকায়। রামভকত প্রলোভন ছাড়তে পারল না। অনেক খোঁজ খবর করে এক রাতে পৌঁছাল সেই মেয়েটার কাছে। মেয়েটা কাঁদছিল।

কাঁদছিস কেন রে?

ছলিয়ারাম আমার ইজ্জত মারতে এখানে এনেছে। নোকরি দেবে। সাদী দেবে, কত কথা বলে আমার গরীব বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে এখানে এনেছে, রোজ রাতে দু-তিনটে মরদকে ঢুকিয়ে দেয় আমার ঘরে।

রামভকতের কি মনে হল, হঠাৎ বলল, তুই সাদি করবি।

মেয়েটা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

তা হলে চল আমার সঙ্গে।

মুনিয়াকে বিয়ে করল রামভকত। কালীঘাটে তেইশ টাকা খরচ করে গলায় মালা দিয়ে রামভকত কালীমন্দির থেকে মুনিয়ার হাত ধরে বেরিয়ে এসে সংসার পাতলো শহরতলীর বস্তিতে। ইদানিং রামভকত সরাব বেশি খায়। অন্য কোন মেয়েমানুষ নিয়ে ব্যস্ত। তাই অভিযোগ মুনিয়ার।

রামভকত বলল, বিলকুল ঝুট, মাইকি কালীমাইকি কিরা, আমি সাচ্চা আছি।

এই বিবাদ মেটানো সহজ নয়। মুনিয়াকে নরক থেকে তুলে এনে সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে রামভকত, এটা কি কম গর্বের। মুনিয়া কেন যে এটা বুঝতে চায় না তা রামভকত চিন্তা করে ঠাহর পায় না। বড়ই বেইমান মুনিয়া।

মামলা শেষ হল।

রামভকত কিরিয়া করল, আর অবিচার করবে না মুনিয়া'র উপর।

আর মুনিয়া? তাকে গোপনে কয়েকটি টাকা হাতে দিয়ে অমিয়া বলল, তোর মেয়ের জামা কিনবি আর চালডাল কিনে নিস্।

মুনিয়া পায়ের ধুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি হাসলাম।

হাসছিস কেন?

আদালত ও বিচার দেখে। তবে তোর কাছে ওরা আসবে। আর্তজনকে নগদ কড়ি কোন বিচারক দেয় না। তোর এই বদান্যতা এদের বশ করে রেখেছে।

অমিয়া তখন কিছু না বললেও খেতে বসে আলোচনা আরম্ভ করল।

বলল, এই ভাবে ঘরোয়া মীমাংসা না করলে কত অঘটন ঘটতে পারে জানিস? আজকাল লকআউট আর ধর্মঘটের ঠেলায় শ্রমিক শ্রেণীর নাভিশ্বাস উঠেছে। তাদের রুটিরোজগার প্রায় বন্ধ। অনেকে অনাহারেও মরেছে। আবার কেউ কেউ দেশে ফিরে গেছে, কেউ কেউ মজুরী খাটছে, কলকাতায় গেছে মুটে-ঠেলাওলার কাজ পেতে, আবার কিছুলোক ছোটখাট ব্যবসার ধান্দায় আছে আর একটা ক্ষুদ্রতম অংশ নানা অসামাজিক কাজ করে দিন গুজরাণ করছে। এদের অবস্থাটা চিন্তা করছে কেউ? কেউ না।

এর বিপরীত ঘটনাও হামেশাই ঘটে। তাদের কেউ কেউ আসে আমার আদালতে। বিচার করতে হয়। একবার একটা মেয়ে হাজির অনেক অভিযোগ নিয়ে।

মেয়েটির নাম নছিরণবিবি গয়া জেলার কোন দেহাতে থাকত। আব্দুলের হাত ধরে এসেছিল কলকাতার উপকণ্ঠে। বিহারে প্রচলিত ব্যবস্থা হল, কলকাতা যাও, রুটিরুজি মিলেগা। এই দৈব নির্দেশ পেয়ে ওরা এসেছিল বিহার সরকারকে বেকার সমস্যার দায়মুক্ত করতে।

আব্দুল আর নছিরণ ভাসতে ভাসতে শহরতলীর এই শিল্প উপনগরীতে এসেছিল। সারাদিন কাজের সন্ধান করত, রাতের বেলায় বিফল মনোরথ হয়ে কোনদিন স্টেশন প্লাটফরমে, কোনদিন গঙ্গার ঘাটে শুয়ে থাকত। একবার পুলিশ আটক করেছিল, ওদের শেষ সম্বলের বড় অঙ্কটা আদায় করে রেহাই পেয়েছিল দু'জনে। ক্রমে ক্রমে তাদের পকেট শূন্য হল। ছাতু লঙ্কা কেনার পয়সা অবধি নেই।

তারপরের ঘটনায় বৈচিত্র নেই। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নছিরণ দেখল আব্দুল নেই। মনে করেছিল কোন কাজে গেছে। হয়ত শীগ্‌গীরই ফিরবে। বৃথাই আশা, কলকাতার আর তার শহরতলীর এক কোটি লোকের মাঝ থেকে আব্দুলকে খুঁজে বের করা নছিরণ কেন বহু বীর পুঙ্গবেরও সাধ্য নেই। আব্দুলকে হারাল চিরতরে। নছিরণ পথে পথে ঘোরে, কেউ দয়া করলে খেতে পায়, নইলে নয়। শ্রমিকবস্তির জওয়ান ছেলেদের নজর তার ওপর। নছিরণ পাগল হবার উপক্রম। কি করে কোন ট্রেনে চেপে সে এসেছে

তাও বলতে পারে না, গয়া জেলায় বাড়ি এইটুকু তার জানা ছিল, গ্রামের নামটা উল্টোপাল্টা বলেছে অনেকের কাছে। মাস কয়েক পরে নছিরণকে আর দেখা গেল না, কোথায় যেন উবে গেছে। অবশ্য এরকম ঘটনা কারও মনে কোন রেখাপাত করেনি, করার আশাও কেউ করে না।

সবাই জানে আমি সরকারী অফিসার। রবিবারে রবিবারে এই সব দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ আসে আমার কাছে কিছুটা সান্ত্বনা পেতে, কিছু সুপরামর্শ পেতে এবং সময় সময় আর্থিক সাহায্য লাভ করতে। এই এলাকার সবাই জানে 'মাইজি' ভাল মানুষ, নেক্ কাম করে। তাই একদিন দেখলাম বারান্দার ওপাশে লোহার গেটের পাশে একটা লোক বসে আছে। যারা আসে তারা আমার সামনে আসতে কখনও ইতস্তত করে না। তাই আমার বাড়ির কাজের লোক গজুকে বললাম, ওই লোকটা কেন বসে আছে জেনে এস। গজু কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এসে বলল, মাইজির কাছে এসেছে কিন্তু ভয় পাচ্ছে। বললাম, নির্ভয়ে আসতে বল।

লোকটার নাম মাখন গায়েন। হাওড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের অধিবাসী।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাও?

থমকে থমকে সে যা বলল, তার অর্থ হল: সে একটা যুবতীকে কুড়িয়ে পেয়েছিল। তাকে ঘরে এনে আদর যত্ন করেছে, খেতে পরতে দিচ্ছে। ক্রমেই তাদের মধ্যে রাগ অনুরাগ জন্মেছে। মেয়েটা বাঙ্গালী নয়। তবে বাঙ্গলা কিছু কিছু বুঝতে শিখেছে। তাকে বিয়ে করতে চাই কিন্তু বাধা হল ধর্ম। এতদিনে সে বলছে সে মুসলমান, আর তার স্বামী জীবিত। কি করি বলতে পারেন মা ঠাকরুণ?

ঘটনা গুরুতর। হঠাৎ কোন মত দিতে পারলাম না। বললাম, মেয়েটাকে নিয়ে এস আগামী রবিবারে। তার কথা শুনতে চাই।

পরের রবিবারে মেয়েটা এল। তার নাম নছিরণ। সে কিভাবে এসেছিল এই অঞ্চলে তা বলল, আব্দুল তাকে ছেড়ে কি করে চলে গেছে তাও বলল। কি করে মাখনের সঙ্গে তার পরিচয় হল, সেই পরিচয় কি ভাবে ঘনিষ্ঠ হল তাও বলল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার সঙ্গে আব্দুলের বিয়ে হয়েছিল কি?

নছিরণ কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

কোন উকিল, মওলবী, মোল্লা এসেছিল কি তোমাদের বিয়ের সময়। মিলাদ পাঠ হয়েছিল কি? তোমাদের দেশে তো অনেক মেয়ের বিয়ে দেখেছ, সে রকম কিছু হয়েছিল? কাজি সাহেবের খাতায় টিপ ছাপ দিয়েছিলে কি?

নছিরণ চুপ করে বসে রইল।

জিজ্ঞাসা করলাম, আব্দুল তোমাকে ফুসলে নিয়ে এসেছিল কি?

এবার নছিরণের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গল। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

কেঁদ না। তোমার কথা বুঝেছি। আর বলতে হবে না। মাখনকে

বললাম, তুমি আর নছিরণ রেজেষ্ট্রি অফিসে গিয়ে বিয়ের নোটিশ দিয়ে এস। আমার বাড়িতে কাজ করে গজানন, সেই নিয়ে যাবে তোমাদের।

মাখন বলল, কিন্তু মা ঠাকরুণ!

কিন্তু কিছু নেই। আব্দুলকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তোমাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না। তাই তোমাদের বলছি, তোমরা বিয়ে কর। স্বামী-স্ত্রী যেভাবে বাস করে তেমনি ভাবে আইনসম্মত উপায়ে বসবাস কর।

নছিরণ এতক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল কোন কথাই বলেনি। এবার সে মুখ খুলল, আব্দুল জানলে আমাকে খুন করবে মাইজি।

আইন তোমার স্বপক্ষে থাকবে। আব্দুল যে তোমাকে বিয়ে করেনি, তোমাকে বিক্রি করে যে পালায় নি এটাই তোমার ভাগ্য। আমি বাৎলে দিলাম। এই পথ ধরে সুখে শান্তিতে ঘরসংসার কর। গজু, এদিকে আয়। আমি একটা চিঠি দিচ্ছি সেটা নিয়ে এদের সঙ্গে রেজিষ্ট্রার সাহেবের কাছে যা।

চিঠি লিখে গজুর হাতে দেবার পর মাখন বলল, কত খরচ পড়বে মা ঠাকরুণ?

তোমাকে ভাবতে হবে না। যা দরকার হবে তা দেব। ঠিক একমাস পরে তোমরা দু'জনে আসবে। রেজিষ্ট্রারের খাতায় সই করবে। যা করার আমি করব।

মাখন বলল, ও যে মুসলমান!

ধমক দিয়ে বললাম, ওর গায়ে মুসলমান লেখা নেই। একজন মানুষ আর একজন মেয়েকে ভালবাসে, বিয়ে করে। এতে জাতিধর্ম কিছুই নই। আছে মানব মানবীর অক্ষয় প্রেমের ইতিহাস। আমরা মোগল পাঠানের যুগে বাস করি না। ভালবাসাকে আজ আর কেউ অপরাধ মনে করে না। ভালবাসার ক্ষেত্র বিশাল, ধর্ম-জাতি এসব অবান্তর। যাও তোমরা। গজু এদের নিয়ে যা।

এরপর কি হয়েছে তা জানি না।

বছর খানেক পর এমনই একটি রবিবারে একটা শিশুকে কোলে নিয়ে মাখন ও নছিরণ আমার সঙ্গে দেখা করে গেল। ওদের খুবই খুশী মনে হল। একজন বাঙ্গালী, একজন বিহারী; একজন বাংলায় কথা বলে, আরেকজন কথা বলে উর্দুতে, একজন জন্মগত ভাবে হিন্দু অপরজন জন্মগত ভাবে মুসলমান কিন্তু ওদের প্রেম সবার উর্দ্ধে। তাদের প্রেমের অবদান শিশু সন্তানকে নিয়ে আমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিল ওরা। মিষ্টি মুখ করিয়ে বিদায় দিলাম। বিদায় কালে বললাম, মাখন নছিরণকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে কখনও ভুল কর না।

আমি নীরব শ্রোতা।

অবশ্য ওই সব সামাজিক অনাচার রোধ করার দায়িত্ব সরকারের কিন্তু তাদের নজর অন্যত্র। যদি সুখী পরিবার গড়ে দিতে না পারে, তাহলে এদের বংশধররা অখুশী করবে সরকারী কর্মকর্তাদের

বললাম, যা করছ ভালই করছ। এইভাবেই কি জীবন কাটাবে।

জানি না। কয়েক বছর পর অবসর নেব। তখন আমার অর্থ কমবে, ক্ষমতা থাকবে না। তখন আর এসব কাজ করা সম্ভব হবে না। বাধাবিঘ্ন থাকবে। তা এড়িয়ে চলা সম্ভব কি? তবুও এমন সময় আসবে যখন উত্তর পুরুষরা সংশোধনের হাত বাড়িয়ে সমাজকে কলুষমুক্ত করবে। শরৎচন্দ্রের পথের দাবীতে নিশ্চয়ই পড়েছ, একটি মেয়ে ভারতীকে বেশ গদগদ হয়ে বলল, আমার মা পালিয়ে গিয়ে অমুকের সঙ্গে ঘর করছে। শ্রমিকবস্তির এই চেহারাটা কিন্তু কাল্পনিক নয়। এইসব বস্তি এলাকায় মধ্যবিত্তদের মানসিকতার বিন্দুবিসর্গ ছাপ পাবি না। কেন?

বললাম, এই মানুষগুলো হল বৃন্তচ্যুত মনুষ্যত্বের বিকার।

ঠিক তা নয়, আবার এটাও ব্যাপক অর্থে অস্বীকার করা যায় না। এরা এসেছিল পেটের তাগাদায় দেশের অথবা গ্রামের সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করে। সামাজিকবোধ এদের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি কোন সময়ই। এরা ঘরভাঙ্গা ছন্নছাড়া মানুষের দল। এরা কোন সময়ই সামাজিক শৃঙ্খলাকে স্বীকার করতে চায় না। পুরুষরা মেয়েদের কর্মসঙ্গী যেমন মনে করে তেমনি তারা ভোগের সামগ্রীও মনে করে। পুরুষপ্রধান সমাজে এরা নিজেদের সত্ত্বা ও অস্তিত্বটুকুও ভুলে যায়। যেন যন্ত্র। যে কাজে লাগাতে পারে এরা তাদের। তাই রামুর ঘরোয়ালি কোন সময় হানিফের ঘরওয়ালি হলে কোন তুফান দেখা দেয় না। সবাই জানে ও স্বীকার করে। অলিখিত আইনে তাদের এই আচার আচরণ তাদের বস্তির মানুষ স্বীকার করে এবং তাই হরিয়ার মা কায়ুমের মা হলে বিকার দেখা দেয় না।

বললাম, এদের যেমন নিজ পরিবারের সঙ্গে আত্মিক যোগ থাকে না, তেমনি থাকে না ভূমির সঙ্গে কোন বন্ধন। এরা tieless এক আজব প্রাণী।

বোধহয় তাই। আর নয়। খাবার টেবিলে শুকিয়ে গেছে। এবার তোমার কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়। বিকেলে বের হতে হবে। অনেক কাজ।

অমিয়ার কাছ থেকে ছুটি পেলাম। অর্থাৎ অমিয়া আমাকে ছুটি দিল একটি শর্তে। প্রতি শনি ও রবিবারে তার দরকারে হাজিরা দিতে হবে।

ইলেকশনের দামামা বেজেছে। চারিদিকে সাজসাজ রব।

কংগ্রেস বলশালী পক্ষ। অর্থবিত্ত লোকবল সবকিছুই তাদের গুদামে।

অমিয়ার কাছে গিয়েছিলাম। সেও খুব ব্যস্ত অবশ্য ভোট দিতে নয় ভোট-পর্বকে শান্তিতে সমাপ্ত করতে। সকাল ন'টার মধ্যেই সে বেরিয়ে যায় তার কর্মকেন্দ্রে আর ফিরতে ফিরতে রাত আটটা বেজে যায়। শনি রবিবারেও তার দেখা পাওয়া যায় না। সত্তর কোটি লোক তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রী দেশের লোকসভা নির্বাচন, এ তো ছোটখাট ব্যাপার নয়!

এক রবিবারে হঠাৎ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল।

অমিয়ার মুখে মৃদু হাসি।

বললাম, কেমন বুঝছিস?

বোঝাবুঝি নেই। মনে হচ্ছে জীবিতকালে ইন্দিরা তিনবার কংগ্রেস ভেঙ্গে অতীতের কংগ্রেসকে কবরস্থ করেছিল। এবার ইন্দিরা কংগ্রেসকে জীবন্ত করবে মৃত ইন্দিরা। বেঁচে থেকে যা পারেনি মরার পর তাই করে যাবে তার বিগত আত্মা।

অর্থাৎ কুমুদিনী মরিয়া জানাইল সে মরে নাই।

দু'জনেই হাসলাম।

ভোট দিবি তো?

দেব।

কাকে দিবি? ঠিক করেছিস কিছু?

করেছি। সবাইকে দেব। আমার এলাকায় আটজন ভোটপ্রার্থী। সবাই আদাজল খেয়ে দেশের মঙ্গলসাধন করতে গাঁটের কড়ি, সমর্থকদের গাঁটের কড়ি দু'হাতে উড়িয়ে দিচ্ছে। এদের সবাই ভাল লোক তাই কাউকেই বঞ্চিত করব না। কংগ্রেস এলে বলব, তোমাদের প্রার্থীকে ভোট দিয়েছি, আবার বামপন্থীরা এলে বলব, তোমাদের ভোট দিয়েছি। বি-জে-পি, জনতা প্রভৃতি সবাইকে বলতে পারব আমি কাউকেই বঞ্চিত করিনি।

তা হলে ভোট নষ্ট করবি।

নইলে ভোট চুরি হবে। ভোটকেন্দ্রে না গেলে ভবিষ্যতে জানতে পারব আমার পিতার কোন উপপত্নীর পুত্র আমার ভোটটি দিয়ে গণতন্ত্রের মানরক্ষা করেছে।

গণতন্ত্রে ভোট না দেওয়াটা নৈতিক অপরাধ।

বোধহয় তাই। কিন্তু চোরাই ভোট দেওয়া, রিগিং করা কি নীতি সম্মত অথবা আইন সম্মত? তার চেয়ে ভোটের কাগজে সবাইয়ের নামের পাশে ছাপ দিয়ে নৈতিক অপরাধ করেও আইনসম্মত অপরাধীদের সুযোগ দেব না।

এদের মধ্যে ভাল লোক তো আছে।

বোধহয় আছে। তবে আমরা তো ব্যক্তিকে ভোট দেই না। ভোট দেই দলকে। পশ্চিম বাংলায় দুটো দল প্রবল। কিন্তু এই দুই দলের কোন নীতি আদর্শ আছে এমন মনে করার মত কোন ঘটনা অদ্যাবধি ঘটেনি। একটা দল যদি পাপী হয় অপর দল মহাপাপী। এই পাপীদের সঙ্গে কোন সমঝোতা অসম্ভব। তবে চাতুর্যে কংগ্রেসীরা অনেক পিছিয়ে, বামপন্থীরা অনেক এগিয়ে রয়েছে। কারণ, কংগ্রেসের উপরতলা দধির অগ্রভাগে ভোজন করে ঘোলের ব্যবস্থা করেছে আর বামপন্থীরা নীচতলা থেকে উপরতলা অবধি ক্রীম দিয়ে মু· মাখিয়ে রেখেছে, এদের ঘোলের কারবার নেই। সেজন্য কংগ্রেসে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বেশি, আর বামপন্থীরা এককাট্টা। তাই ভোট আমাদের দেশে হয়, ভবিষ্যতে

হবেও সেজন্য ভোটের চিন্তা ভোটের ব্যাপারীরা করবে, আমরা দর্শক মাত্র। তাকিয়ে দেখব কার ঠোঁটে কতটা স্নেহপদার্থ লেগে রয়েছে আর আপশোষ করব, এমন সুযোগটা আমরা হেলায় হারালাম। বোকা লোকের যা হয় তাই।

তোর কথা শুনলে গা জ্বালা করে। যত উল্টোপাল্টা কথা বলিস। দেখছিস তো কি ভয়ঙ্কর ভোটের কারবারীরা ছুটেছে। সবার দাবী তারা জিতবে।

হেসে বললাম, যখন স্কুলে পড়তাম তখন বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে এলে বাবা জিজ্ঞাসা করতেন, কেমন পরীক্ষা দিলি? বলতাম, খুব ভাল। আমার মত সবাই এরকম জবাবই দেয়। সে সময়ও যা বর্তমানেও তা। তারপর পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা যেত খুব ভাল পরীক্ষা দেওয়া ছেলে ক্লাশ প্রমোশনও পায় নি। এরা সবাই ভাল পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষক ভোটের বাক্স জানাবে কে কেমন পরীক্ষা দিয়েছে। ভোটের কারবারীরা প্রায় সবাই ভাড়াটিয়া লোক, এরা সোরগোল তুলবে, হুজুত হাঙ্গামা হবে তারপর ভোট গণনার পর সব ঠাণ্ডা। কেউ মিছিল করে জানিয়ে যায় তাদের প্রতি দেশবাসীর কত বেশি সমর্থন আর পরাজিত পক্ষ মাথায় হাত দিয়ে ভাবে কত বেইমান এইসব ভোটাররা। গণতন্ত্রের প্রহসন দেখে আমরা অপার আনন্দ লাভ করি তোর মনে আছে বোধহয় সেই বাহাত্তর সালে যখন সিদ্ধার্থশঙ্কর ছিল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সে সময় নির্বাচন হল। বামপন্থীরা গোহারা হয়েছিল। শোনা যায় দু'ঘণ্টার মধ্যে গোটা ভোটদান পর্ব শেষ। সশস্ত্র অহিংসার সেবকরা বুথ দখল করে নিজেদের দলের প্রার্থীদের কাগজে ছাপ দিয়ে কংগ্রেসের জয়জয়াকার ঘোষণা করেছিল। এটা তো গণতন্ত্র নয় রে অমু। স্বৈরাচারের প্রাথমিক অবস্থা। একসময় হিটলারও একই অবস্থায় ক্ষমতা দখল করেছিল, পরিণাম মোটেই সুখের হয়নি, এটাতো সর্বজন বিদিত। ভোটে দুর্নীতি, বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের হত্যা অথবা কারাগারে নিক্ষেপ করা হল সিদ্ধার্থ শাসনের নিকৃষ্ট উদাহরণ, এই পাপ পরবর্তীকালে আচ্ছন্ন করেছে বামপন্থীদের। আজ আর কথা নয়। তোর অফিসে যাবার সময় হয়েছে। আমি চললাম।

অমিয়া বলল, ইলেকসন শেষ না হওয়া অবধি দিনের বেলায় আসিস না। রাতে এসে তোর কামরায় শুয়ে পড়িস। আমি এসে ডেকে তুলব তখন কথা হবে।

ইলেকসন শেষ হল।

ইন্দিরা কংগ্রেসের জয়জয়াকার।

মায়ের মৃত্যুর পর রাজীব গান্ধীকে কংগ্রেসের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেছিল কংগ্রেসের সদস্যরা। নির্বাচনের পর আবার রাজীবকেই প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ইলেকসনের আগে দিল্লী-বোকারো ইত্যাদি স্থানে শিখহত্যার যে নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল তা নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ

করেছিল। যারা অত্যাচারিত তাদের নগদ অনুদান, গৃহহারাদের গৃহদেবার ইত্যাদি ইত্যাদি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। নির্বাচনের পর সর্বশেষ চেষ্টা হল পাঞ্জাবের অশান্তি দমন, পাঞ্জাবী শিখদের অসন্তোষ লাঘব করতে বিচার-বিভাগীয় তদন্তের আদেশ। শিখ নেতাদের সঙ্গে পাঞ্জাব সমস্যা মীমাংসার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।

যারা নিজেরাই সমাজ সচেতন নয় তাদের হাতে ক্ষমতা থাকলে নীচের তলার মানুষগুলো হয়ে ওঠে মিথ্যাবাদী অনাচারী। এদের নিয়েই চলে প্রশাসন। আমলা নির্ভরশীল এইসব প্রশাসন সাময়িক সাফল্যলাভ করলেও পরিণাম হয় বিষময়। এক সময় নকশাল নিয়েই ব্যস্ত হয়েছিল প্রশাসন। এখন পাঞ্জাবী শিখ আর অসমীয়া জঙ্গীগ্রুপের মোকাবিলায় ব্যস্ত হয়েছে রাষ্ট্রশক্তি। নকশালদের দমন করতে সিদ্ধার্থ যে ব্যবস্থা করেছিল তার একটা চিত্র পাওয়া যায় তৎকালীন পুলিশ কমিশনার রঞ্জিত গুপ্তের বয়ানে: In Baranagar a popular Congressman was killed by the Naxalite lumpen proletariat. In retaliation the Congress lumpen proletariat supporters killed a very large number of Naxalite activists and their supporters in Baranagar and its vicinity. (Illustrated Weekly). সাহিত্যে ভয়ঙ্কর রস নামে একটা রসের কথা অনেকে শুনে থাকেন তারা এই কয়েকটি লাইন পড়লে সহজেই বুঝতে পারবেন বরানগরে কি ভাবে গণহত্যা হয়েছিল। তৎকালীন পুলিশ কমিশনারের কি দায়িত্ব ছিল না তার নিজস্ব এলাকায় এই গণহত্যা বন্ধ করা। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, পুলিশের সহায়তায় এই গণহত্যা ঘটেছিল। নকশাল সমর্থকদের হত্যা করেছিল কংগ্রেসী লুমপেন সর্বহারার দল কিন্তু মৃতদেহ যারা সনাক্ত করেছেন তারা বলেছেন অতি নির্বিবাদী মানুষকেও হত্যা করা হয়েছিল, এমনকি গৃহস্থালী কর্মরত মহিলা ও শিশুকেও। অবসর গ্রহণের পর প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার নকশাল আন্দোলন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে নিজের কর্তব্যবোধ কি-ভাবে বিনষ্ট করেছেন তা সহজেই বোঝা যায়। প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার কোথাও বলেননি, এই সব হত্যাকারীদের (উভয়পক্ষের) গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করা হয়েছিল। নিজের বেআইনী কাজ ও ক্ষমতাকে এভাবে জাহির না করে চুপ করে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার খুব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কিন্তু বোধহয় সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ নাটকটি পড়বার অবসর পাননি। পড়লে নিশ্চয়ই জানতে পারতেন, একটি হত্যা বহু হত্যার কারণ হয়। তাতে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা দায় হয়ে উঠে। সেদিন ভারতীয় দণ্ডবিধিতে যাদের শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল তাদের প্রশস্তি এইভাবে ব্যক্ত করতেন না। সেই ভয়ঙ্কর গণহত্যার পর সমাজ-বিরোধী পোক্ত হাতে কয়েক বছরে গোটা পশ্চিম বাংলার যুবশক্তির একাংশকে পেশাদার খুনীতে পরিণত করেছে। এই ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা যদি মনে

থাকত তা হলে হত্যাকারী যে কোন দলের হোক তাদের গ্রেপ্তার করা হত। এমন কি সর্বদলীয় ডেপুটেশনে সিদ্ধার্থশঙ্কর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এর জন্ম তদন্ত হবে, তাও করা হয়নি। প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার জানতেন কেবলমাত্র সি-পি-এম অথবা নকশালরা সমাজবিরোধী নয়, কংগ্রেসও। উপরন্তু যুক্তফ্রন্টের মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক আবর্তে আদর্শহীনতার দরুণ ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। তাঁকে 'buffoon' বলাটা কতটা সঙ্গত হয়েছে তা জানেন শুধু প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার। কেউ যদি বলে এই পুলিশ কমিশনার কংগ্রেসের buffoon ছিলেন এবং ভাঁড়ামির জন্ম ন্যায়সঙ্গত পথে চলতে পারেননি, তার কি অপরাধ হবে? ইংরেজিতে বহু সভ্য শব্দ আছে, এই শব্দটি ব্যবহার না করলেও তার খুনের ইতিহাসের কৃতিত্ব ম্লান হত না।

প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার স্বীকার করেছেন কংগ্রেসী গুণ্ডারা যখন বেপরোয়া চড়ে বেড়াতে আরম্ভ করল তখন সি-পি-এম দলভুক্ত সমাজবিরোধীরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল, প্রথমে নকশাল দমন, তারপরই সি-পি-এম দমন। 'One reason why peace returned was that with the Congress hoods going around, Promode Dasgupta saw to it that his anti-socials dived into their well-prepared underground. (Illustrated Weekly)." মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। বিরোধী দলনেতাদের প্রতি প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের মন্তব্যগুলো বেশ রুচি বিরোধী। এর চেয়ে ভদ্রভাবে অনেক কিছু বলা সহজ ছিল তাতে পাঠকরা সত্যকার অবস্থাটা জানতে পারত। তৎকালীন মন্ত্রীসভা সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে Scum ministry. এই Scum ministry-তে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার চাকরি করে শেষ অবধি যে মন্ত্রীসভাকে 'Scum' মনে করেছেন তার জন্ম ধন্যবাদ তারই প্রাপ্য। জনসাধারণ নির্বাচিত মন্ত্রীসভাকে 'Scum' বলছেন এমন ব্যক্তি যে জনসাধারণের পয়সায় প্রতিপালিত।

প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার তার কর্তব্য পালন করেননি। কংগ্রেসের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে নিজের পুলিশ বিভাগকে 'Scum' তৈরী করাটাই ওর কৃতিত্ব। যা সহজ সভ্য ভাষায় বলা যেত তাকে অশালীন ভাষায় ব্যক্ত করা মোটেই রুচিকর নয়।

রাজীব উত্তরাধিকারী সূত্রে পঙ্কিল আমলাতন্ত্রের শীর্ষে। এই পঙ্কিলতা দূর করে স্বচ্ছ প্রশাসনের ভরসা রাজীব দিয়েছেন সত্যসত্যই তা সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ।

নির্বাচন স্থগিত ছিল আসামে ও পাঞ্জাবে।

জনমত নির্বাচন বিরোধী নয় তবে কেন্দ্রীয় প্রশাসন বিরোধী। এমত অবস্থায় নির্বাচনের বাদ্য বাজালে অশান্তি ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বেশি।

কংগ্রেসের স্তাবকরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কি করবে তা বলা কঠিন। তবে কংগ্রেসী নীতিতে আঞ্চলিক দলগুলো মাথা চাড়া দিয়েছে।

অন্ধে রামারাও মন্ত্রীসভাকে রাতারাতি ভেঙ্গে দিয়ে আরেক অপকীর্তির স্মারক

সৃষ্টি করেছিল কংগ্রেস, এর আগে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার ও সিকিম সরকারকে জোরজবরদস্তী ক্ষমতাচ্যুত করার পর যেআলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী সেই আলোড়ন থামতে না থামতেই অন্ধ্রে কংগ্রেসী খেলা আরম্ভ হল। প্রথমাবধি কংগ্রেস আয়ারাম গয়ারাম নিয়ে কারবার করে কংগ্রেসের প্রাধান্য সারা দেশে কায়েম করতে চেয়েছে। কংগ্রেসকে দেশের মানুষ সিংহাসনে বসিয়েছে, দেশের মানুষই ধীরে ধীরে কংগ্রেসকে সিংহাসন থেকে নামাতে আরম্ভ করেছে। তবে নানা রঙ্গে ভরা এই ভারতবর্ষ। এর হিন্দীভাষী অঞ্চলে কংগ্রেসের প্রাধান্য বহুকাল থাকবে। প্রথমত হিন্দীভাষীরা মনে করে তারা প্রথম শ্রেণীর নাগরিক, অন্য ভাষাভাষীরা হিন্দীভাষীদের কৃপার পাত্র। ভারতের রাজধানী বহুকাল ছিল উত্তর ভারতে, কখনও আগ্রায় কখনও ফতেপুর সিক্রিতে, কখনও দিল্লীতে। দিল্লীর বাদশাহী ও সুলতানী শাসন তাদের বিজিত সর্বপ্রদেশকে শোষণ করে দিল্লী ও আগ্রার গৌরব বৃদ্ধি করেছে, আজও সেই tradition সমানে চলেছে। তাই হিন্দীভাষীদের কক্ষচ্যুত করে ভারতে অন্য কোন শাসনব্যবস্থা কায়েম করা সুকঠিন। হিন্দীর প্রাধান্য বিস্তার করার মোহ ত্যাগ না করলে বর্তমানে যে আঞ্চলিক ভাষাগত অশান্তি চলছে তা আরও গভীরে শেকড় প্রবেশ করাবার সুযোগ পাবে।

ফারুক আবদুল্লা শেখ আবদুল্লার জ্যেষ্ঠপুত্র। উত্তরাধিকার সূত্রেই হোক আর ন্যাশান্যাল কনফারেন্সের প্রভাবেই হোক আবদুল্লার মৃত্যুর পর ফারুক আবদুল্লা জনতার সমর্থনে কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে তার শাসনব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন তা সমর্থন করা দূরের কথা ফারুক তার বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। কংগ্রেস (ইন্দিরা) তার সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বাচনে লড়ার প্রস্তাব দিলেও ফারুক তা গ্রহণ করেননি এবং তার কনফারেন্স সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে প্রশাসন দখল করেছিল। এত বড় বেতমিক কাজ ইন্দিরা নীরবে হজম করার লোক নন। দিল্লী থেকে পাঠালেন জগমোহনকে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল করে। তখনই সবাই আশঙ্কা করেছিল ইন্দিরার ভানুমতীর খেল দেখাবার সময় হয়েছে। ফারুকের শিরে সংক্রান্তি। এবার বিদায়ের পালা।

'রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দাও'—এই শ্লোগান শোনা গেল উত্তরে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য থেকে দক্ষিণে কর্ণাটক ও পূর্বে ত্রিপুরা অবধি আটটি রাজ্যে। ক্ষমতা দেবার পাত্রী ইন্দিরা নন। তাই নিজের ক্ষমতা জাহির করতে ইন্দিরা পেছন থেকে ল্যাং মেরে কুপোকাৎ করলেন ফারুককে। কাজটি সার্থক করতে গৃহবিবাদকে মূলধন করে নিয়েছিলেন ইন্দিরা। ভগ্নীপতিকে দিয়ে শ্যালককে ক্ষমতাচ্যুত করলেন আয়ারাম গয়ারামদের সমর্থনে। কাশ্মীরের সংবিধান অনুসারে কাশ্মীর আইনসভায় গৃহীত আইন বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকে। কাশ্মীর আইনসভা আয়ারাম গয়ারাম নিরোধ আইন করেছিল। কোন দলের মনোনীত সদস্য যদি দলত্যাগ করে তাহলে তার আইনসভার সদস্যপদও বাতিল হবে। এই আইন থাকা সত্ত্বেও কি করে এই আইন অমান্য করা সম্ভব হল। এর ব্যাখ্যা শোনা

গেল, ব্যক্তিগত দলত্যাগীদের উপর এটা প্রযোজ্য, যখন গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে একাধিক ব্যক্তি দলত্যাগ করবে তখন প্রযোজ্য নয়। ফারুকের ভগ্নীপতি তার দলের সদস্য এবং সে যাবার সময় দলের আরও ডজন খানেক সদস্যকে নিয়ে কংগ্রেসের সমর্থনে মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। জগমোহন এই অগণতান্ত্রিক কাজে ইন্ধন জুগিয়েছে ইন্দিরার নির্দেশে। ঠিক একই ভাবে রামারাও-এর বিরুদ্ধে দাঁড় করাল ভাস্কর রাওকে। কয়েকজন সমর্থক নিয়ে ভাস্কর কংগ্রেসের সমর্থনে মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। কাশ্মীরের জনসাধারণ যত সহজে অন্যায়কে মোটামুটি হজম করেছিল অত সহজে অন্ধ্রের জনসাধারণ হজম করেনি। সমর্থকদের সংখ্যাধিক্যে রামারাও আবার মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। কিছুকাল পরেই মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনে নামল 'তেলেগুদেশম' দল।

সিকিমে নরবাহাদুর ক্ষেত্রী ছিল মুখ্যমন্ত্রী। নরবাহাদুর নেপাল থেকে আগত নেপালীদের ভারতীয় নাগরিক অধিকার দেবার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করলেন। ইন্দিরা কিছুতেই এই প্রস্তাব সমর্থন করেননি। যদিও সিকিম সরকার নিজেদের কংগ্রেসী সরকার বলে দাবী করেছিল তবুও তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করা সংবিধান বিরোধী। অপর কারণের স্রষ্টা ইন্দিরা স্বয়ং। সিকিমের অধিবাসীরা লেপচা শ্রেণীর, তাদের রাজাও ওই একই শ্রেণীর। সিকিম ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়নি, সিকিম ভারত চুক্তিমত হল রক্ষিত রাজ্য। ভারত সরকার বৈদেশিক ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে, ভারতের ট্রেড মিশন থাকবে সেখানে তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি দেখার জন্য, ভারত সরকারের একজন প্রতিনিধি থাকবে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে। সিকিমে বহিরাগত লোকদের জন্য কোন কড়া আইন ছিল না। সেখানে জমিজমা বাড়িঘর নিয়ে সবাই বাস করতে পারে। সিকিম সরকারের এই দুর্বলতার সুযোগে বহু নেপালী ভাষাভাষী সিকিমে স্থায়ীভাবে বসবাস করত। চীন যাতে ভারতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন, দ্বিতীয়ত সিকিম অধিবাসীরা মঙ্গোলীয় এবং লেপচা শ্রেণীরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। সিকিমের নামগিয়াল বা মহারাজাও বৌদ্ধধর্মী, যে কোন সময় সিকিম চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতকে বিপন্ন করতে পারে সেজন্য সিকিমকে ভারতের কব্জায় রাখতে হবে ভারতের নিরাপত্তার জন্য।

কি ভাবে এই কাজ সম্পন্ন সম্ভব তা নিয়ে অনেক গবেষণার পর যা স্থির হল তা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল। নেপালী অধিবাসী জনসংখ্যা লেপচাদের চেয়ে অনেক বেশি। কোন রকমে নেপালীদের হাত করতে পারলেই কার্যসিদ্ধির পথ বের হবে। ভারতের প্রতিনিধিরূপে গেল বানারসীলাল দাস। ইতিমধ্যে প্রচারের প্রখরতায় একদল নেপালী সিকিমের প্রত্যন্ত থানাগুলো দখল করে নিতে আরম্ভ করল। সিকিম মহারাজ দেখলেন এতো মহা বিপদ। বানারসীলালকে ডাকলেন পরামর্শ নিতে। গোপনে কি পরামর্শ হল তা কেউ জানে না। ভবিষ্যত ইতিহাস বলতে পারবে। তবে একদিন মহারাজা তার মার্কিনী পত্নী নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। গণভোট হল, দেশের মানুষ ভারতের সঙ্গে সংযুক্তি

সমর্থন করল। সিকিম হল ভারতের দ্বাবিংশ রাজ্য। এরপর হল ইলেকশন। সিকিমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হল।

ইন্দিরা যদি নরবাহাদুর ভাণ্ডারীর প্রস্তাব গ্রহণ করতেন তা হলে অচিরেই নেপালী ভাষাভাষীরা দাবী করত সিকিম ও দার্জিলিংকে নেপালের সঙ্গে যুক্ত করতে। ইন্দিরার দেওয়া গণভোটে যেমন সিকিম ভারতযুক্ত হয়েছিল তেমন কোন গণভোটের দাপটে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ নেপালে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিত। এ বিষয়ে ইন্দিরার কোন সংশয় ছিল না। নরবাহাদুর নাছোড়বান্দা। তাই সেখানেও আয়ারাম গয়ারামদের দিয়ে সরকার গঠন করালেন ইন্দিরা নরবাহাদুরের মন্ত্রীসভা খারিজ করে কিন্তু নবগঠিত মন্ত্রীসভা তাদের সংখ্যাধিক্য প্রমাণ করতে পারল না। ফলে সেখানেও আবার নির্বাচন।

ইন্দিরার দুঃখজনক মৃত্যুর পর লোকসভার নির্বাচন। তারপরই সিকিম ও অন্ধ্রের নির্বাচন। এদিকে লোকসভার নির্বাচনে জনতা পার্টির ভরাডুবি হল কর্ণাটকে। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেগড়ে মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে জনমত যাচাইয়ের আবেদন করলেন। সেখানেও নির্বাচন। কংগ্রেসও রামকৃষ্ণ হেগড়েকে হটাবার চেষ্টায় ছিল। এই নির্বাচন তাদের সেই সুযোগ দিল। কিন্তু বিধি বিরূপ। ভোট গণনা আরম্ভ হওয়ার দুই ঘণ্টার মধ্যেই সবাই জানতে পারল রামকৃষ্ণ হেগড়ের জনতা দল এগিয়ে চলেছে, তারা সরকার গঠন করবেই। (After only two hours of counting it was known that the Janata Candidates were leading in most places.) কংগ্রেসের স্বপ্ন ভঙ্গ হল। দক্ষিণ ভারতের তিনটি রাজ্য তাদের হাতছাড়া, কেরলে কংগ্রেস সরকার গঠন করেছে মুসলীম লীগ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা আগেই কংগ্রেসকে খারিজ করেছে, সিকিমও কংগ্রেসকে হটিয়ে দিল প্রশাসন থেকে।

পাঞ্জাবে আগুন জ্বলছে। সেই আগুন না নেভালে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা। একদিকে শিখ উগ্রপন্থীরা খলিস্তানের দাবীতে নিরীহ মানুষকে হত্যা করছে, বিশেষ করে হিন্দুদের, অপর দিকে হিন্দুরাও আত্মরক্ষার জন্য হিন্দু সুরক্ষা সমিতি গঠন করে শিখদের প্রতিরোধ করতে আরম্ভ করেছে। মহারাষ্ট্রের শিবসেনার মত শিবসেনা দলও গড়ে উঠেছে পাঞ্জাবে। এরা মুখোমুখী হলে দেশের সর্বনাশ। সবচেয়ে বিপদজনক হল একশ্রেণীর শিখদের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব এবং উগ্রপন্থীদের সমর্থন।

আসামে কোন নির্বাচন করা যায়নি। সংবিধান অনুসারে নির্বাচন করা বাধ্যতামূলক। ইন্দিরা তখন অথৈ জলে। অন্ধ্রপ্রদেশে আঞ্চলিক দল বলছে, তেলেগুদেশম শাসন করবে অন্ধ্র, কর্ণাটকের লোক বলছে, কর্ণাটক শাসন করবে কর্ণাটকের মানুষ, এইভাবে আঞ্চলিকতাবাদ ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে।

বিরোধীপক্ষ বার বার চাপ দিচ্ছে পাঞ্জাবের অশান্তি দমন করতে সৈন্য-বাহিনী নিযুক্ত করতে। শিখরা ধর্মোন্মাদ সম্প্রদায়। তাদের আক্রমণ প্রতিহত

করতে হলে অকাল তখত্ ও হরমন্দির সাহেবের বা স্বর্ণমন্দিরের চত্বরে সশস্ত্র সৈন্য পাঠাতে হবে। শিখ সম্প্রদায় এটা সহ্য করতে চাইবে না। এদিকে শিখ সম্প্রদায়ের নেতারা এই সব উগ্রপন্থীদের আয়ত্তে আনার কোন চেষ্টাই করছে না। এমন কি নরহত্যার কঠোর ভাবে নিন্দাও করছে না। আকালি দলের নেতাদের সঙ্গে বার বার আলোচনা করেও কোন সুফল হচ্ছে না। আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল, উগ্রপন্থীদের সাহায্য করছিল পুলিশ বাহিনীর শিখেরা। কেউ কেউ প্রকাশ্যে, কেউ কেউ গোপনে। পাকিস্তান থেকে অস্ত্র আমদানী করছিল অবাধে। আন্তর্জাতিক লাইন অতিক্রম করতে কোন বাধাই তারা পাচ্ছিল না। ইন্দিরার বড় গুণ কর্তব্যনিষ্ঠা। একবার স্থির সিদ্ধান্তে এলে আর তিনি থামতেন না, থামতে জানতেন না। অনেক অনুরোধ উপরোধ আলাপ আলোচনা যখন ব্যর্থ হল তখন উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করতে হরমন্দির এলাকায় সৈন্য পাঠাতে বাধ্য হলেন। এই কাজের জন্য শিখ সম্প্রদায় যতই বিক্ষুব্ধ হোক তারা যদি কঠোরভাবে উগ্রপন্থী রোধ করতে এগিয়ে আসতেন তাহলে ইন্দিরা সৈন্য পাঠাতেন না।

স্বর্ণমন্দির এলাকায় সৈন্য প্রবেশ করেছে সংবাদ শুনেই শিখ রেজিমেন্টের কিছু সিপাহী এবং জুনিয়ার অফিসার শিবির ছেড়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রওনা হয়েছিল পানজাবের পথে। যদি তাদের মাঝপথে আটক করা না যেত তা হলে ওখানে ভয়ানক রক্তারক্তি হতে পারত। শিখ সৈন্যবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ হিন্দু অফিসারকে হত্যা করে অস্ত্রাগার ভেঙ্গে এরা অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিল অমৃতসরে। শিবির ত্যাগী শিখরা সামরিক আইন ভঙ্গ করেছিল, এবং তারা ভাবেনি, এরপর কি!

শিখ অসন্তোষের মূল যে কয়টি কারণ খুঁজে পাওয়া গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হল, ইংরেজ শিখকে মার্শাল রেস বলে খাতির করত। শিখদের নিয়ে বহু রেজিমেন্টও তৈরী করে গেছে ইংরেজরা। আঠারশত সাতান্ন সালে বিরাট বিদ্রোহের মুখে ইংরেজদের যখন নাভিশ্বাস উপস্থিত তখন ভাড়াটিয়া শিখ সৈন্যরা বিদ্রোহ দমনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। ইংরেজ কৃতজ্ঞতা জানাতে শিখদের মার্শাল রেস নাম দিয়েছিল, আর শিখদের অবাধ প্রবেশ অধিকার দিয়েছিল সামরিক বাহিনীতে। হঠাৎ ভারত সরকার জনমতের চাপে স্বীকার করল, সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীতে রাজ্যগুলির জনসংখ্যার অনুপাতে ভর্তি করা হবে। পানজাব কৃষিতে উন্নত রাজ্য কিন্তু কর্ষণযোগ্য জমির মালিকানা শতকরা ষোলজনের। কিন্তু পানজাবী হিন্দুরা ব্যবসাবাণিজ্যে বেশি মনোযোগী। শিখরা শ্রম করতে অধিক উৎসাহী। এই কারণে পানজাবের বেকার সমস্যা অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে কম। যারা কোন কাজ পায় না তারা যায় সামরিক বাহিনীতে। চাষের সময় বিহার থেকে দলে দলে লোক যায় পানজাবের কৃষিক্ষেত্রে সাহায্য করতে। পানজাব একমাত্র রাজ্য যেখানে বেকার সমস্যা তীব্র নয়। কিন্তু সামরিক বাহিনীতে যোগ দেবার সুযোগ সীমিত হতেই পানজাবী শিখ যুবকদের একাংশ বিক্ষুব্ধ হয়ে

ওঠে। যে পানজাবে বেকার সমস্যা ছিল না সেই পাঞ্জাবে তরুণদের মধ্যে বেকার জীবনের কালোছায়া নেমে আসে ধীরে ধীরে। অবশ্য এটা কেউ বলে না।

বেকার সমস্যার পরই তাদের যে সব দাবী প্রকাশ্যে হাজির করা হয়েছে সেসব কারণের মধ্যে একমাত্র খলিস্তানের অযৌক্তিক দাবী কেউ গ্রহণ করবে না। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু যারা তা বয়েছিল তারা সুখে সংসার পাততে পারনি তাদের প্রার্থিত দেশে। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ স্বীকার মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল দেশের লোক কেবলমাত্র পরাধীনতার শেকল থেকে মুক্তি পেতে। আজ আর সে সমস্যা নেই। আজ সংহত ভারত, সংহতি নষ্ট করার আবদার যে কোন রাষ্ট্রের প্রধান স্বীকার করে নিতে পারে না। ইন্দিরাও পারেননি। অপরাধী তারাই যারা দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করতে চায়। এই সংহতি রক্ষার জন্যই ইন্দিরাকে ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। এতে অগৌরবে কিছু নেই বরং এতে তার গৌরববৃদ্ধি পেয়েছে।

দিন কাটবে, বছর কাটবে তারপর একদিন ইন্দিরা বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাবে। ইতিহাসের পাতায় তার জীবন ও কার্যাদি পর্যালোচনা হবে। সেদিন স্থির হবে জাতীয় জীবনে কোথায় তার স্থান।

প্রয়াত ইন্দিরার ছাপ কোথাও না থাকলেও ব্যালট বাক্সে তার ছাপ পড়ল খুব ভালভাবে। স্বাধীনতার পর যতবার নির্বাচন হয়েছে কোনবারই এতবেশি কংগ্রেস (ই) সদস্য লোকসভায় আসন পায়নি। ইন্দিরা হত্যা প্রখর হল তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। লোকসভার নির্বাচনে প্রায় নির্বংশ হল বিরোধী দলগুলো। উনিশ'শ সাতাত্তর সালে কংগ্রেসের যে অবস্থা হয়েছিল তার চেয়ে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল বিরোধী দলের চুরাশির নির্বাচনে। কেন? আত্মসমালোচনা করেছে বিরোধী দল। তাদের প্রথম আবিস্কার সহানুভূতি ভোট পেয়েছে কংগ্রেস। এটাই কিন্তু সব নয়। তা হলে পরবর্তী-কালে অন্ধ্রে তেলেগুদেশম এবং কর্ণাটকে জনতা পার্টি বিরাট জয়লাভ করে মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারত না।

ভোটের হাঙ্গামা মিটল। বিজয়ীরা মিছিল করে তাদের জয়ের আনন্দ প্রচার করল, পরাজিত পক্ষ নানা অভিযোগ ও নানা যুক্তি দিয়ে নিজেদের বলিষ্ঠতা জারী করতে মোটেই কার্পণ্য দেখাল না। আমাদের মত অভাজনরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আঙুলচোষা ভিন্ন আর কি করতে পারে। যারা ভাঙ্গা বাজারের ফসল তুলল তাদের কথা আলাদা। তিন চারখানা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা নিয়ে দিন মন্দ কাটছিল না। বাইরের উল্লাস অথবা হতাশা আমাকে কিছুমাত্র বিচলিত করতে না পারলেও বিচলিত করল বউদি। বলল, শুনছ ঠাকুরপো, বাজারে চিনির দর আট টাকা। এবার থেকে চায়ের পাট কমাতে হবে। তোমাদের চা সাপ্লাই দিতে হলে সুগার মিলে যেতে হবে।

হেসে বললাম, সদাশয় সরকার প্রভূত উপকার করল। বহুমূত্র রোগে ভারতের প্রায় দেড়কোটি লোক ভুগছে। তারা এবার বাঁচবে। খুব বিবেচক সরকার চিনির খোলাবাজারের দাম বৃদ্ধি করে দেশের ও দশের উপকার করেছে।

তোমার সব কিছুতেই ঠাট্টা। সামনে পৌষপার্বন। এবার আর পিঠেপুলি খেতে হবে না।

তুমি দেখছি সাংঘাতিক লোক। পিঠেপুলি বাংলাদেশের মানুষ খেত সেই আদিম যুগে। এখন ওসব উঠে গেছে। আজকালকার মেয়েরা জানেই না পিঠে-পুলি তৈরী করতে। চিনি মানেই কার্বোহাইড্রেট। আবার চালের গুঁড়ো কার্বোহাইড্রেট। ডায়াবেটিস রুগীদের ও দুটো বিষ। আসল কথা হল, এতবড় একটা নির্বাচনের প্রহসন হল গোটা দেশে, সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করল, তামাসা দেখাতে প্রার্থীরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করল, এটাতো সহজ কথা নয়। এই মহাযজ্ঞে শাসক দলকে টাকার জোগান যারা দিয়েছে তারা সুদে আসলে শোধ করছে। চিনিকলের মালিকরা হল বড় জোগানদার। তারা তো ঘরের টাকা দেবে না। তারা উশুল করবে আমাদের পকেট কেটে।

ওরা যে বলছে এবার আখে চাষ ভাল হয়নি তাই চিনির জোগান কম।

সুযুক্তি। এরপর আর বলার কিছু নেই। ভারত থেকে লক্ষ লক্ষ টন চিনি রপ্তানি হয়েছে এতকাল। এবার ভারতে চিনির আকাল। আর চিনি এবার আসবে বিদেশ থেকে। বড় জোগানদার হবে চীন। ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে সাতচল্লিশ সালে, আর চীন মুক্ত হয়েছে তার দু'বছর পর। বহুকাল যুদ্ধ করেছিল চীন। যখন মুক্ত হল তখন তার ব্যবসা-বাণিজ্য কলকারখানা প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই চীন এত অল্প সময়ের মধ্যে স্বনির্ভর হয়েছে আর আমরা তার দরজায় হাত পাতছি। বুঝতে পারছ কোথায় কাঁটা।

বউদি রাগ করে চলে যাচ্ছিল, বললাম, চিনির জোগানদার আমি হব বউদি। দয়া করে চায়ের কোটা কাটছাট কর না।

বউদি কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে ফিরে গেল। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। দরজায় মোটরের পরিচিত হর্ণ শুনে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। তাতেও রক্ষা নেই। সটান ঘরে ঢুকে অমিয়া ডাকল, দাদু ওঠ, এত বেলা অবধি ঘুমুচ্ছিস কেন? জ্বরটর হয়নি তো?

লেপের মধ্যে মুখ রেখেই বললাম, হয়নি, হবার উপক্রম।

লেপটা টেনে ফেলে দিয়ে অমিয়া বলল, তুই অতিশয় বাজে লোক।

উঠে বসে বললাম, কেন?

জ্বরজারি নেই, ভণ্ডামি করছিস।

না রে না। প্রধানমন্ত্রী হয়েছে রাজীব গান্ধী। মন্ত্রীসভা গড়েছে। তাতে দুজন করিতকর্মা লোকের নাম নেই। আমাদের রুকুমিঞা নট্, প্রণব মুখুজ্যে নট্ মানে পশ্চিম বাংলা নট্।

ওটা কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

রেলমন্ত্রী বংশীলাল গদীতে বসেই বললেন, ঠিকা চাকুরি নট্। বকুমিঞা রেলমন্ত্রী থাকার সময় যাদের ঠিকা চাকুরি দিয়েছিল তারা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। বকুমিঞা জোর গলায় বলেছিল, আমি বাঙ্গালীদের চাকরি দেব। আর বংশীলালের বংশীধ্বনিতে কয়েক'শ বাঙ্গালী যুবক একেবারে পথে বসে গেল।

এতে বকুমিঞার দোষ কোথায়? স ভোট কুড়াতে বেরিয়েছিল। কার্য্য সিদ্ধি হয়েছে। পরের ঘটনার জন্য তো সে দায়ী নয়। আর রাজনীতি তো মিথ্যার বেসাতি। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে রাষ্ট্রনেতারা সব সময় ভুলো। অর্থাৎ সকাল বেলায় যা বলে বিকেল বেলায় তা ভুলে যায়। বকুমিঞা যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পালন করার দায়িত্ব তার নয় সরকারের। যখন বকুমিঞা ছিল সরকারের মন্ত্রী, তার প্রতিশ্রুতি হয় সরকারী প্রতিশ্রুতি। পরবর্তীকালে সরকার তা পালন করবে। বংশীলাল তা যদি না করে তা হলে বকুমিঞা ব্যক্তিগত ভাবে দায়িত্ব নেবে কেন?

হাই তুলতে তুলতে বললাম, ঠিক বলেছিস অমু। তবে প্রণব!

ওটা ম্যাক্সিডেন্ট। তবে বেকার থাকবে না। বকুমিঞারও গতি হবে। প্রণববাবুরও। আর যাই হোক মতিলাল নেহেরুর গোষ্ঠী বেইমান নয়। তারা কিছু না কিছু ব্যবস্থা করবে। বাংলা কংগ্রেস থেকে ইংরেজি কংগ্রেসে নাম না লেখালে এটা কি হতে পারত? তবে প্রণববাবু বেইমান নয়। দুর্দিনে ম্যাডামের কাছছাড়া হয়নি। এটা বোধহয় তোর মনে আছে। সেই শাহ কমিশনের সামনে প্রণববাবু যা বলেছিলেন তাতেই প্রভুভক্তির যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই ভাবছি, ম্যাডামের উত্তরপুরুষ হঠাৎ কি করে প্রণববাবুকে বাদ দিল তা বোঝা শক্ত।

ওরা কি বলছে জানিস? হিন্দীওলারা বাংলার ওপর শোধ নিচ্ছে। অশোক সেন নির্বাচন জেতে কংগ্রেসের কৃপায় কিন্তু তার নিজস্ব কোন সমর্থক নেই তার পক্ষে কংগ্রেসকে বলিষ্ঠ করার আশা না থাকা সত্ত্বেও তাকে ডেকে মন্ত্রীর গদীতে বসাল। এটা কংগ্রেসের কোন্ স্ট্রাটেজি তা বোঝা দরকার।

দেখ দামু, ওরা মানে কংগ্রেসের মন্ত্রীরা মোটেই শান্তিতে রাজ্য চালাতে পারবে না। ওরা ওদের দলের লোককে বেশি ভয় করবে। তার কারণ কি জানিস, ওরা নিজেরা আজও বোঝাপড়া করতে পারেনি। নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগির লড়াই চলে আসছে শতবর্ষ ধরে। কোনও দিনই ওরা দেশের কথা ভাবেনি, ভেবেছে শুধু নিজেদের কথা। তাই বোধহয় মুঘল যুগের অন্তিম অংশের সঙ্গে পরিচয় ঘটতে পারে আমাদের। দিল্লীর মাটি হল বেইমানের পীঠস্থান, তাই যারা প্রশাসনের শীর্ষে তারা সর্বদা সঙ্কিত থাকে, ইতিহাস তাদের শিখিয়েছে, দিল্লী হল মশান, এই মশানে যে কোন সময় বধ হতে পারে তারা।

তুই একটু বেশি ভেবেছিস অমু। মুঘল যুগের দিল্লী আর বর্তমানের দিল্লী এক নয় শুধু সুযোগের অপেক্ষা। যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতেও পারে।

আমি বিশ্বাস করি না।

আমরা অনেক কিছুই বিশ্বাস করি না, অথচ ঘটে। যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে চলেছিল তখনও আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। একমাত্র গান্ধীজির হত্যাটা ছিল একটা ব্যতিক্রম। গান্ধীজির হত্যার কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে তার সঙ্গে ইন্দিরা হত্যার কারণ মোটেই এক হ'তে পারে না। সেজন্য আশঙ্কা রয়ে গেছে।

বললাম, আমাদের আলোচ্য বিষয় থেকে অনেকটা হটে এসেছি।

অমিয়া হেসে বলল, সাইমালটেনিয়াস পারসেপসনের ব্যাপার। একটা ভাবতে গেলে আরেকটা হাজির হয়।

এবারের নির্বাচন থেকে মোটামুটি যা কিছু সংগ্রহ করেছিস তাই শোনা।

অমিয়া গম্ভীরভাবে বলল, এবারের সঞ্চয় অনেক। থলে ভর্তি করে এনেছি।

যেমন ?

এক দলের আশ্রয় তাদের বিগতা নেত্রী, অন্য দলের, যাক্ সে কথা।

তুইতো সি-পি-এমকে এড়িয়ে যেতে চাস।

সরকারী চাকরি করি। এখন ওরাই কর্তা। আমরা হলাম কর্তাভজার দল। শেষে কি বলতে কি বলব আর হিতে বিপরীত হবে। যা বলার তুই বল। ফলাফল তো জানিস। ওদের ভরাডুবি না হলেও শহর এলাকায় ওরা ভয়ঙ্কর ধাক্কা খেয়েছে তাতো দেখলি।

শহরের মধ্যবিত্ত লোকের কোন চরিত্র নেই রে অমু। অর্থবানদের চেনা যায়, গরীবদের চেনা যায় কিন্তু মধ্যসত্বভোগী যারা তারা, মধ্যবিত্ত সামান্য কারণে যেমন হতাশ হয়, তেমনি সামান্য কারণেই উত্তেজিত হয়। গণতন্ত্রের গুরুত্ব থাকে শাসকদের সাফল্যের মাপকাঠিতে। শাসকরা যখন তাদের প্রতিশ্রুতির সামগ্রিক সাফল্য আনতে পারে না স্বাভাবিক ভাবে তখনই শাসক বিরোধী গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

অর্থাৎ তুই বলতে চাস এই বিরোধ গ্রামে দানা বাঁধে শহর এলাকায় ?

আজ্ঞই। শহর এলাকার মানুষ যত বেশি প্রশাসনের কাছে থাকে গ্রামের মানুষ সেই অনুপাতে দূরে থাকে। শাসকদের চেহারা শহর এলাকার মানুষ যতটা দেখতে পায় গ্রামের মানুষ অতটা দেখতে পায় না। তাই শাসক বিরোধী মনোভাব শহরে প্রথম দানা বাঁধে তারপর ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

বুঝলাম। একটা কথা মনে রাখিস দামু, শহরে যা দানা বাঁধে তা তরল হয় সহজেই। কিন্তু গ্রামে দানা বাঁধলে তা বড়ই কঠিন হয়ে ওঠে। কারণ, শহরের জীবন স্রোতে আবর্ত বেশি, একটার পর একটা ঘটনা এসে তাদের চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনে আর গ্রামের জীবন ধারাবাহিক কাঠিন্য দিয়ে গড়া, পরিবর্তন সহজে দেখা যায় না। গ্রামের মানুষ বোকা অশিক্ষিত অজ্ঞ, শহরের মানুষ চতুর। পরিবেশকে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা তাদের বেশি।

ভুল করছিস অমু। আজ গ্রাম ও শহরের অধিকাংশ লোকই রাজনৈতিক সচেতন এবং নিজেদের অবস্থা ও পরিবেশ সম্বন্ধে সজাগ। অবশ্য এটা সম্ভব হয়েছে শাসক ও বিরোধী দলের যৌথ চেষ্টায়। আমরা গণতন্ত্রী, গণভোটের গরিষ্ঠতায় শাসক শ্রেণী গদীতে বসে, কিন্তু যারা লঘিষ্ঠ তারাও তাদের বক্তব্য শোনায় জনসাধারণকে। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনতে শুনতে সাধারণ মানুষ মোটামুটি রাজনীতির আবহাওয়া চিনতে শিখেছে।

এটা কিন্তু সম্ভব হত না যদি বামপন্থী দল সংগঠিত ভাবে শাসকদের ত্রুটি-গুলো জনসমক্ষে তুলে না ধরত। যেটা আমরা বামপন্থী আন্দোলন বলে মনে করি, সেটা যতটা না বামপন্থী তার চেয়ে বেশি দলীয় স্বার্থপন্থী, সেজন্যই জনসমাজে স্থায়ী কোন রূপ নিতে পারেনি আজও। বামপন্থী আন্দোলন গড়ে ওঠে মানুষের নিত্যদিনের জীবন সংগ্রামের মাঝ দিয়ে। যখন সমষ্টি সজাগ হয় তখন তারা খুঁজতে থাকে তাদের দৈন্য দুর্দশার মূল কোথায়? কি ভাবে সেই মূল উৎপাটন করা যায়। তাতে সৃষ্টি হয় লড়াইয়ের পরিবেশ। এই লড়াই কিন্তু আদর্শ ভিত্তিক। ভাবাবেগ দিয়ে আদর্শ সৃষ্টি হয় না, আদর্শের বিকাশ ঘটে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে। তা কতো আমাদের দেশে ঘটেছে তা বলা খুব কঠিন।

জানিস অমু, বামপন্থী বলতে আমরা বুঝি কমুনিষ্ট আন্দোলনকে। এর ভিত্তি হল দুইটি মহানায়কের অবদান। একজন মার্কস অপরজন এঙ্গেল। তাদের শিক্ষা ও তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নিয়ে গড়ে ওঠে কমুনিষ্ট আন্দোলন। ভারতে কমুনিষ্ট আন্দোলনের সূত্রপাতও ঘটেছিল লড়াইয়ের মাঝ দিয়ে। কিন্তু নেতৃত্ব এসেছিল বুদ্ধিজীবি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে।

বললাম, মধ্যবিত্তদের তো স্থায়ী কোন চরিত্র নেই।

সেজন্যই আজও বামপন্থীদের আন্দোলন যেমন লড়াইয়ের রাস্তা ছেড়ে বিলাসের পথে পা বাড়িয়েছে তেমনি ধীরে ধীরে আদর্শের গলা টিপে মারার অবস্থা সৃষ্টি করছে। ওসব আলোচনা আজ শিকেয় তুলে রাখ। এবার চল একবার শহরে প্রদক্ষিণ করে আসি।

কোথায় যাবি?

জানি না গাড়ি যেখানে নিয়ে যায় সেখানে যাব। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে। আজ সারা দিনের প্রোগ্রাম। আমি গাড়িতে তেল ভর্তি করে আনছি, বুঝলি।

অমিয়া বেরিয়ে গেল।

আমি প্রস্তুতি নেবার আগেই বড়দা এসে বলল, শ্যামলীর বিয়ে ঠিক করেছে হরিশখুড়ো।

হেসে বললাম, এতো অনেকবার শুনেছি। শ্যামলীর মতামতটা নিয়েছেন কি?

না নিয়েই কি হরিশখুড়ো এগোচ্ছেন। ওটা ওদের ব্যাপার। আমাদের সঙ্গে কিছুটা আর্থিক লেন দেনের সম্পর্ক জড়িত।

হেসে বললাম, দেনের সম্পর্ক। লেনের নয়। তবে দাদা, যতক্ষণ শ্যামলী

এসে না বলছে ততক্ষণ তার বিষয়ে প্রস্তুতি নিতে অর্থব্যয় নিরর্থক। শ্যামলী নাবালিকা নয়, লেখাপড়া শিখেছে। তার মতের বিরুদ্ধে হরিশখুড়ো যেন কিছু না করেন, পরিণাম ভাল হবে না। মলয়ার ব্যাপার তো জান।

বাইরে মোটরের হর্ন বাজতেই বললাম, শ্যামলীর বিয়ে নিয়ে পরে কথা হবে। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। ফিরতে বিলম্ব হবে।

বড়দা বসেই রইলেন। আমি বেরিয়ে পড়লাম।

গাড়ির দরজা খুলে আমাকে পাশে বসিয়েই অমিয়া বলল, টু ক্যালকাটা।

উদ্দেশ্য?

অফিসে হাজিরা দিয়ে কলকাতার মানুষ নয় এমন সব অ-মানুষের জীবন দেখতে। আজকের কাগজ পড়েছিস?

মোটামুটি।

মোটামুটি পড়লে চলবে না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হয়।

যে কাগজ আমরা পাই তার দশ আনা বিজ্ঞাপন, বাকি ছ'আনায় সংক্ষিপ্ত সংবাদ। এমন কি অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ অন্য কাগজে আজ যা ছেপেছে, এরা ছাপে দু'দিন পরে।

একটা কাগজকে ভরসা করলে চলে না।

অত পয়সা কোথায়! যে টামুটি দেশের অবস্থাটা জানা যায়।

আজ আসাম সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যটাই তো আসল খবর।

বোধহয় তাই। আসাম নিয়ে অনেক শলাপরামর্শ হয়েছে, কোন নির্দিষ্ট ঐক্যমতে কেউ আসতে পারেনি। ইন্দিরা গান্ধী নানা সমস্যা সৃষ্টি করলেও, সরকারী প্রতিশ্রুতিগুলো প্রতিপালনের জন্য যথেষ্ট দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন, বোধহয় এবার তার ব্যতিক্রম ঘটবে।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে তিরাশি সালে নির্বাচন হয়েছিল। ফলে বহু রক্তপাত ঘটেছিল। নেলী নামক গ্রামে কয়েক সহস্র বাঙ্গালী মুসলমানকে হত্যা করেছিল নির্বাচন বিরোধীরা।

আশঙ্কা। বুঝলি, আশঙ্কা! বলে থেমে গেলাম।

ধনীরাম বড় কাকতি বলেছিলেন:

বর্মা ও লাওসের শান এলাকা থেকে একদল উপজাতি উত্তর আসামে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। সেখানেই তারা বেশ শক্ত একটি রাজ্য পত্তন করেছিল। তারাই ধীরে ধীরে দক্ষিণ অংশ দখল করে অসম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। ক্রমেই তারা হিন্দু ধর্ম ও আচার গ্রহণ করে মহাভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টির অংশীদার হয়েছিল।

কলিমুদ্দিন নায়েক বাধা দিয়ে বলল, অতীত ইতিহাস শুনে কি হবে ডাঙ্গোরিয়া। আজ আমাদের সামনে সেই ইতিহাসের ছায়াকে সম্বল করে চলার

কোন যৌক্তিকতা নেই। আসাম অশান্ত। এই অশান্তির পটভূমি কি ভাবে তৈরী হয়েছিল সেটাই বিবেচ্য।

তোমরা শুধু মনে কর দিল্লীর উপনিবেশ বাংলাদেশ, তা নয় বন্ধু, গোটা পূর্ব ভারতই সেই মুঘল যুগ থেকে দিল্লী-আগ্রা ইত্যাদির উপনিবেশ ছিল এবং এখনও আছে। অহোম রাজারা স্বাধীনভাবেই উত্তর আসামে রাজত্ব করেছে, তাদের সময় শিল্পকলায় সাহিত্যে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। দক্ষিণ আসামে ছিল কামরূপ রাজ্য। এই রাজ্যের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ হল অতীতের কোচবিহার রাজ্য। অহোম রাজ্য ধীরে ধীরে দক্ষিণেও প্রসারিত হতে থাকে। এটা কারও অজানা নয়। আওরঙ্গজীব তার সেনাপতি মীরজুমলাকে পাঠিয়েছিল আসাম জয় করতে। গুযাহাটির উপকণ্ঠে যে যুদ্ধ হযেছিল তাতে মুঘলরা সাফল্য লাভ না করায় মীরজুমলাকে ফিরে যেতে হযেছিল। পথে গৌরীপুর আর বগরীবাড়ির মধ্যবর্তী স্থানে মীরজুমলা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আজও তার কবর সেখানে আছে।

কলিমুদ্দিন বলল, ওটা তো শেষ কথা নয়।

না শেষ কথা নয। মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করা হযেছিল। জলপথে আসতে হযেছিল মুঘলদের। তাদের গতিরোধ সহজ হযেছিল কিন্তু স্থলপথে আরেকদল শত্রু এসে হাজির হল আসামের মাটিতে। মণিপুর দখল করে বর্মীরা আসামে প্রবেশ করল। বর্মীদের অত্যাচারে আসামের জনপদগুলো জনশূণ্য হতে থাকে। কৃষি ব্যবস্থা অচল। চাষীরা ঘর ছেড়ে পালাতে থাকে, শিল্পীরা পাহাড়ী গভীর অরণ্যে আশ্রয় নেয়। অহোম রাজা বীর বিক্রমে লড়াই করে পরাজিত হলেন। তখন নিরুপায় হযে ইংরেজের সাহায্য চাইলেন রাজা। ইংরেজ সব সমযই বন্ধুবেশে এসে সব কিছু গ্রাস করেছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। আসামের দক্ষিণ অংশ ইংরেজ অধিকারে গেল। কিছুকাল পরে উত্তর অংশও ইংরেজ দখল করল তাদের বেনিয়া স্বার্থরক্ষা করতে। স্বাধীন আসামের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল আঠারশত সতের থেকে পঁচিশ সালের মধ্যে।

ইংরেজ চা বাগান পত্তন করল। আসামকে বাংলা বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে সংযুক্ত করে শ্রমিক আমদানী করল ভারতের নানা স্থান থেকে, বিশেষ করে ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা এল চা বাগানের শ্রমিকরূপে।

অর্থাৎ বহিরাগতরা ধীরে ধীরে আসামের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ল। আর প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে আসতে আরম্ভ করল বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবিরা। শ্রীহট্ট ও কাছাড় এই দুটো জেলা বাংলা ভাষাভাষী। এরা সংযুক্ত রইল আসামের সাথে।

অসমীযা জনসাধারণ তখন চিন্তা করেনি। যারা তখন এসেছিল প্রশাসনে তাদের অধিকাংশই হিন্দু এবং বাংলা ও আসামের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বহু যুগের।

ধনীরাম বলেছিল, ইংরেজ রাজত্বকালে আসাম ছিল অন্যতম বৃহৎ প্রদেশ।

স্বাধীনতা লাভের পর আসাম ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। মণিপুর, ত্রিপুরা দেশীয় রাজ্যের কথা বাদ দাও। নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয়, অরুণাচল, আসাম থেকে আলাদা হয়ে গেল।

কলিমুদ্দিন হেসে বলল, এর জন্য দায়ী তোমাদের উগ্র অসমীয়া প্রীতি। তোমরা এইসব রাজ্যে অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছ যা ওরা সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি।

কিন্তু আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা তো রয়েছে মধ্যপ্রদেশে, উড়িষ্যায়, অন্ধ্রে, বিহারে। এইসব রাজ্যের মানুষ তো স্ব-স্ব রাজ্যের ভাষাকে গ্রহণ করেছে বিনা প্রতিবাদে।

কারণ হল মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে হিন্দীভাষীর সংখ্যা অনুসারে আদিবাসী ভাষা-ভাষীর সংখ্যা অতি নগণ্য। এমনি ধারা অন্য রাজ্যেও। কিন্তু অসমীয়া ভাষা-ভাষী এবং অন্যান্য ভাষাভাষী জনসংখ্যার ভাষা একত্রে বিচার করলে অসমীয়া ভাষী জনসংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়ে যায়। সেইজন্য আলাদা আলাদা রাজ্য গঠন করা হয়েছিল ওদের আলাদা আলাদা ভাষা ও কৃষ্টিকে মর্যাদা দিতে। বর্তমান আসামেও অসমীয়া ও বাংলা ভাষার অনুপাত দশে ছয়জন ও চারজন। এটাও ঠিক নয়, কারণ গোয়ালপাড়া জেলা ধুবরীসহ এলাকার জনসংখ্যার সত্তর ভাগই বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান। দেশ বিভাগের পর এরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে নিজেদের অসমীয়া ভাষাভাষী বলে প্রচার করেছে। উপরন্তু হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীরা সচেষ্ট হিন্দী ভাষার ব্যাপক প্রচারের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে হিন্দী ভাষা চালু করতে এবং হিন্দী ভাষী সরকারী কর্মচারীদের পাঠাচ্ছে সেইসব এলাকায়। এবার তোমরা বিচার কর, আসল অবস্থাটা কি?

ধনীরাম বিরক্তির সঙ্গে বলেছিল, তা কি সম্ভব। হিন্দী প্রচার করা সম্ভব কিন্তু অন্য কোন ভাষাভাষীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া কি সম্ভব?

কলিমুদ্দিন হেসে বলল, পাঞ্জাব কেশরী রঞ্জিত সিংহের সেই ঐতিহাসিক কথাটা মনে রেখ ডাঙ্গোরিয়া। রঞ্জিত সিংহ ভারতের মানচিত্রের লাল রং দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এটা লাল রং কেন? তাঁর উজির বলেছিলেন, মহারাজ, লাল রং দেওয়া হয়েছে ইংরেজ অধিকৃত ভারতে। রঞ্জিত সিংহ কিছুক্ষণ মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, সব লাল হো জায়েগা। সারা ভারত ইংরেজদের দেওয়া লাল মানচিত্রে অচিরেই স্থান পেয়েছিল। তুমি ভাবছ, হিন্দী চাপানো যাবে না। চেষ্টা চলবে। তোমরা যেমন অসমীয়া ভাষা ও কৃষ্টি আসামের সর্বত্র চাপাতে চেয়েছিলে, ফল তো দেখেছ। তেমনি হিন্দী চাপাতে গিয়ে যদি কখনও ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয় তাতেও কেউ আশ্চর্য হবে না, আবার যদি সব লালের মত সব হিন্দী হয় তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রয়ে সহে চলতে হয় বন্ধু।

ধনীরাম বাধা দিয়ে বলেছিল, আমাদের সহনশীলতার সুযোগ নিয়েই আজ বহিরাগতরা এভাবে আসামের দুর্দিন ডেকে এনেছে।

কলিমুদ্দিন বলল, ইতিহাস তা বলে না। ভবিষ্যতেও বলবে না। আমরা একটু পেছন হাঁটতে পারি। সেই যখন প্রথম আসাম একটা নতুন প্রদেশের পূর্ণরূপ পেল সেদিন থেকে আজ অবধি অঙ্ক কষলে দেখা যাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ অসমীয়ারা সর্বপ্রথম শঙ্কিত হয়েছিল বৃটিশ রাজত্বকালে যখন দলে দলে বাঙ্গালী মুসলমান ময়মনসিংহ ও রংপুর জেলা থেকে ব্রহ্মপুত্রের চর দখল করে বসবাস আরম্ভ করেছিল। সংযুক্ত ভারতে তাদের উপনিবেশ স্থাপনে বাধা দেওয়া হয়েছিল যার জন্য লাইন প্রথার সৃষ্টি। চাকুরির ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট না নিলে কোন বাঙ্গালী সেখানে চাকরি পেত না। এটা শুধু উত্তর আসাম বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রয়োগ করলেও সুরমা উপত্যকায় দলে দলে বাঙ্গালী মুসলমান উপনিবেশ গড়তে আরম্ভ করেছিল শ্রীহট্ট, কাছাড ও খাসি পাহাড়ের জয়ন্তিয়া অঞ্চলে। তখন তোমরা চিন্তা করেছিলে ওদের মুসলমান হিসাবে। তাই মুসলমানদের জমিজমা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলে কিন্তু এর রাজনৈতিক গুরুত্বটা কখনও ভেবে দেখনি।

ধনীরাম কোন উত্তর দেয়নি। চুপ করে শুনছিল।

কলিমুদ্দিন বলল, তখন মুসলীমলীগ পাকিস্তানের জিগির দিতে আরম্ভ করেছে। মুসলমান গরিষ্ঠ প্রদেশগুলো পাকিস্তান হবে এই আশা তাদের। কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। সুযোগ পেল মুসলীম লীগ। সাদুল্লা আসামের প্রধানমন্ত্রী, তাকে সিলেট-কাছাড়ের মুসলমানরা যেমন অকুণ্ঠ সহযোগিতা করত আসামকে পাকিস্তানের সামিল করতে, ঠিক সেই সময়ে ঘাগমারির চরে আসামের তৎকালীন এম-এল-এ আব্দুল হামিদ খাঁন ভাসানী কসম খেয়ে লেগেছিল আসামকে মুসলীম গরিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত করত। গোয়াল-পাড়া জেলার ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরের স্থানীয় বাসিন্দাদের সংখ্যা বহিরাগতদের ধাক্কায় দশজনে দুইজনে পরিণত হল। বহিরাগত আটজনের সবাই প্রায় বাঙ্গালী মুসলমান। দেশ স্বাধীনতা লাভ করতেই চিত্র গেল বদলে।

ধনীরাম বলেছিল, স্বাধীনতাকে আমরা অভ্যর্থনা জানালাম আর আসামকে পাকিস্তানের কব্জায় নিতে না পেরে ভাসানীর মওলানা আব্দুল হামিদ খাঁ রাতারাতি ঘাগমারির চর ছেড়ে ময়মনসিংহে পালাল। পেছনে পড়ে রইল তার হাজার হাজার সহচর, অনুগামী ও মুরীদ। যে মুসলমানদের জন্য পাকিস্তানের দাবী হাসেল করতে পাকিস্তানের কায়েদে আজম জিন্নাহ্ চেয়েছিল ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র সেই জিন্নাহ সাড়ে আট কোটি মুসলমানকে পেছনে ফেলে পালিয়ে গিয়েছিল করাচিতে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের গদীতে বসতে। একই অবস্থা সৃষ্টি করেছিল জিন্নাহের বিশ্বস্ত অনুগামী ভাসানীর মওলানা। কিন্তু আমরা বাঁচলাম মুসলমানদের অত্যাচার থেকে, বিশেষ করে শ্রীহট্ট পাকিস্তানে যুক্ত হওয়াতে মুসলমানরাও বেশ বেকায়দায় পড়েছিল।

কলিমুদ্দিন বলল, তা নয় ডাঙোরিয়া। তোমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙ্গালীদের সংখ্যালঘিষ্ঠ করে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ পেয়েছিলে। দেশ স্বাধীনতা

পেল। মণ্ডল'না পালাল, সাম্প্রদায়িকতার মেরুদণ্ড না ভাঙলেও বেশ রুগ্ন হয়ে পড়ল। তাও সাময়িক। তোমরা প্রথমে ভয় পেয়েছিলে মুসলমান প্রাধান্যের, দেশ ভাগ হতেই তোমরা শঙ্কিত হলে বাংলাভাষীর প্রাধান্যের। ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতার বদলে দেখা দিল ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতা। এর পরিণাম হবে গুরুতর। আমরা ভাবছি এরপর কি?

ধনীরাম বলেছিল, আসামকে উপেক্ষা করেছে ভারত সরকার, আসামের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। এর পরিণতিতে আজ আসাম অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু বিদেশী বিতাড়ণের ধুয়া তুলে যে অন্যায় অবিচার করে চলেছ তার কি কোন নৈতিক মূল্য আছে?

এটা সৃষ্টি করেছিল জনতা সরকার। মঙ্গলদৈ উপনির্বাচন নিয়ে উনসত্তর সালে প্রথম অবিশ্বাস ও অশান্তির উদ্ভব হয়। অসমীয়া ভাষাভাষীরা আতঙ্কিত হয় তাদের সব কিছু হারাতে হবে যদি তারা বিদেশী অনুপ্রবেশ বিশেষ করে মুসলমানদের অনুপ্রবেশ বন্ধ না করতে পারে।

কলিমুদ্দিন অবশেষে বলেছিল, আসাম পর্ব এখানেই তো শেষ নয়। আরও কিছু জমা আছে ভবিষ্যতের কোলে। সেদিন কারও কিছু দেবারও থাকবে না, নেবারও থাকবে না। থাকবে শুধু হিংসা আর ঘৃণার, অবিশ্বাস ও অশান্তির পরিবেশ।

আমি অমিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আসাম কি চায় বলতে পার?

আসাম? মানে, আসামের অসমীয়াভাষী জনসাধারণ? চায় ক্ষমতা!

সে ক্ষমতা তো ওরা ভোগ করছে। বরদলুই ছিলেন খাঁটি অসমীয়াভাষী, সেখান থেকে আরম্ভ করে হিসাব করে দেখ সব মুখ্যমন্ত্রী-ই ছিলেন অসমীয়া। শরৎ সিংহ, গোলাপ বরবরা, হিতেশ্বর শইকিয়া, কেশব গগৈ, যোগেন হাজারিকা, আনোয়ার তৈমুর এদের একজনও আসামে বহিরাগত নয়। তবু কেন অশান্তি? নীতির দ্বন্দ্ব। কংগ্রেসী অসমীয়া আর অকংগ্রেসী অসমীয়ার দ্বন্দ্ব ক্ষমতা বিভাজনের। কংগ্রেস তো অনেক কাল রাজ্য প্রশাসনের দায়িত্বে ছিল, তাতে অসমীয়ারা কতটা লাভবান হয়েছে? অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কতটা এগিয়েছে, তারই হিসাব হয়েছে শেষ অবধি। অসমীয়া ভাষাভাষীদের যুব সম্প্রদায় বেকারত্বের পয়জারে পয়মাল হতে বসেছে। তারা বাঁচার তাগাদায় দায়িত্বটা তুলে নিয়েছে নিজের হাতে, ক্ষোভ দেখা দিয়েছে বঙ্গভাষাভাষীদের ওপর। তাদের সবাই বিশ্বাস করে, তাদের আর্থিক দুর্গতির কারণ-ই হল বঙ্গভাষাভাষীরা। তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হল বাঙ্গালীরা। আসামে কংগ্রেস যে ক্ষমতা লাভ করে তার মূলে রয়েছে বাঙ্গালী ভোটদাতারা। কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হলে আঘাত করতে হবে বাঙ্গালীদের। সেই কাজই করছে বিরোধী অসমীয়ারা। তাদের অন্য কোনপ্ল্যান প্রোগ্রাম আছে বলে মনে হয় না। তারা প্রবীণ কংগ্রেসীদের বিতাড়িত করে তরুণদের বসাতে চায় ক্ষমতায়। শেষ অবধি তারা যে নামেই পরিচিত হোক,

কংগ্রেসের বি-টিমে পরিণত হতে বাধ্য হবে। ক্ষমতা প্রবীনদের হাত থেকে নবীনদের হাতে যাবে এবং ভারতীয় সংবিধানের বাঠ'মোর মধ্যেই তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হবে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথে।

অমিয়া বিশ্বাস কর, ইন্দিরা যা পারেনি রাজীব তা পেরেছে। ইন্দিরা সাক্ষাৎভাবে আসামে কংগ্রেসের প্রভুত্ব স্থাপন করতে চেয়েছিল, এর পরিণামে আসামে অশান্তি দেখা দিয়েছিল, এর হোতা হল জনতা সরকার। তাদের অপরিচ্ছন্ন নীতি আসামের অশান্তি সৃষ্টি করে তা জিইয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। রাজীব অসমীয়াভাষীদের দাবী মেনে নিয়ে ভারতীয় সংবিধানকে অমর্যাদা করেছে ঠিকই। আবার ভারতীয় সংবিধানের আওতায় আসামের নবীনদের টনে এনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শিকার হতে বাধ্য করেছে। যতই ক্ষোভ থাক, যতই উচ্চাশা থাক, যতই প্রতিশ্রুতি থাক, সংবিধান বহির্ভূত কোন কাজ করার ক্ষমতা থাকবে না নবীনদের। যতদিন ক্ষমতা ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল ততদিন সরকারের সঙ্গে লড়াই করা যত সহজ ছিল, ক্ষমতালাভ করে প্রচলত সংবিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে আর লড়াই করার ক্ষমতা থাকবে না। অচিরেই তাদেরও পরিচ্ছন্ন রূপে কালিমার ছাপ পড়বে। এই সমস্যার সমাধান কি ভাবে হবে তা ভবিষ্যত বলতে পারবে।

বাঙ্গালী মুসলমানদের নেতৃত্বে ছিল মওলানা ভাসানী। দেশ স্বাধীন হবার পর মওলানা পলায়ন করেছিল। অসমীয়া সরকার গোয়ালপাড়া, নওগাঁ, তেজপুর, কামরূপ জেলার বহিরাগত মুসলমানদের আর সহ্য করতে পারছিল না। প্রাণের ও মানের দায়ে এবং বাচার আশায়, বহিরাগত মুসলমানরা বলল, আমরা অসমীয়াভাষী। যার ফলে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বঙ্গভাষাভাষী গোয়ালপাড়া জেলাকে আর ভাঙ্গাচোরা করেনি। ষাট সালে যখন কাছাড়ে ভাষা আন্দোলনে বহু তরুণ প্রাণ হারায় তখন গোয়ালপাড়ার বাঙ্গালী মুসলমানরা নিরপেক্ষ থেকে প্রমাণ করে তারা অসমীয়াভাষাভাষী। অসমীয়া জনসাধারণ কিন্তু ওদের এই নিরপেক্ষতাকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি। যতই অসমীয়া ভাষাকে মাতৃভাষা বলুক, মূলত ওরা বাঙ্গালী। এই সব নয়া অসমীয়া বাঙ্গালীদের ভোটেই কংগ্রেসকে হটাতে হবে।

কোন বামপন্থী আন্দোলন ভালভাবে দানা বাঁধতে পারেনি এই রাজ্যে। যার ফলে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হলে আঞ্চলিক দল গড়াই সুবিধা-জনক। এরা না ঘরকা, না ঘাটকা। এরা বামপন্থী নয়, আঞ্চলিক মনোভাবকে সুরসুরি দিয়ে ক্ষমতা চায়। এই পথে বিঘ্ন বঙ্গভাষাভাষীরা, বিশেষ করে বহিরাগত বাঙ্গালী মুসলমানরা।

এদের যত ক্রোধ গিয়ে পড়ল তাদের ওপর। তিরাশি সালের নারকীয় ঘটনা এটাই প্রমাণ করে। সুস্থ রাজনৈতিক দল গড়া সম্ভব নয়, তাই অসুস্থতার মাঝ দিয়ে আঞ্চলিকতার জন্ম। পরিণতি তো অসুস্থতার পথেই অগ্রসর হবে।

রাজীব গান্ধী দুটো চুক্তি করেছেন। পাঞ্জাবের অশান্তি নিবারণের জন্য আকালি দলনেতাদের সঙ্গে, অপরটি আসামের অস্থির অবস্থা আয়ত্বে আনতে আসাম গণপরিষদের সঙ্গে। উগ্রপন্থী আকালি দল এই চুক্তির বিরোধী। তারা চুক্তি স্বাক্ষরকারী আকালি দলের সভাপতিকে হত্যা করতে কিছু মাত্র দ্বিধা করেনি। উগ্রপন্থীরা ভারতকে খণ্ডবিখণ্ড করে স্বাধীন খলিস্তানের স্বপ্ন দেখছে। তাদের মদত জোগাচ্ছে বিদেশে বসবাসকারী কিছু শিখ নেতা ও পাকিস্তান। তারা অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে ভারতের স্থায়িত্বকে ভেঙ্গে দিতে বদ্ধপরিকর। উগ্রপন্থী আকালীদের শিক্ষণ ও আশ্রয় দিচ্ছে ভারতের নিকট প্রতিবাসী পাকিস্তান। অবশ্য সরকারী ভাবে পাকিস্তান এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। কিন্তু এতেও সন্দেহের নিরসন ঘটেনি। রাজীব গান্ধী লাঙ্গোয়ালের হত্যার পরই পাঞ্জাবে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজীব জানতেন এই নির্বাচনে কংগ্রেসের জয় অসম্ভব। তবুও আকালি দল ক্ষমতা লাভ করে যদি পাঞ্জাবের উগ্রপন্থীদের দমন করতে পারে, এরূপক্ষেত্রে কোন পক্ষই কেন্দ্র অথবা কংগ্রেসকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না। আকালিরা নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মিটিয়ে নিক, তৃতীয় পক্ষ এতে নাক গলাবে না। নির্বাচনে আকালি দল নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে শাসনযন্ত্র হাতে তুলে নিল কিন্তু উগ্রপন্থীরা ঝোপ-ঝাড়ে গোপনে তাদের ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। কেবলমাত্র হিন্দু নিধন তাদের লক্ষ্য নয়, তারা পন্থ নায়ক সাহেব সিংহকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে জখম করতে দ্বিধা করেনি। মনে হয়, খলিস্তানের স্বপ্ন ওদের উন্মাদ করে তুলেছে। নইলে নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষকে এভাবে হত্যা করা কেবলমাত্র পেশাদারী ঘাতকের পক্ষেই সম্ভব।

উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপকে পরোক্ষে সমর্থন জানিয়েছে বহু আকালি নেতা। অতীতে যখন নির্বিচারে খলিস্তান বিরোধীদের এবং নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করছিল এইসব বিপথগামী তরুণরা তখন আকালিরা কঠোরভাবে তার নিন্দা করেনি। মৃদু প্রতিবাদ কারও কারও কণ্ঠে শোনা গেলেও, তার মূল্য কেউ দেয়নি। এইসব নেতারা জীবনের ভয়ে এতই ভীত হয়ে পড়েছিল যার জন্য সশস্ত্র উগ্রপন্থীদের ধর্মস্থানেও অবাধ বিচরণে বাধা দেয়নি।

ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করেছিল দুজন ধর্মান্ধ শিখ। অবশ্য পেছনে বিরাট ষড়যন্ত্র না থাকলে এমন ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়। হত্যার চব্বিশ ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতে দিল্লী-বোকারো সহ বহু স্থানে শিখদের হত্যা ও লুণ্ঠন চলতে থাকে অবাধে। এই সময় রাজধানী দিল্লীতে কোন সভ্য সরকার কায়েম ছিল এমন দাবী করার মত লোক বিরল। রাজীব গান্ধীর কাছে অভিযোগ করা হল, বহু কংগ্রেস নেতা এই লুণ্ঠন ও হত্যা কার্যে নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেজন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত আবশ্যক। রাজীব শিখদের এই দাবী যেমন মেনে নিয়েছেন তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত শিখদের কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতির অধিক ক্ষতিপূরণ দিতে কার্পণ্য করেন নি!

পশ্চিমবঙ্গে শিখ হত্যার ঘটনা শোনা যায়নি তবে সমাজবিরোধীরা কোন কোন শিখের দোকানপাট লুটপাট করেছিল। তাও দমন করেছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। এই লুটপাটের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে শিখরা যে নিরাপদ এটা বুঝতেও কারও কোন অসুবিধা হয়নি। এই কৃতিত্ব বামফ্রন্ট সরকারের। কংগ্রেসের নয়। উপরন্তু বামফ্রন্ট ইন্দিরাকে হত্যা করেছে গুজব তুলে সরকারী বাস ট্রাম পোড়াতে ইতস্তত করেনি বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিয়ে কতিপয় সমাজবিরোধী। বিশেষ বিশেষ স্থানে দেখা গেছে লুটেরা নিকটবর্তী বস্তির বাসিন্দা সমাজবিরোধীরা যাদের বৃহৎ অংশেই হিন্দু নয়। এক্ষেত্রে মনে হয়েছে বিরোধটা হিন্দু-শিখের নয়। সুযোগবুঝে কিছু অন্য ধর্মাবলম্বীও লুঠের বখরা নিয়েছে।

প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে সব হিন্দু অথবা অহিন্দুকে শিখ উগ্রপন্থীরা হত্যা করেছে, যাদের সম্পদ লুঠ করেছে তাদের কিন্তু দরাজহাতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি কোন ক্ষেত্রেই। বিশেষ বিশেষ শ্রেণী বিশেষ বিশেষ সুযোগ ভোগ করবে এটা সংবিধান সম্মত নয়। প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

খোদ রাজধানীও উগ্রপন্থীদের হামলায় অস্থির।

এইসব উগ্রপন্থীদের গ্রেপ্তার করা গেছে এমন সংবাদ আজও জানা যায়নি। সশস্ত্র উগ্রপন্থীরা জনারণ্যে কি করে আত্মগোপন করল তা সাধারণ মানুষ ভেবে স্থির করতে পারেনি আজও। তাদের যারা আশ্রয় দেয় তাদেরও হদিশ করতে পারেনি। এ থেকে প্রশাসনের অক্ষমতা শুধু প্রমাণ হয় না। এটা সবার বিশ্বাস, যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়বে সেই সরষেতেই ভূত আছে। প্রশাসনের কোন একটা অংশ এদের সাহায্য করছে আত্মগোপন করতে এবং তাদের আশ্রয় দিতে। নইলে পর পর বহু মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলেও তার বিহিত আজ অবধি হয়নি কেন?

ট্র্যানজিসটার বোমা ফাটল। প্রাণ দিল বহু অভাজন যাদের সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক ছিল না কোন দিন। নিতান্ত দীন দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ, কোথাও ঝুপড়িতে, কোথাও কলোনিতে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে কষ্টার্জিত রোজানা আয়ে জীবন ধারণ করত তারাই এই চক্রান্তের বলি হয়েছিল। তাদের জন্য কে কতটা অশ্রুপাত করেছে তাও জানা যায়নি। কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অথবা কোন মন্ত্রী এইসব অভাজনদের জন্য কত শোকাশ্রুপাত করেছে তাও জানা যায়নি। এদের প্রাণের মূল্য কিভাবে নিরুপিত হয়েছে তাও অজ্ঞাত। এরা ক্ষতিপূরণ পেতে পারে কিনা সেটাও কি শিকেয় তোলা থাকবে চিরটা কাল। সংখ্যালঘুরা যে সুযোগসুবিধা পাবে সংখ্যাগরিষ্ঠরাও তার অংশীদার হবে না কেন! পৃথিবীর কোন সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এমন ব্যবস্থা আছে বলে কোন নজীর পাওয়া যায়নি। ভারতের মত দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে কোন শ্রেণী থাকতে

পারে না। একমাত্র তাদের পরিচয় ভারতীয়। প্রচলিত আইন কানুন এই বৈষম্য স্বীকার করে না। অথচ ভারতীয় রাষ্ট্রনেতৃত্ব কতটা পঙ্গু তার এও একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

কিন্তু মাকোয়ান আর অর্জুন সিংহকে প্রাণ দিতে হল কেন ?

সরকারী ভাবে না হলেও জনশ্রুতিতে জানা গেছে, ইন্দিরা হত্যার পর যারা শিখমেধ যজ্ঞে নেতৃত্ব দিয়েছিল এরা দুজন তাদের অন্যতম। ইন্দিরা হত্যার বদলা নিতে শিখ হত্যা যেমন অনৈতিক ও কানুন বহির্ভূত কাজ, তেমনি শিখ হত্যার বদলা নিতে এদের হত্যাও অনৈতিক ও কানুন বহির্ভূত কাজ। একটা অপরাধী বহু অপরাধীর জন্ম দেয় এই ঋষিবাক্য যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য তা বলা বাহুল্য। শিখ উগ্রপন্থীদের হাত থেকে বাঁচতে হিন্দু সুরক্ষা বাহিনী ও শিব সেনার আবির্ভাব এই রকমই একটি ভয়ঙ্কর পরিণতি।

শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে স্বাধীনতার পর কিন্তু আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের পথে একটুও আমরা এগোতে পারিনি। কেন পারিনি সেটা অবান্তর, কিন্তু যা হচ্ছে তারই মূল্যায়ন প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজন মেটাবে কে ? যারা প্রশাসক তারা গদী রক্ষায় যতখানি ব্যস্ত সেই অনুপাতে সামান্যতম ব্যস্ততা তাদের নেই সংহত ভারত গড়তে।

এইসব শুনে অমিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, অতঃপর !

পরে যে কি তা বলতে পারি না। এ চিন্তা সবারই। এরপর কি !

অমিয়া বলল, পানজাব হল ভারতের শস্যভাণ্ডার।

কারণ, পাঞ্জাবের রিফুজিদের জন্য অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করছে ভারত সরকার।

পাঞ্জাবে জন বিনিময় হয়েছে যা ইতিহাসের অতি নক্কারজনক অধ্যায়ের একটি কালো অংশ। তাই এই ছন্নছাড়া মানুষদের নতুন উপনিবেশ গড়তে যেমন অর্থ ব্যয় করছে সরকার, তেমনি ওরাও মুসলমানদের পরিত্যক্ত সম্পদ পেয়েছে, বিশেষ করে ভূমি। এই ভূমি ওদের ক্ষুধা মিটিয়েছে। সম্পদ সৃষ্টি করেছে। পঞ্চনদের ভূমি উর্বর। জল সরবরাহ, কঠিন পরিশ্রম পাঞ্জাবকে ধনধান্যে পরিপূর্ণ করেছে অথচ সম সংখ্যক বাঙ্গালী হিন্দুদের নতুন করে জীবন গঠনের সুযোগ যথেষ্ট দেওয়া হয়নি। বাংলার রিফুজিদের দেওয়া হয়েছিল দারিদ্র আর ভিক্ষাপাত্র। তারা এক ছটাক জমিও পায়নি নতুন জীবন গড়ার কাজে, বরং বলা যায় যারা কিছু সম্বল নিয়ে এসেছিল তারাই নানা বিশৃঙ্খলা ও কষ্টের মাঝে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে। সরকারী উদ্যোগ মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। এটাও বিচিত্র ব্যবস্থা। একই দেশে দুই প্রান্তের রিফুজিদের জন্য দুই ব্যবস্থা। এটা কতটা সমর্থনযোগ্য তা আজ সবাই ভাবতে বসেছে। সবাই ভাবছে। এরপর কি !

অমিয়া বলল, এতো শেষ নয়। ভারত সরকার ঘোষণা করেছিল, পাকিস্তান থেকে যারা ভারতে এসে বসবাস করবে তারা হবে ভারতীয়। এই

আশ্বাসে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মান-সম্মান ও জীবন রক্ষার আশায় এদেশে এসেছিল। অবশেষে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি অনুসারে স্থির হয় একাত্তর সনের মার্চ মাস অবধি যারা এদেশে আশ্রয় নেবে তারাই পাবে ভারতের নাগরিকত্ব। কিন্তু কার্যকালে তা কি হয়েছে?

বললাম, হয়নি। আসাম সমস্যা মেটাতে রাজীব গণপরিষদের সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন তা অতি অবমাননাকর। কোন সার্বভৌম রাষ্ট্র তার প্রতিশ্রুত চুক্তির বিপরীত কিছু করবে এটা কল্পনাও করা যায় না। অথচ তা হয়েছে। কেন? কংগ্রেসের স্বার্থে অথবা দেশের স্বার্থে সেটাই ভেবে দেখতে হবে। এতে আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা যে ভাবে স্থান করে নেবে তার আঘাত সহ্য করতে পারবে কি কেন্দ্রীয় সরকার! পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরায় বামপন্থী সরকার রয়েছে। কিন্তু অন্ধ্রে তেলেগুদেশম আঞ্চলিক দল, আসামেও গণপরিষদ আঞ্চলিক দল। এগুলো কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়েছে। পাঞ্জাব সহ কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, সিকিম—এদের ওপর কংগ্রেসের আধিপত্য প্রায় নিঃশেষ। কেরল ও জম্মুকাশ্মীরে জোড়াতালি দিয়ে সরকার পরিচালনা করতে কংগ্রেস নাজেহাল। সেই হারাধনের দশটি ছেলের মত একে একে সবাই যেতে বসেছে।

তবুও কেন্দ্রে তো কংগ্রেস শক্ত বুনিয়াদের ওপর অধিষ্ঠিত।

সেটাও হিন্দীওলাদের হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের প্রতি বিশেষ অনুরাগে সম্ভব হয়েছে। ওরা ভয় পেয়েছে, তাই হিন্দীওলারা পাইকারী হারে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। এবার ইন্দিরার প্রতি সহানুভূতির বাতাস ছিল পালে তাই স্রোতের টানে তর তর করে নৌকো ছুটেছে।

এখনও তো সংবাদপত্র সমূহ রাজীবের কেন্দ্রীয় সরকারের জয় গান করছে।

বললাম, স্বাধীন নিরপেক্ষ সংবাদপত্র বিরল। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা সংবাদপত্র পরিচালনা করে, মালিকানাও তাদের। মালিকের ইচ্ছাই ভাড়াটে সাংবাদিকরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলে জাহির করে। মালিকরা সরকারকে চটালে বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত হবে। মালিকরা সংবাদ ও মতামত প্রকাশ করে শাসকদের অসন্তুষ্টি যাতে না হয় সেজন্য। যারা বা যে দল ক্ষমতায় থাকে তাদের কোন সময় প্রত্যক্ষভাবে কোন সময় পরোক্ষভাবে তোষামোদ করে। বিশেষ করে কেন্দ্রের শক্তিকে এরা সমীহ করে, ভয়ে ও ভক্তিতে। নইলে, আচ্ছা থাক এ সব আলোচনা।

থাকবে কেন, বলেই শেষ কর। তোর হিসাব আমার হিসাব মেলে কিনা যাচাই করে দেখি। আমার মনে হয় ভারতের বিগত সকল প্রধানমন্ত্রীদের চেয়ে রাজীব বেশি জনপ্রিয় এবং জনদরদী।

তা তুই বলতে পারিস। বহুজনেরই সেই মত। পাঞ্জাবের ও আসামের দিকে সবাই তাকিয়ে রয়েছে। রাজীব অনুসৃত নীতি কতটা জনপ্রিয় এবং জনদরদী তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এই দুই রাজ্যে। যা বলেছিলাম, সেটা হল ক্ষমতাসীনকে তোষামোদ কি ভাবে করে থাকে তার নিকৃষ্ট উদাহরণ হল

কলকাতার কোন একটি সংবাদপত্র। এবা সর্বাধিক প্রচারিত অর্থাৎ জনমনে প্রভাব খুব বেশি। বোলপুর সংসদীয় নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র পেশ করেছিলেন অনেকে অথচ এই খ্যাতনামা পত্রিকা কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় অন্য কারও কথা বিস্তারিত না ছেপে ছাপালো সিদ্ধার্থশঙ্কর কি ভাবে কখন কোথায় মনোনয়ন পত্র পেশ করেছিলেন সেই সংবাদ ও ছবি। অথচ এই পত্রিকা সত্তরের দশকে অবিরাম সিদ্ধার্থশঙ্করের অপকীর্তি ফলাও করে ছেপেছে তার জন্য কঠিন দুর্ভোগ সহ্য করেছে। হঠাৎ এই পত্রিকা সিদ্ধার্থপ্রেমী হল কেন? শুধু তাই নয়, এদের সাংবাদিক গোষ্ঠী নির্বিচারে সিদ্ধার্থ মহিমা ঘোষণা করে চলেছিল নির্বাচনের দিন অবধি। অবশ্য সুফল কিছুই হযনি। প্রতিপক্ষ হল শক্তিশালী। তারাও ছেড়ে কথা কযনি। ফলে যা হল তাকে বলা যায় সিদ্ধার্থশঙ্করের রাজনৈতিক মৃত্যু। এবার জনসাধারণ কর্তৃক খারিজপ্রাপ্ত নেতাদের জন্য রযেছে রাজ্যপাল অথবা রাষ্ট্রদূতের পদ, সিদ্ধার্থশংকর এরই সাধনা করবেন।

অমিয়া বলল, সিদ্ধার্থকে কংগ্রেসে ফিরে আসতে দিয়ে মহাভুল করেছে রাজীব? এতে কংগ্রেসের ইমেজ নষ্ট হযেছে।

হেসে বললা, মোটেই না। সিদ্ধার্থ রাজনীতির ক্ষেত্রে অনুপযোগী। অবশ্য কংগ্রেস হল আযারাম-গযারামের কলোনী, সেখানে রাজনৈতিক চরিত্র ও আদর্শ তেমন বিরাট বিষয় নয। সিদ্ধার্থকে হাড়ে হাড়ে চিনেছিল ইন্দিরা গান্ধী। তাঁর জীবদ্দশায় সিদ্ধার্থ কংগ্রেসে দলে না পেযে 'একলা চল রে' এই নীতি অবলম্বন করেও কোন সুফল হযনি। নতুন একটা পার্টি গড়বার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। রাজীবের প্রশংসা করতে হয। এক ঢিলে দুটো পাখী মারার কায়দাটা ভালো করে দেখালো। সিদ্ধার্থকে কংগ্রেসের আঁস্তাকুড়ে জাযগা দিযে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করলেন, আবার তাকে ভোট যুদ্ধে জাযগা করে দিযে রাজনৈতিক ভবিষ্যত অন্ধকারে ঠেলে দিলেন। সিদ্ধার্থের নাম শুনলে এখনও পশ্চিম বাংলার লোক আঁতকে ওঠে। যে ভোট সিদ্ধার্থ পেয়েছে সেটা সম্ভব হয়েছে বোলপুরে কংগ্রেসের সংগঠন শক্তির কিছুটা অবশিষ্ট ছিল বলেই। নইলে সিদ্ধার্থকে ভোট দেবার মত চাটুকারের সংখ্যা খুবই কম।

সত্তরের দশকে আমরা ফিরে যেতে চাই।

দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি ছিল একটা অখ্যাত গ্রাম। কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত। যুক্তফ্রন্ট সরকার মহাকরণে শোভা পাচ্ছে। এমন সময় উত্তরবঙ্গের এই অখ্যাত গ্রামের কৃষকরা তাদের জমি নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করল। এরা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত চিরকাল, এবার তারা প্রতিবাদ মুখর। জমিচোর জোতদারদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হযে চোরাই মাল উদ্ধারে নেমে পড়ল। এই আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল তারা সবাই মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টির সদস্য এবং এদের সহযোদ্ধা চাষী ক্ষেতমজুর ইত্যাদি মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টির সমর্থক। কিন্তু নেপথ্য কাহিনী হল ক্ষমতার স্বাদ পেযেছে মার্কসবাদী কমুনিষ্টরা। অথচ

তারা ভারতীয় সংবিধানকে সম্মান করতে বাধ্য। সংবিধানের আওতায় থেকে এই জঙ্গী আন্দোলনকে সমর্থন করা দূরের কথা, এর বিরোধিতা করাই হল শ্রেয়। অবশ্য প্রথমে এই দল একে সমর্থন জানাবে স্থির করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর বিরোধিতা করতে নানা অপকাজের সঙ্গী হতে বাধ্য হয়েছিল। পীযূষ দাশগুপ্তের যে সব প্রবন্ধ 'বর্তমান' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বের হয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট যে মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টি নকশালবাড়ির 'এই আন্দোলনকে দমন করতে মার্কসকে বাদ দিয়ে যে শোধনবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার পশ্চাতে ছিল উগ্র ক্ষমতা লিপ্সা অথচ এই নেতারা এককালে 'বিপ্লব'-এর মধুর বাণী শুনিয়ে তরুণ সমাজকে উত্তপ্ত করতে কখনও ত্রুটি করেনি ' বর্তমানে তাদের এই বাণী দেওয়ালে লেখা হয় কিন্তু দেওয়াল পেরিয়ে তরুণ মনে সারা জাগায় না। ভোঁতা হয়ে গেছে তাদের বহু উচ্চারিত বাণী। এখন এরা ভোটের কাঙ্গাল।

ইন্দিরা নকশালবাড়ির অবস্থাকে সিঁদুরে মেঘ মনে করে প্রস্তুত হলেন। কংগ্রেসকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ছলাকলার আশ্রয় নিয়ে ভেঙ্গে দিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকার। কংগ্রেস তার কিছু স্তাবক নিয়ে সরকা গড়ল। আবার নির্বাচন। এবারও হার মানল কংগ্রেস, আবার যুক্তফ্রন্ট সরকার কায়েম হল। ইন্দিরা হার মানার মত লোক নয়। নকশালবাড়ির আন্দোলন এবার ভাল করে দানা বাঁধলো। বেঘোরে পড়ল অজয়বাবু। অজয়বাবু মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লীর সঙ্গে সাক্ষাত যোগাযোগে অজয়বাবু মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে জনমত যাচাইয়ের আবেদন করলেন।

নির্বাচন হল না।

রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম হল।

সিদ্ধার্থশঙ্কর ইন্দিরা গান্ধীর অতি প্রিয়জন। কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী। ইন্দিরা তাকেই পাঠালেন পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করতে। উদ্দেশ্য বিরোধীদের ধ্বংস করা এবং কংগ্রেসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

ইন্দিরা তার এই মহৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গীরূপে সিদ্ধার্থকে পেয়েও কার্যসিদ্ধি করতে পারলেন না। সিদ্ধার্থশঙ্কর হিংসা দিয়ে কংগ্রেসী রাজত্ব কায়েম করার মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলেন, দলে দলে তাজা তরুণ জীবন নির্বাপিত হল পুলিশী ব্যবস্থায় ও ঘাতকের হাতে। এই কার্যে তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর হয়েছিল তৎকালীন পুলিশ কর্তাদের বিশেষ কয়েকজন যারা ইতিহাসে ঘৃণ্যজীব বলেই পরবর্তীকালে জনসাধারণের কাছে পরিচিত। সিদ্ধার্থশঙ্কর হিংসাকে যেমন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তেমনি নিজের দলের মধ্যে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসকে রসাতলে দিয়েছিলেন। বরানগর, কাশীপুর, বারাসতের হত্যাকাণ্ড-ই শেষ কথা নয়। মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টির এগার শতাধিক কর্মী হত্যা সিদ্ধার্থশঙ্করের মহান কীর্তি। এমন সন্ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর যার ফলে সমাজবিরোধী ও পুলিশের হাতে নিহত সন্তানের জননী উচ্চস্বরে

কাঁদতে সাহস পেত না। কোন পিতা বা ভ্রাতা মর্গ থেকে নিহতদের লাশ নিয়ে আসার সাহস পেত না। কেউ মুখ খুলে কথা বলতে সাহস পেত না। বিশেষ করে যাদের ঘরে জোয়ান ছেলে ছিল তারা ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। যারা মৌখিক প্রতিবাদ করেছে তাদের স্থান হয়েছিল জেলখানায়।

সমাজে যা কিছু শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ ছিল সিদ্ধার্থশঙ্কর তা ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে মোটেই দ্বিধা করেননি। কংগ্রেসকে ক্ষমতায় রাখতে ইন্দিরা ও সিদ্ধার্থশঙ্করের পশ্চিমবঙ্গের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পাপ ও দুর্নীতি প্রবেশ করিয়ে আত্মপ্রসাদ নিশ্চয় লাভ করেছিল কিন্তু তার পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর তা পাঁচটি বছর অতিবাহিত হবার পর সবার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

জরুরী আইন জারী করেছিলেন ইন্দিরা। ক্ষমতা পাগল ইন্দিরা এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে নস্যাৎ করে গদী দখল রাখার যে খেলায় মেতে ছিলেন তাকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর এবং তারই পরামর্শে ইন্দিরা দেশে জরুরী অবস্থা জারী করে ধাপে ধাপে নানা আইনকানুন ও নির্দেশ দিয়ে সাধারণ মানুষের স্বাধীন সত্তাকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছিলেন।

শোনা যায় ভারতের প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিমান ব্যারিস্টারদের অন্যতম হলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর। তার খ্যাতি অর্থের কৌলিণ্যে অথবা জ্ঞানের ও বুদ্ধির কৌলিণ্যে বিচার করা দরকার। অর্থের কৌলিণ্য তার আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধির কৌলিণ্য আছে এমন দাবী কেউ করতে পারে না। ইন্দিরাকে জরুরী অবস্থা জারীর পরামর্শ দেওয়াটা যদি বুদ্ধির পরিচয় হয় তা হলে তা হবে সর্বনাশা বুদ্ধি। আর শাহ কমিশনের সামনে সিদ্ধার্থ যে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ইন্দিরার বিরুদ্ধে তাতে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার শূণ্য তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

সিদ্ধার্থশঙ্কর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের দৌহিত্র। দেশবন্ধুর একমাত্র পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। সিদ্ধার্থ-ই একমাত্র দৌহিত্র নয়, দেশবন্ধুর আরও দৌহিত্র রয়েছে। তাই জন্মসূত্র নিয়ে গর্ব করার কিছু থাকা উচিত নয়। দেশবন্ধুর ত্যাগ, মেধা, বিরাটত্বকে মূলধন করে তার এই দৌহিত্র বাজার জয় করার চেষ্টা করেছেন অনেকবার কিন্তু কোন বারই সাফল্য লাভ করেননি, কিছু স্তাবক থাকলেও অনুগামীর সংখ্যা নগণ্য। কোন সময় আমার ঠাকুর্দা ঘিয়ে খেয়েছিলেন আজ আমি নিজের হাতে শুঁকে সেই ঘিয়ের গন্ধ যেমন পাইনা তেমনি দেশবন্ধুর ত্যাগ, মেধা, দেশপ্রেম, বিরাটত্ব সিদ্ধার্থশঙ্করের হাত শুঁকলে পাওয়া যাবে না। টাকা থাকলেই মানুষের ভালবাসা পাওয়া যায় না। বহু-জনকে খ্যাতির সিঁড়িতে পা ফেলতে দেখেছে দেশের লোক, নীতিহীনতায় যখন এরা ভারসাম্য রাখতে পারেনি তখন তারা তলিয়ে গেছে। উপেক্ষা ও অবহেলাই তারা পায়নি, ঘৃণা ও ধিক্‌কারও পেয়েছে। মসীলিপ্ত হয়েছে তাদের নাম।

সিদ্ধার্থশঙ্করের সহযোগীদের প্রায় সর্বাংশই চাকুরিজীবি এবং ওপরওলার

আদেশ প্রতিপালন তাদের কর্তব্য কিন্তু তারা যে আইনের দাসত্ব করতে বাধ্য এটা প্রায় সবাই বিস্মৃত হয়ে নরহত্যা যেমন করেছে, তেমনি দুর্নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা উপার্জন করেছে। দলীয় রাজনীতির বটবৃক্ষ-তলে তারা নিশ্চিন্ত। তবুও কিছু করণীয় ছিল পরবর্তী বামপন্থী সরকারের। তদন্ত কমিশনে বহু তথ্য উদঘাটিত হলেও অতি বিপ্লবী বামপন্থী দল, বিশেষ করে মার্কসবাদী কমুনিষ্টরা ইন্দিরা গান্ধীকে ক্ষমতায় ফিরে আসতে দেখে গদী হারাবার ভয়ে তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট যেমন ধামাচাপা দিয়েছে, তেমন যারা শাস্তিযোগ্য তাদের সাদরে বুকে টেনে নিয়ে তাদের রাজত্বে ওই সব নরপিশাচদের অবাধ বিচরণের সুযোগ দিয়েছে।

মার্কসবাদী কমুনিষ্টরা তাদের মাননীয় সদস্য কমল সরকারের উপর যে অকথ্য উৎপীড়ন হয়েছে জরুরী অবস্থাকালীন তা বেমালুম হজম করেছে অথবা করতে বাধ্য হয়েছে। ইন্দিরাকে গদীতে বসতে দেখে তাদেরও ভাবতে হয়েছে, এরপর কি? গদী অথবা বিপ্লব? গদীতে বসলে গদা সঞ্চালন যত সহজ, বিপ্লবের বুলি শোনানো সহজ হলেও বিপ্লবের দায়িত্ব নেওয়া মোটেই সহজ নয়। তাই তারা সহজ সরল পথে মার্কসকে বাদ দিয়ে শোধনবাদের সুশীতল ছত্রতলে আত্মগোপন করতে দ্বিধা করেনি।

সিদ্ধার্থ মনে করেছিলেন আবার সে কংগ্রেসে স্থান করে নেবে কিন্তু ইন্দিরা তার কংগ্রেসে কোন ক্রমেই স্থান দিতে রাজি হননি। অবশ্য কংগ্রেস বলতে আজ যা আছে তা কংগ্রেস নয়। কংগ্রেস কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। ছিল সবার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র যেখানে গান্ধীবাদী, সমাজবাদী এমন কি সাম্যবাদীদের স্থান ছিল কারণ তখন কংগ্রেসকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্লাটফরম মনে করা হত। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম করতে হয়েছে সমগ্র ভারতবাসীকে। সেই কংগ্রেসের মৃত্যু ঘটেছে যখন কংগ্রেসীরা নিজেদের রাজনৈতিক দল স্থির করে ক্ষমতালাভের জন্য মরণপণ যুদ্ধ করছে তাদের কাজে বিপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে দ্বিধা করেনি। আজ কংগ্রেস গান্ধীজি প্রদর্শিত পথে চলছে না এটা কতকগুলো কংগ্রেসের নামধারী বামন দলের সমাহার মাত্র। (In place of Gandhiji, today you have pygmies leading the Congress.—Minoo Masani.) প্রাক-স্বাধীনতা যুগে কংগ্রেস যা ছিল আজ তার অনু মাত্র নেই। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে কংগ্রেসীরা ত্যাগ স্বীকার করেছে দেশের জন্য, মুক্তির জন্য, জনসাধারণের জন্য আর আজ স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসীদের কাজ হল ত্যাগ নয়, গ্রহণ। তারা আকণ্ঠপূর্ণ করে নেবার ধান্দায় রয়েছে। এরকম কংগ্রেসে সিদ্ধার্থশঙ্করের মত আদর্শহীন ব্যক্তিই স্থান করে নিতে পারে, সাময়িক বিফল মনোরথ হলেও, হয়েছেও তাই। তারপর কি?

লোকসভায় উপনির্বাচন বোলপুরে। সিদ্ধার্থশঙ্কর এর সুযোগ গ্রহণ করলেন। লণ্ডন থেকে উড়ে এসে রাজীব ভজনা করে কংগ্রেসের মনোয়ন লাভ তথা

কংগ্রেসের সদস্যপদ লাভ হল তার ইহলোকের বড় প্রাপ্তি। ইন্দিরার মৃত্যুর পর সব কিছুই ওলটপালট হতে আরম্ভ করেছে। ইন্দিরা কংগ্রেসের রূপও বদলেছে। সিদ্ধার্থ সিদ্ধলাভ করলেও জনসাধারণ তাকে গ্রহণ করেনি।

জনসভায় সিদ্ধার্থশঙ্কর ঘোষণা করলেন, আমি পনর দিনের মধ্যে নকশাল আন্দোলন দমন করেছি, আমি লোকসভায় গেলে মার্কসবাদী কমুনিষ্টদের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গের নির্যাতীত মানুষদের রক্ষা করতে পারব। এতবড় চাটুবাক্যও কেউ মেনে নেয়নি। নকশাল আন্দোলন সিদ্ধার্থশঙ্কর দমন করতে পারেননি। তার প্ররোচনায় কিছু তরুণকে প্রাণ দিতে হয়েছে মাত্র। আর কমুনিষ্টদের নির্যাতন থেকে পশ্চিম বাংলার মানুষকে রক্ষা করার শপথ নিয়ে সিদ্ধার্থশঙ্কর তার শাসনকালে এগার শত কমুনিষ্ট নিধন ঘটিয়েও সাতাত্তর সালেও দেখা গেছে কংগ্রেস প্রায় নির্বংশ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আর নকশাল আন্দোলন নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তারলাভ করে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছে যার জন্য বামপন্থী সরকারও পুলিশের নকশাল 'বিশেষ সেল' গঠন করে একজন পাকা বুরোক্র্যাটের হাতে তার দায়িত্ব দিতে বাধ্য হয়েছে।

সিদ্ধার্থশঙ্করের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। কংগ্রেসের সদস্যপদ লাভ করেছেন। উপনির্বাচনে মনোনয়ন পেয়েছেন। লড়াই ভালই জমেছিল। তবে দেশের লোক তাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। মনে হয় রাজীবেরও মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে, বোধহয় তার ইচ্ছা ছিল সিদ্ধার্থশঙ্করকে রাজনৈতিক মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেওয়া। নইলে সুলতানের প্রাসাদে ধন্না দিয়েও তার সাক্ষাৎ না পেয়ে সিদ্ধার্থশংকর সোজা লণ্ডন পাড়ি জমালেন কেন! সিদ্ধার্থ সব পারে। রং বদলে কমুনিষ্টদের আশ্রয়ে গিয়ে নির্বাচন জিতে আবার কংগ্রেসে গিয়ে কমুনিষ্ট নিধনে নেমে কলংকিত দৃষ্টান্ত স্থাপন কম লজ্জার নয়। আবার কংগ্রেসের মনোনয়ন না পেয়ে দার্জিলিং এ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করে হার মানার পরও কংগ্রেসের সদস্যপত্রের জন্য লালায়িত হওয়া কম মানসিক শক্তির পরিচয় নয়।

ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। ইন্দিরার কংগ্রেস দাবী করে তারা গণতান্ত্রিক দল। বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসকে তার 'পকেট পার্টি' করে তুলেছিলেন তার জীবিত কালে, সেই ঐতিহ্য এখনও চলছে। প্রধানমন্ত্রী হলেন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। তার দয়াতে রাজ্যে রাজ্যে যেমন মুখ্যমন্ত্রী বদল হচ্ছে, তেমনি রাজ্যে রাজ্যে বদল হচ্ছে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট। 'আজকে যে গো রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়।' অর্থাৎ সব কিছুই একজনের মর্জির ওপর নির্ভর করছে। ইনি হলেন শাহানশাহ ভারতের প্রধানমন্ত্রী। কংগ্রেসের পতনের মূলে রয়েছে এই স্বৈরাচারী ব্যবস্থা। একটা সর্বভারতীয় দল, তার রয়েছে সংবিধান অথচ সেই সংবিধান অনুসারে বিগত চোদ্দপনর বছর যাবত কোন নির্বাচন হয়নি। যাদের পার্টির কর্তা করে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে তাদের সব সময় তাকিয়ে থাকতে হয় দিল্লীশ্বরের মুখের দিকে। দিল্লীশ্বর তার স্বনিযুক্ত

স্তাবকদের পরামর্শ অনুসারে কখন কার শিরোচ্ছেদ ঘটাবেন তা জানা নেই। সবাই ক্ষমতা হারাবার ভয়ে অস্থির। এরকম একটি দল কখনও কায়বৃদ্ধি করতে পারে না, পারবেও না। (The Party elections used to be the prime mover of its activities in our time. How can a party leader function if the authority vested in him by the party Constitution is not given him ?—Atulya Ghosh.) অতুলবাবু এইটুকু বলেই থামেননি। কংগ্রেস সাধারণ মানুষের চক্ষে ক্রমে ক্রমে হেয় হলেও, বর্তমানে যে সব তরুণ কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে বেড়াচ্ছে তাদের কংগ্রেস সম্বন্ধে কি গভীর জ্ঞান ও অনুরাগ তা প্রতিভাত হয় এইসব তরুণদের কংগ্রেস সম্বন্ধে বক্তব্য থেকে। এরা বলে থাকে কংগ্রেস বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন সুরেন ব্যানার্জি। (The youngman who was the main organiser said, the Congress was founded in Bombay. Suren Banerji, he said, was the first Congress President. —Atulya Ghosh.) এই কংগ্রেস আজ আর সেদিনের কংগ্রেস নয়। কংগ্রেসের নাম মূলধন করে ডিভিডেণ্ট পাচ্ছে কিছু অসৎ লোক।

এমন একটি কংগ্রেসের মনোনয়ন পেয়ে সিদ্ধার্থশঙ্কর কৃতার্থ হলেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে তার শ্রেণী চরিত্রদের শেষ কথা বলেছেন, ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এছাড়া ভিন্ন তার বলারও কিছু আর ছিল না।

অমিয়া গাড়ি থামিয়ে বলল, আর নয়, এবার পায়ে হেঁটে চল।

চলতে চলতে শহর কলকাতার রাজপথের একটি গলির সামনে আসতেই বাধা পেলাম। একজন ভিখারী পথ রোধ করল।

হরে কৃষ্ণ কিছু পাই মা।

অমিয়া ব্যাগ খুলে দশটা পয়সা তার হাতে দিল।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম।

অমিয়া আমার দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে বলল, কি ভাবছিস ?

ভাবছি। না, এমন কিছু না। তবে তোর দান বড়ই কটু লাগল।

কেন ?

জানি না। তবে যে দেশের প্রায় পঞ্চাশ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে সে দেশে এই দান নিছক ব্যঙ্গ। অবশ্য আমরা হিন্দু। দান আমাদের ধর্মের অঙ্গ। আমাদের কেন, মুসলমানদের 'জাকাত' মানে দানের জন্য অর্থ সঞ্চয় ধর্ম। কৃশ্চানরাও দানকে মহৎ বৃত্তি মনে করে। কিন্তু দানের কড়ি কি কখনও সমাজকে দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে। যে হরির নাম করে ভিক্ষা চায়, সেই হরির ওপর ওদের বিশ্বাস আছে বলে মনে হয় না।

তবুও ওরা হরির নাম করেই ভিক্ষা চায়। মুসলমান অন্ধখঞ্জ ভিখারীরাও 'আল্লা তোমার মঙ্গল' করবে বলেই ভিক্ষা চায়। এই যে নামের মহিমা এটাতে

ওদের বিশ্বাস যদি নাও থাকে তবুও আশ্রয় বলে মনে করে। দাঁড়া তো। দেখছিস না মেয়ে মদ্দতে ফুটপাতে লড়াই আরম্ভ করেছে।

দাঁড়িয়ে রইলাম। চেষ্টা করলাম ওদের বক্তব্যগুলো অনুধাবন করতে।

অমিয়া বলল, কি ভাবছিস?

ভাবছি এরা ঘরবাড়ি ছেড়ে এসে ফুটপাতের জমিদারী নিয়ে কেমন লড়াই করছে। ওই যে কালো মতো রোগা মেয়েটা। কি দাপট দেখ। পাশে বোধহয় ওর স্বামী।

নারে, ওর কেমন চুল ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে মেয়েটা। স্বামী হলে ওর গায়ে হাত তুলতো কি!

তা বটে। আর দেখে কাজ নেই। এবার উল্টো দিকের ফুটপাতে যাই।

উল্টো দিকের ফুটপাতে এসে দম নিয়ে বাঁচলাম। ওপারের ফুটপাতে বেশ ভীড় জমে গেছে। সবাই দেখছে, কৌতুক অনুভব করছে। আটদশটা মেয়ে পুরুষে কি কারণে ঝগড়া লড়াই করছে তা জানার চেষ্টা করছে না কেউ। কিছু দূরত্ব রক্ষা করে সবাই এই তামাসা উপভোগ করছে।

ক'মাস আগে শ্যামলী নিয়ে এসেছিল তারই বয়সী একটা মেয়ে। বাড়ির কাজের লোক। রাস্তা থেকে ডেকে আনেনি। কাজ খুঁজতে এসেছিল। তাকে যাচাই করতে হাজির করেছিল আমার সামনে। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোমার নাম কি? বলেছিল, মালতী।

এরপর অনেক প্রশ্ন করেছিলাম।

তোমার স্বামী কি করে?

স্বামী আমাকে ছেড়ে গেছে। রেসকা চালায় বাবু।

কেন ছেড়ে গেল?

খেতে দিতে পারত না। রেসকা চালিয়ে যা পেত তা উড়িয়ে দিত চোলাই খেয়ে। ঝগড়া হত। পরপর কদিন খুব মেরেছিল। ফুটের সবাই সালিশী করে আমাকে ছাড়িয়ে দিল।

তোমার বাবার কাছে যাওনি কেন?

বাবা। জানেন বাবু, দখিণের লোক বউ নিয়ে ঘর করে না। কি করে করবে। সারা বছর পেট ভর্তি খেতে পায় না তারা। খেতে দেবে কি করে তার বউ ছেলেমেয়েদের। আমার মাকেও বাবা ছেড়ে পালিয়েছিল। বাবার কথা মনেই পড়ে না। পাথর প্রতিমায় নাকি থাকে। কোন গাঁয়ে তা জানি না। আমাদের কারও কোন জমিজমা নেই। পেটের দায়ে আমার মায়ের মত অনেকেই এসে ফুটপাতে ঘর বাঁধে। দেখতেই তো পান ফুটপাত ভর্তি হচ্ছে। এরা আসছে ওই বাদার মাটি ছেড়ে। না আছে ঘর, না আছে সংসার। ফুটপাতেই আমাদের বিয়ে, ফুটপাতেই আমাদের ঘরসংসার।

মা আমাদের দুটো বোন আর দুটো ভাইকে নিয়ে এসেছিল। বাবুদের বাড়িতে বাসন মাজতো। আমরা কয়লা কুড়োতাম, ভাইরা কাগজ কুড়োত

তারপর বড় হলাম। ভাইয়েরা কে কোথায় চলে গেল কেউ জানে না। আমাদের দুই বোন সেয়ানা হতেই নজর পড়ল মহল্লার ছেলেদের। আমাদের বাঁচাতে আমার বিয়ে দিল ওই রাজেনের সঙ্গে আর ছোট বোন পালিয়ে গেল খলিলের সঙ্গে। তবুও সে ভাল আছে বাবু। রাজাবাজারে থাকে, আর আমারই কপাল পোড়া।

কিছুক্ষণ থেমে মালতী বলেছিল, পেট তো শোনে না বাবু, বাদার বউদের তাড়ায বরেরা। এটা কেমন একটা রেওযাজ। পেটের দায়ে ফুটপাতে পড়ে থাকি। ছোটবেলায বাজারের পচা তরকারী কুড়িযে আনতাম। মা বাবুদেব বাড়ি থেকে রুটি মেঙ্গে আনত। সেগুলো শুকিয়ে গুঁড়ো করে জলে গুলে খেতাম, তার সঙ্গে মা সেদ্ধ করে দিত ওই সব আনাজতরকারী। এই খেয়েই তো বেঁচে ছিলাম। বড় হলাম। যাক ওসব কথা। কাজ করতে বেরিয়েছি, কাজ পাব কি?

মালতীকে কাজ দেবার সুপারিশ করেছিলাম। কাজও করত। সকাল-বেলায় এক পাঁজা বাসন মাজা, কাপড় কাচা সব কাজই করত।

একদিন শ্যামলী এসে বলল, মালতী আর কাজ করবে না দামুকাকা।

কেন?

মালতী আবার বিয়ে করবে। একবার বিয়ে করে ওর সখ মেটেনি আবার বিয়ে করতে চায। পাত্রটি মন্দ নয। কোন কাজ নেই, বোধহয মোট বযে পযসা কামাই করে। মালতী বলল, ভাল ছেলে, চোলাই খায না। বিড়িটিড়ি টানে।

হেসে বললাম, উপযুক্ত পাত্র। চালচুলোর খোঁজ নেই অথচ বিযে। তবে কি জানিস, মানুষ চিরকাল মানুষ। ভাল মন্দ সব কিছু নিযেই মানুষ। মানুষ তো তার জৈব প্রয়োজনগুলো গলা টিপে মারতে পারে না। সব সমযই হার মানতে হয। জওযান মেয়ে বিপথে না গিয়ে আবার যে ঘর বাঁধতে চায এটা ভাল লক্ষণ। শতকরা আশীটা ক্ষেত্রেই এরা নিজেদেব রক্ষা করতে পারে না।

শ্যামলী বাধা দিয়ে বলল, ঘর কোথায় যে বাঁধবে? গাঁটছড়া বেঁধে ফুটপাতেই যাবে।

হেসে বললাম, শহরতলীর মানুষ আমরা। শহরের ফুটপাতে ওরকম গাঁটছড়া বাঁধা হাজার হাজার মেয়ে পুরুষকে দেখতে পাবি। ওরাই আমাদের আসল ভারত, ওরাই হল ভারতের ভবিষ্যত। এদের কাছে ন্যায়নীতি আশা করা মূর্খতা। এদের শিক্ষাদীক্ষা দেবার যাদের দায়, তারা মুখ ঘুরিযে থাকে, এদের আহার্যের সংস্থান করে দেবার দাযিত্ব নেয না সমাজ ও রাষ্ট্র। এরা কি করবে, এদের ভবিষ্যত কি! আমরাও জানি না, ওরাও জানে না।

কে এর জন্য দায়ী?

দায়ী রাষ্ট্র পরিচালকরা। এই তো কদিন আগে এককালীন প্রধানমন্ত্রী চরণ সিংহ বলেছিল, "I blame Nehru and his daughter Indira Gandhi

for all the ills from which the country suffer today as these two persons ruled this country for about four decades and their policies went wrong at every step."—এর পর কি বুঝিয়ে বলতে হবে এইসব ফুটপাতের বাসিন্দাদের দুঃখ দুর্দশার মূলে কে! কিন্তু ভাবছি, এরপর কি!

কদিন পরে মালতীকে সঙ্গে করে শ্যামলী আমার ঘরে ঢুকেই বলল, একে চিনতে পার কাকা?

মালতীর নতুন চেহারা। হাতে কয়েক গোছা কাঁচের চুড়ি, কপালে টিপ, মাথায় সিঁদুর। তেলে জবজবে মাথা, অর্ধেক মাথা ঘোমটায় ঢাকা, পায়ে ফুটপাতের সস্তা দামের সৌখীন চটি, পরণে ছাপা শাড়ি, তার সঙ্গে ম্যাচ করা ব্লাউজ। মালতীর নতুন চেহারা। মালতী দেখতে খুব মন্দ নয়, কমনীয় চেহারা। ভালই লাগল দেখতে। বললাম, চিনেছি। তা ভাল, কদ্দিন হল তোমার বিয়ে?

মালতী লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। তার শ্যাম বরণে আলতার ছোপ পড়ল। বেশ সলজ্জভাবে বলল, এগার দিন হল।

তোমার বর কোথায়?

বাইরে বসে আছে।

ডেকে আন। দেখি কেমন বানিয়েছে।

মালতী ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। শ্যামলী মৃদু হেসে বলল, তোমার ভীমরতি ধরেছে কাকা। তোমার সখের বলিহারী। জোড়ে দেখতে চাও। বাবাঃ।

মালতীর পেছন পেছন ঘনকৃষ্ণবর্ণ সবল সতেজ একটা জওয়ান ছেলে ঘরে ঢুকেই প্রণাম করল। তার দেখাদেখি মালতীও প্রণাম করল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি নাম তোমার?

আজ্ঞে সতীশ।

থাক কোথায়?

আজ্ঞে সোনারপুর।

কি কর?

ভ্যান চালাই। নিজের নয়। চুক্তিতে চালাই।

আর কিছু জানার দরকার নেই। মালতী আর সতীশ। এরকম জোড় বাঁধা মানুষ নেমে পড়ে সংসারে লড়াই করতে। তারপর একদিন লড়াইয়ের ময়দানে হার মেনে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। নতুনত্ব কিছু নেই। শ্যামলীকে বললাম, মালতীকে একখানা শাড়ি কিনে দাও। আর সতীশকে মিষ্টি খেতে দশটা টাকা দিও।

মালতী ও সতীশ প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।

শ্যামলী আমার প্রস্তাব সুস্থ মনেই গ্রহণ করেছিল।

আরও কয়েক মাস পরে শ্যামলী এসে বলল, মালতী ফিরে এসেছে কাকা। বাড়ির কাজ করতে চায়।

বললাম, সে কি! সে তো ঘরসংসার করছিল। আবার বাড়ির কাজ কেন?

সতীশ পালিয়েছে কাকা। মালতীর কপালে আর স্বামীর ঘর নেই। দু-দুবার বিয়ে করেও ঘর পেল না। সতীশ যাবার সময় মালতীর কাপড়জামা সব নিয়ে পালিয়েছে। এক কাপড়ে এসে হাজির হয়েছে। ওদের বিয়েও যেমন, তালাকও তেমনি। না আছে সমাজের বাঁধন, না আছে আইনের বাঁধন। এদের পরিণতি যে কি তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

সতীশের বউ পলাবার ক্ষমতা থাকলে পালাতো না। ওরা কি সংসার চায় না? চায়। কিন্তু রক্ষা করতে পারে না। পুরুষরা দারিদ্র্যের কশাঘাতে বউ ছেড়ে পালাতে পারে, মেয়েরা আশায় আশায় দিন কাটায় তারপর একদিন কোথায় তলিয়ে যায়। ওদের বাঁচার মত লড়াই করার শিক্ষাদীক্ষা থাকে না, তাই সহজেই বাস্তবের কষাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়। কপাল চাপড়ায় আর আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজেকে ভাগ্যের বলী স্থির করে মাটির বুকে হামাগুড়ি দিতে দিতে নর্দমায় গিয়ে পৌঁছয়।

কিন্তু ওরা তো এর জন্য দায়ী নয়।

কে দায়ী তা আমরা জানি। ভারতের দুঃখ দুর্দশার মূল রয়েছে রাষ্ট্র ব্যবস্থার মানবতাবোধহীন কার্যকলাপ। একদিকে সামান্য কিছু মানুষের অগাধ সম্পদ সৃষ্টি হয়ে চলেছে, অপরদিকে কোটি কোটি মানুষ এই ভাবে নেমে চলেছে অধঃপতনের শেষ সীমায়। যারা স্রষ্টা এই দুরবস্থার তারা মিথ্যাবাদী, অনাচারী, ব্যাভিচারী মনুষ্যত্ববোধহীন। ভবিষ্যতে বংশধরেরা তাদের কখনও ক্ষমা করবে না। সতীশ চিরকাল এরকম ছিল না, ছিল ওদের ঘরবাড়ি জমিজমা সুখের সংসার। ওদের বঞ্চিত ও শোষিত করে ওদের ছাড়পাত্তরা বের করে দিয়েছে উপরতলার মানুষরা, তারপর ওদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে নরকের পথ। দৈনিক প্রয়োজনেই ওরা জোড় বাঁধে না। সংসার করার মধুর স্বপ্নও ওরা দেখে। কিন্তু ওরা সংসার গড়তে পারে না। এটাই হল বাস্তবজীবনের পরিহাস।

শ্যামলী আজ আর কোন যুক্তিতর্ক উত্থাপন করল না। মালতীর চরম দুর্দশা ওকেও ব্যথিত করেছিল। নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমিয়াকে বলেছিলাম মালতী সতীশের কাহিনী। এমন সহস্র সহস্র কাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভারতের কন্দরে কন্দরে। কলকাতার ফুটপাতে গৃহহীনদের ভীড় দেখে শঙ্কিত হই। এর চেয়েও কম ভয়ঙ্কর নয় মহারাষ্ট্রের রাজধানী বোম্বাই। ভারতের অন্যতম ধনাঢ্য জনের সমাবেশ এই নগরে। ঝুপড়ি আর ঝুপড়িতে ভরে উঠেছে এই শহর। দরিদ্র মারাঠী, গুজরাতি, সিন্ধি আর কংকোনীদের ভীড় জমেছে ফুটপাতে ফুটপাতে। তাদের উচ্ছেদ করতে বোম্বাই পুরসভার নতুন কর্তা শিবসেনারা ফতোয়া জারি করেছে। শহরকে কাঙ্গালীমুক্ত করতে হবে। ঝুপড়ি হঠাও, কাঙ্গালী হঠাও। হটাবার পর এরা যাবে কোথায়? সে প্রশ্ন অবান্তর। হঠাও আর হঠাও জিগীর ছাড়ছে পৌরপিতারা। কলকাতার প্রশাসন ও পৌরপিতারাও হঠাও হঠাও জিগীর

তুলেছে। ঝুপড়ি হঠাও, কাঙ্গালী হঠাও, ফেরিওলা হঠাও। সব হঠাও। হঠাও হঠাও করতে করতে একদিন নিজেরাও হঠে যেতে পারে সে কথা ওরা ভুলে গেছে।

ওরা কারা ? পশ্চিম বাংলার গৃহহীন, অনাহারীরা যেমন ভীড় করেছে, তেমনি বিহারের গৃহহীন, অনাহারী লোকেরাও ভীড় করেছে কলকাতার ফুটপাতে। পশ্চিম বাংলার মানুষের কর্মস্থান হচ্ছে না কারণ বিহারের অতি দরিদ্র অন্ত্যজ শ্রেণী ও মুসলমানেরা নিজের রাজ্যের উচ্চবর্ণ ও অর্থবানদের অত্যাচারে গৃহহারা হয়ে ছুটতে ছুটতে কলকাতার ফুটপাতে এসে হাজির হয়েছে। বোম্বাই শহরে এই ভাবেই জমায়েত হয়েছে গৃহহীন অন্নহীন মারাঠা। মারাঠীরা দাবী করছে বোম্বাই তাদের শহর। যারা মারাঠী নয় তাদের প্রতি ধীরে ধীরে বিদ্বেষ জন্মাচ্ছে। কলকাতাও বাঙ্গালীদের শহর, অবাঙ্গালীদের প্রতি বিদ্বেশ ও ঘৃণা ক্রমেই ছড়াচ্ছে। মহারাষ্ট্রে গড়ে উঠেছে শিবসেনা, পশ্চিমবঙ্গেও দানা বাঁধছে আমরা বাঙ্গালী। কে কতটা অগ্রসর হবে সেটা ইতিহাস বলবে তবে সুসংহত ভারতবর্ষের পক্ষে এটা অভিশাপ। এই অভিশাপ মুক্ত হওয়া তখনই সম্ভব যখন ভারতের প্রতিটি মানুষ দারিদ্র সীমার ঊর্ধে উঠতে পারবে।

অমিয়া মালতী-সতীশের কাহিনী শুনে কোন মন্তব্য করেনি। আজ দুজনে যখন কলকাতার পথ ধরে চলছিলাম তখন অমিয়া ফুটপাতের জমিদারদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, এরাও তোর সেই সতীশ-মালতীর গোষ্ঠী। এদের ডেকে যদি প্রত্যেকের ইতিহাস শুনিস তা হলে দেখবি সতীশ-মালতীতে গোটা ফুটপাত আর ঝুপড়ি ভর্তি। তবে একটা কথা মনে রাখিস। এদের কোন ধর্ম নেই। পাশাপাশি হিন্দু মুসলমান-কৃশ্চান যেমন বাস করছে তেমনি বাঙ্গালী, খোট্টা, উড়িয়া, তেলিঙ্গা। সব ধর্ম ও সব জাতের এমন সমাহার একমাত্র কলকাতায় পাবি। বিহারীর সঙ্গে জোড় বেঁধেছে বাঙ্গালী, হিন্দুর সঙ্গে জোড় বেঁধেছে মুসলমান। এদের পরিচয় নেই, আছে শুধু মানুষের মত চেহারা।

বললাম, জানি।

জানিস তো সতীশ আর মালতী নিয়ে চিন্তা করিস কেন ? বরং চল ওদের পাশে বসে শুনে আসি ওদের নিজস্ব কথা।

ওরা বলবে না। আমাদের বেশভূষা ওদের আপন করে নেবার পথে অন্তরায়। ওদের মত বেশভূষা চালচলন নিয়ে ওদের কাছে যদি যেতে পারি তবেই ওরা কথা বলবে। নইলে কোন ক্রমেই ওরা আমাদের আপনজন মনে করবে না। আমরা ওদের কাছে বাবু আর মাঠাকরুণ হয়েই থাকব।

অমিয়া বলল, তা বটে। জওহরলাল ভারতীয় নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবার অধিকার দিয়ে গেছেন। ভাবছি, জওহরলাল বোধহয় সতীশ ও মালতীর মত নরনারীর সঙ্গে কখনই পরিচিত হননি। যদি তা হত তা হলে বুঝতে পারতেন, তার আইন প্রণয়নের বহুকাল আগে থেকেই দরিদ্র সমাজে অলিখিত আইনে, যাদের আমরা ছোটলোক বলি, তাঁদের ঘরে বিবাহ বিচ্ছেদ হামেশাই

ঘটেছে। স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েরা আশ্রয় চেয়েছে কারও ঘরে, ঘর না পেলে ছুটে গেছে অপর ধর্মীর ঘরে, অথবা রেড লাইট এলাকায় ভীড় করেছে।

বললাম, বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের প্রয়োজন ছিল না।

ছিল। বলতে পারিস প্রযোজন ছিল না হিন্দু ব্যক্তিগত আইন (Personal law) বা ধর্মীয় আইন রদ করে এই আইন করা।

সংসদের সকল সদস্য একে সমর্থন করেছে।

এরকম একটা আইন করার আগে গণভোট নেওয়ার প্রযোজন ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের উদার প্রগতিশীল মনোভাব এই আইন তথা হিন্দুকোডকে সাদরে গ্রহণ করেছে কিন্তু যে দেশ ধর্ম নিরপেক্ষ, যে দেশে নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত সে দেশে বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বিশেষ আইন ও ব্যবস্থা সংবিধান সম্মত নয়। তুই তো জানিস শাহবানুর খোরপোষের মামলা নিয়ে এক শ্রেণীর মুসলমান জেহাদ ঘোষণা করতে আরম্ভ করেছে, তারা বলছে শরীয়তের পরিপন্থী। এই খোরপোষ ব্যবস্থা মুসলমান ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ। তারা চায় আইন সংশোধন করে খোরপোষের এই আইন সম্মত ব্যবস্থা নাকচ হোক। অর্থাৎ ধর্ম নিরপেক্ষ দেশে নারী পুরুষের সমান অধিকারের আইনকে শরীয়তের দোহাই দিয়ে খারিজ করতে চায়। আমরা যদি বলি সরকার হিন্দুকোড করে হিন্দু পার্সোনাল আইনের ওপর আঘাত হেনেছে এবং সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের ওপর আঘাত করা হয়েছে, আমরা যদি দাবী করি, বহুবিবাহ হিন্দু ধর্ম সম্মত। হিন্দুকোড এই ধর্ম ব্যবস্থাকে আঘাত করেছে, আমরা যদি বলি পিতামাতার সম্পত্তিতে পুত্রকন্যার সমান অধিকার ছিল না, একমাত্র পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পুত্রসন্তান। হিন্দুকোড এই সনাতন ধর্ম ব্যবস্থার পরিপন্থী ; আমরা যদি বলি, হিন্দুদের বিবাহবিচ্ছেদ শাস্ত্রসম্মত নয় তখন সরকার কি জবাব দেবেন। আদালতে হিন্দু পার্সোন্যাল আইন দিয়ে ধর্মের ধুয়া তুলে কোন মামলা হলে মুসলমানদের শরীয়তের নজির দেখিয়ে হিন্দুকোড বাতিল করার দাবী করা যেতে পারে। এমন অবস্থা যে সৃষ্টি হবে না একথা কি কেউ বলতে পারে। মুসলমানদের ভোটের আশায় যদি সংবিধান ও ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন করা হয় তা হলে ভারতের কপালে আরও দুঃখ দেখা দেবে। ভারতের সংহতি বিপন্ন হবার সম্ভাবনা বেশি।

বললাম, যা বলছিস তা ঠিক কিন্তু মুসলমান মৌলবাদীদের কাছে সরকার নতি স্বীকার করার আশঙ্কা বেশি। অশিক্ষিত অজ্ঞ মুসলমানদের ধর্মের নামে ক্ষেপিয়ে তোলা মৌলবাদীদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। পাকিস্তান কায়েম করতে এই ভাবেই মুসলীম লীগ অজ্ঞ মুসলীমদের ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। সেই অবস্থার পুনঃপ্রকাশ অবশ্যম্ভাবী।

অমিয়া গম্ভীর ভাবে বলল, অসুবিধাটা কোথায় জানিস। অর্থনৈতিক কারণে বর্তমানে চার বিবি পালন সম্ভব নয়। কোন কোন অর্থবান দুই বিবি পর্যন্ত পালন করে থাকে। কিন্তু নারীকে যারা পণ্য মনে করে তাদের অনেকে

একটি বিবি তালাক দিয়ে আরেকটি যুবতীকে বিয়ে করার যে নীতি এতদিন অবলম্বন করে এসেছে, সেই নীতি কার্যকর করতে হলে অবশ্য খোরপোষের দায়িত্ব মাথায় পেতে নিতে হবে। অত্যধিক অর্থবান ব্যক্তির এটা সম্ভব। সাধারণ মানুষ যারা শরীয়তের দোহাই দিয়ে তালাক ব্যবস্থাকে অপব্যবহার করেছে তাদের পক্ষে ঘোরতর দুর্দিন। সেইজন্য এত সোরগোল।

কিন্তু এই আইনের বিরোধীতা করতে তথা সুপ্রীমকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে মুসলমান মেয়েরাও তো সোচ্চার।

অনেকে মনে করে থাকে মুসলমান মেয়েদের স্বাধীনতা বেশি কিন্তু তাদের মনোভাব জানাবার মত বাক্‌-স্বাধীনতা কজনের আছে? আবার যে সব মহিলা পশ্চিমবঙ্গে মৌলবাদীদের সমর্থন জানিয়েছে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য এবং এদের সর্বাংশই অবাঙ্গালী। বাঙ্গালী মুসলমান পুরুষ ও নারী সমাজ মৌলবাদীদের ফতোয়া কিছুতেই মানতে রাজি নয়। মুসলমান সম্প্রদায়ও দ্বিধাগ্রস্থ ও বিভক্ত।

বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে বলশালী করবে। এক সম্প্রদায়ের ওপর আরেক সম্প্রদায়ের ঘৃণা ও অবিশ্বাস জন্মাবে। ভারতের সংহতি বিপন্ন হবে। তাকিয়ে দেখ গুজরাটের দিকে। সংরক্ষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখতে কত লোকের প্রাণহানি ঘটেছে, শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ডেকে এনেছে। সংবিধানে ছিল পনর বছরের জন্য অনুন্নত সম্প্রদায় তথা তপসীলি উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা আরও কিছুকাল বর্ধিত করার ব্যবস্থাও হয়েছে। কিন্তু এটা চিরকাল চলতে পারে না। অনুন্নত সম্প্রদায় বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে অনেক এগিয়েছে। যারা সরকারী কৃপা লাভ করেছে তারাই তাদের সমশ্রেণীর অনুন্নতদের যথেষ্ট অবহেলা ও ঘৃণা করে থাকে। মেধার মূল্য না দিয়ে শুধু মাত্র জন্মগত অধিকারকে স্বীকার করলে তাতে আজকের প্রযুক্তির উন্নত যুগে আমরা পিছিয়ে পড়ব। অনুন্নত সম্প্রদায়ের যোগ্য ব্যক্তি নিশ্চয়ই যথোপযুক্ত স্থান পাবে, তা বলে বর্ণহিন্দুদের যোগ্য ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়।

পরিণাম তো দেখতে পাচ্ছি, মুসলমানরা তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ চায়। এমন কি পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে যেখানে শতকরা পাঁচজনও উর্দুভাষী নয় সেখানে উর্দুকে রাজ্যের স্বীকৃত ভাষার দাবী উঠেছে। এই সব অবাঙ্গালীরা শুধু মাত্র এতেই ক্ষান্ত হয়নি। তাদের তোষণ করতে বামপন্থী সরকার উর্দু একাডেমি করে দিয়েছে। এসব সম্ভব হচ্ছে একমাত্র ভারতের আপামর জনসাধারণের মনে ভারতীয় বোধ সৃষ্টি না হওয়াতে। অনেক রাজ্যেই ইতিমধ্যে আঞ্চলিক দল সরকার দখল করছে। সর্বভারতীয় দলকে হটে আসতে হচ্ছে। অন্ধ্রে তেলেগুদেশম, আসামে অসম গণপরিষদ, জম্মু-কাশ্মীরের ন্যাশান্যাল কনফারেন্স, তামিলনাডুতে আন্না ডি-এম-কে, নাগাল্যাণ্ডে নাগা সংস্থা, মণিপুরে বিদ্রোহী মণিপুরীরা ক্রমেই ঘাঁটি শক্ত করছে। এসব তো ভারতের সংহতির

পক্ষে শুভ সূচনা নয়।

বাধা দিয়ে বললাম, আজকের মত নগরদর্শন এখানেই ইতি। এবার ফিরতি পথ ধরি। সমস্যাসঙ্কুল ভারতে আরও সমস্যা সৃষ্টি হবে। ভাবছি, তারপর কি!

অমিয়ার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তার গাড়ির কাছে এলাম। তার ড্রাইভার বোধহয় বিরক্ত হয়ে দিব্য নিদ্রাসুখ উপভোগ করছিল। অমিয়া তাকে ডেকে তুলে গাড়ির পেছনের সিটে বসিয়ে নিজেই গাড়িতে স্টার্ট দিল। আমি তার পাশে বসে ঝিমিয়ে পড়লাম।

কখন যে অমিয়ার বাড়ির সামনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি। অমিযা আমাকে সজাগ করে বলল, ঘুমোস না। বাড়ি এসে গেছি।

আর কিছুটা পথ এগিয়ে আমার বাড়ি পৌঁছে দে।

গাড়ি থেকে নামতে নামতে অমিয়া শক্ত গলায় বলল, তোর আবার বাড়ি কোথায়? চল্ আমার বাড়িতে। থাকিস তো মুসাফিরখানায়। আমার বাড়িতে তো কোন অসুবিধা নেই। যারা মুসাফিরখানায় থাকে তাদের সব জায়গায়ই তীর্থস্থান। নে চল।

অমিয়ার পেছন পেছন তার বৈঠকখানা ঘরে এসে হাত-পা ছড়িয়ে বসলাম। সামনের সোফায় অমিয়া বসতেই বললাম, ঠিকই বলেছিস, মুসাফিরখানার অস্থায়ী অধিবাসী, বোধহয় এই কারণেই কোন কিছুতেই আকর্ষণ নেই।

অমিয়া কিছু বলার আগেই তার সাহায্যকারিণী জানতে এল, মেমসাহেবকে কি দিয়ে আপ্যায়ন করবে।

শোন দাদু, সংসার তো করলি না তাই আকর্ষণ নামক মানসিকতা তোর ভাল করে জন্মায়নি।

সংসার করার সুযোগ পেলাম কোথায়? ভেবেছিলাম তোকে নিয়ে ঘর সাজাব, কিন্তু হঠাৎ তোর বিয়ের নেমন্তন্নপত্র পেয়ে সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল, তারপর আর মনের মত ঘর সাজাবার যোগ্য কোন মহিলাকে আর পেলাম না।

বাংলাদেশে মেয়ের অভাব?

মেয়ের অভাব ছিল না, এখনও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। কিন্তু সবাইকে যাচাই করে নেবার সুযোগ পাইনি। একজন নয়, বেশ কয়েকজনকে যাচাই করার পর বুঝতে পেরেছিলাম স্ত্রীভাগ্য আমার নেই।

মাধুরী কফি আর খাবার রেখে গেল।

কি যেন আমাকে পেয়ে বসেছিল, অনর্গল বলতে থাকি, একজনের কথা বেশ মনে আছে। কত সহজ সরলভাবে আমার কাছে এসেছিল। সবাই মনে করেছিল, অজন্তাই হবে আমার ভাবী গৃহিণী। বউদি তো ডগমগ। একদিন বলল, তোমার খেলা বন্ধ কর ঠাকুরপো, এবার অজন্তাকে ঘরে নিয়ে এস।

হেসে বললাম, অজন্তা রোজই তো আসছে, নতুন করে আবার আনব কি করে।

ওসব পাকামি ছাড়ো, বলে বউদি চোখ পাকালো।

বললাম, বুঝেছি। অজন্তাকে জিজ্ঞেস করে দেখব।

অজন্তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ির সবাই চায় তুমি এ বাড়ির বউ হয়ে এসে আমার ঘর আলো কর। তোমার মত কি?

অজন্তা যেন হাতে স্বর্গ পেল।

বললাম, তুমি তো জান না, এই যে বিরাট ঐশ্বর্য দেখছ এর এক কণার ওপর আমার কোন অধিকার নেই। তোমাকে নির্ভর করতে হবে তোমার নিজের ওপর। আমি শুধু মাত্র তোমাকে সামান্য সাহায্য করব, যেমন বাজার-হাট করে দেব, তোমার কোন সন্তান হলে তাকে কোলেপিঠে করে বড় করব।

অজন্তা আমার কথা বুঝতে পারল না।

বললাম, সামন্ততন্ত্র বোঝ নিশ্চয়ই। আমাদের এই বাড়ির প্রতিটি ধূলিকণায় আমার পূর্বপুরুষদের পাপের ছবি আঁকা আছে। সেই পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সবকিছু থেকে আমি নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছি। এই অবস্থা তুমি মেনে নেবে কি?

(অজন্তা বোধহয় আমার কথা বুঝতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করলে কিন্তু সর্বজ্ঞ হওয়া যায় না। পরীক্ষায় প্রথম স্থান যারা অধিকার করে জীবনের পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার গ্যারান্টি তাদের থাকে না। আমার মনে হয়, তাদের বাবা-মা তাদের উচ্চশিক্ষা দেয় শুধু মাত্র বিয়ের বাজারে লোভনীয় সামগ্রী করে গড়ে তুলতে। শিক্ষাটা যে পাশের ওপর নির্ভর করে না, এটা ওরা বুঝতে চায় না। বাবা-মায়ের কাছে জন্মাবধি শোনে, তোদের তো অন্যের ঘর করতে হবে। বাজারের উপযুক্ত পণ্য করে তুলতে গান শেখায়, নাচ শেখায়, সেলাই শেখায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিগ্রি পেতে সাহায্য করে, কুরূপার জন্য নানা প্রসাধনী এনে দেয়। কারণ ওই একটি, সেটি হল বিয়ের বাজারে নিখুঁত একটি পণ্য তৈরী করা।)

কিন্তু এমন মানসিকতা সৃষ্টি কখনও হতে দেয় না যা দিয়ে নারী তার ব্যক্তিত্ব দিয়ে, কর্ম দিয়ে, জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তার পরিবেশকে সুন্দর করে তুলতে পারে। অজন্তার মত বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ অজন্তা বিবাহ বৈতরণীর পারাপার করার অপেক্ষা করে নিজেদের অন্যের কাছে পণ্যরূপে বিলিয়ে দিয়ে। যাই হোক অজন্তাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিতে পারিনি। মোটামুটি সে বুঝেছিল আমার চিন্তাধারা ও রুচি তার গ্রহণযোগ্য নয়। দুটো বিষয়ে তার খটকা ছিল প্রবল। বিয়ে হবে পরস্পরের মানসিক সামঞ্জস্যে। তার জন্য ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান হবে না। হবে পাঁচ দশজনের সামনে আমরা পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রীরূপে স্বীকৃতি দানে। অজন্তা বলল, সে আবার কি বিয়ে? কেন, মুসলমানদের বিয়েতে তো কোন মন্ত্রপাঠ হয় না। একটি মেয়ে আর একটি ছেলের সম্পূর্ণ সম্মতিতেই তারা স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করে। অবশ্য কাজির খাতায় তাদের নাম রেজিস্ট্রিও করা হয় সময় বিশেষে।

অজন্তা বলল, তোমার কথা মানতে পারছি না। হিন্দুদের বিয়ে ওভাবে হয় না, সমাজও স্বীকার করে না। লোকে বলবে আমি তোমার রক্ষিতা। আমাদের সন্তানরা জারজ বলে চিহ্নিত হবে, পিতামাতার কোন সম্পদে অধিকার পাবে না।

কেন পাবে না? অধিকার দেবার কর্তা পিতামাতা। লিখিতভাবে সেই অধিকার দিলে কারও সাধ্য নেই সেই অধিকার কেড়ে নেয়।

অজন্তা স্বীকার করল না।

অপরটি হল সম্পদ সৃষ্টি। বললাম, সম্পদ আমি চাই না অজন্তা, আমি চাই জীবনে প্রতিষ্ঠা। অজন্তা বলল, সম্পদ থাকলেই প্রতিষ্ঠালাভ করা যায়। বললাম, সব সময় নয়। আজ যা আমার তোমার কাছে অমূল্য মনে হচ্ছে তার স্থায়িত্ব কতটা তা বিচার করে আমাদের পা ফেলতে হবে। আগামীকাল সমাজ আমাদের ভুলে যাবে। তাকিয়ে দেখ, আমাদের এই পাঁচমহলা বাড়ি যিনি তৈরী করে গেছেন উত্তরাধিকারীদের জন্য তাঁর কথা সবাই ভুলে গেছে। তাঁর অর্থ ছিল, বিত্ত ছিল, সম্পদ ছিল, উত্তরকালের জন্য সেগুলো রেখে গেলেও তাঁর নামটাও তাঁর উত্তরপুরুষদের স্মরণ রাখার মত নৈতিকবোধও তার ছিল না। তাঁকে চিনতো কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পুরানো কাগজ, যা আজ ডাস্টবিন ভর্তি করছে। এই জীবনকে আমি সহ্য করতে রাজি নই। পারবে তুমি সহ্য করতে?

অজন্তা বলল, ভেবে বলব।

তার ভাবনা আজও শেষ হয়নি অমু। বউদি মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেছেন, অজন্তা আর আসে না কেন ঠাকুরপো? বলতাম, ও আর আসবে না বউদি। বউদি চোখ উল্টে রাগতভাবে বলেছিলেন, ঝগড়া? বলতাম, না, মতানৈক্য।

অজন্তাব বিয়ে হয়েছিল। কোন এক ভাগ্যবান ইঞ্জিনীয়ারের ঘব আলো করছে এখনও। তবে এর জন্য অজন্তাব বাবা-মাকে যা দিতে হয়েছে তা দিয়ে অতীতে ছোটখাটো একটা জমিদারী কেনা যেত। উপায় ছিল না। সাড়ে তিন'শ প্রার্থীর মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়া কঠিন কাজ, তাই ইঞ্জিনীয়াররূপী এই জন্তটির ক্রয়মূল্য নিশ্চিত বড় অঙ্কের হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অর্থবানের কন্যা কি স্বেচ্ছায় অর্থহীনকে পাশে নিয়ে ঘর করতে পারে। তোরা বলবি পণপ্রথা। আমি বলি, অতীতে যে দাসপ্রথা ছিল তার এটি হল নতুন চেহারা। কন্যার পিতামাতা অর্থ দিয়ে পাত্র ক্রয় করে, তাতে কন্যা লাভ করে নিশ্চিত আশ্রয় আর সন্তান সৃষ্টি করার লাইসেন্স। একে আমাদের দেশধর্মে বলে বিবাহ। অজন্তা সেই বিবাহ চেয়েছিল এবং তা পেয়েছে। অবশ্য পরবর্তী সমাচার আমার জানা নেই।

আমার বাক্যস্রোত হয়ত বন্ধ হতে বিলম্ব হত। মাধুরীর মধুর কণ্ঠ বাধা দিল।

হাতমুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে বসলাম।

অমিয়া বলল, নো টক্। আজ অনেক ঘুরেছি, অনেক কথা বলেছি, এবার বিশ্রাম। কাল তোকে সকালবেলায় তোর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে অফিস যাব। বুঝলি।

মাথা ঝাঁকিযে বললাম, আচ্ছা।

মুখের শব্দ হল কথা। শব্দ হল ব্রহ্ম। কিন্তু শব্দ না করেও মানুষ কথা বলে। কখনও ইঙ্গিতে কখনও মনে মনে। সেখানে "নো টক্" নির্দেশ ব্যর্থ। এই কারণেই বোধহয় সারারাত এপাশ ওপাশ করেছি। ঘুমোতে পারিনি।

বাড়ি ফিরে এসেই পেলাম সাকিনাকে। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। হাসলাম।

হাসছেন কেন কাকু? আমাকে দেখে?

বললাম, না, সামরিক বাহিনীতে উঁচুতলার অফিসারকে যেমন য়্যাটেনশন হয়ে সেপাইরা সেলাম জানায় তেমনি কায়দায় তুমি উঠে দাঁড়ালে। তাই হাসলাম। আর অনেক দিন পরে কাকুকে মনে পড়েছে সেজন্যও কিছুটা হাসি।

সময় পাইনা কাকু। তার ওপর ঘর সংসার। আপনার জামাই তো কুটোও ভাঙ্গে না। বাড়ির কাজ, অফিসের কাজ করে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আপনার কথা মনে পড়ে।

কি মনে পড়ে? অতি দুর্বলের পাল্লায় পড়ে তোমার জীবন নষ্ট হয়ে গেছে।

ঠাট্টা করছেন কাকু? আপনি না থাকলে কোথায় ভেসে যেতাম! আজ যে চাকরি করছি, শুধু চাকরি নয় অফিসার হয়েছি সরকারী দপ্তরে সে তো আপনার চেষ্টায়।

সন্তানাদি কিছু?

একটিও নয়। মা বলে কেও ডাকার নেই। এটাই জীবনের মস্ত গ্যাপ্। বলতে পারেন ট্রাজিডি। কত বছর পর আপনার সঙ্গে দেখা অথচ মনে হচ্ছে এই তো সেদিন আপনার সঙ্গে এসেছিলাম চাকরির তল্লাসে।

ওসব কথা থাক। হালিমকে তালাক দিলে কেন?

আমাদের মেয়েরা তালাক দেবার অধিকারী নয়। একমাত্র আদালত আমাদের সেপারেশন দিতে পারে মেয়েদের আবেদনে, তাকে বলে খুলা। আমি আদালতে যাইনি। হালিম তালাক দিয়েছে, সেটাই কবুল করেছি দু'জনেই। বোধহয় এটাই ছিল বিধিলিপি।

পরিতোষকে বিয়ে করাটাও নিশ্চয়ই বিধিলিপি।

সাকিনা চুপ করে গেল।

অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে বলল, আমি থাকি কলকাতায় আর হালিম থাকে সেই উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত কোণে। তার সঙ্গে ঘর করতে হলে আমাকে চাকরি ছাড়তে হত। চাকরিটা ছাড়িনি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে প্রতিদিন হালিমের গজব শোনা আর চড়চাপ্পড় খাওয়া কি সম্ভব।

কিন্তু হালিম-ই কষ্ট করে তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। তোমাদের সমাজের অত্যাচার সহ্য করেও হালিম তোমাকে কলেজে পড়িয়েছে। নিজে যদিও প্রবেশিকা পাশ করতে পারেনি তবুও তোমাকে তো গ্রাজুয়েট করতে কোন ত্রুটি করেনি। তোমার কিছুটা কৃতজ্ঞতাবোধ থাকা উচিত মনে করি।

সাকিনা বলল, আমি বেইমানি করিনি। হালিমকে বলেছিলাম, তুমি কলকাতায় চল। সেখানে ছোটখাট কোন ব্যবসা কর। আমাদের সুখেই দিন কাটবে। হালিম বাড়ি ছেড়ে আসতে রাজি নয়। তার খড়ের চালা ছেড়ে পাকাবাড়ির ফ্ল্যাটে আসতে মন চায়নি।

তারপর ?

তারপর আর কি। মাঝে মাঝে হালিমের কাছে গিয়েছি। তখন শুধু ঝগড়া দাঙ্গা। একবার গিয়ে দেখি একটা মেয়ে আমার বিছানায়। হালিমকে জিজ্ঞাসা করলাম। বলল, তুই তো ঘর করলি না, তাই আজিজাকে বিয়ে করেছি। বললাম, খবরটা দিতে তো পারতে। বললাম, এই বিয়ে নাজায়েজ, আমার সম্মতি না নিয়ে বিয়ে করে বে-শরীয়তি কাম করেছ। আর নয়, এখানেই আমাদের সম্পর্ক শেষ। হালিম রেগে গেল। মহল্লার লোক ডেকে তাদের সামনে আমাকে তালাক দিল। আমি তো বেইমানি করিনি কাকু।

চুপ করে রইলাম।

সাকিনা আঁচলের খুঁট নাড়তে নাড়তে বলল, পরিতোষকে বিয়ে করেছি। পরিতোষ সরকারী অফিসের কেরানী কিন্তু ভালমানুষ। তবে খুবই দুঃখী। আমাকে বিয়ে করার জন্য তার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায়। তার ভাই ও ভায়ের বউরা তার সঙ্গে কথা বলে না। বাড়ির ছেলেমেয়েরা আগের মত ছুটে আসে না।

পরিতোষ কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।

না স্পেশাল ম্যারেজে ধর্মের কোন স্থান নেই কাকু। যেমন হিন্দু ছিল তেমনিই আছে আমিও মুসলমান রয়েছি। তবে আমার নামের পেছনে সাকিনা বসু লিখি স্বামীকে মর্যাদা দিতে। আমিও নমাজ পড়ি না পরিতোষও মন্দির যায় না। আমরা মানবতাবোধের কাছে নতিস্বীকার করে পরস্পরকে ভালবেসে সংসার করছি। নতুন কিছু মনে হচ্ছে কি ?

না আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। শুধু ভাবছি হালিমকে না ছাড়লেই ন্যায় সঙ্গত কাজ হত।

আমি তো তাকে ছাড়িনি। সে আমাকে ছেড়েছে। আমি মুসলমান ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে আমি ভারতীয় বাঙ্গালী। বাঙ্গালীর জীবনে হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য শুধু কৃষ্টির ক্ষেত্রে। আমরা আরবীয় কৃষ্টিতে প্রভাবিত আর হিন্দুরা ভারতীয় কৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত। আমরা যখন ভারতীয় তখন ভারতীয় কৃষ্টির আমরাও অংশীদার। বাঙ্গালী হিন্দুরা যে ভাষায় কথা বলে, আমিও সেই ভাষায় কথা বলি। বাঙ্গালী হিন্দুরা যেমন মাছের ঝোল ভাত খেয়ে পরিপুষ্ট,

আমরাও তাই। মেয়েদের পোষাক একই রকম। কয়েক দশক আগে আমাদের পুরুষরাও ধুতি পড়ত এখন যেমন তারা পড়ে না, তেমনি লক্ষ লক্ষ হিন্দুর ছেলে এখন লুঙ্গি পড়ে। হিন্দু পুরুষদের সঙ্গে মুসলমান মেয়ের বিয়ে তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরং বলতে পারি একটা বাঙ্গালী ছেলের সঙ্গে একটা বাঙ্গালী মেয়ের বিয়ে হয়েছে। এতে দোষের কিছু নেই কাকু। হালিম আমাকে ত্যাগ করেছে, আমার সঙ্গী চাই আমার মনোমত। আমি পরিতোষের মনুষ্যত্ববোধকে উচ্চমূল্য দিয়েছি।

আর কথা নয়। কি খাবে বল?

আমি খাব না কাকু। আপনার জন্য আমি খাবার নিয়ে এসেছি। প্রায় দু'ঘণ্টা বসে আছি আপনার জন্য।

সাকিনা তার ব্যাগ থেকে কেক্, পুডিং ও স্যাণ্ডউইচ বের করে বলল, আপনার জন্য এনেছি।

বললাম ঠিক আছে। টেবিলের ওপর রেখে দাও।

বউদি হঠাৎ ঘরে ঢুকে থমকে গেল। অনেকক্ষণ সাকিনার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি তো সাকিনা।

সাকিনা উঠে বউদিকে প্রণাম করল।

আমি সাকিনা। চিনতে ভুল হয়নি আপনার।

বউদি হেসে বললেন, অনেকদিন তো ছিলে আমার কাছে। তা আজকাল কোথায় কাজ করছ। কোথায় কাজ পেয়ে তুমি মেয়েদের হোষ্টেলে চলে গেলে তারপর আর পাত্তাই নেই। তারপর বিশ বছর তো কেটে গেছে। হঠাৎ কি মনে করে। মনে পড়েছে বুঝি। তা ভাল। একেবারে ভুলে যাওনি, এই তো ভাগ্যি।

রিলিফে আছি বৌদি?

খুব ভাল। শুনেছি রিলিফে অনেক আয়।

সাকিনা গম্ভীর হয়ে গেল।

বললাম, বউদি, তোমার কথাটা ঠিক হল না।

বউদি লজ্জিত হল না। বলল, আমাদের নিতু, মানে নিত্যানন্দ বলে মানুষের দুর্দশা তাদের মূলধন। ও রিলিফে যায়। এই বন্যা, এই খরা, এই ঝড়, তুফান, একটা কিছু হলেই নিতু ছোটে। বলে, রিলিফের টাকার তো মা-বাপ নেই। কেউ হিসাবও চায় না। পঞ্চায়েতের সঙ্গে সাট্ রেখে দু'পয়সা কামাই করা যায়। সরকারী বেতনে তো পেট চলে না। মানুষের বিপদ ওদের সম্পদ। যাকে বলে কারও পৌষমাস কারও সর্বনাশ, কোটি কোটি টাকার নয়ছয় করার এমন সুযোগ বছরে দু'একবার এলেই পাকা বাড়ি হবেই।

সাকিনা মৃদুস্বরে বলল, নীচুতলায় এরকম দুর্নীতি কিছু কিছু থাকতে পারে। তবে আপনি যতটা বলছেন অতটা ঠিক নয়।

কিছুটা তো মেনে নিচ্ছ। উঁচুতলায় দুর্নীতি না থাকলে নীচুতলার মানুষ কি বেপরোয়া হতে পারে। সরষেতে ভূত থাকে বলেই ভূত ছাড়ানো যায় না। যাক ওসব কথা। তোমার কথা বল।

আমার কোন কথা নেই বউদি। চিরাচরিত সেই স্টেরোটাইপ জীবন। সারাদিন কাজ করি। কখনও বাড়ির কাজ, কখনও অফিসে। মাঝে মাঝে ছুটতে হয় বাইরে। রিলিফের কাজ দেখতে।

বউদি বলল, খেয়েদেয়ে যেও সাকিনা।

সাকিনা হেসে বলল, বলতে হবে কেন, এতো আমার দাবী।

বউদি কি বললেন শোনা গেল না।

সাকিনা বলল, বউদি বেঠিক কথা বলেনি কাকু। রিলিফের টাকা দুঃস্থদের জন্য যতটা ব্যয় হয় তার চেয়ে বেশি পার্টির জন্য ব্যয় হয়। আমরা জানি! বলতে সাহস পাই না। আমাদের হিন্দুঘরের মান্ধাতা আমলের বউদের মত অবস্থা। স্বামীর নাম জানলেও মুখে উচ্চারণ নিষেধ। আমরা বলি না; কারণ চাকরির ভয়, পার্টির লাঠির ভয়, তৃতীয় হল নিজেদের হাঙ্গামা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা।

চাকরিতে তুমি সুখী নও।

নিজ নিজ কাজে কজনই বা সুখী বলতে পারেন সবাই অসুখী সবাই মুখ গুঁজে চলে। সব কিছুকে বাগ মানানো যায় না। জীবন যতক্ষণ, বাঁচার চেষ্টাও ততক্ষণ। একবার খবর এল কোন বন্যা পীড়িত এলাকায় শাসক দল বেছে বেছে নিজেদের দলের সমর্থকদের সাহায্য দিচ্ছে। প্রতিবাদ উঠল। সরকার একেবারে লজ্জাঘেন্নার মাথা খেয়ে বসেনি। সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত করার নির্দেশ পেলাম লিখিতভাবে। অলিখিতভাবে যা পেলাম তার ভিত্তিতে আমি রিপোর্ট দিলাম। অপর পক্ষ যাদের বামপন্থী সমর্থক বলছে তাদের শতকরা সত্তরজনই হল বিরোধীদলের সমর্থক। যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্যের বস্তু নেই সেজন্য সমানভাবে বিতরণ-ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ কেউই পায়নি, অবশ্য কেউ বঞ্চিতও হয়নি। অবিলম্বে আরও রিলিফের মাল এই এলাকায় পাঠানো হোক।

যা সত্য তা প্রকাশ করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। বলেই থামলাম। সাকিনা কিছু ভাবছিল। বললাম, আগে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে রিলিফের কাজ দেওয়া হত। এই সব প্রতিষ্ঠান পথে পথে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করত। তাদের কিছু আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হত সরকার পক্ষ থেকে। বামপন্থীরা রিলিফ ব্যবস্থাকে পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দিয়েছে। এতে দুনো লাভ। ক্যাডাররা টু-পাইস পায়, আর রিলিফ মারফত দলের প্রসারণ ঘটে। পশ্চিম বাংলার শতকরা আশীটি পঞ্চায়েত বামপন্থীর হাতে। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অপরিমেয়। যারা তাদের বিরোধী তাদের দূরে হটিয়ে দিতে বিশেষ বেগ পেতে হয়না।

সাকিনা বলল, এর পরেও তো সংসদীয় নির্বাচনে বামপন্থীদের হার হয়েছে অনেক আসনে।

বললাম, এ পরাজয় রোধ করা কঠিন। বিশেষ করে বিরোধীরা জয়লাভ করেছে শহর এলাকায় এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে। পল্লী এলাকায় বাম-পন্থীদের আসন টলানো মোটেই সম্ভব নয়। শহর এলাকার মানুষ সাধারণত অভিজাত এবং মধ্যবিত্ত মনোভাবাপন্ন। এরা শাসকদলের সামান্য ত্রুটি-গুলো বড় করে দেখে, শুধু তাই নয় পুঁজিপতিদের পরিচালিত পত্রপত্রিকা অভিজাত ও মধ্যবিত্তদের মানসিকতায় যথেষ্ট সুরসুরি দিয়ে বামবিরোধী মনোভাবের শিকার করে, আবার অন্যত্র দেখা গেছে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে ওরা উৎসাহ দিয়েছে বামপন্থীদের সায়েস্তা করতে কিন্তু পল্লী এলাকার মানুষের সামনে যে সব বাস্তব অসুবিধা আছে তা নিরসনের জন্য বামপন্থীরা কিছু কিছু মনোযোগ দিয়ে থাকে। সেখানে তাদের প্রচার ব্যবস্থাও বেশ শক্তিশালী। এই কারণেই পরাজয় হয়েছে শহর এলাকায়। উপরন্তু বিরোধীরা যে সব গাল-ভরা শ্লোক দিয়েছে তাতে অনেকেই বামপন্থী বিরোধী হয়ে পড়েছিল।

রঙ্গভূমিতে শ্যামলার আবির্ভাবে সাকিনা মুখ তুলে তাকাল। চোখের জিজ্ঞাসা। বললাম, আমার ভাইঝি শ্যামলী। ওকে তুমি দেখেছ কিনা জানি না। হয়ত দেখেছিলে, তখন ও হামাগুড়ি দেওয়ার মত অবস্থা ছিল। হরিশখুড়োর কথা মনে আছে?

খুব। আপনাদের ছোট শরীক।

তার নাতনী। আমার সময় অসময়ের সহচর, কখনও কখনও ঘোরতর সমালোচনা মুখর অর্থাৎ আমার কথা ওর মনঃপুত না হলেই তর্কাতর্কি। নইলে আমার প্রাণাধিক কন্যা।

সাকিনা বলল, আমার পরিচয়টা ওকে দিন।

মন্দ কথা বলনি। এর নাম সাকিনা বসু। আগে ছিল সাকিনা হালিম। হালিম এখন অপসৃত, বসু এখন অধিষ্ঠান। প্রায় বিশ বছর আগে আমাদের দেশের বাড়ির বারান্দায় বসে থাকতাম। একটা মেয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বগলে বই কেতাব নিয়ে স্কুলে অথবা কলেজে যেত। খবর নিয়ে জানলাম, হালিমের স্ত্রী সাকিনা কলেজে পড়ে, রোজই আমাদের বাড়ির সম্মুখ দিয়ে কলেজ যায়। পুরানো বাড়ির বেলু ওর সহপাঠিনী না হলেও কলেজের নীচের ক্লাশের ছাত্রী। পরিচয় ছিল দু'জনের। বেলুর সঙ্গে একদিন এসেছিল। পরিচয় হয়েছিল। সেই পরিচয় হল সর্বনাশা।

সাকিনা বাধা দিয়ে বলল, কি বলছেন কাকু!

যা বলছি ঠিকই বলছি। বি-এ পাশ করে জুলুম করেছিলে চাকরির জন্য। গ্রামের স্কুলের শিক্ষকতার কাজ খুঁজে দিলে তোমাকে আর সাকিনা বসু হতে হত না। সরকারী চাকরি খুঁজে দিতে এখানে নিয়ে এলাম। তোমার বড় জ্যাঠাইমার হেপাজতে প্রায় ছয় মাস থাকার পর অনেক কষ্টে একটা চাকরি।

আবার সাকিনা বাধা দিয়ে বলল, আমি সংগ্রহ করিনি, আপনি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

তা বলতে পার। চাকরি পেয়েই সাকিনা চলে গেল Working Women Hostel-এ, তারপর দু-একদিন এসেছে এখানে। বিগত প্রায় বিশ বছর আর এ রাস্তায় হাঁটেনি। অনেকদিন পর কৃতজ্ঞতা জানাতে কিছু ভোগ্যদ্রব্য নিয়ে এসেছে। তুমি তখন কত বড? বড় জোর এক বছর।

সাকিনা বলল, আমি লজ্জিত।

আ নি আনন্দিত। কারণ, তোমার তালাক ও আবার বিয়ের সাক্ষ্য দিতে হয়নি, তোমার জন্য ফ্ল্যাট খুঁজে দিতে হয়নি, তোমার জন্য হাসপাতালের দরজায় ধন্না দিতে হয়নি, আর নবজাতকের জন্য বেবিফুড কিনতে হয়নি।

ঠাট্টা করছেন কাকু!

না। থাক, ওসব পুরানো কথা। আজকের কথা হল কংগ্রেসের জয় অথবা পরাজয়। সারা ভারতে যখন ইন্দিরার মৃত্যুজনিত বেদনাভরা সহানুভূতির হাওয়া এবং সেই হাওয়াতে কংগ্রেস ভোট বৈতরণী অবাধে অতিক্রম করেছে তখন পশ্চিমবঙ্গে অতটা সুবিধা করতে পারেনি কেন? তবে শহর এলাকায় যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছে নিঃসন্দেহে। বিশেষ করে শ্রমিক এলাকায় কংগ্রেসের জয় অতি আশ্চর্য ঘটনা। ব্যালট বক্স প্রতারণা করে এই ঋষিবাক্য মেনে নিতে হয়। কংগ্রেসের জয়ের পেছনে তার সাংগঠনিক ক্ষমতা কাজ করেনি এটাও সত্য।

শ্যামলী বলল, কংগ্রেসের প্রার্থীরা ব্লাফ্ দিয়ে ভোট বৈতরণী পার হয়েছে। বরকত গণি রেলের মন্ত্রী। সদম্ভে বলেছিল বাঙ্গালীকে সে চাকরি দেবে। সাময়িক চাকরিও দিয়েছিল অবশ্য সেগুলো ঠিকে ঝিয়ের কাজ। নির্বাচন শেষে বরকত আর রেলদপ্তর পায়নি। বংশীলালের বংশীবাদনের সঙ্গে সঙ্গে ঠিকা ঝিয়ের কর্ম বিরতি। বাঙ্গালীদের ডেকে চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি নিমেষেই নষ্ট, আবার প্রিয় মুন্সী হাওড়ার বন্ধ কলকারখানা খুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দেবার পর হাওড়ার গা ধুয়ে অনেক গঙ্গার জল বয়ে গেছে, কলকারখানা একটাও খুলতে পারেনি। মমতা ব্যানার্জী রিফুজি কলোনীর পাট্টা স্থায়ী করার অঙ্গীকার করেও কাউকেই স্থায়ী পাট্টার ব্যবস্থা করতে পারেনি। কংগ্রেসী বক্তৃতার চমকে ভড়কে গিয়ে লোকে ভোট দিয়েছে কংগ্রেসকে। একজনকে বহুকাল বোকা করে রাখা যায়। বহুজনকে বেশিদিন বোকা করা যায় না। তাই এরপর কি, সে চিন্তা করতে হচ্ছে সবাইকে।

বললাম, রাইট ইউ আর। ভাঁওতাবাজি আজ অচল। আসাম কংগ্রেসের দুর্দশার মূলে শুধু ভাঁওতাবাজি। শতকরা চল্লিশজন অন্য ভাষাভাষীদের তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আঞ্চলিক দলের অন্যায্য দাবীর কাছে মাথা নুইয়ে কংগ্রেস ভোট বৈতরিণী পার হবার যে চেষ্টা করেছিল তাকে অগ্রাহ্য করেছে ওই চল্লিশজন। ফলে কংগ্রেস আসামে বিলুপ্তির পথে। সাম্প্রদায়িকতার

বীজ যেভাবে রোপিত হয়েছে অদূর ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আসাম যদি বিধ্বস্ত হয় তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আসামের বর্তমান সরকার এই অবস্থা সামাল দিতে পারবে এমন ভরসা করা নিরর্থক।

সাকিনা সরকারী চাকুরিয়া। যে কোন মন্তব্য অপরের সামনে করতে সাহস পায় না। সেজন্য সে চুপ করেই ছিল। শ্যামলী কিছু বলবার আগেই বড় বউদি এসে বললেন, খাবার প্রস্তুত। আর কথা নয়।

সাকিনা তার বাড়িতে যাবার নেমতন্ন করে গিয়েছিল।

যাওয়া হয়নি। শ্যামলী দু-একবার মনে করে দিয়েছিল কিন্তু কেমন একটা মানসিক আলস্য আমাকে যেতে দেয়নি।

শ্যামলীর বর্তমান কাজ হল বধূ হত্যার খবর বের হলে তার কাটিং রেখে দেওয়া। সেই সব কাটিং এনে মাঝে মাঝে বেশ উত্তপ্ত সমালোচনা ও মন্তব্য করত। আমি নীরব শ্রোতা। একদিন বললাম, এতো নতুন কিছু নয়। চিরকাল হয়ে এসেছে, হবেও।

কেন?

জানি না। বলে পাশ কাটাতে চেষ্টা করেছি।

এবার সে বধূহত্যা মামলার বিচারফলগুলো নিয়ে বেশ তৎপর। বলল, হ্যাঁ, এই রকম আদর্শ শাস্তি দরকার। ফাঁসী হওয়াই উচিত।

তাতে সমস্যার সমাধান হবে কি?

নিশ্চয় হবে।

ফাঁসির আদেশ দেবার পরও বেশ কয়েক ডজন বধূ হত্যা ইতিমধ্যে ঘটেছে। কোন ক্ষেত্রেই এই শাস্তি কোন ছায়াপাত করতে পারেনি। সেটা লক্ষ্য করেছ কি? ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে এই পাপ সমাজ থেকে দূর করা যাবে না। এটা শুধু হিন্দু পরিবারে ঘটছে এমন নয়, মুসলমান পরিবারেও এ পাপ ঢুকেছে। হিন্দুরা সহজে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে না, মুসলমানরা তো পারে। তাদের সমাজে তালাক না দিয়ে বধূ হত্যার পাপ কেন ঢুকেছে বলতে পার।

শ্যামলী সোজা বলল, মুসলমানরা নামেই মুসলমান, তারা মুসলমানদের শাস্ত্র মেনে চলে না। হিন্দুদের পণপ্রথা যে পাপ সৃষ্টি করেছে, সেই পণপ্রথার পাপ মুসলমান সমাজেও প্রবেশ করেছে। তাদের শাস্ত্র পণপ্রথার বিরোধী, তবুও তারা মেয়ের বাবাকে দোহন করে টাকা, অলঙ্কার, অন্যান্য সামগ্রী আদায় করছে।

বললাম, ভবিষ্যতে দেখবে মুসলমান সমাজে এই বধূহত্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, মুসলমান সমাজে জীবনে প্রতিষ্ঠিত পুরুষের সংখ্যা অতি অল্পসংখ্যক। আর অর্থবান ঘরের মেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই সব মেয়েরা উচ্চশিক্ষাও পাচ্ছে কিন্তু তাদের জন্য পাত্রসংখ্যা অত্যধিক কম। পরিণামে ছেলে বেচাকেনার বাজার বসছে। এখানে যে বেশি মূল্য দেবে সেই পারবে তার মেয়ের জন্য পাত্র কিনতে। এদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করতে না পারলেই অঘটন ঘটবে।

কৃশ্চান সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই পাপ প্রবেশ করছে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত কৃশ্চান যুবকের সংখ্যাও কম। অথচ তাদের ঘরের মেয়েরা শিক্ষায় দীক্ষায় এগিয়ে চলেছে। তারা বেকার কৃশ্চান যুবকের চেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। ভবিষ্যতে মুসলমান মেয়েরাও বেকার মৌলবাদী স্বামীর চয়ে অপর ধর্মের উদারমনা জীবনে প্রতিষ্ঠিত যুবকদের গলায় মালা দিতে পেছ্‌পা হবে না।

কিন্তু!

কিন্তু বলে লাভ নেই শ্যামলী। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। হিন্দুরা মুসলমান রাজত্ব কালে অতিশয় রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিল। তাদের রক্ষণশীলতার সঙ্গে ছিল অপরকে শোষণ ও বঞ্চনা করার লিপ্সা। নির্যাতীত ও অস্পৃশ্য শ্রেণীর মানুষ শুধু মাত্র বাঁচার তাগিদে ধর্মান্তরিত হতে দ্বিধা করেনি অবশ্য জোরজবরদস্তি ধর্মান্তরও হয়েছে হাজার হাজার। এমন সময় আবির্ভূত হলেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। জাতিধর্মের বাঁধন ছিঁড়ে প্রেমের ধর্ম প্রচার করে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করে গেছেন, নইলে ভারতের হিন্দুরা অবলুপ্ত হতেও পারত। হিন্দুদের যতই ঔদার্যের খ্যাতি থাকুক তারা বিধর্মীদের আপন করে নেবার কোন আগ্রহ দেখায়নি। মুসলমানদের সুফী সম্প্রদায়, হিন্দুদের বৈষ্ণব সমাজ সমন্বয়ের যে প্রচেষ্টা করেছে তাও সম্পূর্ণ সক্ষম হয়নি।

শ্যামলী বলল, তবুও হিন্দুরা তাদের বিরাটত্ব নিয়ে আজও বেঁচে আছে।

বললাম, না বেঁচে নেই। যে বাঁচাটা দেখছ তা এই বঙ্গভূমিতে, বাঙ্গালী হিন্দু চরিত্রের প্রগতিমূলক চিন্তাধারায়, যা ভারতের অন্যত্র পাওয়া কঠিন। ইংরেজ এল, তারা নিয়ে এল নতুন ধর্ম। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ বিলাতফেরতদের সমাজে গ্রহণ করল না, মিশনারীরা নানা ভাবে হিন্দুশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করে যুবসমাজকে কৃশ্চান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকে, এমন সময় বেদান্তের বাণী শোনালেন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি। তাঁরা নতুন সমাজ সৃষ্টি করলেন, ব্রাহ্মসমাজ। এই সমাজের আশ্রয়ে এসে হিন্দুরা কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু এর প্রসারও বাংলার সীমা পেরিয়ে বিশেষ এগোতে পারেনি, পাঞ্জাবে দয়ানন্দ সরস্বতী আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করে হিন্দুসম্প্রদায়কে রাহুমুক্ত করার চেষ্টাও করেছেন। এর ফলে একটা উদার প্রগতিশীল মনোভাব বিরাজ করতে থাকে শিক্ষিত সমাজে, যারা মোট জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অংশ। এসব পুরানো কথা। সেদিনের সে সমাজব্যবস্থা আজ নেই।

শ্যামলী বলল, আজকের সমাজে ধর্মীয় নীতি অচল। অর্থনীতিই চালিকা শক্তি। অর্থের কৌলীণ্য যার নেই সে সমাজে অপাংক্তেয়। অর্থ আজ সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে। এই শ্রেণী বিভাগই ভারতের অভিশাপ।

ঠিক বলেছ। এক শ্রেণীর হাতে প্রচুর অর্থ। তারা অর্থ উপার্জন সুপথে করেছে এমন দাবী তারা করতে সাহস পায় না, অথচ এই অর্থের অপচয় ঘটাতেও পেছপা হয় না। আরেক শ্রেণী যারা সমাজের ষাট ভাগ তাদের না

আছে অর্থ, না আছে কর্ম। কর্মহীন এইসব দরিদ্র মানুষও বাঁচার মত পথ না পেয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠেছে। যারা চোর তারা সমাজের মাথায়, আর যারা চোরের টাকা জবরদস্তি হাতিয়ে নেয় তারা হল সমাজের নিম্নশ্রেণীর অপরাধী। উঁচুতলার এই সব চোরদের শায়েস্তা করার কোন উপায় নেই প্রশাসনে। ভোটের বাজারে কোটি কোটি টাকা দেয় এইসব চোরেরা। তাই তাদের সাতখুন মাপ। আর যাদের সমর্থনে প্রশাসন করায়ত্ত করেছে দল বিশেষ তাদের দুঃখ দুর্দশার দিকে তাকাবার অবসর পায় না ভোটের বাজার ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে। এইসব বঞ্চিত যুবশক্তিকে কর্মোপযোগী না করে তাদের বেকারের খাতায় নাম লেখাতে হয়েছে বলেই এরা ক্রমে ক্রমে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠছে।

ভারতের সংবিধান আমাদের অনেক মৌল অধিকার দিয়েছে।

আইনের চোখে সবার সমান অধিকার।

তাই যদি সত্য হয় তা হলে শাহ্‌বানুর মামলার পর এত সোরগোল কেন? রাজীব গান্ধী মুসলমান ভোটের আশায় সালিশ ব্যবস্থার ডাক দেবে কেন? যে আইন হিন্দুর পক্ষে বাধ্যতামূলক, সেই আইন শিখদের পক্ষে বাধ্যতামূলক, মুসলমানসহ অন্য ধর্মাবলম্বীদের পক্ষেও বাধ্যতামূলক। রাজীব সালিশ করার পথ নিয়েছে, তাই যদি স্বীকার করা হয় তা হলে মুসলীম আইন অনুসারে নারী ধর্ষণকারী, খুনী ইত্যাদিকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার আইন অন্ততপক্ষে মুসলমানদের জন্য প্রয়োগ করা হোক। রাজীব এখনও বুঝতে পারেনি, মুসলমান মৌলবাদীদের তোষণ করতে বিষাক্ত সর্পের লেজে পা দিতে যাচ্ছে। বুঝতে পারছে না, এরপর কি!

কর্মের অধিকার দিয়েছে সংবিধান।

কর্মের কোন ডেফিনেশন নেই। কুকর্মও কর্ম। কুকর্মের পাইকাররা যদি দাবী করে আমাদের কর্মের অধিকার আছে, সে কর্ম ভাল কি মন্দ তা দেখার এক্তিয়ার রাষ্ট্রের অথবা আইনের নেই। এটা অবশ্য স্বীকার্য কিছু নয়। কুযুক্তি। কিন্তু কর্মলাভের অধিকার তো সংবিধান দেয়নি। কর্মের অধিকার থাকলে কর্মলাভ করা যায়, এমন সত্যধর্ম ভারতে স্বীকৃত নয়।

বসবাস করার অধিকার দিয়েছে সংবিধান। যে কোন ভারতীয় নাগরিক ভারতের যে কোন স্থানে বসবাস করতে পারে, জমি সংগ্রহ, গৃহনির্মাণ করতে পারে, ভারতীয় নাগরিকের সকল অধিকার ভোগ করতে পারে।

জম্মু-কাশ্মীরে পারে কি একজন রাজস্থানী ভূমি সংগ্রহ করে গৃহনির্মাণ করতে? একমাত্র জম্মু-কাশ্মীরের স্থায়ী অধিবাসীরাই তা পারে। আসামে দশ লক্ষাধিক লোক কলমের আঁচড়ে নাগরিকত্ব হারাল কোন সংবিধানের ধারা অনুসারে?

অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে, প্রশাসকরা, বিশেষ করে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কংগ্রেসীরা সংবিধানকে ক্রমে ক্রমে প্রহসনে পরিণত করতে আগ্রহী।

প্রতিবাদ কে করবে? যে সব বিরোধীদল আছে ভারতে তাদের আদর্শ সাধারণ মানুষ গ্রহণ করতে পেরেছে কি। কোন বিকল্প নেই। অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী ভারতদেশম আন্দোলন করে কংগ্রেসের বিকল্প স্থাপন করবে?

একটি রামারাও-এর শত্রুপক্ষ বলে, তেলেগুদেশম এর সাফল্য আঞ্চলিকতার প্রশ্রয়ে কিন্তু রামারাও নিজেই স্বচ্ছ নয়।

বিপত্নীক রামারাও হঠাৎ একটি যুবতীর পাণিগ্রহণ করেছে এই গুজব হায়দ্রাবাদের ঘরে ঘরে শোনা যায়। রামারাও বিবাহ করতে পারে, তাতে আপত্তি করার এমন কিছু নেই। কিন্তু তার যুক্তি এত দুর্বল ও হাস্যকর তা বলে শেষ করা যায় না।

রামারাওকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার সন্তানরা বড় হয়েছে, এমত অবস্থায় বিয়ে করাটা কি রুচি সম্মত হয়েছে।

রামারাও হেসে বলেছিল, আমি রাম। আমি হিন্দু। হিন্দু রাজা রাম সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে স্বর্ণসীতা তৈরী করেছিলেন কারণ রাজা একা রাজ্য চালাতে পারে না তার রাণী ছাড়া। আমিও কলিকালের রাম। আমি রাজ্য চালাব কি করে যদি আমার চালিকাশক্তি না থাকে। বর্তমান যুগে স্বর্ণসীতা তৈরী অসম্ভব তাই তরতাজা সীতার অনুসন্ধান করেছি। সীতা পেয়েছি। সেই হবে আমার চালিকাশক্তি।

এটা অবশ্য শোনা কথা। এর এক কণিকাও যদি সত্য হয় তা হলে রামারাও প্রতিষ্ঠিত ভারতদেশম ভারতের সর্বনাশ ডেকে আনবে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। রামারাও মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তার চৈতন্য-রথে চড়ে ধর্মভীরু হিন্দুসমাজে অবাধে বিচরণ করছে, প্রতিবাদ মুখর হতে তারা সাহস পাচ্ছে না। রাজনীতিতে এটাই শেষ কথা নয়।

রামারাও কেন, জনতার মুখ্য সম্পাদক সাহাবুদ্দিন কিশনগঞ্জে ফতোয়া দিয়েছেন, মুসলমান মৌলবাদীদের দাবী ন্যায্য। সুপ্রিমকোর্টের আদেশ লড়াই করে বদল করবে সংসদে গিয়ে। এই ফতোয়া তাকে বিজয়ী করেছে, ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস প্রার্থী ভয়ঙ্করভাবে পরাজিত হয়েছে। সাহাবুদ্দিন কি করে জনতার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত তা ভাবলে মনে হয় জনতা পার্টি একটা প্রতিক্রিয়াশীল দল, তারা ভোটের কাঙ্গাল। সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে ভোট সংগ্রহ করতে চায় অথচ বিহারের জামসেদপুরে জনতা রাজত্বকালে যে বিভীষিকাময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে তার সমতুল্য দাঙ্গা একমাত্র মুসলীম লীগ ঘটিয়ে ছিল কলকাতা শহরে ছেচল্লিশ সালের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন। রামকৃষ্ণ হেগড়ে কর্ণাটকের পক্ষে উপযুক্ত লোক, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তার স্থান কতটা শক্ত তা বলা কঠিন। জনতা পার্টির ভরাডুবি ঘটেছে সর্বভারতীয় স্তরে, একমাত্র কর্ণাটক জনতার কেতন উড়িয়ে মুখরক্ষা করছে কিন্তু জনতার দৃষ্টিভঙ্গী যদি ভোট সংগ্রহ হয় তা হলে জনতার ভবিষ্যত অন্ধকার এটাও জোর দিয়ে বলা যায়। সর্বভারতীয় চিন্তাধারা যে প্রয়োজন তা সাহাবুদ্দিনের নির্বাচন দিয়ে প্রমাণ হয়নি। বরং

বলা যায় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সাহাবুদ্দিন মোটেই বসবাসের উপযুক্ত নয়। সাহাবুদ্দিন কি সংবিধান পড়েনি? সাহাবুদ্দিন মনোনয়ন পত্র স্বাক্ষর করার সময় সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ নেয়নি? সংবিধান কোথাও সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় বিষ ছড়াবার কোন সুযোগ তো দেয়নি। মৌলবাদীদের অযৌক্তিক দাবীকে ধর্মীয় দাবী বলে অজ্ঞ মুসলমানদের ধর্মচিন্তায় সুরসুরি দিয়ে ভোট সংগ্রহ নীতি সম্মত নয়, আইন সম্মত নয়।

কিশনগঞ্জে কংগ্রেসের পরাজয় রাজীবকে মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণের মত অবস্থা সৃষ্টি করেছে। তাহলে শিখ চরমপন্থীরা যখন খলিস্থানের দাবী করে তখন তার কাছে নতিস্বীকার করতে রাজীব গররাজি হবে এমন মনে করার মত যুক্তি কোথায়? পাঞ্জাবেও অকালী দল ধর্মীয় জিগিরেই কংগ্রেসকে পরাজিত করেছে, সেজন্য আনন্দপুর সাহেবের দাবীগুলো মানতে হবে, এমন মনোবৃত্তি সংহত ভারতের পক্ষে বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। সবাই চিন্তা করছে এরপর কি!

শম্ভুচরণ আমার সহপাঠী।

কলেজের পড়া শেষ করার আগেই তার বাবার বাঁধাই মালের ব্যবসাযে নেমে পড়তে বাধ্য হযেছিল। অনিচ্ছায় বাবার কারবারে যোগ দিলেও কয়েক বছরের মধ্যে নিজেকে মানিযে নিয়ে পাকা ব্যবসায়ীতে পরিণত হযেছিল। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা হত। যখন দেশে চালের খুব অভাব তখন শম্ভু আমাদের মাঝে মধ্যে চাল সংগ্রহ করে দিত। কখনও বেশি দাম আদায় করত না।

শম্ভুর বড ছেলে প্রদীপ কিন্তু বাবার ব্যবসায়ে বসতে চাযনি। কলেজে পড়ার সময়ই শম্ভুর সঙ্গে নানাভাবে তর্কাতর্কি করে শম্ভুকে বুঝিয়েছিল, বাঁধাই মালের ব্যবসার অর্থ দেশের লোকের মুখের অন্ন কেড়ে নিযে অধিক অর্থ উপার্জন। এটা মানবতা বিরোধী।

শম্ভু বাদপ্রতিবাদ করেও কোন ফল হযনি। প্রদীপ ব্যবসাযের পথ ছেড়ে চাকরির সন্ধান করছিল। চাকরিও সে পেয়েছিল মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের। তাকে গোটা ভারতবর্ষ ঘুরতে হত, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলা ও বিহারের শহরে ও গ্রামগঞ্জে।

শম্ভুর সঙ্গে দেখা হলে দুঃখ করে বলত, প্রদীপ আমার কথা শুনল না। আমাদের রক্তে আছে ব্যবসা। যদি বাঁধাই মালের ব্যবসা তোর ভাল না লাগে অন্য কোন ব্যবসা কর। ছেলে কোন কথাই শুনতে চায়নি। চাকরি করছে। ওই বেতনের চাকরি আমিই ওকে দিতে পারতাম।

বলেছিলাম, ও বিষয়ে প্রদীপের ইচ্ছাটাই বড়।

শম্ভু আমার কথায় আস্থা রেখেই বলল, বেশ। যা করছিস তাই কর। কিন্তু তোর যদি এতই মানবতাবোধ তা হলে তুই কেন পার্টিতে গিয়ে, ক্লাবে গিয়ে মদ খেয়ে আসিস!

চমকে উঠলাম শম্ভুর কথা শুনে। কোন কথা বলতে পারিনি।

কমলকুমার অধ্যাপনা করে। সে খুব ভাল শিক্ষক। তার খ্যাতি আছে। রাতেরবেলায় বিশ্বের যাবতীয় রাজনীতির বই নিয়ে বসে। পড়তে থাকে, আর হাতের কাছে গেলাসে থাকে হুইস্কি। মাঝে মাঝে চুমুক দেয়। কমলের স্ত্রী অনুপমা, অনুপম ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে গ্লাস ভর্তি করে আর সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে কখন তার কৃতী স্বামী তার শয্যায় এসে অংশ নেবে।

কমলকুমারের স্ত্রী গর্বিত তার স্বামীর কৃতিত্বে। কমলকুমারের রুচিকে প্রশংসা করে বলে থাকে, কমল হুইস্কি খেতে ভালবাসে, অন্য কোন নেশা তার নেই।

শম্ভুচরণের পুত্র প্রদীপ কমলকুমারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলে, আমাদের কমলদাও তো মদ খায়। সে তো সমাজে অপাংক্তেয় নয় বরং অভিজাত শ্রেণীর লোক। মাঝে মাঝে সেও তো পার্টিতে যায়, ক্লাবে যায়, কখনও কখনও সস্ত্রীক। এতে তো দোষের কিছু নেই।

শম্ভুচরণ গালে হাত দিয়ে বসে।

তার স্ত্রী কান্তমণি কোন মতেই ক্ষান্ত হয় না। প্রদীপের মুখের সামনে আঙুল ঘুরিয়ে বলে, কমল বুঝি তোর আদর্শ। মদ খাওয়াটা যদি আদর্শ হয়, চোলাই খেয়ে যারা রাস্তায় গড়াগড়ি দেয় তারাও নিশ্চয়ই তোদের গুরুদেব।

আজকাল ঘরে ঘরে মদ। কাকে বাদ দেবে মা। আমি তো নিত্যকার খদ্দের নই। কালে ভদ্রে কখনও কখনও।

তা বটে, আমার বাড়ির উল্টোদিকে যে ছোঁড়ারা বসে আড্ডা দেয় সন্ধ্যার পর তারা সহজভাবে পা ফেলতে পারে না।

ওদের অপরাধ কোথায়! ওরা বুঝতে পেরেছে ওদের কোন ভবিষ্যত নেই। বর্তমানও ঘোরতর তমসাবৃত। বেকার জীবনের সান্ত্বনা মদের গেলাসে।

ওদের সান্ত্বনা মদের গেলাসে? বলিস কিরে! রাস্তায় ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েরা ওদের উৎপাতে হাঁটতে পারে না। এটাও বুঝি সান্ত্বনা। সরকার এবিষয়ে মুখ খোলে না, চোখে দেখে না। এরাই অথবা এদের মত নোংরা ছেলেরা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই করে বেড়ায়।

সরকার দেখবে কেন? বলেই প্রদীপ হাই তুলল। তারপর গর্ভধারিণীর বাঁহাতটা ধরে বলল, আমার যখন জন্ম হয়েছিল তখন তো ভেবেছিলে বংশরক্ষা হবে। তারপর একটু বেচাল দেখেই তো অস্থির হয়েছ। ওদের বেচাল দেখলে সরকার অস্থির হয় না। বরং স্থির হয়ে ভাবে, এরা আছে বলেই তাদের পার্টির বংশ রক্ষা হচ্ছে ও হবে। এমন সোনার চাঁদ ছেলে না পেলে ডান-বাম কারও ক্ষমতা নেই দিল্লীর সুলতানী আর মহাকরণের গদী ছোঁয়ার, বরং এদের উৎসাহিত করে, এদের বেলেল্লাপনা ও অসামাজিক কাজকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেদের আখের গোছাচ্ছে।

শম্ভুচরণ অতি দুঃখিত ও লজ্জিতভাবে তার ঘরের কথা পরকে শুনিয়ে নীরবে বসে রইল আমার সামনে। আমি কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না।

দিন কাল বড়ই খারাপ দামু। আমাদের সময় কত মহৎ চিন্তা আমাদের ভবিষ্যতের পথ দেখাত। এখন সবাই অভিজাত হতে চায়। অভিজাত হবার পথ হল মদের গেলাস আর নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা। ভেবেই পাই না এর পরিণতি কি!

ছোট্‌কু দু' কাপ চা দিয়ে গেল।

বউদি এসে তাগাদা দিল, আজ বিকেলে ফাংশান আছে ঠাকুরপো। ছেলে মেয়েদের নিয়ে যেতে হবে।

ফাংশানটা আজকের দিনে প্রমোদ বিতরণের একটা ভাল মাধ্যম। বললাম, ঘরে রেডিও, টেলিভিশন দেখেশুনেও ওদের বুঝি মন ভরে না।

শম্ভুচরণ বলল, ঠিক বলেছিস দামু। ফাংশান আর ফাংশান। ঘরে বসে আনন্দ পাওয়ার হাতিয়ার থাকতে বাইরে ছুটবি কেন!

বউদি বলল, টেলিভিশন! আর বলনা শম্ভু ঠাকুরপো, কলকাতায় একটা কেন্দ্র আছে। পশ্চিমবাংলার মানুষকে আনন্দ দিতে? শিক্ষামূলক কিছু জানাতে। বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতির গৌরব প্রচার করতেই নাকি কলকাতায় দূরদর্শন কেন্দ্র করেছে সরকার। তুমি নিয়মিত দূরদর্শনকে দর্শন কর কি?

আমার সময় কোথায়। রাতের বেলায় মাঝে মাঝে দেখি।

কি দেখ অথবা শোনো?

হিন্দী গান, নাটক এইসব।

কলকাতা পশ্চিমবাংলার তথা বাঙ্গালীর প্রাণকেন্দ্র। কলকাতা দূরদর্শনে যা দেখানো আর শোনানো হয় তার শতকরা বিশভাগ বাংলা, বাকি অংশের প্রায় সবটাই হিন্দী। সপ্তাহে এমন দিন আছে যেদিন বাংলা সংবাদ ভিন্ন আর কিছুই কলকাতার প্রোগ্রামে পাওয়া যায় না।

বললাম, ওসব বলে তো লা- নেই। দূরদর্শন আর বেতার পরিচালনা করে সরকার। সরকার হাজারো ব্যবস্থায় দলীয় সরকারের প্রচার ব্যবস্থা কায়েম রাখতে ব্যস্ত। হিন্দীওয়ালা এই দুই শক্তিশালী মাধ্যমকে সরকারী প্রচারে সব কাজে আটক করে রাখে। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ও তার অন্যান্য মন্ত্রীদেরকাজকর্ম, বাণী বক্তৃতা ফলাও করে প্রচার করা, হিন্দীকে ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে অহিন্দীভাষীদের সেবা করাই এই দুই মাধ্যমের উদ্দেশ্য। নেট ওয়ার্ক প্রোগ্রামের পয়সা দেয় পুঁজিপতি গোষ্ঠী, তারা আদা নুন খেয়ে সরকারের অভিপ্সা অহিন্দী-ভাষীদের ওপর হিন্দীর বোঝা চাপাচ্ছে প্রা- নিয়ত। আমরা অভাজন তাই দেখে শুনে কৃতার্থ হচ্ছি।

বউদি বাধা দিয়ে বললেন, জানো ঠাকুরপো, কদিন আগে শিশু চলচ্চিত্র নাম দিয়ে যে ছবি দেখানো হয়েছিল কানাড়ীভাষায় তা বুঝবার আগেই সুইচ অফ করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

শম্ভুচরণ বলল, তা ঠিক বউদি। হিন্দী ছায়াছবির যে সব চিত্র দেখানো হয় তাতে আর কিছু থাকুক আর না থাকুক তরুণদের এমন উৎসাহিত করছে যার প্রতিফলন দেখছি রাস্তাঘাটে। মেয়েরা মানসম্মান নিয়ে আজকাল পথ

চলতেই পারছে না। বিশেষ করে দিল্লী শহরে মেয়েরা মোটেই নিরাপদ নয়। খাস রাজধানীর ঢেউ লেগেছে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে। প্রতিবাদ করলে শুনবে কে? ওই সব কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী সহ য সব ছবি দেখানো হয় সেগুলো নাকি আ; আর উদ্দেশ্য হল তরুণ দলকে প্রলোভিত করে হিন্দীপ্রেমী করা। কোন সভ্যদেশে এরকম হয় বলে শুনিনি। খুব নামী দামী খবরের কাগজওলার ভাড়াটিয়া সাংবাদিকরা এগুলোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ওসব ছবি হল ভারতীয় উচ্চ শ্রেণীর আর্টের বিকাশ।

বউদি বললেন, রাজ্য সরকারের উচিত প্রতিবাদ করা।

হেসে বললাম, রাজ্য সরকার মানে বামপন্থী সরকার। কংগ্রেস হল নেহেরু পরিবারের জমিদারী। কংগ্রেস যা আমরা দেখেছি তা মৃত সেটা ছিল ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কংগ্রেস। বর্তমানে এটা হল ইন্দিরা কংগ্রেস। ইন্দিরা কংগ্রেস নামে যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আজ ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় কায়েম হয়েছে সেটি আসলে একটি পরিবারের জমিদারী। স্তাবক পরিবৃত হয়ে জমিদারীর মালিক ও তার পরিবার যা করছে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। একজন স্তাবক একসময় উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেছিল, India is Indira আরেকজন বয়োবৃদ্ধ স্তাবক রাজীবকে রামায়ণের রাম সাজিয়ে তুলসীদাসের নতুন দোঁহা লিখছে: যেখানে রাম সেখানেই অযোধ্যা, যেখানে রাজীব সেখানেই ভারতবর্ষ। এই অনভিপ্রেত কংগ্রেস ক্ষমতালাভ করেছে, তাতে কংগ্রেসের (ইন্দিরা) সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি পায়নি। ইন্দিরা কংগ্রেসের কার্যকলাপই ভারতে আঞ্চলিক দল গড়ে তুলতে যেমন সাহায্য করেছে।

কমুনিষ্ট পার্টিকে বলিষ্ঠ করতে জন্ম নিয়েছে মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টি। কমুনিষ্ট আন্দোলন সূচনা করেছে ভারতে নতুন অধ্যায়।

মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার পর দেশের লোক প্রথম জানতে পারল কমুনিষ্ট আন্দোলনের কথা। সেই জানাও এমন কিছু ব্যাপার নয়। স্বাধীনতা লাভের পর কাকদ্বীপ তেলেঙ্গানার কমুনিষ্ট আন্দোলনে জনসমক্ষে কমুনিষ্টদের যে অস্তিত্ব উপস্থিত করল তাকে ব্যাপক আকারে প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিল কংগ্রেস সরকার। তখনকার পরিস্থিতিতে কমুনিষ্ট আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিতে ভুল ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

শীঘ্রই ভাঙন দেখা দিল। ভারত চীন সংঘর্ষের সময় কমুনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হল। একদল পরিচিত হল জাতীয় কমুনিষ্ট পার্টি অপর দল এই নামের পেছনে লিখল মার্কসবাদী। সাচ্চা কমুনিষ্ট বলে নিজেদের জাহির করল আপাতঃ দৃষ্টিতে মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টিকে যে কোন আখ্যা দেওয়া হোক না কেন, এই নবগঠিত পার্টিতে দেখা দিল প্রাণের স্পন্দন। কেবলমাত্র এই পার্টির সাফল্য সমর্থকদের মধ্যেই নতুন আশা জাগালো না, যারা রাজনীতির গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য রাখে তারাও ভবিষ্যতের আশ্বাস পেল। নতুন কর্মপ্রেরণা দেখা দিল জনমানসে।

ক্ষমতায় এল যুক্তফ্রন্ট সাতষট্টি সালে। নতুন সরকার গঠিত হল। এর মুখ্যমন্ত্রী যদিও বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জি কিন্তু মূল শক্তির আধার মার্কসবাদী কমুনিষ্টরা ছিল। যে মার্কসবাদীরা এতকাল বিপ্লবের বাগাড়ম্বর করেছিল তাদের তরুণজঙ্গী সমর্থকদের মনে জাগল নতুন উদ্দীপনা। তারা তাকিয়ে দেখল মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টি'র নেতারা বিপ্লবের কথা ভুলে যাচ্ছে। ক্রমেই তারা পা ফেলছে দক্ষিণপন্থী পথে। এই জঙ্গী ভাবাপন্ন বিপ্লবপন্থীরা অধীর হয়ে উঠল, তারা দেখল মার্কসবাদীদের নামে সি-পি এম শোধনবাদের দিকে ঝুঁকে আদর্শকে হত্যা করতে উদ্যত। তারা প্রথম পদক্ষেপ করল কৃষকদের ন্যায্য দাবী আদায়ে। দেখা দিল সংঘর্ষ। সংসদীয় গণতন্ত্রের ছায়াতে বসে বিপ্লবের মিঠে বুলি শোনানো সহজ, তা কাজে পরিণত করা খুবই কঠিন। এই জঙ্গী ভাবাপন্ন কর্মীদের আন্দোলন শুরু হল নকশালবাড়ির দুর্গম অঞ্চল থেকে। একটি বিপ্লবী ঘাঁটির প্রতিষ্ঠা তাদের লক্ষ্য। তারা আওয়াজ তুলল মুক্তিযুদ্ধের ও রণকৌশল অবলম্বন করল সশস্ত্র সংগ্রামের। এই সংগ্রামী নেতৃত্বের ভুল হল অতি-বামপন্থায় পদে পদক্ষেপ করা। নীতি বিজ্ঞান সম্মত হলেও তার প্রয়োগ বিধি অবশ্যই ভ্রান্ত পথে চলেছিল। অবশ্য আন্দোলন স্তিমিত হলেও বিনষ্ট হয়নি। কোনদিন হবেও না।

সি-পি-এম সাতষট্টি সালেই ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিল। পুরোপরি ক্ষমতা লাভ করেছিল আটাত্তর সালে ত্রিপুরায় ও পশ্চিমবঙ্গে। ক্ষমতা লাভের পর দেখা গেল স্ফীতোদর হয়েছে এই পার্টি। এই কলেবর বৃদ্ধি অত্যধিক ভয়ের কারণ যেদ বহুল দেহ যেমন স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয় তেমনি এই কলেবর বৃদ্ধি মোটেই স্বাস্থ্য সম্মত নয়। রাতারাতি যে সব লোক এসেছে ভীড় জমিয়েছে সি-পি-এম পার্টিতে তাদের আদর্শের গাঁটছাড়া কোথায় বাঁধা তা অনুমেয়। কমুনিষ্ট আন্দোলনের ভিত্তি রচিত হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে। রাশিয়াতে শ্রমিক শ্রেণীই বিপ্লবের পুরোধা ছিল। চীনের কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি কৃষকদের এগিয়ে দিয়েছিল বিপ্লবের পথে। আজ ভারতের কমুনিষ্ট গোষ্ঠী ক্রমেই এগিয়ে চলেছে পেটি বুর্জোয়া পার্টি'র পথে। বাস্তবত দুই কমুনিষ্ট পার্টি'ই কমবেশী শোধনবাদী পেটি বুর্জোয়ার দলে রূপান্তরিত হয়েছে। কারণ খুঁজতে হলে বলা যায় নেতৃত্ব এসেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে। মধ্যবিত্ত চরিত্র সর্বত্র প্রতিভাত হচ্ছে। যতই গালভরা কথা শোনানো হোক। কমুনিষ্ট পার্টি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে মোটেই কমুনিষ্ট নয়। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন অতি অল্প সংখ্যক বোধহয় চার হাজার কমুনিষ্টকর্মী এই বিশাল দেশে এমন আলোড়ন সৃষ্টি করছিল তাদের ব্যক্তিগত এবং পার্টিগত চরিত্রের ঐকান্তিকতা ও সাহসিকতা দেখিয়ে। আজ তারা কোথায়?

ভারতীয় কমুনিষ্টদের এই পরিণতি প্রার্থিত নয়। দেশের মানুষ অনেক বেশি আশা করেছিল তাদের কাছে। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে জমিদার-জোতদার জন্মেই জমিদার-জোতদার হয়, পেটিবুর্জোয়া জন্মেই পেটিবুর্জোয়া হয় কিন্তু কমুনিষ্ট

হয়ে কেউ জন্মায় না। কমুনিষ্ট হতে হলে অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাহসিকতা, ঐকান্তিকতা ও আদর্শপরায়ণ হয়ে বহু বৎসর সাধনা করতে হয়। আজ যারা পার্টির নেতৃত্বে রয়েছে তারা কিন্তু ভুলে গেছে চৌষট্টি সালের ঘোরতর দুর্দিনে যখন তারা ও তাদের কর্মীরা কংগ্রেসের দয়াতে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তখন তাদেরই কিছু নিষ্ঠাবানকর্মী আত্মগোপন করে মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টিকে রক্ষা করে আন্দোলন করেছে অথচ পরবর্তীকালে এই আন্দোলনের সামিল হয়ে যারা নেতৃত্বের শিখরে পৌছে কমুনিষ্ট আদর্শকে হত্যা করছে তারা আর যাইহোক কমুনিষ্ট নয়। এরা সাইনবোর্ড সর্বস্ব একটা পেটিবুর্জোয়া পার্টি। অতঃপর কি, এই ভাবনা সবার মনে।

শ্যামলী বলল, দুই দুটো পিকনিক পার্টি হয়ে গেল পঁচাশির ডিসেম্বরে। এসবের কোন খবরই দেখছি তুমি রাখ না কাকা। যা শুনলাম প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে তাতে মনে হল ভারতের শতকরা আশী ভাগ লোকের আর দুঃখ দৈন্য নেই। থাকলেও অচিরে তো শেষ হবে।

আমি বললাম, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই আমার।

বললেই হল। মুখ বাঁকা করে শ্যামলী উত্তর দিল। আমার সামনে চেয়ার টেনে বসল লড়াই করার ভঙ্গীতে।

বলল, বোম্বের তিলক ময়দানে আর আজাদ ময়দানে কংগ্রেসের পিকনিক পার্টি, আর সল্টলেক স্টেডিয়ামে কমুনিষ্ট মার্কসবাদীদের পিকনিক পার্টি। এই দুই পার্টিতে লক্ষ লক্ষ লোকের হাজিরা, খানাপিনা, গালগল্প এসব খবর তুমি শোননি।

কি করে শুনব। আমি যে বধির।

কিছু বলতেও পার।

যে বধির সে মূক। তা তো জানিস। আমি কানেও শুনি না। মুখেও বলি না। বোবা কালার নাকি কোন শত্রু থাকে না। আমি অজাতশত্রু। আমাকে ওসব বলে লাভ নেই। শীতকালে দল বেঁধে পিকনিক করে ছেলেমেয়েরা। এদের পিকনিকে ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ী সবাই গেছে। মহা উৎসব। সেসবের খবর আমার মত গরীব গুবরোদের জন্য নয়।

আমি ভাবছি কি পরিমাণ অর্থের অপচয় ঘটালো এরা।

আরে বাপু, শুনেছিস তো মিষ্টান্ন ইতরে জনাঃ। এসব লোক বহুদিন ভাল-মন্দ খেতে পায় নি। দু-চারদিন না হয় খেয়ে মুখের স্বাদ বদলানো। এতে আপত্তি করা ঘোরতর অন্যায়। একদল পিকনিক করল কংগ্রেসের শতবার্ষিকী পালন করতে। আরেক দল পিকনিক করল দ্বাদশ কংগ্রেস করতে গিয়ে কমুনিষ্ট পার্টি মার্কসবাদীর নামে। তা করবে বইকি! কংগ্রেস অনেক কাল আগে মরে ভূত হয়েছে। ওরা গয়াতে পিণ্ড না দিয়ে বোম্বেতে পিণ্ড দিতে পিকনিক করছে। আরেক দল মার্কসকে বাদ দিয়ে সাইনবোর্ড টাঙ্গালো মার্কসবাদী কমুনিষ্ট। ওদের তো পিণ্ড দেবার ব্যবস্থা নেই তাই ভোজ দিয়ে সবাইকে

স্মরণ করিয়ে দিল, আমরা মার্কসবাদী নই শোধনবাদী। বাস্তবত ন্যাশন্যাল ইন্দিরা কংগ্রেসের এপিঠ-ওপিঠ। এতে আপশোষ নেই। বিকার নেই শুধু ভোজনভাব তোর ডাক পড়েনি এই তো।

সবচেয়ে হাসির কথা হল, রাজীব গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন ইতিহাস রচনা করে জনসাধারণ তথা তার স্তাবকদের জানিয়েছে ভারতের স্বাধীনতা এনেছে তিনজন, একজন হলেন মহাত্মা গান্ধী। দ্বিতীয়জন হলেন তাঁর মাতামহ জওহরলাল নেহেরু এবং তৃতীয়জন হলেন তাঁর জননী ইন্দিরা গান্ধী। কালাপাহাড় হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করছিল, বাধা পেল পুরীতে আর বৈদ্যনাথ ধামে। আপশোষ করে বলেছিল, বোদে পাথর আর জগা কাঠ আর সব ফুটফাট। গান্ধী আর জওহরলাল বাদে সবাই ফুটফাট, বলিহারি ইতিহাস জ্ঞান।

বললাম, নিজের ঢোল সবাই পেটায়। সকাল সন্ধ্যা বেতার দূরদর্শন থেকে সরকারী মাধ্যম, সংবাদপত্র সবাই রাজীবের স্তুতি গান করছে। জানিস তো সেই চোর আর ছাগলের গল্প। চার পাঁচজন চোর একজন ছাগল বিক্রেতার মনে এমন বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছিল যার ফলে কুকুর মনে করে ছাগলকে রাস্তায় ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। একটা মিথ্যা বার বার বলতে হয়। কারণ এই মিথ্যার ফসল আদায় করে ক্ষমতায় থাকতে হবে। দু-দশ বছর জেল খেটে গান্ধীজি ও জওহরলাল যদি দেশ স্বাধীন করত তা হলে তো ফাঁসির দড়িতে লটকে শতশত তরুণকে প্রাণ দিতে হত না। মহারাষ্ট্রের চাপেকার ভাইদের কথা ওরা ভুলে গেছে, ভুলে গেছে ভগত সিংহ, শুকদেব ইত্যাদির কথা। ভুলে গেছে ক্ষুদিরাম প্রফুল্লচাকীর কথা। কারণ, এদের স্বীকৃতি দিলে রাজীব যে জমিদারী লাভ করেছে তার ভিত নড়ে যেত। রাজীবের মাতামহ সুভাষচন্দ্রকে নস্যাৎ করেছিল, এমন কি গান্ধীজি পট্টভি সীতারামাইয়ার পরাজয়কে ব্যক্তিগত পরাজয় মনে করেছিল, ঠিক একই ধারায় রাজীবও সুভাষচন্দ্রকে কোণঠাসা করে নিজ পরিবারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই শ্যামলী। ওরা আতঙ্কিত, তাই সত্যকে স্বীকার করতে চায় না।

শ্যামলী কিছুটা সমঝদারীর সঙ্গে বলল, যে সিঁড়িতে পা দিয়ে আমরা উপরে উঠি সেই সিঁড়ির কথা কি মনে থাকে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার পর। যারা প্রাণ দিয়েছে, অত্যাচার সহ্য করেছে, বন্দীদশায় দিনের পর দিন কাটিয়েছে তারা তো উপরে ওঠার সিঁড়ি, এদের বুকের ওপর পা রেখেই ওরা গদী পেয়েছে, স্বাভাবিক জাগতিক নিয়মে সিঁড়ির কথা ভুলে গেছে।

অবশ্যই। কিন্তু রাজীব গান্ধী শুধু মাত্র তার দাদামশায় ও মাকে নিয়ে এত ব্যস্ত তার কারণ তার নিজস্ব সত্বা সম্বন্ধে ভয়ঙ্কর সন্দিহান। এমন কি তার বাবা ফিরোজ গান্ধীর নাম পর্যন্ত কোথাও করেনি। জরুরী অবস্থাকে সর্বতোভাবে সমর্থন জানালেও কোন সময় তার ভাই সঞ্জয়ের কথা বলেনি অথচ সঞ্জয় ছিল জরুরী অবস্থায় অনেক জরুরী কাজ করে জনমানসে কংগ্রেসবিরোধী মনোভাব গড়ে তুলেছিল।

রাজীব জরুরী অবস্থা সমর্থন করছে কেন ?

বললাম, সত্যকে আড়াল করতে। রাজীব যে নীতি অনুসরণ করছে তাতে নিজ দলেই ভাঙ্গন দেখা দেবে, কখনও প্রকাশ্যে কখনও গোপনে। দেশের সাধারণ মানুষ অর্থনৈতিক কারণে বিপর্যস্ত হলে রাজীবের গদী টলটলায়মান হলে তখন তার একমাত্র পথ হবে জরুরী অবস্থার আশ্রয় নেওয়া। আত্মরক্ষার সামরিক অস্ত্রটি যে কোন ভাবে সমর্থন জানানোর অর্থ অদূর ভবিষ্যতে তাকেও ইন্দিরার মত জরুরী অবস্থার খোলস পরিধান করে ক্ষমতা হস্তগত রাখা।

শ্যামলী বলল, বোধহয় এই কারণেই সিদ্ধার্থশঙ্করকে মঞ্চে আনতে চেয়েছিল।

না। সিদ্ধার্থকে পছন্দ করে এমন কোন প্রমাণ কোথাও নেই। প্রথমত সিদ্ধার্থশঙ্করের রাজনৈতিক মৃত্যু ছিল কাম্য। অনেকে মনে করে বিদেশী পুঁজির অবাধ প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করে রাজীব পুঁজিপতির গায়ে আঁচড় দেবার চেষ্টা করছে। ভারতীয় পুঁজিপতিরা রাজীবের এই নীতি গ্রহণ করতে পারছে না। তারা রাজীবকে ভাল শিক্ষা দেবার মুখবন্ধ আরম্ভ করেছিল সিদ্ধার্থকে মঞ্চে আসতে সহায্য করতে। তাদের আশা ছিল, সিদ্ধার্থ বোধহয় রাজীবকে ভারতীয় পুঁজিপতিদের সপক্ষে টেনে আনতে পারবে। ভারতীয় পুঁজিপতিরা যেভাবে শোষণ করছে সেই শোষণের অবাধ রাজত্ব কায়েম রাখতে তারা চেষ্টা করবে বইকি।

ইন্দিরার সময় যা দেখা গেছে এখনও তাই দেখছি। গণতন্ত্র সম্মত উপায়ে কংগ্রেসকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা সে সময়ও হয়নি, এখনও হচ্ছে না। যারা কংগ্রেসকে গণতন্ত্রী করতে সচেষ্ট তাদের প্রতিবাদককে স্তব্ধ করতে এই সব প্রতিবাদকারীদের পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

বললাম, কোন দল যদি গণতন্ত্রমুখী হয় গণতন্ত্রকে স্বীকার করে তা হলে দলে মতানৈক্য থাকবেই। কংগ্রেস গণতন্ত্রমুখী নয় তাই প্রতিবাদ শুনলেই হাইকমাণ্ড ক্ষিপ্ত হয় তাকে "নিকাল দেতা হায়"। এই পাপ থেকে বামপন্থীরাও মুক্ত নয়। কি বামপন্থী, কি দক্ষিণপন্থী, কেউই ইতিহাস পড়ে না। ইতিহাসের শিক্ষাও গ্রহণ করে না। দলকে কল্পণ নয়, বাস্তব অবস্থিতি আছে ও থাকবে। দল গণতন্ত্রমুখী হলে তাতে দ্বন্দ্ব থাকবে। দলে যদি দ্বন্দ্ব না থাকে, অন্যের মতের প্রতি অপরের শ্রদ্ধা না থাকে তা হলে দল হবে স্থানু। দল যদি স্থাণু হয় তাকে ফসিলের পর্যায়ে নেমে যেতে হয় নিকট ভবিষ্যতে। এই কারণেই কংগ্রেস হাইকমাণ্ড বলতে বোঝা যায় এখনও রাজীবকে। অবশ্য এর স্রষ্টা তার জননী। পরধর্মমত সহিষ্ণু না হলে যেমন বিভিন্ন সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করতে পারেনা, তেমনি দলের অভ্যন্তরে মতবিরোধকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দলকে গতিশীল করতে না পারলে ফ্যাসিবাদ জন্মায়। এর নিকৃষ্ট পরিচয় দেখা গেছে হিটলারী শাসন ব্যবস্থায়।

শ্যামলী বাধা দিয়ে বলল, এসব কথা যাক। পিকনিকের পরিণতি কি? এরপর কি হতে পারে?

কি হতে পারে। এটাই চিন্তার বিষয়। পিকনিকে যারা ভোজ খেতে এসেছিল তারা সবাই কি দলীয় আকর্ষণে এসেছিল ? কলকাতায় কেউ এসেছিল গঙ্গাস্নান করে কালীমাই দর্শন করতে, কেউ এসেছিল চিড়িয়াখানা দেখতে, কেউ এসেছিল বিনামূল্যে দেশভ্রমণ করতে, আবার কেউ কেউ এসেছিল পার্টির দ্বাদশ অধিবেশন দেখতে। নেতাদের বক্তৃতা শুনতেও এসেছিল। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যারা এসেছিল তারা যে সাচ্চা কমিউনিষ্ট নয় এটা অনস্বীকার্য বোম্বাইতে যারা গেছে তারাও পেছপা নয়। তারা ইণ্ডিয়া গেট থেকে সমুদ্র দর্শন, নগর দর্শন, এলিফ্যাণ্টটা দর্শন না করে ফিরবে এমনটা মনে করা ভুল। যেখানে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে সেখানে আনন্দ উৎসব ও হুল্লোর না হয়েছিল এটা মনে করা ভুল। আবার কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে কলকাতার পিকনিক পার্টি আনন্দ উৎসব বিরহিত তা মনে করা ভুল। পার্থক্য কিন্তু একটি বিষয়ে। বোম্বাইয়ের পিকনিকে পুলিশ লাঠি চালিয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে চেষ্টা করেছে সেখানে কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা নগ্ন ভাবে দেখা গেল কিন্তু কলকাতায় মার্কসবাদীদের সাংগঠনিক নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে পুলিশ লাঠি চালায় নি। কোন রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়নি। দলের লাল উর্দীপরা স্বেচ্ছাসেবকরা নিয়ম শৃঙ্খলা রক্ষা করে দলের ভবিষ্যত অনেক উজ্জ্বল করেছে, যেটা ইন্দিরা কংগ্রেস পারেনি।

শ্যামলী অনেকক্ষণ ভেবে বলল, তোমার কথা শুনে আমি ভীত।

বললাম, কেন ?

তোমার এই সমালোচনা জনসমক্ষে করলে বিভিন্ন দলের সদস্য ও সমর্থকরা তোমাকে আর আস্ত রাখবে না।

হেসে বললাম, যখন যুক্তিবুদ্ধি অকেজো হয় তখন হিংসার আশ্রয় নিতে হয়। এতে নতুনত্ব নেই। কিন্তু হিংসা দিয়ে কোন সমস্যার সমাধান হয় না শ্যামলী। মানুষ মারলে মানুষ শেষ হয় না। হত্যা দিয়ে নতুন জীবনের সন্ধান পাওয়া যায় না। এতে সামাজিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। আমাদের দেশের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখ। নেতারা যা বলে তা করে না। ইন্দিরা কংগ্রেস বলছে সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে। শুনতে ভাল। অথচ সাম্প্রদায়িক দল মুসলীম লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেরলে কংগ্রেসীরা রাজত্ব করছে। হিন্দু কোড যারা প্রণয়ন করে তারা ভারতীয় কোড তৈরী করে সবাইকে একছত্র তলে আনার কোন চেষ্টা করে না। প্রকাশ্যে যারা সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে তাদের প্রশ্রয় দিতে ইন্দিরা কংগ্রেস কোন সময়ই ইতস্তত করে না। আর বিচ্ছিন্নতাবাদ ?—এর স্রষ্টা ইন্দিরা কংগ্রেস। তাদের নীতি আঞ্চলিকতাবাদের সৃষ্টি করেছে। অন্ধ্রে আঞ্চলিক দল রাজ্য শাসন করছে। তামিলনাড়ুতে আঞ্চলিক দল রাজ্য শাসন করছে। আসামে আঞ্চলিক দল রাজ্য শাসন করছে। পাঞ্জাবে আঞ্চলিক দল রাজ্য শাসন করছে। এটা তো বিচ্ছিন্নতাবাদের অঙ্কুর। শীঘ্রই মহীরুহ হয়ে দেখা দেবে না, কে বলতে পারে ? সংহতিরক্ষার এটা মোটেই সুস্থ নীতি নয়। কলকাতার

পিকনিকেও একটা ভাঙ্গা রেকর্ড বাজিয়েছে সি-পি-এম। সি-পি-এম সমর্থন করেছে আসামের আঞ্চলিক দলকে। সংসদ নির্বাচনে আকালিদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে তাদের বৈরাগ্য দেখা যায় নি। মুসলীম লীগের দরজার ধর্না দিয়ে নির্বাচন জেতার ও সরকার গড়ার চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি। অথচ এই দুইটি দলই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য মাঝে মাঝেই জিগীর দিচ্ছে। ইন্দিরা কংগ্রেসের পিকনিকপার্টি'তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে যে সব কেনেস্তারা পার্টি'র বাজনা আর কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীর নাচ দেখানো হয়েছে তাতে ভারতীয় ঐতিহ্য কতটা রক্ষা হয়েছে তা গবেষণার বিষয়। মানুষের জীবন আর জীবিকা এক নয়। জীবিকাকে প্রাধান্য দিলেই রুচির বিকার ঘটবেই, জীবনের স্পন্দন সমাজে অনুভূত হবে না। এই সব দল জীবনকে বাদ দিয়ে জীবিকাকে সমাজের সামনে দাঁড় করিয়ে মানবিকতা হত্যা করেছে সজ্ঞানে। রাজনীতির আবর্তে আমরা বড় বড় বাণী ও বক্তৃতা শুনে শুনে এমন একটা বস্তুতে পরিণত হয়েছি যার পরিণতি প্রত্যক্ষ করছি বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ে। আমাদের মন নামক যদি কোন পদার্থ থাকে তা অসাড় হয়ে গেছে। আরও কিছুকাল এই ভাবে চললে জড়বুদ্ধিতে পর্যবসিত হব আমরা সবাই।

শ্যামলী উসখুস করছিল। বুঝলাম এ প্রসঙ্গ তার মনোমত নয়। অথচ সেই অবতারণা করেছিল। মনীষা উপস্থিত হল হঠাৎ। তার চোখ মুখের চেহারা দেখে ভীত হয়ে পড়লাম। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার? এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছ কেন?

শ্যামলী বোধহয় সুযোগ পেল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি মনীষামাসীর সঙ্গে কথা বল, আমি যাচ্ছি। আজ দাদার হোস্টেল থেকে আসার কথা এবার তার ফরমাইস খাটতে হবে।

বলতে বলতে শ্যামলী বেরিয়ে গেল।

মনীষাকে বসতে বললাম।

আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে সে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, বসার ইচ্ছা নেই। আমি আর সহ্য করতে পারছি না দাদা!

মনীষা কি বলতে চায় তা জানি। এরকম অভিযোগ এর আগেও অনেক বার সে করেছে। মনীষার কথা বলতে হলে অনেক পেছনে তাকিয়ে দেখতে হয়। সে দেখাটা বিশ্লেষণ করতে হয়। সবই জানি। জেনেও কখনও কোন মন্তব্য করিনি।

মনীষা তার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সন্তান। কোন রকমে সে মাধ্যমিক পাশ করেছিল কিন্তু অর্থভাগ্য তার মন্দ নয়। মনীষা সহজেই চাকরি পেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরে। তার বিশেষ যোগ্যতা হল সে তপশীলি জাতি। কোটা তাদের জন্য নির্ধারিত থাকায় উচ্চবর্ণের অনেক যোগ্য প্রার্থীর দাবী নস্যাৎ করে সে চাকরি পেয়েছিল।

মনীষার উনিশ বছর পেরিয়েছে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে সংসারে।

বিধবা মা আর ছোটভাইয়ের সংসার। ছোটভাই তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। এমন সময় তার পরিচয় হল বরেণের সঙ্গে। বরেণ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন একটি কর্মস্থলের কর্মচারী। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। সুন্দর স্বাস্থ্য, মনহরণকারী চেহারা। অবশ্য মনীষাও কুৎসিৎ নয়। শ্যামবর্ণ লাবণ্যময়। দু'জনের পরিচয় কি করে হয়েছিল তা মনীষার মুখেই শোনা যাক।

রোজ বাড়ি ফিরবার সময় শিয়ালদহের ফুটপাতে বাজার করতাম। কলকাতার সব বাজারের চেয়ে শিয়ালদহ বাজার কিছুটা সস্তা। তবে সস্তার বার অবস্থা ঘটে অনেক সময়। কখনও পচা জিনিস আসল বলে পাচার করে, কখনও ওজন কম দেয়। খুব সর্তকভাবে বাজার করাটাই হল শিয়ালদহের ক্রেতাদের অলিখিত আইন।

একদিন আলু কেনার পর মনে হল ওজন যেন কম। পাশের একজনের পাল্লায় ওজন করে পেলাম মাত্র আটশ গ্রাম এক কেজির বদলে। গেলাম সেই বিক্রেতার কাছে। বললাম, তুমি কম ওজন দিয়েছ।

দোকানদার তেড়ে এল, বলল, কখনই নয়। আমি কমং দিতে পারি না। আজ পাঁচ বছর এখানে দোকানদারী করছি কেউ একথা বলেনি আর আপনি বললেই মেনে নেব। বের করুন আলু, আবার ওজন করে দেখিয়ে দিচ্ছি।

আলু বের করে দিলাম। দোকানদার ওজন করে দেখিয়ে দিল ওজন ঠিক আছে। আমি বোকার মত তাকিয়ে রইলাম। নিজেকে অপরাধী মনে হল।

আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল একজন ভদ্রলোক। তিনি বোধহয় মজাটা দেখছিলেন। আমাকে বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, আপনি একটু সরে দাঁড়ান। আমি ওর পোরেণটা যাচাই করছি।

দোকানদার কিছুতেই তার এক কেজির পোরেণ হাতছাড়া করতে চায় না। গোলমাল পেকে উঠল। ভদ্রলোকও ছাড়ছেন না। ভীড় জমল। শেষ অবধি দোকানদার পোরেণ যাচাই করতে দিল। পাশের দোকানে পোরেণ যাচাই করে দেখা গেল, তার পোরেণটাই দুশ গ্রাম কম। মারামারি হবার উপক্রম। রাস্তার লোক দোকানদারকে এই মারে তো সেই মারে। এমন অবস্থায় আমি বললাম, যা হয়ে গেছে তার জন্য আর অশান্তি করে কি হবে।

এই ভাবে মিটে গেল হাঙ্গামা।

ভদ্রলোক আমার পাশে পাশে চলতে চলতে বললেন, ওজন কম দেওয়া, ভেজাল মাল বিক্রি করা যে সামাজিক অপরাধ তা জেনেও লোকে বাদ প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসে না।

বললাম, আমি ডেলি প্যাসেনজার। ট্রেন ধরতে হবে। তাই সামনে যা পাই কিনি, যাচাই করার অবসর কোথায় বলুন। যাচাই করতে গেলে ট্রেন ফেল, তারপর আরও আধঘণ্টা বসে থাকতে হবে পরের ট্রেনের জন্য। আমার মত যারা তাদেরই ঠকতে হয়।

বুঝি। কিন্তু আমি না থাকলে দোকানদার তো আপনাকে বেইজ্জত করে দিত। এরপর যাচাই করে জিনিস কিনবেন।

বললাম, আচ্ছা।

এবার ভদ্রলোকের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। মন মুগ্ধ করার মত তার রূপ ও স্বাস্থ্য। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথায় থাকেন? বললাম। উনি বললেন, আমি থাকি আর দুটো স্টেশন এগিয়ে। দু'জনেই ট্রেনে উঠলাম। সেদিন আর রাস্তায় কোন কথা হয়নি। আগের দিন আবার প্ল্যাটফরমে দেখা। এবার অনেকটা লজ্জা কেটেছে, ওঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। বললাম, সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে দেখা হল। উনি হাসলেন। বললেন, এভাবে রোজই দেখা হতে পারে। আজ তো বাজারে ঠকে আসেননি।

বললাম, জানিনা। কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

সেদিন শহরে খুব হাঙ্গামা। ছাত্ররা উপাচার্য বিতাড়ণে বদ্ধপরিকর। সরকার মনোনীত ব্যক্তিকে উপাচার্য না করে আচার্য নিজের ইচ্ছামত উপাচার্য নিয়োগ করাতে বামপন্থী ছাত্ররা, বিশেষ করে সি. পি. এম সংগঠন প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেছিল। সেই আন্দোলন কি আকার ধারণ করতে পারে তাতো জানেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর ছেড়ে কলেজ স্ট্রীটে হাঙ্গামা। ঘন ঘন জিগীর, ইন কিলাব আর বন্দেমাতরম্ সেই সঙ্গে বোমা ফাটছে, মানুষ ছুটছে। কলকাতার পথে ঘাটে এই দৃশ্য সবারই দেখা আছে। পরিণতিও জানা আছে। পুলিশ আসবে, লাঠি নিয়ে তাড়া করবে, প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে কাউকে কাউকে গ্রেপ্তার করবে। ইত্যাদি। তার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িঘোড়া চলাচল বন্ধ। আমি কোন রকমে গলিঘুপচি দিয়ে স্টেশনে পৌঁছলাম। স্টেশনে প্রবেশ করতেই ট্রেন হুইশিল দিলে, দৌড়ে গিয়ে উঠলাম শেষের বগিটায়। দেখা হল না ভদ্রলোকের সঙ্গে।

ট্রেন থেকে নামার সময় আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ভদ্রলোক প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে। উনি এগিয়ে এলেন, জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখানে?

আপনার জন্য, শহরে হাঙ্গামা। ভাবলাম, আপনি ফিরতে পারবেন কি না। তাই নেমে পড়লাম মাঝপথে। এখন দেখছি আপনি ঠিকই এসেছেন।

বললাম, এমন হাঙ্গামা তো শহরে হামেশাই হয়।

তা ঠিক কিন্তু মরতে মরণ আমাদের। কখন কার গায়ে বোমা এসে পড়বে, তার নেই কোন ঠিকানা। তার ওপর স্টেশনে এসে গাড়ি পাব কিনা সেটাও এক সমস্যা। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য। এর প্রবর্তক আমাদের মহান কংগ্রেস সরকার। সেই ঐতিহ্য আজও চলছে। কে উপাচার্য হবেন তার জন্য ছাত্রপরিষদ আর ছাত্রফেডারেশনের মাথা ব্যথা কেন? তারা পড়তে এসেছে, পড়াটা কতটা এগোল সেদিকে কারও নজর নেই।

যারা ছাত্রদের আন্দোলন পরিচালনা করে তাদের অতি ক্ষুদ্র অংশও তো ছাত্র নয়। ওরা রাজনীতির চক্করে পাক খাচ্ছে দাদাদের নির্দেশে। এই

আন্দোলন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ করে দেবে, ভোগান্তি হবে ছাত্রদের। চাকরির উমেদারী করতে গিয়ে দেখবে তাদের বয়স পেরিয়ে গেছে চাকরি সংগ্রহ করার। আসলে রাজনীতি সর্বনাশ ডেকে এনেছে সমাজের সকল স্তরে, অবশ্য এই রাজনীতি দলীয় অপরাজনীতি।

ঠিক বলেছেন। আমরা যখন পড়তাম তখন এমনটা ছিল না। এখন অংগ্রেজি হঠাও চলছে। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পড়ানো বন্ধ। শুধু তাই নয় প্রাথমিক স্কুলে কোন বার্ষিক পরীক্ষা নেই। মাস্টার মশাইদের পোয়া বারো। পড়ানো দরকার নেই। বছর শেষে এক শ্রেণীর ছাত্রকে উপর শ্রেণীতে তুলে দিয়ে খালাস। মাস্টার মশাইরা পড়ান কিনা তা যাচাই করার মত ইনস্পেক্টার যথেষ্ট নেই। কোন কোন বিদ্যালয়ে বছরে একবারও এই মহাশয় ব্যক্তিদের পদধূলি দেবার অবসর থাকে না। গরীবগুরবো মানুষরা ইংরেজি কেন পড়বে? চাষার ছেলে চাষা হবে, তারজন্য বাংলা পড়াই যথেষ্ট। যারা জজ ম্যাজিস্ট্রেট হবে তারা তো ওসব লোকের ছেলেমেয়ে নয়। তাদের জন্য ইংলিশমিডিয়াম স্কুল আছে। মন্ত্রী ফন্ত্রী ও অভিজাতদের ছেলেমেয়েরা ইংলিশমিডিয়ামে পড়তে যায়। তাদের কথাই আলাদা।

ভদ্রলোক বললেন, আপনার বাড়ি আর কত দূর?

সামনেই। আসুন না। পথ পাবেন।

আমার পাশাপাশি চললেন। বাড়িতে এসে যথাযথ ভদ্রতা দেখাতে কোন ত্রুটি করিনি। এইভাবে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল।

ভদ্রলোকটি হলেন বরেণ মজুমদার।

আমি যেন মোহাচ্ছন্ন। যখন বরেণ বিবাহের প্রস্তাব দিল তখন সব দিক তো ভেবে দেখিনি। তখন আমরা প্রেমে ডগমগ। ভবিষ্যতের রঙীন ছবি আমাদের চোখের সামনে। বিবাহের শুভ প্রস্তাব গ্রহণ করতে দ্বিধা করিনি।

তারপর একদিন দু'জনে বন্ধুবান্ধব নিয়ে রেজিস্ট্রারের ঘরে নাম সহি করে এলাম।

যতই সম্পর্ক ঘনিষ্ট হল ততই বুঝতে পারলাম আমি বরেণের ঘরে অনভিপ্রেত অতিথি। বিশেষ করে আমার নিম্নবর্ণে জন্ম তার বাড়িতে কোন ক্রমেই গ্রহণ-যোগ্য হল না। বরেণের মা সোজাসুজি বলেই দিলেন, বাপু হে, তুমি পূজার ঘরে আর হেঁসেলে যেওনা।

বরেণ প্রতিবাদ করল না।

আমি প্রতিবাদ করলাম। ক্রমেই সম্পর্ক তিক্ত হতে থাকে। তিক্ততা ছড়িয়ে পড়ল বরেণের মনে। আমি যে অনভিপ্রেত তা বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হয়নি।

মণীষা শুধু ভাবছে এরপর কি!

আমার কাছে মণীষা এসেছিল সমস্যার সমাধান খুঁজতে। বললাম, আমি

তো সংসারী নই। তোমার সমস্যা তোমাকে অন্ধ করেছে, আমিও অন্ধ। একটি অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাতে পারে কি?

মণীষা বলল, ওরা পুরুষ, তাই সমাজকে ওরা যেমন শাসন করে তেমনি পরিবারেও তারা শাসক হয়ে থাকতে চায়। বাড়ির মেয়েদের বিশেষ করে বউদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করতে কখনও পেছপা হয় না।

স্বয়ং নির্বাচিত বিবাহে শুধু কি এই ঘটনা ঘটে?

না দাদা, যোগাযোগের বিবাহেও এরকম ঘটনা বিরল নয়।

এর জন্য দায়ী তোমরা।

কেন?

তোমরা তোমাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন নও। পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের স্থান করতে হয় ব্যক্তিত্ব দিয়ে, সেই ব্যক্তিত্ব তোমরা হারিয়েছ।

আমরা যে দুর্বল।

দুর্বল মনে করে সবলের কণ্ঠলগ্ন হতে চাও। আচ্ছা মণীষা, তুমি তো বোম্বাইয়ের হিন্দী সিনেমা দেখেছ, বোধ হয় অনেকই দেখেছ। মেয়েদের নাচও দেখেছ সেইসব ছবিতে। সেইসব নাচ কতটা রুচিকর তা নিশ্চয়ই বোঝ। মেয়েরা শুধু পয়সার বিনিময়ে নিজেদের রূপ যৌবনের বিজ্ঞাপন দেয় শুধুমাত্র যৌন আসক্তি সৃষ্টি করতে দর্শকদের মনে, সেটা কি সম্ভব হত যদি নারী তার ব্যক্তিত্ব নিয়ে আর্থিক প্রলোভন জয় করতে পারত।

কিন্তু দরিদ্র দেশে মেয়েরা বাধ্য হয় এই বৃত্তি নিতে।

এটা সত্য কথা নয়। যে সংখ্যক মেয়ে এইসব নানা ছবিতে নানাভাবে নিজেদের বিকৃত রুচির শিকার করে তাতে মনে হয় না দারিদ্র তাদের তাড়না করে ছবির জগতে এনেছে। আমার মনে হয় বোম্বাইয়া কুৎসিত ছবির খোরাক জোটাতে বোম্বাইয়ের প্রতি ঘরের একটি করে যুবতী ছুটে আসে স্টুডিওর চত্বরে। আমরা বলে থাকি হিন্দী ছবি, কস্মিনকালেও এগুলো হিন্দী ছবি নয়। মুখ্যত এগুলো উর্দু ছবি। উর্দু ছবিগুলো হিন্দী-ইংরেজির যেমন জগাখিঁচুড়ি করে থাকে, তেমনি সমাজে শুভরুচিকে বিপথে টানতে পুরুষ-মেয়ের যৌন অভিব্যক্তি দেখিয়ে আরেকটা জগাখিঁচুড়ি করে তোষণ করে দর্শকদের। তাই বলছিলাম। রুচির প্রশ্নই শুধু নয়, ব্যক্তিত্বহীনতা এই সব অপসংস্কৃতিকে যেমন ছড়িয়ে দিয়েছে তেমনি পুরুষের কাছ থেকে হারিয়েছে যথাযথ শ্রদ্ধা। বরেণকে দায়ী করলেও, নারীসমাজ দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

আমি কি করব সেটাই বলুন দাদা।

বললাম, ভেবে পাচ্ছি না। যেটা বাই-পার্টি টকে মীমাংসা হওয়া উচিত, যা বোঝাপড়ায় স্থির হতে পারে সেক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তি কি বলতে পারে। শোন মণীষা, এ সমস্যা আমার তোমার নয়। এই সমস্যার শিকার কমবেশি সবাই। এক্ষেত্রে তোমাকে এমন কোন প্রস্তাব দিতে পারি না যা সত্যিই

কার্যকরী করা যায়। তবে কি জানো, যদি কিছুকাল মানিয়ে নিয়ে চলা যায় তা হলে আখেরে একটা বোঝাপড়া হয়।

মণীষা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক জানি না। শেষ তো দেখার সুযোগ এখনও আসেনি। তবে বরেণ বিবাহবিচ্ছেদ চায়, এটাই বড় আশঙ্কা।

মুসলমান পুরুষরা নিজেদের খেয়াল-খুশীমত বিয়ে আর তালাক দেবার যে অধিকার ভোগ করে হিন্দুদের ঘরে তা সম্ভব নয়। তাদের আদালতে যেতে হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণগুলো খতিয়ে না দেখে আদালত বিচ্ছেদের আদেশ দেয় না। উভয়পক্ষ যদি সম্মত হয় সেটা সম্পূর্ণ আলাদা। তবুও হিন্দু মুসলমান সবার ক্ষেত্রেই ভরণ-পোষণ দেবার আইন মোতাবেক দায়িত্ব থাকে, সেই দায়িত্ব পালন খুব সহজ নয়।

কিন্তু ওরা যে আমাকে বাধ্য করবে, প্রতিদিনকার জীবন বিষময় করে তুলছে।

আমি বলেছিলাম বরেণকে সঙ্গে করে একদিন আসতে! এসেও ছিল। বরেণকে বুঝিয়েছি। বরেণ বলেছিল, আমি বউয়ের জন্য মা-বাবা পরিবার পরিজন ছাড়তে পারি না।

বলেছিলাম, এত জেনেও তো তুমি বিয়ে করেছিলে।

বরেণ এই কথার কোন উত্তর দেয়নি। বুঝলাম তার ভালবাসার মন্ত্রটি বেসুরে বাজছে তার মনে। ফিকে হয়ে গেছে তার চোখের নেশা। ভালবাসা ও প্রেম দুটোই তার কাছে পণ্যবস্তু, বোধহয় অপর কোন বন্দরে নৌকা ভিড়িয়ে পেছনের বন্দরের কথা ভুলতে চাইছে।

মণীষার ঘটনা মণীষার কাছেই শুনেছি। কোন সময়ই তাকে সমাধানের পথ দেখাতে পারিনি। সংবাদপত্রে যখনই বধূহত্যার ঘটনা পড়ি তখনই শঙ্কিত হই। মণীষাকে এই অন্যায় অবিচারের নারকীয় ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে প্রাণ হারাতে না হয়, এমন কথাই মনে হয়েছে বার বার। আজ মণীষা এসেছে। তবে মনে হল আগের মত ম্লান নয়। অনেক বেশি সবল ও প্রাণবন্ত।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোন সংবাদ আছে মণীষা।

এমন কিছু নয়। আমি বদলির আদেশ পেয়েছি। এবার আমিও খুশী, বরেণও খুশী হবে। কয়েকটা বছরের গ্লানি আর লাঞ্ছনার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

শ্যামলী মণীষার বিষয়ে মোটেই আগ্রহী নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় সাংসারিক ঘটিবাটি, নুন-তেলের বন্ধনে আটকে থাকুক তা সে চায়না। তবুও মণীষার কথা শুনে কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। মণীষা ফিরে গেলে বলল, ভালই হল।

কি ভাল হল?

মণীষামাসীও বাঁচল, বরেণবাবুও। ওরা তবুও সামাজিক অধঃপতনের একটা দিককে উপেক্ষা করতে পেরেছে. যারা অবক্ষয়ের প্রত্যক্ষ শিকার তাদের চেহারা তো নিত্য নৈমিত্তিক।

বললাম, আমার মনে হয় সামাজিক এই অবক্ষয়ের পেছনে রয়েছে আর্থিক অসাম্য। আর বহু শতাব্দী চারদেওয়ালে আটকে থাকতে থাকতে মেয়েরা হঠাৎ একটু স্বাধীনতার স্বাদ পেয়ে ভারসাম্য রাখতে পারছে না। দেওয়াল ভেঙে তাদের মন বহুকাল আগেই ছুটতে চেয়েছে, পারেনি, এবার দেহ আর মন দুটোই ছাড়া পেয়েছে কিন্তু বাইরে এসেই তারা বিপদে পড়েছে আর্থিক দুর্যোগের আবর্তে। তাই কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে স্থির করতে না পেরে ক্রমেই নিজেদের ঠেলে দিচ্ছে অবক্ষয়ের দিকে।

শোনো কাকা, আজ সকালেই দু'জন ভদ্রলোক আলোচনা করতে করতে যাচ্ছিলেন। একজন বললেন, আমরা পলিটিকাল ডেমোক্রাসি পেয়েছি, ইকনমিক ডেমোক্রাসি পাইনি। তাই আমাদের দুর্দশা। আচ্ছা কাকা, ইকনমিক ডেমোক্রাসি বললে কি বুঝায়?

ওরা বোধহয় শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার কথা বলছিল। আর্থিক গণতন্ত্র বলতে কি বুঝায় তা আমার বুদ্ধিরও অগম্য। তবুও শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থায় কিছু আর্থিক সাম্য চিন্তা করা যায়।

শ্যামলী বাধা দিয়ে বলল, তা কি এদেশে সম্ভব।

আমি হাসলাম।

হাসছো কেন? বল না কাকা।

শুনেছিস তো বাঘ হিংস্র হলেও সব সময় নরমাংস ভোজী নয়। যখন খাবারে অভাব হয় তখন তারা মানুষের ওপর চড়াও হয়। আর অন্য জীবজন্তু মারার চেয়ে মানুষ মারা সহজ, ধীরে ধীরে এই বাঘই ম্যানইটার হয়ে উঠে।

মানুষের মনের বাঘ হল ভয়ঙ্কর বাঘ। এই মন যখন ক্ষমতার স্বাদ পায় তখন সেই মন হয়ে ওঠে ম্যানইটারের মত ভয়ঙ্কর। ক্ষমতার বাইরে থাকতে থাকতে বুভুক্ষু মন যখন ক্ষমতার স্বাদ পায় তার পরিতৃপ্তি ঘটাতে ভাল মন্দ জ্ঞান হারায়। কুযুক্তির অবতারণা করে। তুই দুটো পিকনিক পার্টির কার্যকলাপ ভাল ভাবে অনুধাবন করলেই বুঝতে পারবি ক্ষমতা বস্তুটি কি। আর কিভাবে ক্ষমতা তাদের যুক্তিবুদ্ধি বিবেকের বৈরী করেছে।

শ্যামলীকে যা বললাম তা সর্বজন স্বীকৃত। এর আগে আমাদের মহল্লার কমরেড দনুজমর্দনদেব বেশ গর্বের সঙ্গে বলেছিল, আমাদের পার্টি কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তা গরীবদের উপকারের জন্য। দেশে বিপ্লব ত্বরান্বিত করতে।

বললাম, ওরা যা বলছে, তোমরা যা করছ তা সেই হিটলার যুগের সোস্যাল ডেমোক্রাসি ভিন্ন আর কিছু নয়। দল চলেছে অথবা চলবে ক্ষমতাবান ব্যক্তির অঙ্গুলি নির্দেশে। কংগ্রেসের গণতন্ত্রের প্রহরী যেমন একমাত্র রাজীব গান্ধী, তেমনি তোমাদের অধিকৃত রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশই দলের নির্দেশ এবং এটাই নাকি গণতন্ত্র এবং বিপ্লবের পথ।

নিন্দা শুনতে শুনতে আমাদের গায়ের চামড়া শক্ত হয়ে গেছে।

বললাম, তোমরা তো সব কিছুই করছ। তোমাদের রাজত্বকালে মানুষের দুঃখ দুর্দশা শোনা যায় অনেক কমেছে। তবে তোমরা যাতেই হাত দেবে তার অস্তিত্ব খুঁজতে লোকে হয়রান হয়ে যায়।

কমরেড উত্তেজিতভাবে বললেন, তুমি দেখছি সেই চক্রান্তকারীর দলে নাম লিখিয়েছ। প্রগতিশীল চিন্তাধারার অপমৃত্যু ঘটিয়েছ।

তা তুমি বলতে পার। একটা জনশ্রুতির কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কংগ্রেসী রাজত্বকালে, অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে, একবার এক বৃদ্ধা হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর আম দরবারে। অনেক কষ্টে মুখ্যমন্ত্রীর সামনে যেতেই মুখ্যমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি চাই মা। বৃদ্ধা নিজের গলার ঘ্যাঁগ দেখিয়ে বললেন, এতে একটু হাত বুলিয়ে দিন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন, তাতে লাভ কি? বৃদ্ধা বললেন, শুনেছি সরকার যাতেই হাত দেয় তা বাজার থেকে নিমেষে নিরুদ্দেশ হয়। আমার এই ঘ্যাঁগে হাত বুলিয়ে দিলে কষ্টদায়ক ঘ্যাঁগের হাত থেকে মুক্তি পাব। তোমাদের অবস্থাও ওই একই ধরনের।

কমরেড ক্রুদ্ধভাবে হাত পা নাড়িয়ে বললেন, যাচ্ছে তাই। তোমার মত গর্দভ যে কত আছে হিসাব করতে হবে।

বাপু হে, কম্বলের লোম বাছতে গেলে কম্বল থাকে না। বুঝলে, শেষ পর্যন্ত দেখবে সারা দেশ ভর্তি শুধু আমার মত গাধা। মানুষ আর নেই। তবে ভাল কাজও তোমরা করেছ। সেটাও অস্বীকার করি না। অশক্ত বৃদ্ধাদের পেনশান দিচ্ছ, এটা তো মন্দ কাজ নয়। এ রকম হরেক কাজ আছে প্রত্যক্ষ সুফল ভোগ করছে জনসাধারণের একাংশ। কিন্তু বাপধন, বিশ্ববিদ্যালযে তোমাদের কোমল হস্তস্পর্শে যে অবস্থা হয়েছে তা কি কারও অজানা আছে। যেমন কলকাতা তেমন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। মাধ্যমিকের কথা বলে সময় ও সামর্থ্য নষ্ট করে লাভ নাই। আর স্বাস্থ্য। আহা পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে যে সব পালোয়ান সৃষ্টি করেছ, তার একাংশ চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, খুন আর নারী ধর্ষণ করে বেড়াচ্ছে। আর একাংশ কলকাতার ফুটপাতের সংসারে কেউ টি বিতে, কেউ রক্ত আমাশায়, কেউ অন্যান্য কঠিনরোগে ভুগছে। আর হাসপাতাল! বাপ রে। ত্রাস তো উড়ে গেছে। পাতাল আছে। সেখানে লোকে যাচ্ছে ডেথ সার্টিফিকেট পেতে। আর শুনতে চাও।

এ সব কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের জন্য ঘটছে।

তা বটে। কংগ্রেস তো গঙ্গাজল ধোয়া তুলসী পাতা নয়। তাদের সবাই চেনে। যত রকম দুর্নীতি, অসদাচার, অনাচার, সমাজবিরোধী কাজ ঘটছে তার নেতৃত্ব দিচ্ছে কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে, কখনও পরোক্ষ এই সব কংগ্রেসীরা। তাদের তো কানু বিনা গীত নাই। আগে ছিল দেশের কানু ইন্দিরাগান্ধী। এখন দেশের কানু হয়েছে তার পুত্র রাজীব গান্ধী। গোটা ভারতে কংগ্রেস বলতে একমাত্র রাজীব। আর ডিগগ্রেস প্রাপক হল কংগ্রেসের অনুগামীরা।

কমরেড বাধা দিয়ে বলল, আমরা তো কংগ্রেসী নই।

কে বলল? তোমাদের নাম্বুদ্রিপাদ তো বললেন, আমরা কংগ্রেসের উত্তর-পুরুষ।

মিথ্যা কথা। উনি বলেছেন, সাম্রাজ্যবাদ বিতাড়ণের লড়াইতে কমুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের মতই সক্রিয়। বর্তমানে কংগ্রেস পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপোষ করেছে তাদের লড়াই করার ক্ষমতা আর নেই। এবার আমরা লড়াইতে নেমেছি তাই কমরেড জেনারেল সেক্রেটারী বলেছেন আমরা কংগ্রেসের উত্তরপুরুষ।

আমি অবশ্যই মিথ্যাবাদী তবে সত্যবাদী তোমরা যা করছ তার হিসেবটা দিচ্ছি। কংগ্রেসের কানু হল রাজীব তোমাদের কানু রাজ্য ভিত্তিক মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার জ্যোতিবাবু। সব মন্ত্রী এবং দলীয় অনুগামী তার অনুমোদনের জন্য তাকিয়ে থাকে। কারও কিছু করার নিজস্ব ক্ষমতা নেই। যা করে ব্রজের কানাই মুখ্যমন্ত্রী। এটাও মিথ্যা? পুঁজিপতিদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে গোয়েঙ্কার সঙ্গে চুক্তি অবশ্যই বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ। এটাও মিথ্যা? বহুজাতিক পুঁজিকে সাদর আহ্বান নিশ্চয় গরীব বন্ধুদের নতুন চেহারা। এটাও মিথ্যা। আর কর্পোরেশন, পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাঙ্কের টাকার বিনিময়ে তাদের দেওয়া সর্ত বিনা দ্বিধায় হজম করাটা বোধহয় মার্কস সাহেব তোমাদের শিখিয়ে গেছনে। এটাও মিথ্যা? আর সল্টলেকের পিকনিকে যে রাজসিক ভোজ্যপানীয় কমরেডদের পরিতৃপ্ত করেছে তাও বোধহয় গরীবদের বন্ধুর অকৃত্রিম ভালবাসা। আর শীতের রাতে কলকাতার ফুটপাতে একটি মাত্র ছেঁড়া কাপড় গায়ে দিয়ে খোলা আকাশের তলায় কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে লোকে রাত কাটায় তা অবশ্য কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের নিদর্শন। এটাও মিথ্যা? তবে কি জানো, লণ্ঠনের তলায় চিরকাল অন্ধকার থাকে, তাই আত্মসমালোচনা তো করই না। অপরের সমালোচনা তোমরা সহ্য করতে পার না।

কমরেড মিউ মিউ করে বলল, গোয়েঙ্কার সাহায্য, বহুজাতিক পুঁজির সাহায্য নিতে হচ্ছে দেশের বেকারি মেটাতে। যুগধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে তো মার্কস সাহেব নিষেধ করেননি।

বললাম, বাহোবা। প্যামপ্লেট পড়ে কমুনিষ্ট হলে তার বিচার বুদ্ধিকে নেতাদের কাছে রেহান রাখতে হয়, তাই ঘটছে তোমাদের। কংগ্রেস যেভাবে দেশকে রসাতলে নিয়ে চলেছে তার সঙ্গে তোমাদের পার্থক্য যে কোথায় তা এখন গবেষণার বিষয়। তবে কংগ্রেস অনেক দিন আগেই নিমতলায় গিয়েছে অপেক্ষা করছে চিতা সাজাবার। বর্তমানে যে কংগ্রেস সে তো ইন্দিরা কংগ্রেস। অবশ্য আইন বলেছে, এটাই খাঁটি কংগ্রেস। তোমরাও বলে থাক আমরা সাচ্চা কমুনিষ্ট। কিন্তু কংগ্রেস যখন ইন্দিরা কংগ্রেস হয়েছে, তোমরাও ধীরে ধীরে মার্কসকে বাদ দিয়ে হয়েছ মার্কসবাদী কমুনিষ্ট তথা শোধনবাদী কমুনিষ্ট পার্টি। যুক্তিতর্ক তোমরা মান না, তাই লগুড় তোমাদের

প্রধান সহায়। সে লগুড় কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে কেবলমাত্র বিরোধীদের শায়েস্তা করতে। কালোবাজারী মুনাফাখোরদের শায়েস্তা করতে নয়। দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের বশে আনতে নয়। জিনিসের দাম বাড়ছে। তোমরা বলবে, আমাদের এসব আয়ত্তের বাইরে, কেন্দ্র এর জন্য দায়ী। নিশ্চয়ই, কেরোসিন অপ্রতুল, তোমরা কেরোসিন বিক্রির লাইসেন্স যাদের দিয়েছ তারা চোরাপথে তাদের দেশওয়ালি ভাইদের ব্যারেল বোঝাই করে দিচ্ছে চোরাবাজার কায়েম রাখতে। তোমরা তা সংযত করতে পেরেছ?

এটা অতি সামান্য ব্যাপার।

অবশ্যই। রাস্তার ড্রেনের ঢাকনিগুলো চুরি করে যাদের কাছে বিক্রি করছে তাদের পরিচয় কালোয়ার। দেশওয়ালী ভাইয়াদের সাহায্য করতে এই সব কালোয়ার চোরাই ঢাকনা কিনে সমাজের কত ক্ষতি করছে তা নিশ্চয়ই জান। রাস্তার মরণ ফাঁদগুলোতে কতজন আহত হয় তার হিসাব কি রেখেছ? তোমাদের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনী লাঠি-বোমা যথেষ্ট ব্যবহার করে বিরোধীদের ওপর কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তাদের দেখা যায় কেন? কমিশন পায় কি তারা? এ সবই মিথ্যা। অপকাজের ফিরিস্তি দিলে মহাভারত রচনা হবে।

আমরা কি ভাল কাজ করিনি।

অবশ্যই কিছু ভাল কাজ করেছ। সেটা কেউ কি অস্বীকার করে?

কমরেড বললেন, সারা ভারতবর্ষ যে পাপে জর্জরিত অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা, তা এই পশ্চিমবঙ্গে নেই। এটাও তো আমাদের কৃতিত্ব।

বললাম, কৃতিত্বটা অস্বীকার করি না। তবে সাম্প্রদায়িকতা নেই এটা স্বীকার করি না। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানেরা সাম্প্রদায়িক নয়। কারও মনে হয়ত কিছু ক্ষোভ আছে, তা মোটেই বিবেচ্য নয় কিন্তু অবাঙ্গালীরা মাঝে মাঝে দাঙ্গা বাধায় তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বামফ্রন্ট সরকারের কৃতিত্ব হল এই সব হাঙ্গামা সহজেই কঠিন হস্তে দমন করে বিস্তার ঘটতে দেয়নি। আর এই সাম্প্রদায়িকতার স্রষ্টাও বামফ্রন্ট অন্তত আংশিক। ভোটের কাঙ্গাল বামফ্রন্ট নেতারা মুসলমানের তোষণ করতে সচেষ্ট, যার পরিণামে অপর সম্প্রদায়ের মনে বিদ্বেষ জন্মাতে সাহায্য করেছে ও করছে।

অপারেশন বর্গাকে ছোট করে দেখতে চাও বুঝি। এই আইনে গরীব ভূমিহীন চাষীরা কত উপকৃত তাতো জান।

জানি। কিন্তু আইনটা করে গেছে কংগ্রেস। তোমরা তার ফসল তুলছ। তোমরা ফুড ফর ওয়ার্ক নিয়েও গলাবাজী কর কিন্তু এটা কেন্দ্রের জনতা সরকার প্রবর্তন করেছিল, বামফ্রন্ট শুধু চালু করেছে। তাদের কৃতিত্ব কোথায়! তোমাদের ক্ষমতায় যা করতে পার তার কতটা করেছ তার হিসাব দাও। সেই সব কাজের সাফল্যই তোমাদের কৃতিত্ব। ভারতের পূর্বাঞ্চল চিরকাল উপেক্ষিত, এটা সর্বজন বিদিত। হিন্দীওলাদের মনের কথা হল তারাই দেশের শাসক, তাদের উপনিবেশ হল ভারতের বাকি অংশ। এই উপনিবেশের মানুষ

তাদের কৃপার পাত্র। এই কৃপা থেকে বঞ্চিত হলে আর্তনাদ করা যায় তাতে কোনই সুফল প্রত্যাশা করা যায় না। বেতার দূরদর্শন যেমন ইন্দিরা কংগ্রেসের গুণগান করে চলেছে অবাধে। ওমনি হিন্দী প্রচারে নেমেছে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার এবং কংগ্রেস ভারতের একমাত্র প্রতিভূ করার অপচেষ্টা চলছে। আমরা ভাবছি, এরপর কি!

দনুজমর্দনদেব হাল ছাড়বার পাত্র নয়। শেষ কথাটি বলে সে বিদায় নিল। বুঝলে দামু। আমরাই ইন্দিরা কংগ্রেসের একমাত্র বিকল্প।

বললাম, বামপন্থীরা ইন্দিরা কংগ্রেসের বিকল্প এটা স্বীকার করি। তবে তোমাদের বামপন্থাটা আজও ভাল করে বুঝতে পারি না। ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

এসব ঘটনা শ্যামলী কি জানে না? জানে। তবে বলতে সাহস পায় না। আমাকে বার বার ওয়ার্নিং দিয়েছে, কাকা, প্রাণের মায়া থাকলে চুপ করে থেকো।

সত্যিই চুপ করে থাকাই বাঞ্ছনীয়। মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনে হাঙ্গামা এড়িয়ে চলা স্বাভাবিক ধর্ম। রাস্তায় কোন যুবতীকে যদি কেউ বা কারা উত্যক্ত করে আমরা মুখ ফুটে তার প্রতিবাদ করতে সাহস পাই না। পাশের বাড়িতে ডাকাত পড়লে আমরা চিৎকার করে লোক জড় করতেও ভয় পাই। রাস্তায় সমাজবিরোধীরা যখন উত্যক্ত করে তখন মুখ বুঁজে পাশ কাটাই। সম্মিলিত ভাবে প্রতিবাদ জানাবার মনোবৃত্তি আমাদের লোপ পেয়েছে। চাঁদার খাতা নিয়ে জুলুমবাজি করলে আমরা ভয়ে সিঁটকে যাই। শ্যামলী ঠিকই বলছে, চুপ করে থাকাই বোধহয় বুদ্ধিমানের আত্মরক্ষার পথ।

যে অর্থনীতির আবর্তে মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠিত। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় মার্কসীয় দর্শন যে প্রভাব বিস্তার করেছে তা অনুসরণ করে চলতে যে আদর্শ দরকার তা আমাদের নেই। ব্যক্তিগত চরিত্র আদর্শপন্থী না হলে কমুনিষ্ট হওয়া যায় না। এই আদর্শনিষ্ঠ ব্যক্তিরা কোন সময়ই মৃত্যুভয়ে ভীত হয় না। আদর্শের জন্য এরা বহু কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করে। প্রাণ দেয়। আদর্শবান সেই সব মানুষের বড় অভাব। তাই চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

যারা আজ বিপ্লবের কথা বলছে, তারা বিপ্লবের সঠিক অর্থ অনুধাবন করেছেন কিনা সেই প্রশ্ন অনেকের মনে। দেওয়ালে দেওয়ালে বিপ্লব লিখলে বিপ্লব ঘটানো যায় না। আজও বিপ্লবের বাণী দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে ওপারে যেতে পারেনি অথচ বিপ্লবের ফাঁকা বুলি শুনতে শুনতে একদল উচ্চাভিলাষী যুবক সশস্ত্র বিপ্লবের ধারা প্রবর্তনে নেমে পড়েছিল। যারা নিজেদের কাঁচিধুতি আর আদ্দির পানজাবীতে ভাঁজ পড়তে দেয় না তারা যখন বিপ্লবের কথা বলে তখন লোকেরা মুখ ঘুরিয়ে হাসে। তারা জানে না এরপর কি!

ভারত শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়। ইন্দিরা কংগ্রেস মনে করে ভারত শাসনের এক চেটিয়া অধিকার ইংরেজ তাদের দিয়ে গেছে। কংগ্রেসীরা মনে করে তারাই

ভারতের স্বাধীনতা এনেছে এবং তারাই স্বাধীনতার অছি। চরকা আর খদ্দর যদি স্বাধীনতা আনতে পারত তা হলে হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনতার জন্ত প্রাণ দিতে এগিয়ে যেত কি? বরং বলা যায় স্বাধীনতা আন্দোলনকে বার বার বিপথে চালিয়েছেন কংগ্রেসী নেতারা। যাকে বলা যায় স্যাবোটেজ করেছিলেন তারা। তারপর যখন সত্যিই স্বাধীনতা পেলাম তখন দেখা গেল যারা কোনদিন স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে যোগ দেয়নি, এবং পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করেছে তারাই হল স্বাধীনতা আনয়নের দাবীদার। হঠাৎ তারাই হল বড় দেশ-প্রেমিক আর যারা সর্বস্ব দান করেছিল তারা চলে গেল আস্তাকুঁড়েতে।

কমরেড দনুজমর্দনদেব বলেছিলেন, আমরা শ্রেষ্ঠতম দেশপ্রেমিক।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কারণ, কার্য থাকলেই কারণ থাকে। কি কারণে দেশপ্রেমিকের শ্রেষ্ঠত্ব তোমরা দাবী কর।

কমরেড বলেছিলেন, আমরা সংহতি চাই। চাই অখণ্ড ভারত। আঞ্চলিকতা বর্জন করেছি। দেশকে সমৃদ্ধ করতে হলে সংহতি চাই-ই চাই।

বলেছিলাম, বন্ধু, ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। প্রাক স্বাধীনতা যুগে মুসলীম লীগ যখন রমরমা, ভারত তখন ছিল অখণ্ড। তৎকালীন কংগ্রেসও চেয়েছিল অখণ্ড ভারত। সংহতিকে তারা অস্বীকার করেনি কিন্তু সেই প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে মুসলীম লীগের সঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে তোমরা জিগীর দিয়েছিলে, আগে পাকিস্তান মানতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে। তোমরা যে কবে সংহতির জন্য শহীদ হয়েছিলে তা কিন্তু ইতিহাসে লেখা নেই, লেখা আছে উল্টোটা। মুসলীম লীগের দোসর হয়েই ভারত ভাগ করতে চেয়েছিলে। তবে গতস্য শোচনা নাস্তি। বলতে পার, এখন তোমরা সংহতি চাও। অর্থাৎ তোমরা আশা করছ একদিন ইন্দিরা কংগ্রেসের উত্তরাধিকারী হয়ে তোমরা গোটা ভারতে তোমাদের প্রভুত্ব কায়েম করতে পারবে। এই তো?

আরেক দিন কমরেড দনুজমর্দনদেব বললেন, আমরা অসাম্প্রদায়িক। আমাদের কাছে কোন জাতি ধর্মের ভেদ নেই।

বলেছিলাম, অবশ্যই। তোমরা জাতি ধর্মের ভেদ কর না বলেই মুসলীম লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কেরলে সরকার গড়েছিলে। মুসলীম লীগ অসাম্প্রদায়িক, কেরলের ক্যাথলিক পরিচালিত কেরল কংগ্রেস অসাম্প্রদায়িক, তাই জাতি ধর্মের ভেদ না করে তাদের বাহুবন্ধনে নিয়েছিল শুধুমাত্র ক্ষমতা দখল করতে। নয় কি? এরচেয়ে খাঁটি অসাম্প্রদায়িক দল ভারতে আর দ্বিতীয়টি নেই। কোনক্রমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে তোমরা যা করেছ তার তুলনা নেই। ভাবছি, এরপর কি?

কমরেড দনুজমর্দনদেব বললেন, পুরানো দিনে অনেক ভুল হয়েছে তা আমরা স্বীকার করেছি। উপরন্তু সেদিনের সেই কমুনিষ্ট পার্টি আর নেই। বর্তমানের মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টি হল আসল কমুনিষ্ট পার্টি।

বলেছিলাম, অবশ্যই। আঞ্চলিকতাকে প্রশ্রয় দিতে তোমরা আসামের

গণপরিষদকে সম্প্রতি সমর্থন করে প্রমাণ করেছ তোমরা আসল কমুনিষ্ট। উদ্দেশ্য আসাম সরকারকে খুশি রেখে গায়ে গতরে বৃদ্ধি পাবে। চীন ভারত সংঘর্ষের সময় দামী দামী নেতারা আত্মগোপন করেছিল, কেউ কেউ বোঝাপড়া করে গ্রেপ্তার এড়িয়েছিল, উদ্দেশ্য ছিল এই ভাবে সংগঠনকে সতেজ করা। করেও ছিলে। সেই একই রণ-কৌশল নিয়েছ আসামে। বাদাবসম্বাদ করলে শ্রীঘরবাস হতে পারে। তার চেয়ে বোঝা পড়া করে গায়ে গতরে বৃদ্ধি পাওয়া ভাল। শোন কমরেড দনুজমর্দনদেব তোমরা একটা দল। ইন্দিরা কংগ্রেস একটি দল, সমাজতন্ত্রী কংগ্রেস একটি দল, জনতাপার্টি একটি দল, লোকদলও একটি দল। প্রত্যেক দলের আলাদা আলাদা সমর্থক ও সদস্য রয়েছে ভারতের বিভিন্ন স্থানে। জনগণের সমর্থনপুষ্ট হবার একচেটিয়া অধিকার হারিয়েছে সবাই। যে যতই মুখে বলুক আমরা জনগণের প্রতিনিধি, কার্যত কেউ তা নয়। কিছু জনের প্রতিনিধি হলেও জনগণের নয়। যারা দলের পেছনে ঘোরে তারা প্রাপ্তির আশা নিয়েই ঘোরে। এই সব সমর্থকরা হল দোকানের সেলসম্যান, যে দোকানদার বেশি সুখ সুবিধা দিতে পারে তাদের কাছে এরা ভীড় করে। ভাড়াটিয়া লোকের মত সামান্য স্বার্থহানি ঘটলে এক দোকান ছেড়ে আরেক দোকানের সেলসম্যানশিপ নেয়। তোমরাও তাই স্থান বিশেষ বিভিন্ন রণ-কৌশলে অপরকে ভূপাতিত করে ক্ষমতা দখল করতে চাও, যেমনটা অপর দলগুলো চায়।

দনুজমর্দনদেব আমার কথায় খুশি হতে পারেনি। বলাবাহুল্য তবুও আমার মত লোকের অসৎসঙ্গও ছাড়েনি। মাঝে মাঝেই দেখা হলেই কূটতর্ক অনিবার্য হয়ে উঠে। কিন্তু আমরা কেউ কারও বৈরী নই।

আমরা বোধহয় এবিষয়ে পাকা জহুরী। সে আমাকে বলত, সবাই ভাল। মন্দ যা কিছু আমার আর তোমার ভূষণ।

বলার কারণটা অন্য।

সংসদ নির্বাচনে অভাবনীয় কংগ্রেসী সাফল্য উৎফুল্ল হয়ে ইন্দিরা কংগ্রেসের কোন এক পোড় খাওয়া নেতা কারণ সেবনে বেসামাল হয়ে অনেক অবান্তর উচ্ছ্বাস জানাতেই আমরা কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের ই-কং নেতা গর্বের সঙ্গে বলল, শালারা ভেবেছিল আমরা কর্পূরের মত উপে গেছি দেশ থেকে। দেখলে তো।

অমিয়া হেসে বলল, কর্পূরের গন্ধটা তো উপে যায়নি। তোমার মুখ থেকে তা ভেসে আসছে আমাদের নাসারন্ধ্রে।

ই-কং নেতা থেমে গেল। পকেট থেকে এক মুঠো সুপুরি এলাচ মুখের মধ্যে ছুড়ে দিয়ে বলল, আজ বড় আনন্দের দিন, তাই একটু ইয়ে করেছি। রাগ করনা অমিয়াদি। দেখলে তো নীরেন ঘোষ, সমর মুখুজ্যে, সোমনাথ চাটুজ্যে কুপোকাৎ বাবা, চালাকি পেয়েছে। ইউনিয়নের টাকায় বউ ছেলে নিয়ে দিব্যি আরামে ছিলে, এবার কি হবে বাছাধন। হাঁ কমুনিষ্ট বটে সোমনাথ চাটুজ্যে। ব্যারিস্টার বাপ, হাইকোর্টে জজ, তৎপুত্র ব্যারিস্টার সোমনাথ। ফিসের টাকা

কড়ায় গণ্ডায় পকেটস্থ না করে গরীবের মামলা করে না। এমন লোক কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি। ভাঁওতা বাজি কত দিন চলবে বাপধন!

অমিয়া বলল, তোমরা তিরিশ বছর কাটিয়েছ ভাঁওতা বাজি করে, এরা আর এমন কি করেছে, যাতে গালমন্দ করছ। বিশেষ করে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে নিজেকে ছোট করছ। তোমরা যা করেছ ইতিহাসের পাতায় সমকলঙ্কের ছাপ কোথাও খুঁজে পাবে না।

ই-কং নেতা জবাব খুঁজে না পেয়ে বলল, তবুও জিতেছি।

নির্বাচনে হারজিত দিয়ে জনমন যাচাই হয় না। বিশেষ করে বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি মোটেই জনমন যাচাইয়ের যন্ত্র নয়।

অমিয়াদি তুমি বড়ই বাঁকা বাঁকা কথা বল।

কারণ, কথাগুলো সত্য। নির্বাচনে রিগিং হচ্ছে, বুথ দখল হচ্ছে, মিথ্যা ভোট দিচ্ছে। এসব নোংরামি দিয়ে কি জনমনের পরিচয় পাওয়া যায়। নির্বাচনের পর তোমরা যদি স্বীকার কর এটাই জনমনের পরিচয় হয় তা হলে সেই নির্বাচিত সরকারগুলোকে সংবিধানের অজুহাতে গায়ের জোরে তোমরা বাতিল করতে পারতে কি? সংবিধানের প্রতি যদি তোমাদের আনুগত্য থাকত তা হলে আঞ্চলিক দলগুলো কি তাদের স্থান গড়ে নিতে পারত বিভিন্ন রাজ্যে। তোমরাই আঞ্চলিক দল গঠনে মদত দিয়েছ অথচ তাদের সহ্য করতে পারছ না। আঞ্চলিক দলগুলো ক্ষমতা দখল করলেই তোমরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে যত রকম অপকৌশল অবলম্বন করে থাক। কেন?

তুমি ওদের হয়ে ওকালতি করছ অমিয়াদি।

অমিয়া হেসে বলল, ওদের সমালোচনা করলে ওরা বলে চক্রান্ত, তোমাদের সমালোচনা করলে তোমরা বল দেশদ্রোহী। অভিধানে আর কোন শব্দ খুঁজে পাওনা বুঝি। তোমরা জম্মু-কাশ্মীরে যে খেলা দেখিয়ে ফারুক মিঞাকে ঘর ছাড়া করেছ তা কতটা গণতন্ত্র সম্মত বলতে পার? সিকিমে তো ডিগবাজি খেয়ে চুপ করে গেছ। দুটোই প্রান্তিক রাজ্য। এই দুটোতেই তো শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে তোমাদের সচেষ্ট থাকা উচিত। অথচ তোমরা নানাভাবে এইসব রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে দিব্য নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছ। অন্ধ্রে যে কেলেঙ্কারী করলে তার নজীর পাওয়া ভার। অতীতে কেরলে একই খেলা দেখিয়েছিল জওহরলাল তৎকালীন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট তথা তার কন্যার পরামর্শে। অথচ তোমরা বলছ, আমরা ভাঁওতাবাজি করি না। আশ্চর্য তোমাদের যুক্তি যার সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই।

বামপন্থী দলগুলো কি এর বাইরে।

অমিয়া গম্ভীরভাবে বলল, পাঠশালার পড়ুয়াদের মত কথা বলছ কমরেড। রাম যদুকে মেরেছে। পণ্ডিতমশায় বেত তুলতেই রাম বলল, পণ্ডিতমশায় হরিও মাধবকে মেরেছে। রাম মনে করল এতে তার দোষ মুক্তি ঘটবে। বামপন্থী ভাঁওতাবাজি করছে তাই তোমাদের ভাঁওতাবাজি একেবারে গঙ্গা জলে ধোয়া

তুলসী পাতা। বামপন্থীরা আত্মসমালোচনাও কখনও কখনও করে, দোষ স্বীকার করে, ভুল স্বীকার করে অথচ তোমরা হেঁড়ে গলায় তোমাদের দোষত্রুটির সমর্থনে কুযুক্তির অবতারণা কর, আত্মসমালোচনা তো দূরের কথা। আজ সবাই শঙ্কিত। তোমাদের ইন্দিরা কংগ্রেসে কোন নির্বাচন হয় না। দিল্লীর খেয়াল-খুশিতে রাজ্যের ই-কং সভাপতিরা গদীচ্যুত হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীরা গদী হারিয়ে হারাধনের দশটি ছেলের মত কেঁদে বেড়াচ্ছে, আবার নির্বাচিত রাজ্য সরকার-গুলিকে যে কোন সময় বরখাস্ত করে চরম অন্যায় সাধনে ব্রতী হয়েছে। অবশ্য দিল্লীর হাইকম্যাণ্ডের নামে যা হচ্ছে তা একমাত্র একজনের ইচ্ছাতেই তা হচ্ছে, এবং এই প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হলেন প্রধানমন্ত্রী, অতীতে ইন্দিরা গান্ধী আর বর্তমানে তস্য পুত্র রাজীব গান্ধী। এগুলো ভাল করে ভেবে দেখবে। তবে তোমরা হলে বেকুবের দল, উঁচুতলার নেতারা যা কিছু চেঁছেপুঁছে খেয়ে ছিবড়ে রাখে তোমাদের জন্য। ভাগে কম পড়লেই তোমাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আর খুন-খারাপি চলে নিজেদের মধ্যে আর বামপন্থীরা তোমাদের মত বেওকুফ নয়, তারা নীচের তলা থেকে উপর তলা পর্যন্ত সবাই ভাগাভাগি করে নেয় যৌথ পরিবারের সদস্যরূপে। তাই তাদের বিশৃঙ্খলা কম চোখে পড়ে।

ই-কং নেতা সেদিন বিরত হলেন। বললেন, data উপস্থিত করে তবেই তর্ক করবেন। আমরাও খুশি হলাম। এতক্ষণ আমি ছিলাম শ্রোতা। অমিয়া আমার দিকে একবার তাকিয়েও দেখেনি। ই-কং নেতা চলে যেতেই বলল, তুই তো কিছু বললি না।

বললাম, বলার বাকি তো কিছু ছিল না। আর এসব কূটতর্কে আমার রুচিও বিশেষ নেই।

ই-কং নেতা বিরত হলেও কমরেড দনুজমর্দনদেব মোটেই রেহাই দেননি আমাকে। পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটতে কোমর বেঁধে হাজির হলেন একদিন। বললেন, তুমি তো আমাদের মন্দটাই দেখে যাও। ভাল কিছু দেখ কি ?

বললাম, ভাল যে করে অথবা যারা করে তাদের প্রশংসা না করা গুরুতর অন্যায়। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা এনেছে এটা স্বীকার কর কি ?

না স্বীকার করি না। ই-কং যে সব অনাচার শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়েছিল তা আংশিক শুধরে দিয়েছি আমরা। পরীক্ষায় নকল করা ছিল সার্বজনীন। সেটা বন্ধ হয়েছে। সময়মত পরীক্ষা হচ্ছে, পরীক্ষার ফল বেরুচ্ছে। আমরা উচ্চমাধ্যমিক অবধি বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা করেছি। এগুলো তো প্রশংসার যোগ্য, নয় কি ? তবুও তোমরা নিন্দা কর।

অবশ্যই প্রশংসা তোমাদের প্রাপ্য কিন্তু কিছুকাল যাবত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাতে পরীক্ষা নেওয়াও যেমন অসম্ভব হয়েছে তেমনি পরীক্ষার ফলও সময় মত বেরুচ্ছে না। কলকাতা, যাদবপুর আর বিধানচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় তো ধীরে ধীরে বোমার কারখানায় পরিণত হতে চলেছে।

স্নাতকোত্তর পাঠ শেষ করে যারা দেশের প্রশাসনে, দেশের গৌরব বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশ নেবে তারা যদি বোমা ফাটায়, মারামারি করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তখন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে জনসাধারণ। এইসব যুবক-যুবতীর হাতে দেশের হাল ধরার দায়িত্ব দিলে ভারতের মত দেশের ভাঙ্গা নৌকা ডুবি অবশ্যম্ভাবী। এর কারণ, তোমরা রাজনীতিকে এমনভাবে ছাত্র সমাজে প্রবেশ করিয়েছ যার পরিণতিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে আচার্যকেও কটূক্তি করতে মোটেই দ্বিধা করছ না। অথচ এই নিয়োগের আইন তোমাদেরই তৈরী। আর উচ্চমাধ্যমিকে বিনা বেতনে পড়ার যে সুযোগ তোমরা করেছ তা সুদে-আসলে উশুল করছে স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ। নানা রকম ফিসের বহরে অভিভাবকরা চোখে সর্ষের ফুল দেখছে। ইংরেজি উঠিয়ে দিতে তোমরা আদাজল খেয়ে নেমেছ, অথচ তোমাদের বড় বড় কমরেডের ছেলে ইংলিশ মিডিয়ামে যাচ্ছে। কারণ, তোমরা চাও দেশে দুটো শ্রেণী, অভাজন আর সুখীজন। অভাজনদের তো কোন ভবিষ্যত নেই, তাই সুখীজনরা বড় বড় নোকরির পথ খুলে রাখছে তাদের লাল্টু ছেলেদের জন্য। যেটুকু ভাল তা স্বীকার করছি, প্রশংসা করছি কিন্তু তার উল্টো পিঠটা দেখতে ভুলে গেলে কি সমাজ রক্ষা সম্ভব হয়।

তারপর!

তারপর কি? শিক্ষার পর ভরসা নেই, তাই কেন্দ্রীয় সরকার যে শিক্ষানীতি চালু করতে চাইছে তা যে কত বেশি জনস্বার্থবিরোধী তা কি তোমরা জনসাধারণকে বুঝিয়েছ? কেন তোমরা চুপ করে রয়েছ। সর্বনিম্ন শৃঙ্খলাটুকুও তোমরা মানতে চাও না। তা যদি করতে তা হলে তোমাদের শিক্ষানীতি জনমুখী হত, তোমরা কেন্দ্রের শিক্ষার নামে যে ধাপ্পাবাজি তা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসতে।

আমরা পশ্চিমবঙ্গের খেলাধুলায় কত বেশি উৎসাহ দিচ্ছি তা তো জান। যুবভারতীর মত ক্রীড়াঙ্গন গোটা এশিয়াতে খুঁজে পাবে না। সব রকম খেলা-ধুলার উৎসাহ দিচ্ছি আমরা তার জন্য অর্থ ব্যয়ও করছি।

এটা অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। খেলায় উৎসাহ দিলেই খেলোয়াড় তৈরী হয় কি কমরেড! ডাঁটা চচ্চড়ি খেয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় মান লাভ করা যে মোটেই সম্ভব নয় সে কথাটা ভুললে চলবে না। খেলোয়াড় তৈরী করতে হলে তাদের যে পুষ্টির দরকার তা কি অস্বীকার কর? বোখুমের বিরুদ্ধে যে দল যুবভারতীতে খেলল তারা কেউ কেউ একশাথী, দেড়শাথী মনসবদার অথচ কোথায় তাদের স্কিল, খেলার মত দেহ ও সামর্থ্য? গোটা শহরে কতকগুলো বিশ-পঁচিশ তলা বাড়ি করলে বস্তির মানুষদের নগ্ন দারিদ্র্য যেমন ঢাকা যায় না, তেমনি বিরাট স্টেডিয়াম গড়লে খেলোয়াড়দের অযোগ্যতা ও অক্ষমতা ঢাকা যায় না। সুষ্ঠু পরিকল্পনা করেছ কি কখনও? ভোটের দালাল পয়সা দিলে পাওয়া যায় কিন্তু খেলোয়াড় তৈরী না করলে খেলোয়াড় পাওয়া যায় না।

অতঃপর!

তোমাদের কাজ হল আমাদের দোষ খুঁজে বেড়ানো।

ঠিক বলেছ কমরেড। মক্ষিকাঃ ব্রণং ইচ্ছন্তি। আমরা মক্ষিকা ব্রণ খুঁজে বেড়াই, এই তো তোমার বক্তব্য। তবে মিত্রের কথা যেমন শুনবে, শত্রুর সমালোচনা তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ করবে। তবে সার্থকতা আসবে।

কমরেড দনুজমর্দনদেব হাল ছাড়ার পাত্র নন। সময়াভাবে সেদিন ফিরে গেলেও অবসর সময়ে আসতেন। আগে যেমন উত্তেজিত হতেন আজকাল আর তেমন উত্তেজিত হন না। বোধহয় বুঝতে পেরেছেন, জনমত কিছুটা তাদের প্রতিকূল।

বিদ্যুৎ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। বলেছিলাম, বিদ্যুৎ ঘাটতিটা কংগ্রেসী রাজত্বকালের। আমরা কতটা বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারব তার হিসাব না করেই পাইকারী হারে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পোন্নয়ন ঘটাতে কলকারখানা বসানো হয়েছিল। এরজন্য কোন পরিকল্পনা ছিল না, অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের পরামর্শ নেওয়া হয়নি। এই পাপ কংগ্রেসী আমলের, সেই পাপের বোঝা বহন করছে পরবর্তী সরকাররা তবে বর্তমানে বিদ্যুৎ ঘাটতির অন্যতম কারণ অযোগ্য পরিচালন ব্যবস্থা, সেটা তোমাদের সৃষ্টি। ট্রেড ইউনিয়নের নামে কুৎসিত দলাদলি, মারপিঠ এবং সাজসরঞ্জাম বেপরোয়া চুরি। এগুলো তোমরা সংযত করতে পারতে কমরেড। এসব করতে পারনি, শুধু পার্টি কমরেডদের মুখ চেয়ে যারা দলাদলি করে ও প্রশ্রয় দেয়, অশান্তি সৃষ্টি করে, কাজে ফাঁকি দেয়। যারা চুরি করে তাদের একাংশ তোমাদের সদস্য অথবা সমর্থক, চোরাকারবারী ভিন্ন রাজ্যের লোককে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে ভিন্ন রাজ্যের যারা পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সদস্য তাদের মধ্যে শক্তিশালী, প্রভাবশালী, ক্ষমতাশালী কোন কোন বিধানসভার সদস্য থানায় ফোন করে থানাদারকে এসব বিষয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ করেন। ইনি তোমাদেরই শাসকগোষ্ঠীর একজন বামপন্থী। এসব তো সবাই জানে। তাই বিদ্যুৎ বিপর্যয় কমানো সম্ভব হচ্ছে না।

কমরেড দনুজমর্দনদেব পরিসংখ্যান দিয়ে বললেন, অন্য রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা অনেক ভাল।

পরিসংখ্যান অনুসারে তা ঠিক। ঘটনা তা নয়। যত সমাজবিরোধী ঘটনা ঘটে তার অর্ধাংশও থানার গোচরে আনা হয় না। সাধারণ মানুষ থানায় সহজে যেতে চায় না। নিরুপায় হয়েই যায়। সামান্য ঘটনা নিয়ে থানায় গিয়ে নিজেদের মর্যাদা নষ্ট করার মত মনোভাব খুব কম লোকেরই থাকে। তবে গুরুতর ঘটনা, যেমন খুন, ডাকাতি ইত্যাদি ঘটলে না গিয়ে উপায় থাকে না কিন্তু তোমরা তো পুলিশকে জনসেবার মেরুদণ্ড করে গড়ে তুলতে পারনি। তোমরা তাদের মনে ও কাজে রাজনীতির প্রভাব সৃষ্টি করে এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছ তাতে পুলিশ মনে করে তারা প্রভু আর যারা সাহায্যপ্রার্থী তারা তাদের ভৃত্য। এটা তোমাদের একার দোষ নয়। এটার উৎস হল কেন্দ্র। তারা যেমন মনে করে হিন্দীভাষীরা প্রভু আর বিভিন্ন ভাষাভাষীরা তাদের উপনিবেশে

বসবাসকারী কৃপার পাত্র, তোমাদের পুলিশ তার ব্যতিক্রম নয়। তোমরা পুলিশকে হাই হ্যাও দিয়েছ, ফল ভুগছে জনসাধারণ।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, পুলিশ বিচারক নয়। অথচ বিচারকের ভূমিকা নেয় পুলিশ। বিহারে ডাকাতি দমনে অক্ষম পুলিশ সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিয়েছিল, কেন? তারা বিচারকের ভূমিকা নিয়ে পাশব শাস্তি দিয়েছে অপরাধীকে নয়, সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে। এরকম ঘটনা তোমাদের রাজত্বেও ঘটছে। হাজতে আসামীদের বেধড়ক প্রহার, অমানুষিক অত্যাচারে বহু সন্দেহভাজন ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছে। ইদ্রিসের মৃত্যুর কোন ফয়সালা তোমরা করতে পারনি। যারা সন্দেহভাজন তাদের ভরসায় তোমাদের ইমারতের স্থায়িত্ব। নকশাল আন্দোলনের সময় সন্দেহভাজন যুবকদের যেভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল তা তদন্তে প্রকাশ পেলেও তোমরা নীরব কেন? কারণ, এইসব অমানুষিক অত্যাচারীদের উপর ভরসা করে তোমাদের চলতে হচ্ছে।

কমরেড দনুজমর্দনদেব চুপ করে শুনছিল। আমিও থেমে গেলাম ছোটকু দু-কাপ চা এনে বলল, দিদিমণি এসেছে ছোটকর্তা।

দিদিমণি অর্থাৎ অমিয়া।

বললাম, বসতে বল। আমি আসছি।

কমরেডের দিকে তাকিয়ে বললাম, ইন্দিরা কংগ্রেস যা করেছে তার চেয়ে ভাল কিছু কি করেছ তোমরা? ওরা বরানগরে ও অন্যান্য স্থানে পাইকারী হারে নরহত্যা ও লুণ্ঠন করেছিল। এমন কি মেয়েরাও রেহাই পায়নি। তেমনি তোমাদের সময় কসবার প্রভাত সরকারের অনুগামী আনন্দমার্গীদের হত্যার কোন কিনারা কি হয়েছে? কত যে ব্যাঙ্ক ডাকাতি হচ্ছে তা তোমার অজানা নয়। পুলিশ বলছে, দু-একটা বাদে সব ডাকাতির আসামী ধরা পড়েছে। বমাল ধরা-পড়েছে। তোমরা খবর নিলে জানতে পারবে ডাকাতির যে টাকা উদ্ধার হয় তার বড় একটা অংশ সরকারে জমা পড়ে না। পাঁচলাখ টাকা উদ্ধার হলে তিনলাখ টাকা জমা পড়ে এমন সংবাদ অনেকেই দিয়ে থাকে, বাকি টাকাটা কোথায় যায় তার হদিস কি তোমাদের কমরেড মন্ত্রীরা করেছেন কখনও। এসব আলোচনা আর করা উচিত নয়। কমুনিষ্ট পার্টির আদর্শকে তোমরা গলা টিপে মেরেছ শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে। ক্ষমতা তোমাদের সামনে দুর্নীতির পথ খুলে দিয়েছে। এটাই দুঃখের বিষয়। এই দুর্নীতির ফিরিস্তি দিয়ে শেষ করা যাবে না। তবে জনসমাজ কোন কালেই অন্যায়কে ক্ষমা করবে না, এটা ভুলে যেওনা। পরের দিনের চিন্তাটাও করবে।

অমিয়া বলল, চল আমরা ভারত দর্শনে বের হই।

বলেছিলাম, কলকাতার উপকণ্ঠে বসেই আমরা ভারত দর্শন যা করছি তারপর আর দরকার হয় না।

অমিয়া বলেছিল, এখনই ভারত দর্শনের শেষ সুযোগ। এরপর সংহত ভারত

দেখার সৌভাগ্য হয়ত হবে না।

বললাম, কি বলছিস অমু। সংহত ভারত চিন্তার বাইরে অন্য কোন চিন্তা থাকা উচিত নয়, থাকবেও না।

তুই না ভেবেই কথা বলছিস। রাজ্যে রাজ্যে আঞ্চলিক দলগুলো শক্ত খুঁটি গেঁথে বসছে। সর্বভারতীয় দলগুলো ক্রমে ক্রমে হটে যাচ্ছে। এই সব রাজ্য অধিক ক্ষমতার দাবীদার। শেষ পর্যন্ত জল কোথায় গড়াবে তা বলা কঠিন। জম্মু-কাশ্মীর ন্যাশন্যাল কনফারেন্স তো প্রথম অবধি তাদের দাবী জানিয়েছে। এর জন্য জম্মু-কাশ্মীর ভারতে অচ্ছেদ্য অংশ হয়েও বিশেষ কতকগুলো সুবিধা ভোগ করে।

ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে আঞ্চলিক দলের অভ্যুত্থান কোনই সংকট সৃষ্টি করবে না বরং তাদের নিজ নিজ সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত ক্ষমতা ও সুযোগ পেলে ভারত যুক্তরাজ্য আরও শক্তিশালী হবে। যুক্তরাজ্য অর্থাৎ ফেডারেল সরকার পৃথিবীর বহু দেশ আছে। সে সব দেশ ভেঙ্গে পড়েনি, দুর্বলও হয়নি। সে সব দেশের কেন্দ্রীয় সরকার যথেষ্ট শক্তিশালী এবং জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন।

কথাটা ঠিকই বলেছিস দামু, ভারত নামেই যুক্তরাজ্য। কেন্দ্র সব ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। কেন্দ্রীয় সরকার ইন্দিরা গান্ধীর আমল থেকে কুখ্যাত স্বৈরতন্ত্রী। এই যে সেদিন ই-কং-এর কোন শক্তিমান সদস্য বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা কংগ্রেসে ডেমোক্রাসি নেই আছে প্রিয়ক্রাসি। কথাটা আংশিক সত্য, যদি বলা হত ইন্দিরা কংগ্রেস ডেমোক্রাসি নেই আছে হিপোক্রাসি, যার সৃষ্টি হল প্রিয়ক্রাসি, আখেরে জুটেছে অটোক্রাসি, তাহলে ঠিক বলা হত। অটোক্রাসিতে ফেডারেল সরকার গড়ে উঠে না। তাই আঞ্চলিক দলগুলো ধীরে ধীরে শক্তিশালী হযে উঠছে আর তার দায়িত্ব ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর যিনি কংগ্রেসের একমাত্র চিফ অব্ স্টাফ্। সংবিধান বিরোধিতা না করেও বলা যায় কেন্দ্রীয় সরকার দলীয় স্বার্থে সংবিধানকে অসম্মানিত করছে বার বার। উপরন্তু সব ক্ষমতা কেন্দ্রের কুক্ষিগত থাকায় ভারতের বহু রাজ্য উপেক্ষিত ও বঞ্চিত। তারা এবার নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চায়।

তোর কথা হল তেলেগু দেশম্, আসামে গণপরিষদ, সিকিমে জাতীয় দল, আন্না ডি-এম-কে প্রভৃতি দল ক্ষমতা লাভ করে ভারতে সংহতি বিপন্ন করছে? তা সম্ভব নয়। সংসদীয় রাজনীতিতে কেন্দ্রে বিকল্প সরকার গড়া সম্ভব, তাতে ভারতের অখণ্ডতা বিপন্ন হবার কোন আশঙ্কা নেই।

অমিযা বলল, বিকল্প সরকার কেন্দ্রে এককভাবে কেউ গঠন করতে পারবে না, এটা আকাশকুসুম। অকংগ্রেসী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতারা মিলিত হয়ে কনক্লেভ তৈরী করার স্বপ্ন দেখেছিল, এই কনক্লেভ ভবিষ্যতে বিকল্প সরকার ঠিক করবে কেন্দ্রে এটাই ছিল তাদের আশা। কিন্তু ভারতীয় চরিত্র

মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে এমনভাবে একসূত্রে বাঁধা যার প্রত্যক্ষ ফল হল পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, কলহ ও বিশ্বাসঘাতকতা। এই কনক্লেভ প্রভৃতি আগারেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পরলোকগমন করেছে। যেমন করে জনতা সরকারের পঞ্চত্বলাভ ঘটেছিল। এবার কোন সরকার গঠন করার আগেই কনক্লেভের মৃত্যু ঘটেছে। চারবার মিলিত হয়েও পঞ্চমবার মিলিত হতে পারেনি নেতৃত্বের গদী নিয়ে টানাটানিতে। আর কে সাম্প্রদায়িক আর কে অসাম্প্রদায়িক তা স্থির করতে আজও গবেষণারত ভারতের তথাকথিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতারা। অর্থাৎ, মিলিত শক্তি গড়ে তোলার যোগ্যতা ও ক্ষমতা আমাদের নেই।

বললাম, তবুও এবার কোরাম তৈরীর চেষ্টা চলছে।

সেটাও ব্যর্থ হবে। একই কারণে। তাই শক্তি সঞ্চয় করবে আঞ্চলিক দল।

তোমার কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তাদের প্রশাসন পরিচালনার জন্য কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

সেটাই তো আঞ্চলিক দলরা চায় না। সবাই সম্যকভাবে বুঝতে পেরেছে ভারতের সব সম্পদ হিন্দীভাষী ও কংগ্রেস শাসিত অঞ্চলের জন্য জমা করছে। অন্যান্য অংশ পাচ্ছে কেবলমাত্র দিল্লীর করুণা। অথচ বলছে ভারত যুক্তরাজ্য কিন্তু কয়েক দশক এই অসত্য প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছে অনেকেই এখন সময় এসেছে সব কিছুর ফয়সালা করার। আঞ্চলিক দলগুলো তাই অধিক অর্থ ও ক্ষমতার দাবী জানিয়েছে।

তুই কি মনে করিস আঞ্চলিক দল জনসাধারণের আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করতে পারবে। আসামে গণপরিষদ সরকার গঠন করেছে। প্রথম অসুবিধা হল তারা যে গরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছে তা মোটেই নির্ভরশীল নয়। কংগ্রেসের বেচা-কেনা প্রকল্প এই গরিষ্ঠতা যে কোন সময় গণেশ উল্টে দিতে পারে। অসম গণপরিষদের সব সদস্যই তো অসমীয়া ভাষাভাষী নয়। তাই আনুগত্য প্রায়ই সন্দেহজনক মনে হবে। অবশ্য আমরা চাই এই সরকার সাফল্যলাভ করুক, যা প্রমাণ করবে তারুণ্যের জয়। কিন্তু সবকিছুই ভবিষ্যতের গর্ভে।

শক্ত হাতে প্রশাসন চালাচ্ছে অসম গণপরিষদ। প্রথমেই অনভিপ্রেত আমলাদের নব বিন্যাসের সামিল হয়েছে।

এখানেই ভুল হয়েছে। সব আমলাই Loyal to service, প্রভু বদল হয়, নীতি বদল হয়। তাৎক্ষণিক প্রভুর নীতি কার্যকরী করাই তাদের ধর্ম কর্ম ও মোক্ষ। এরা কেউ-ই অপরাধী নয়।

তোর কথায় মনে হচ্ছে তুই আঞ্চলিক দলগুলোকে সহ্য করতে চাস না দামু।

ঠিক তা নয়। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতান্ত্রিক ও গণতন্ত্রী দেশ। এখানে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে দল তাদের আদর্শ ও নীতি নিয়ে, এটাই কাম্য। এতে সর্বভারতীয় রূপ থাকবে, সংহতি বজায় থাকবে, ঐক্য অটুট থাকবে। যুক্তরাজ্য গঠনের অজুহাতে সাম্প্রদায়িকতার নানা চেহারাকে সমর্থন করা ঘোরতর অন্যায়।

আজ আমরা মনে করছি আমরা হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের শিকার হয়েছি, আঞ্চলিক দল ক্ষমতায় এলে সংখ্যালঘিষ্ঠরাও মনে করবে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের করুণায় বাঁচতে বাধ্য হচ্ছে।

এই সমস্যার সমাধান ঘটাতে পারে কেন্দ্রের যুক্তিযুক্ত কর্মপদ্ধতি। সেখানেও যুক্তিযুক্ত কর্মপদ্ধতির অভাব ঘটেছে তাই অশান্তি সর্বত্র। এক শ্রেণীর নাগা যুথবদ্ধ হয়ে লড়াই করছে স্বাধীন নাগাভূমির জন্য, এক শ্রেণীর মৈতি লড়াই করছে স্বাধীন মণিপুরের জন্য। এক শ্রেণীর মিজো লড়াই করছে, স্বাধীন মিজোরাজ্য গড়তে, একশ্রেণী ত্রিপুরার জনজাতি লড়াই করছে স্বাধীন ত্রিপুরার জন্য, এক-শ্রেণীর শিখ লড়াই করছে স্বাধীন খলিস্থান পেতে, ভারতে নবাগত বহু নেপালীদের উত্তেজিত করে গোর্খাল্যাণ্ডের স্বপ্ন দেখছে দার্জিলিং-এ, এই অশান্তির মূলে রয়েছে শাসকদের অথর্ব রাজনৈতিক চিন্তা এবং অনুদার যুক্তিহীন কর্মপদ্ধতি। অশান্তি সর্বত্র। এমন কি এই পশ্চিমবঙ্গে অতি সামান্য সংখ্যক উর্দুভাষী মুসলমানেরা দাবী করছে উর্দুকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য ভাষা করতে, তারা শাহবাবুকে আক্রমণের কেন্দ্র করে বন্ধ ডেকে অশান্তি সৃষ্টির চারা রোপণ করার অপচেষ্টাও করেছে। গুজরাটে সংরক্ষণ নিয়ে যে আন্দোলন চলছিল তাও সাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করেছে। এই সব সমস্যার সমাধান কে করবে, কবে করবে তা জানে ভবিষ্যত। এমন সময় আঞ্চলিক দলকে স্বাগত করার কোন অর্থ হয় না। এরা ফোরাম গড়তে চায় কংগ্রেসের বিকল্প দল হিসাবে। এই যে সাময়িক উত্তেজনা এতে সুফল হবে কি না সন্দেহ। আমরা তো জনতা সরকারের চেহারা দেখেছি। সংঘবদ্ধ হবার পর দেখা দেবে কয়েক ডজন রাজনারায়ণ আর চরণসিংহ যাদের ক্ষমতার লোভ স্থায়ী সরকারকে অস্থায়ী করে জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি করবে।

ঠিকই বলেছিল দামু। আমরা এটা চাইনা। তবে স্থায়ী সরকারের অর্থ তো স্থায়ীভাবে দুঃখ দুর্দশাকে জনসাধারণের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া নয়। গণতন্ত্রে সরকার বদল হওয়া একটা অত্যাবশ্যক অলিখিত কানুন কিন্তু ভারতবর্ষে তা কখনও সম্ভব হবে কি? বিকল্প সরকার কেন্দ্রে গড়বার মত সর্বভারতীয় কোন রাজনৈতিক জোট আজ অবধি ঠাঁই করতে পারেনি। সর্বভারতীয় বিকল্প সরকার গড়ার মত কোন দল ভারতে গড়ে উঠতে পারত তাহলে কংগ্রেসের শতবার্ষিকী উৎসবের মত পিক্‌নিক্ পার্টি বসত না বোম্বাইতে। ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম দিবস অথবা মৃত্যু দিবস পালনের নামে কোন একটি পরিবারের গুণগরিমা ফলাও করে জনসাধারণের পয়সায় জাহির করা যেত না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের জন্ম অথবা লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যু উপলক্ষে তো এমন ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান করা হয়নি। শুধু তাই নয়। সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলো মুখর হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে। প্রতিবাদ করার মত দল ভারতে নেই, যারা আছে তাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে প্রতিবাদ জানাবার সাহসও পায় না। প্রতিবাদ জানালে যদি তারা ক্ষমতাচ্যুত হয় এটাই তাদের মুখ্য বিবেচ্য বিষয় দেশের

মানুষের মনের কথা ওরা শুনতে চায় না।

বললাম, যেমন একটা নির্বাচনের ফলাফল দিয়ে মানুষের মনের কথা জানা যায় না তেমনি সরকারের একটি কাজ দিয়ে সব কাজের বিচার করা যায় না। সংসদীয় নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসের সাফল্য বিরাট। পরবর্তী কালে বিধানসভার নির্বাচনে তাদের পরাজয়ও বিরাট ঘটনা। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেগড়ের ভাষায় বলা যায় বিধানসভায় নির্বাচন কালে রাজীব গান্ধী কয়েকটি বিরাট ভুল করেছিলেন। সংসদ নির্বাচনের সাফল্য তাকে ভারসাম্যহীন করে তোলে, রাজীব প্রচার করলেন, রামকৃষ্ণ হেগড়ের জনতা সরকার কর্ণাটকের কোন উপকারই করেনি। কিন্তু এই অসত্য প্রচারই তার দলকে জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। যে ভুল ইন্দিরা করেছিল সেই ভুলই রাজীব করেছেন। স্তাবক পরিবৃত হলে রাষ্ট্র পরিচালনায় গলদ দেখা দেবেই। রাজীব এই চক্রে ঘুরছেন। ভাবছি। এরপর কি।

তুই বসে বসে ভেবে দেশ উদ্ধার কর। আর আমি ভেবে ভেবে ঠিক করি আমাদের গন্তব্যস্থল। আমাদের দেশে শ্যালক হওয়াটা বড় কৃতিত্ব। ভগ্নীপতিরা শ্যালকদের রুজি রোজগারের চিন্তা করে, তাদের উন্নতির জন্য জীবনপাত করে। আবার কেউ কেউ শ্বশুরের দয়াতে সমাজেরই উচ্চস্তরেও স্থান করে নেয়। লোক বলে, স্বনামধন্য পিতার গৌরবের গৌরবান্বিত হলে তাকে বলে পিতৃনাম ধন্য। আর যারা ধন্য হয় শ্বশুরের নামে অথবা ভগ্নীপতির নামে তাদের নাকি বলা হয় অধম। এই অধমের খাতায় জল জমা করছে কয়েকজনের নাম। চন্দ্রবাবু নাইডুর নাম শুনেছিস। অন্ধ্রের রামরাওয়ের জামাতা।

জামাতা নয়, প্রথম উপদেষ্টা। রামরাও কোন কিছু করার আগে বাবুর সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করে না। চন্দ্রবাবু বিধায়ক নয়। মন্ত্রী নয়। মস্ত বড় আমলাও নয় অথচ তার প্রতাপে বাঘে ছাগলে একঘাটে জল খায়। পি-উপেন্দ্র হলেন তেলেগু দেশম প্রধান। এই প্রধানের প্রভাব স্তিমিত হয়েছে চন্দ্রবাবুর প্রভাবে। তেলেগু দেশম কংগ্রেসের মতই ছোটখাট এমন একটি দল যার প্রধান হলেন রামরাও যার হাতে রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতা ন্যস্ত। অর্থাৎ রামরাও রাজীবের মত দল প্রধান, এবং রাজীবের মত রাষ্ট্রীয় প্রধান না হলেও রাজ্যের ক্ষমতার প্রধান। যাদের হাতে ক্ষমতা থাকে তাদের স্তাবক থাকা স্বাভাবিক। রাজীবও ব্যতিক্রম নয়, রামরাও কেমন করে ব্যতিক্রম হবে? তবে রামরাওয়ের প্রধান স্তাবক তার জামাতা।

রামরাও মুখ্যমন্ত্রী অথচ বিক্রয়কর অর্ডিন্যান্স পাশ হল তার অজান্তে, আর বিক্রয়কর বসানো হল মুড়ি-খৈ ইত্যাদির ওপর। রামরাওকে জিজ্ঞাসা করা হল এ কেমন তোমার নীতি? রামরাও বললেন, না, না। এরকম কোন অর্ডিন্যান্স আমার রাজ্যে জারী করা হয়নি। তা হলে কি করে হল? নেপথ্য নায়ক চন্দ্রবাবু নাইডু। তার ইঙ্গিতে এই অর্ডিনান্স যার উদ্দেশ্য হল গরীবদের ক্ষুধা মেটাবার সহজতম লভ্য খাদ্যের ওপর কর বসানো। তুই তো সব খবর

রাখিস না দাদু আসলে তেলেগু দেশম্ হল এমন কতগুলো লোকের আড্ডাখানা যারা বহুকাল কংগ্রেসী রাজনীতিতে পাকাপোক্ত হয়ে হঠাৎ দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য কংগ্রেস ত্যাগ করে তেলেগু দেশমে আত্মনিয়োগ করেছে। এরা কংগ্রেসী চরিত্র বদল করতে পারেনি, এদের সামনে কোন আদর্শ নেই। কংগ্রেস হটানো ভিন্ন অন্য কোন চিন্তাধারা, বিশেষ করে জনগণের মঙ্গল সাধনের চিন্তা নেই। আছে বিরোধীদের নির্মূল করতে কংগ্রেসীদের মত পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া, বিরোধীদের দাবী উপেক্ষা করার সনাতনী কংগ্রেসী ব্যবস্থা।

আমার মনে হয় রামরাওয়ের এই হঠকারিতা ও স্বজনপোষণই কংগ্রেসকে সুযোগ করে দেয় ভাস্কররাওকে কুক্ষিগত করার। নিজের অর্থমন্ত্রী নাদেনলা ভাস্কররাও এইসব কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজের জন্যই তাকে পেছন থেকে আঘাত করার সুযোগ পেয়েছিল। তবে যত দূর মনে হয় চন্দ্রবাবু রামরাওকে রাজনীতির প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়েছিল। রামরাও সিনেমার পর্দায় রাম সেজেই বোধহয় জীবন কাটাতো কিন্তু ধূর্ত চন্দ্রবাবু অনেক আগেই ছিল রাজনৈতিক ময়দানে। সেই টেনে এনেছিল রামরাওকে রাজনীতির খেলায়।

চন্দ্রবাবু নাইডু মঞ্চে প্রধান স্থান দখল করেছিল রামরাওয়ের মন্ত্রীসভা বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর। শোনা যায় তার বুদ্ধিতেই রামরাও আবার ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। নিজের স্টুডিয়োতে বিধায়কদের আটকে রেখে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ক্ষমতায় ফিরে আসার কৌশলের উদ্ভাবক নাকি চন্দ্রবাবু নাইডু। রামরাও বুঝেছে তার সৌভাগ্যরবি চন্দ্রবাবুর অবদানে তাই সব সময় রামরাও তার জামাতার ওপর বেশি নির্ভরশীল।

আমরা দু'জনেই চুপ করে রইলাম।

যথারীতি চা জলখাবার এল। সদ্ব্যবহার করে অমিয়া আমার হাত ধরে বলল, ওঠ, বাইরে গাড়ি রেখে এসেছি। ড্রাইভার ছুটি নিয়েছে। আমরা দু'জনে পাশাপাশি বসে কলকাতা বেড়িয়ে আসি।

বললাম, আমরা যেখানে আছি সেটাও তো কলকাতা। আবার কোন কলকাতায় যাবি। এখানে বসেই মূল কলকাতার ছবি দেখা যায়।

উত্তর-মধ্য-দক্ষিণ-পূর্ব নিয়ে যে কলকাতা তার বাইরে আমরা বাস করি। অর্থাৎ কর্পোরেশন এলাকার বাইরে থাকি, আইনত এটা কলকাতা নয়।

অমিয়া হাসল।

বুঝলাম। তুই বেড়াতে যাবি, এই তো, নে চল।

অমিয়ার সঙ্গে বের হলাম। পাশাপাশি বসে। প্রথমে মুখ খুলল অমিয়া।

আজকাল খবরের কাগজ খুললেই বধূহত্যার সংবাদ। বধূহত্যা তো মনুষ্য সমাজে নতুন কিছু নয়। আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে।

বললাম, প্রচার ব্যবস্থা অতীতে এত বেশি ছিল না। বর্তমানে প্রচার মাধ্যমগুলো খুবই শক্তিশালী। এই মাধ্যমগুলো চায় সমাজ সংস্কার হোক, জনমত গড়ে উঠুক। বধূহত্যার পাপ সমাজ থেকে নির্বাসিত হোক। তাই

এত প্রচার, এই প্রচারের জন্যই সরকারও এ বিষয়ে তৎপর, বিচারকও কঠিন দণ্ডদান করছেন।

মূল সমস্যা তো বিচার ব্যবস্থায় দূর হবে না। মূলত সমস্যা যেখানে সেখানে হাত দিতে পারছে না সরকার এবং বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা। তাই কঠোর দণ্ডও এই অপরাধ নিবারণ করতে পারবে না।

বললাম, বধূ হত্যাই তো সমস্যা নয়, স্বামী হত্যার ঘটনা বিরল নয়। পুরুষ তার দৈহিকশক্তি দিয়ে নারীর কণ্ঠরোধ করে ঠিকই আবার নারীও সুযোগ-সুবিধা মত বিষ প্রয়োগ করে, কখনও কখনও উপপতির সাহায্যে স্বামীকেও হত্যা করে থাকে। শতকরা হারের তারতম্য আছে, এই মাত্র। তবে নারী দুর্বল, সেজন্য তার ওপর কোন অত্যাচার হলে ফলাও সংবাদ হয়। অবশ্য একথা সত্য, পুরুষ যদি স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে না পারে, উভয়ের সম্মতিক্রমে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটালে এমন মর্মান্তিক ঘটনা কিছুটা রোধ করা যেত। কেন যে হয় তা ভেবে পাই না।

যার ঘরে বউ নেই সে এই সমস্যাকে গুরুত্ব দিতে পারে না।

তুই বলতে চাস, এবিষয়ে আমার অনধিকার চর্চা।

বোধহয় তাই। শোন, কয়েকমাস আগে একজন তার স্ত্রীর চরিত্রহীনতা সন্দেহ করে, অথচ সে নিজেও মদ্যপ। একদিন স্ত্রীর গলার ওপর বালিশ চাপা দিয়ে মাঝ রাতে হত্যা করেছিল। খবর প্রচার হতেই, স্ত্রীর ভাই উত্তেজিত ভাবে ভোজালী হাতে ভগ্নীপতির বাড়িতে এসেই ভোজালি দিয়ে ভগ্নীপতি হত্যা করল। এতে দাঁড়াল কি ? একজন খুনী আরেকজন খুনী তৈরী করল। সবচেয়ে দুঃখজনক আর বিপদজনক জীবনধারা হল স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। এর পরিণতি কখনও সুখের হয় না। পারিবারিক অশান্তি নিত্যকার ঘটনা। সন্তানাদি কলহপরায়ণ পিতামাতার আচার আচরণে বিপথগামী হয়ে থাকে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই।

কলকাতা পৌছাবার আগেই অমিয়া গাড়ি ঘোরাল। আমি কোন কথা না বলে মাঝে মাঝে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে অমিয়া বলল, গাড়িটা রেখে আসি। পদব্রজে কলকাতা দেখব। কখনও বাসে কখনও ট্রামে কখনও ট্যাক্সিতে, কেমন ?

বললাম, যথা আজ্ঞা দেবী।

অমিয়ার বসার ঘরে আশ্রয় নেওয়া মাত্র মাধুরীর আবির্ভাব। মাধুরী দাসী হলেও সাধারণত যে সব দাসীর সাক্ষাৎ পাই গেরস্তঘরে সে তা নয়। বলতে গেলে সে-ই অমিয়ার ঘরের কর্ত্রী। জানি না মাধুরী আমাকে ও অমিয়াকে নিয়ে কোন ধরনের পাঁচালি রচনা করে থাকে, তার চালচলনে তার মনের কথা মোটেই বোঝা যায় না। তবে আমি যে অমিয়ার অতি ঘনিষ্ঠ তা বুঝলেও কোনদিন অথবা কোন রাতে আমাদের দু'জনকে পাশাপাশি শয্যায় দেখতে

না পেয়ে আমাদের সম্পর্কটা ওর কাছে বেশ ঘোরাল থেকে গেছে। বহুদিন রাত্রি কাটাতে হয়েছে অমিয়ার বাড়িতে। পাশের ঘরে রাতের শয্যাটি নিপুণহাতে সাজিয়ে পলকে সে চোখের আড়ালে চলে গেছে। কোন সময়ই মাধুরীকে লক্ষ্যণীয় বস্তু মনে করিনি, তার সম্বন্ধে আগ্রহও প্রকাশ করিনি, তবে তার চালচলনে মনে হয়নি যে কোন নিম্নশ্রেণীর। তার চেহারায় দেখেছি বিষাদের ছাপ, কিন্তু কেন তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি।

কদিন অমিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই মেয়েটাকে কোথায় পেলি?

ভগবান জুটিয়ে দিয়েছে।

ওর ভবিষ্যত কি?

অমিয়া গম্ভীরভাবে বলল, আমার যা ওরও তা।

মানে?

মানে শুনতে চাস। ভেসে আসা লাখ লাখ মানুষের কোন এক দারিদ্রক্লিষ্ট পিতার সন্তান। তেরটি সন্তানের দশম হল মাধুরী। পরের তিনজন পৃথিবীর আলো ভাল করে দেখার সৌভাগ্যও করেনি। ত্রয়োদশ সন্তান ও তার জননী একই সঙ্গে পাড়ি জমিয়েছিল বেহেস্তে অথবা দোজকের পথে। মাধুরীর বয়স তখন ছয় বছর।

পরে আর কি থাকতে পারে। অনাদরে অবহেলায় ভাইবোনদের সঙ্গে বড় হয়েছিল। সবার বড় বোন, নাম তার রাধা। কোন এক শ্রীকৃষ্ণের বংশীবাদন তাকে ঘরছাড়া করেছিল, তারপর থেকে আর তাকে দেখা যায়নি। আরও দুটো বোন বেঁচে আছে এই টুকুই জানা গেছে অবশ্য খুব সম্মানিত জীবন যে তারা পায়নি তা বলা বাহুল্য। ভাইদের মধ্যে যে সবার বড় সে প্রথমে নানা ভাবে উপার্জনের চেষ্টা করছে, অবশেষে দলে ভীড়ে গেল। ধরাও পড়ল, মেয়াদ হল সাত বছরের। বোধহয় এতদিন সে খালাস পেয়ে আবার পুরানো দোস্তদের সঙ্গে কারবারে নেমেছে। আর সবার খবর অজানা রয়েছে আজও। মাধুরী বৃন্তচ্যুত একটি নারী যার ভবিষ্যত থেকেও নেই।

তুই পেলি কি করে?

সেও একটা রোমাঞ্চ উপন্যাস। রাতের বেলায় ক্লাব থেকে ফিরছি। কলকাতার সীমানা পেরিয়েছি, বাড়ি তখনও এক কিলোমিটার। গাড়ির আলোতে দেখতে পেলাম অন্ধকার গলির মুখে তিনটে জোয়ান ছেলে একটা মেয়েকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে। মেয়েটা প্রতিবাদ জানাচ্ছে, চিৎকার করছে অথচ আশেপাশের বাড়ির কোন লোক দরজা খুলে এগিয়ে আসছে না তাকে রক্ষা করতে। ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে আমি নামলাম। মস্তানগুলো বুঝতে পারেনি কেউ তাদের বাধা দেবে। বিশেষত কোন মহিলা। বাধা পেয়ে ওরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মেয়েটাকে ছেড়ে আমাকে আক্রমণ করল। ওদের হাতে ভোজালি, অবশ্য একজনের হাতে। ড্রাইভার তখন গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে ততক্ষণ, তার পকেটে ছিল পিস্তল। পিস্তল বাগিয়ে এগিয়ে

আসতেই মস্তানরা বুঝল অবস্থা জটিল। নিমেষে তারা মেয়েটাকে ছেড়ে গলির অন্ধকারে আত্মগোপন করল।

মেয়েটাকে নিয়েই সমস্যা।

কোথায় পাঠাই, কোথায় নিয়ে যাই! প্রথমে ঠিক করেছিলাম থানায় নিয়ে যাব। থানার নাম শুনে মেয়েটা ভয়ে আমার পা চেপে ধরল। ভেবেছিলাম রেস্কিউ হোমে দেব, তাও হল না।

মাধুরী থেকে গেল আমার কাছে।

অরিন্দম চলে যাবার পর মাধুরীই আমার একমাত্র গৃহধর্মের সঙ্গী। তবে মাধুরী একটা উপন্যাস। এর আদিও নেই অন্তও খুঁজে পাইনি। আঠার বছরের মাধুরীকে নতুন জীবনের ভাবনা দেখাবার প্রথম অধ্যায় হল তার মাতৃত্বলাভের প্রতি ঘৃণা।

মাধুরী বলল, আমার পেটে পাপ। এই পাপ মুক্তি চাই সবার আগে।

তার গর্ভে যে কার সন্তান তারও কোন ঠিকানা নেই। পিতার পরিচয়হীন সন্তানের মা হতে সে চায় না। বাধ্য হলাম তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে পাপ মুক্তি ঘটাতে।

শিক্ষিকা রাখলাম তাকে অক্ষর জ্ঞান দিতে। মাধুরী পড়ত, কিছুটা শিখেওছে কিন্তু পড়ার চেয়ে তার বেশি আগ্রহ সংসার সাজাবার। ভেবে দেখেছি সংসার সে চায় অথচ পায়নি। দারিদ্র্য অবহেলা আর লাঞ্ছনা তাকে মানুষ হবার সুযোগ দেয়নি। মাধুরী বলে, আমাদের বস্তির এমন একটা ঘর নেই যে ঘরের মেয়ে পুরুষ কোন না কোন অকাজ না করে বেড়ায়। মেয়েরা খোঁজে সহজ উপায়ের পথ অর্থাৎ দেহবিক্রয়। কিনে আনে নানা রোগ। আর ছেলেরা অভ্যাস করে হাত সাফাইয়ের। যারা একটু শেয়ানা তারা রাহাজানি করে, ডাকাতি করে, তারা মেয়েদের অসৎ জীবিকার দালালি করে।

আমি মাধুরীর কথা শুনেছি, ভেবেছি তাকে সুন্দর জীবন দেবার কথা কিন্তু মাধুরী সংসার চাইলেও সে চায় না পুরুষের সঙ্গ। বিয়ের কথা বলেছি, সে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু আজও ভাবতে হচ্ছে, এরপর কি! আমার অবর্তমানে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। শেষ রক্ষা সে করতে পারবে কি!

অমিয়ার কাছে মাধুরীর কথা শুনেছি। তার রূপযৌবনের হিসাব নিকাশ কখনও করিনি। ভাবিওনি কখনও তার একটা জীবন আছে। ভেবেছি তার জীবিকাই বোধহয় তার জীবন। গভীর ভাবে চিন্তা করার অবসর ছিল না।

আজ ঘরে বসতেই বলল, চা আনছি।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে তার চলার ভঙ্গীটা দেখে বিস্মিত হলাম। এযেন ব্যাধতাড়িত হরিণী। চোখে তার ভয়। মুখে তার বিষাদের ছাপ। কোন শিল্পী যদি তাকে নিয়ে চিত্রাঙ্কণ করত তা হলে তার মুখের ছাপে মনের ছাপ খুঁজে পাওয়া যেত।

অমিয়া পদব্রজনের প্রস্তুতি নিয়ে হাজির হল।

মাধুরী চায়ের কাপ সামনে রেখে নীরবে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মাধুরী চলে যাবার পর অনেক কথাই মনে পড়ল। সব সময় স্বেচ্ছায় মানুষ অবক্ষয়ের পথে পা বাড়ায় না। বাধ্য করে তাদের পরিবেশ। অমিয়ার মত সবাই তো নয়। একা অমিয়াই বা কত করতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করতে কেউ এগিয়ে আসে না। সবাই চায় নিজে বাঁচতে। সবাই ভুলে গেছে live and let live। সামাজিক চেতনা বোধ শুকিয়ে গেছে। আক্রান্তকে যারা রক্ষা করতে যায় তারা সমাজের প্রশংসা আদায় করতে যতটা না পারে তার বেশি ধিক্কার লাভ করে তার বোকামির জন্য। আক্রান্তকে রক্ষা করতে কেউ যায় না সহজে। যারা যায় তাদের পেছনে যারা ভীড় করে তাদের মুখে প্রশংসা শোনা যায়। এসব কাজে কেউ প্রতিবাদ করে না বলেই সমাজবিরোধীরা প্রশ্রয় পায়; কেউ সক্রিয় ভাবে এগিয়ে আসে না। মন্তব্য করেই কর্তব্য শেষ করে।

মাধুরী তার অপর তিনটি বোনের মত কোথায় হারিয়ে যেত তা কেউ জানে না। সমাজে কোথায় তার স্থান তা নিরূপণ করার জন্য সমাজব্যবস্থা গড়ে না উঠলেও অবক্ষয়ের মুখে দাঁড়িয়ে তারা নীতিবাক্য শোনাত, সার্থক ভাবে কোন বিষয়ে অংশ নিত না মনুষ্যত্বকে মর্যাদা দিতে।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, বস্তিতে অপরাধী সৃষ্টি হয়। তাদের এই অমৃতময় বাক্য অতি শ্রুতিমধুর। কেন অপরাধী তৈরী হয় বস্তিতে এবং কিভাবে তার প্রতিকার সম্ভব সে বিষয়ে সবাই নীরব।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে এটাই হল পরিণতি। সামান্য কিছু সংখ্যক মানুষ অর্থের প্রাচুর্যে ক্রমেই শ্রেণীর শিখরে উঠতে থাকে, আর গরিষ্ঠ সংখ্যক লোক ক্রমাগত দারিদ্রের পেষণে শোষণে নীচে নামতে থাকে। একসময় মনে হয়েছিল দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস তথা ইন্দিরা কংগ্রেসের নীতি বদল না হলে এই শ্রেণীবৈষম্য দূর হওয়া সম্ভব নয়। এদের বিকল্প যদি কখনও আসে তা হলে মানুষের দুঃখ দুর্দশা হ্রাস পাবে। দেশের মানুষ জনতা পার্টিকে গদিতে বসিয়েছিল। অভিজ্ঞতা আরও কঠোর হয়েছিল জনতা সরকারের ঘরোয়া কোঁদলে। তবুও কোন কোন রাজ্যে অকংগ্রেসীদের হাতে শাসন ব্যবস্থা যাবার পর আশা করেছিল এবার অন্তত এইসব রাজ্যের মানুষ সুখের ও শান্তির মুখ দেখতে পারে। কিন্তু, এরাও হায় হায় করে বুক চাপড়াচ্ছে।

অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী রামরাও জনসমক্ষে অতি ধার্মিক, বিশেষ করে তার কপালের তিলক এবং জাফরান রঙের আলখাল্লা অজ্ঞ অশিক্ষিত ব্যক্তিদের ভক্তিভাজন করে তোলে। রামরাও বোধহয় নিজেকে রামায়ণের রামচন্দ্র মনে করে থাকেন। রজনীশের মত ব্যক্তিও ভগবান যদি হতে পারেন, রামরাও তো নেহাৎ আজেবাজে লোক নন। বেশ একটি উচ্চশ্রেণীর V. I. P. সে যদি নিজেকে রামের অবতার মনে করে তা হলে এমন কিছু দোষের হয় না। তার চৈতন্য রথমের ঘর্-ঘর্ শব্দে অন্ধ্রবাসী মুগ্ধ। এবার আশ্রম গড়তে মন দিয়েছেন।

হায়দ্রাবাদের নাচারামে প্রথম আশ্রম করেছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্রের অধিকৃত বিরাট একটি ভূমিখণ্ডে। এটা রামরাওয়ের প্রীতি সঞ্চার করতে পারেনি। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যের অধিবাসী, রামরাও নিজামের বিরাট বৈভব স্বয়ং স্বচক্ষে দেখেছেন। সেই বৈভবের আলোক ছটাতে নিজেকে তো অন্ধকারের জীব করে রাখতে পারেন না। রামরাও তার পুত্রের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমকে সিনেমার ছবি তোলার সুযোগ দিয়ে হায়দ্রাবাদ শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে গান্ধীপেটে নতুন আশ্রম গড়ে তুললেন। সেইখানে বসবাস করেন বর্তমানে। বিপদ ঘটালো ল্যাণ্ড সিলিং আইন। নাচারামের জমি নিয়ে আপত্তি তুলল রাজস্ব ও ভূমি বিভাগ। রামরাও রাতারাতি নির্দেশ দিলেন, নাচারামের জমি ল্যাণ্ড সিলিং আইন বহির্ভূত রইবে। কেন? রামরাও বললেন, জমি আমার ছেলের। যেহেতু সে মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র সেজন্য সে ল্যাণ্ড সিলিং আইনের সুযোগ সুবিধা পাবে না, এতো হতে পারে না। অতএব এই ব্যবস্থা পাকা ও আইনসম্মত।

নাগার্জুন সাগর তীরে একহাজার একর জমি রামরাও দিলেন মহেশ যোগীর বেদবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যাপীঠম্-কে। এটা আইনসঙ্গত কিনা তার তদন্ত চলছে। হয়ত শেষ পর্যন্ত বে-আইনী হলেও তাকে আইনসম্মত করে নেবেন রামরাও।

ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত রামরাও আবার যখন ক্ষমতায় ফিরে এলেন তখন তার চেহারাই আলাদা। জামাতা বাবাজীবন চন্দ্রবাবু নাইডু তেলেগুদেশম্-কে শক্তিশালী করতে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী রইলেন শান্তিকুটিরমে। নাগার্জুন সাগর তীরে মনোরম বিরাট প্রাসাদকে আশ্রম আখ্যা দিয়ে সেখানে কর্মী সংঘের ট্রেনিং দেবার জন্য ইরেজি 'L' আকারের ব্যারাক তৈরী করে বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রদের সংগ্রহ করলেন ট্রেনিং দিতে। তেলেগু দেশমের আদর্শ প্রচার করতে কর্মঠ একদল যুবক দরকার। এদের মূল শ্লোগান হল "তেলেগুদেশম্ জিন্দাবাদ" আর মূল সঙ্গীত হল, 'মা তেলেগু তেল্লি'-এর বেশি ট্রেনিং দেবার প্রয়োজন বোধহয় নাই। কিন্তু যারা এই ব্যারাকে ট্রেনিং নিতে আসে তাদের বক্তব্য হল, আমাদের চলাফেরার, কথা বলার, স্বাধীন ভাবে চলার কোন উপায় নেই। এই ট্রেনিং-এর উদ্দেশ্য হল বীর রামরাও বন্দনা, তার গুণাবলী প্রচার।

অতঃপর কি?

মুখ্যমন্ত্রীর বহু কার্যাবলীর এই কটা সামান্য দৃষ্টান্ত।

এই শ্রেণীর লোক দেশের মানুষের কতটা উপকার করতে পারে সেটাই ভেবে দেখার। কিন্তু ভাবার মত শিক্ষা তো আমাদের দেশের মানুষ পায়নি। যত দিন স্বাধীনভাবে ভাল মন্দ বিচার করার শিক্ষা দেশের মানুষ না পাবে ততদিন কখনও ধর্মীয় উন্মাদনা, কখনও সামাজিক ভাঁওতাবাজি, কখনও রাজনীতির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেশের মানুষকে বিপথে নিয়ে চলবে।

কলকাতার রাস্তায় শণিপূজার রমরমা। যারা পূজারীর পাত্রে অর্থ দেয়

তাদের অমঙ্গল নিরসনের জন্য তাদের অমঙ্গল কখনও মোচন হয়েছে কিনা আজও জানা যায় নি। যারা অর্থ দান করে তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে আর যারা পূজার উদ্যোক্তা তাদের ঘাড় থেকে শণি অনেক কাল আগেই নেমে গেছে। তারা বেশ জমাটি জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছে। ঠিক এইভাবে ধর্মের ভণ্ডামির সঙ্গে রাজনীতির ককটেল ঘটিয়ে রামরাওয়ের মত অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে। আমরা অবাক হয়ে যেমন তাকিয়ে থাকি ফুটপাতের অনাহারী মানুষের দিকে তেমনি অবাক হয়ে ভাবি তিরুপতি মন্দিরে দর্শনী আদায় হয় বৎসরে বাইশ কোটি টাকা। এই টাকা যায় কোথায়? এর সঠিক হিসাব কেউ কি জানে?

যে দেশের উঁচুতলার মানুষের চরিত্রগঠন হয়নি আজও সে দেশে মাধুরীর মত অসহায় মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণ কল্পনার অতীত।

পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালাম। সামনের গলির মুখে ভীড়। বড় রাস্তা ফাঁকা। হঠাৎ শোনা গেল বোমার শব্দ। পাঁচ ছযজন যুবক সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে এলাকায়। আমরাও গলির আড়ালে দাঁড়িয়ে গেলাম।

অমিয়া ফিস ফিস করে বলল, নকশাল আন্দোলনের সময় এ রকম অবস্থার মুখোমুখী হতে হযেছে অনেকবার।

তখন কিন্তু সমাজবিরোধীরা একেবারে কোণঠাসা হযেছিল।

ঠিক তা নয়। সমাজবিরোধীদের পকেটে পযসা দিয়ে আর হাতে পিস্তল দিয়ে পুলিশ নকশালদের দলে ভিড়িয়ে দিয়েছিল। ওইসব সমাজবিরোধীরা নকশাল আন্দোলনের নামে লুটপাট করত আর গোপনে পুলিশকে সংবাদ দিত এই আন্দোলনের নেতাদের খবরাখবর। ওই সব খবরের ভিত্তিতে পুলিশ রাতের বেলায় নেতাদের ও সক্রিয় কর্মীদের গ্রেপ্তার করত, মাঠে-ঘাটে তাদের গুলি করে হত্যা করত এবং প্রচার করত নকশালরা পুলিশকে আক্রমণ করেছিল। পুলিশ আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালিয়েছিল। গুলিতে কিছু নকশাল প্রাণ হারিয়েছে, কিছু পালিয়ে গেছে কিন্তু নকশালদের আক্রমণে একজন পুলিশও প্রাণ হারায়নি। অর্থাৎ সমাজবিরোধীরা তখনও সক্রিয় ছিল পুলিশের ছত্রছায়ে। এখন ওদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, পুলিশ ওদের আর টাকা পয়সাও দেয় না, তাই ওরা এখন স্বাবলম্বী হতে মহল্লায় মহল্লায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, লুটপাট করছে, ডাকাতি করছে, খুন করছে, নারী ধর্ষণের সুযোগ পেলে তাও করছে।

আর বলা হল না। সবাই তখন প্রাণ ভয়ে ছুটছে। বোমা ফাটছে অনবরত। একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা। অমিয়াকে বললাম, ফিরে চল।

না, বলে অমিয়া কঠোরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, তুই যা। আমি শেষ অবধি দেখব।

একবার তাকিয়ে দেখ, পাঁচ ছ'টা ছেলে কিভাবে শহরের একটা সদাব্যস্ত অঞ্চলকে দখল করে রেখেছে।

কারণ, শান্তিপ্রিয় মানুষের হাতে হাতিয়ার নেই। হাতিয়ার না থাকলে ওদের মোকাবিলা করা কি সম্ভব? তাই বা বলছি কেন? গ্রামে বন্দুক থাকে অনেকেরই। কিন্তু কারও বাড়িতে ডাকাত পড়লে সেই বন্দুক দিয়ে ক'জন আসে ডাকাত তাড়াতে? ভাবছি, আমরা কোথায় নেমে গেছি। এরপর কি?

এরপর যে কি তা ওই সমাজবিরোধীরাও জানে না, আর যারা সন্ত্রাসের শিকার তারাও জানে না। আর পুলিশ? তাদের কথা না বলাই ভাল। যদি কঠোর হয় তাতেও অপরাধ, আবার যদি নিষ্ক্রিয় থাকে তাতেও অপরাধ। তারা এখন চাকরি বজায় রেখে অবসর গ্রহণের দিন গুনছে। সেই সুযোগে যদি কিছু পকেটে আসে তা হলেই পরমার্থ লাভ। ওই যে পুলিশের গাড়ি এসে গেছে। কিন্তু একি! পুলিশ রাইফেল নিয়ে নামলেও মস্তানরা পিছু হটছে না। এবার তাদের লক্ষ্যস্থল পুলিশ। মুড়িমুড়কির মত তাদের ওপর বোমা পড়ছে!

পুলিশকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্য পালাবার পথ প্রশস্ত করা। বোমার ধোঁয়াতে পুলিশ কিছুটা বিভ্রান্ত হবে এই সুযোগে ওরা পালাবে।

পুলিশ ওদের চেনে না?

নিশ্চয় চেনে নইলে দুর্গাপূজা-কালীপূজার সময় কয়েক হাজার মস্তানকে গ্রেপ্তার করতে পারত কি! ওই ক'দিন মাত্র, তারপর ছাড়া পেয়ে আবার তাদের পুরানো খেলা খেলতে থাকে।

অমিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বলল, এবার এগিয়ে চল।

যথা আজ্ঞা দেবী। কোনদিকে যাবি?

কোন নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল আমাদের নেই। কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা অঞ্চলটা ঘুরে দেখে আসি। এদিকে তো ট্রামবাস বন্ধ। পদব্রজন ভিন্ন কোন উপায় নেই।

হাঁটতে হাঁটতে যখন ধর্মতলা পৌছলাম তখন দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। গাড়ির জট রাস্তা রোধ করেছে। কোন রকমে গলিপথ ধরে এগোচ্ছিলাম। বার বার অমিয়াকে বলছিলাম, আর নয়, এবার ফিরে চল। দেখছিস তো রাস্তা হেঁটে চলারও অযোগ্য হয়ে গেছে। ওই দেখ দূরে ফেস্টুন আর ফ্ল্যাগ নিয়ে মিছিল এগোচ্ছে। একেই শহরের গাড়ির গতিবেগ ঘণ্টায় ছয় মাইল, তার ওপর মিছিলের পর মিছিল গাড়ির গতিবেগকে মন্থর থেকে নিশ্চল করে তুলেছে।

এসব তো নতুন কিছু নয়। আমরা যে গণতন্ত্রী। আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে যে কোন আন্দোলন করার অধিকারী। আমাদের দাবী ও অধিকার আদায় করতে এইভাবে আন্দোলন করতে পারি। শুনতে পাচ্ছিস তো, 'আমাদের দাবী মানতে হবে', 'আমাদের আন্দোলন চলছে, চলবে'।

সবই স্বীকার করছি। কিন্তু কিয়ৎকাল মাত্র। কিছুক্ষণের মধ্যেই এরা অশান্ত হবে, পুলিশ শান্তি রক্ষা করতে লাঠি নিয়ে তাড়া করবে, আরম্ভ হবে মহীরাবণের যুদ্ধ। ফলভোগ করবে পথচারী আর মাশুল দেবে দোকানীরা।

কারও মাথায় লাঠি পড়বে, কারও মাথায় পড়বে ইঁট আর সেই সুযোগে দোকানীরা ঝাঁপ বন্ধ করবে লুটপাটের আশঙ্কায়। এটা তো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকৃত চেহারা। আরও ভয়ঙ্কর হয় ফুটবল খেলাকে ভিত্তি করে। কিছুকাল আগে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলা নিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয়ে গেছে। অবশ্য বিস্তার লাভ করতে পারেনি সরকারের দৃঢ়তায় কিন্তু খেলার সঙ্গে ধর্মীয় পাগলামি কিভাবে জড়িয়ে ফেলা হয় তা তো দেখেছিস। অথচ মহামেডান স্পোর্টিং একটা নাম। খেলোয়াড় সবাই মুসলমান নয়। হিন্দু, মুসলমান ও কৃশ্চান খেলোয়াড় নিয়েই এই দল। নামের মোহ কতকগুলো অর্বাচীনকে মারমুখী করে তোলে। কেন?

কেন? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয় গভীরে। কলকাতায় মুসলমান বাসিন্দার একটি বিরাট অংশই অবাঙ্গালী মুসলমান। এদের বৃহদংশই তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করার পর বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসে কলকাতার কতকগুলো অংশে বহাল তবিয়তে বাস করছে। তাদের আশ্রয় যারা দিয়েছে তারা ভারতের মুসলমান হলেও মনেপ্রাণে আজও তারা পাকিস্তানী। অমুসলমানকে তারা শত্রু মনে করে এসেছে, এখনও করছে। ভারতের বৃহত্তর সমাজের স্রোতে তারা নিজেদের সনাক্ত করতে চায়নি, বরং তারা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আজও বলে থাকে 'আমরা মুসলমান', ভারতে তারা এখনও একটি আলাদা nation, আর এই অপকার্যে ও অপচিন্তায় তাদের সমর্থক হল একশ্রেণীর রাজনীতিক। এরা ভোটের ধান্দায় এই সব অভারতীয় চিন্তার পোষক মুসলমানদের প্রশ্রয় দেয়। আর চোরা পাকিস্তানীরা আশ্রয় পায় বিচ্ছেদকামী মুসলমানদের আস্তানায়। কোন সময়ই সরকার এই সব চোরা পাকিস্তানীদের খুঁজে বের করে না। এই কারণে হঠাৎ হঠাৎ সাম্প্রদায়িক অশান্তি কোন কোন স্থানে দেখা দেয়। এইসব চোরা পাকিস্তানীরা মাদকদ্রব্যের চোরা কারবার চালায়, বিদেশী মাল গোপন পথে আমদানী করে। কলকাতার ফুটপাতে যে বিদেশী মালের পাহাড় জমে উঠছে তার পেছনে রয়েছে এরাই। আর যারা বিক্রেতা তারাও এই সব চোরা পাকিস্তানীদের একাংশ।

আসাম সমস্যার মূলেও রয়েছে এই সব চোরা পাকিস্তানী। বাংলাদেশ সরকার বিহারী মুসলমান নামে পরিচিত পাকিস্তানীদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে ব্যস্ত। পাকিস্তান সরকার এদের স্থান দিতে নারাজ। ত্রিশঙ্কুর মত অবস্থা। তারা সহজপথ পেয়েছে ভারতে আশ্রয় নেবার। উর্দুভাষী এইসব পাকিস্তানীরা ভারতের উর্দুভাষী মুসলমান এলাকায় নির্ভয়ে বাস করার সুযোগ পাচ্ছে। এদেরই একটা অংশ প্রবেশ করেছে আসামে। পরিণতি তো দেখতেই পাচ্ছিস। সমস্যা তো বললাম, সমাধান কোথায়? চোরা পাকিস্তানীরা রেশন কার্ড সংগ্রহ করেছে, ভোটার তালিকায় নাম লিখিয়েছে তাদের সধর্মী রাজনৈতিক নেতাদের অপার করুণায়, এদের ভোটেই ওই সব নেতা বিধানসভায় প্রবেশ করছে, সংসদেও স্থান করে নিচ্ছে। ভাবছি, এরপর কি?

গলি ঘুপচি দিয়ে গঙ্গার ধারে পৌছে গেছি।

আস্তে আস্তে বাবুঘাটের দিকে এগিয়ে গেলাম।

তিরিশ বছর আগে যে শান্ত সমাহিতভাব ছিল গঙ্গার ঘাটে তা নজরে পড়ল না, গঙ্গার ধার বেয়ে গড়ে উঠেছে ঝুপড়ি কলোনী। বাসিন্দার শতকরা নব্বইজনই অবাঙালী, সবাই অমুসলমান। বাবুঘাটের সিঁড়িতে দু'জনে চুপ করে বসেছিলাম। মাথার ওপর দিয়ে চক্ররেলের গাড়ী ভোঁ ভোঁ শব্দ করে পেরিয়ে গেল। সামনে গঙ্গায় স্টীমার আর নৌকা। পাশের লঞ্চঘাটে হাওড়া থেকে এসে ভিড়ল একটা লঞ্চ। হুব্ হুব্ করে একদল যাত্রী পাগলের মত ছুটতে ছুটতে নেমে এল লঞ্চ থেকে। মাটিতে পা দিয়েই ছুটল। কয়েক মিনিটের মধ্যে যাত্রীরা মিলিয়ে গেল। ফিরতি লঞ্চের যাত্রীরা তখন টিকিট কাটতে ব্যস্ত। ভাল লাগছিল।

অমিয়া বলল, বকুমিঞা চক্ররেল করে ভালই করেছে। দমদম থেকে সোজা বিনয়-বাদল দীনেশ বাগে অল্প সময়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছে।

বললাম, দমদম পৌছাতে পারেনি। রেল প্রশাসনের জমি জবর দখল করে বসে যারা আছে তাদের উঠাতে না পেরে চক্ররেলের কাজ থমকে আছে। জনসাধারণের সুবিধা যাতে হয় সেদিকে নজর দেবার কোন চেষ্টা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নেই। তাদের কথা হল, জবরদখলকারীদের বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা না করলে তাদেব হটানো যাবে না। আর বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে রেল প্রশাসনকে। কেন? জবরদখল যারা করে তারা বে-আইনী কাজ করে। এই অন্যায়কারীদের জামাই আদরে পুষতে হবে কোন আইনে? আগামীকাল যদি কিছু জবরদখলকারী রাজভবনের মাঠ দখল করে তখন তাদের হঠাতে হবে কি বিকল্প রাজভবন তৈরি করে? অদ্ভুত যুক্তি? মুষ্টিমের লোকের সুবিধা করতে লক্ষ লক্ষ লোকের অসুবিধা করাটা বিধি সম্মত কিনা তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভাল জানে। কষ্টের লাঘব না হয়ে কষ্ট বৃদ্ধিতেই সরকার সাহায্য করছে। এরা নিজেদের গণতন্ত্রী বলে,এটা কোন দেশীয় গণতন্ত্র তা ওরাই জানে।

বকুমিঞার চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না। অবশ্য অসভ্য ভাষণে পারদর্শী বকুমিঞা মালদহের জন্য নাকি অনেক কিছু করেছে, শুধুমাত্র যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছিল তা বানচাল হতে চলেছে বংশীলালের বংশীবাদন আরম্ভ হতেই। বকুমিঞা বুঝতে পারেনি, নির্বাচন জেতার পর রাজীব গান্ধী তাকে অপাংক্তেয় মনে করে হটিয়ে দেবে। রেলের জন্য সব প্রতিশ্রুতি হিন্দীওলার চক্রান্তে হা-হুতাশে পরিণত হবার উপক্রম। এমন সময় বকুমিঞার কপালে ছিকে ছিঁড়েছে, তদারকী মন্ত্রীর চাকরি। অনেকটা পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল অবশ্য পুলিশী ক্ষমতা বিহীন, ইন্সপেক্টার জেনারেলের মত উপরওলার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে, তবুও তো মন্ত্রী। বকুমিঞা আশা করছে, বোধহয় এবার কিছু কাজ হবে। তাই বোলপুর নির্বাচনের সভায় পঁচিশ হাজার যুবকের চাকরির নতুন প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। অমৃতের স্বাদ না জানলেও অমৃতের

নাম শুনতেও ভাল। তাই নতুন প্রতিশ্রুতি শুনে গদগদ হয়েছে পশ্চিমবাংলার বেকারবৃন্দ। বকুমিঞা জানে জোর গলায় অনেক কিছু বলা যায় কিন্তু জোর করে কেন্দ্রকে দিয়ে কিছু করানো যায় না। একেই তো রাজনৈতিক জীবনের প্রথম ধাপেই তার বিরুদ্ধে ছিল গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ। বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে চাকরিটাও থাকবে না।

বললাম, এটা তো নতুন কথা নয়। এমন প্রতিশ্রুতি কেবলমাত্র বকুমিঞা দিচ্ছে এমন নয়, কেন্দ্রীয় বহুমন্ত্রী বহুবার ভোট সংগ্রহ করতে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ভবিষ্যতেও দেবে তবে তা কার্যকর হবে না। শুধু ই-কং নয়, বাম-পন্থীদের সেই যে শ্রমিক নেতৃত্বের মাধ্যমে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রাপ্তির চটক-দারী ঘোষণা, তাও অসত্যভাষণের আরেকটি দৃষ্টান্ত। জনগণতান্ত্রিক শব্দটাই কেমন ঘোরালো, এতদিন কি গণতন্ত্র জনকে বাদ দিয়ে চলছে? শ্রমিক নেতৃত্বে শুনলেও যেমন নিজেকে বোকা-বোকা মনে হয়। সি পি-এম চায় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, তাকে সফল করতে নেতৃত্ব দেবে শ্রমিক। কিন্তু নেতৃত্বের কাঠামোতে শ্রমিককে খুঁজতে হয়রাণ হয়ে গেছি। নেতৃত্বে আছে ব্যারিস্টার, ডাক্তার, উকীল ইত্যাদি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিরা। কোথাও সত্য ভাষণ নেই, প্রতিশ্রুতি পালনের সদিচ্ছাও নাই।

ওসব জানা কথা নতুন করে আর জানাতে হবে না। সামনে যে বিরাট বস্তি দেখছিস ওটা চিনিস?

খুব ভাল করে চিনি। যাবি ওখানে?

আজ আর নয়। এবার ফিরি চল।

কিছুটা পথ চলার পর অমিয়া হঠাৎ বলল, কয়েকদিন আগে আমার এক সহকর্মী জিজ্ঞেস করল, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নীতি সম্বন্ধে তোমার কিছু বক্তব্য আছে কি? হেসে বললাম, আমার বক্তব্য শুনে কি হবে, এ বিষয়ে যা বলার তা বলবে রাজনৈতিক নেতারা। তারা তো প্রথম থেকেই বলছে, নভিস, বিমানের পাইলট কি রাজ্যপরিচালনা করতে পারবে! প্রাক্তন সাময়িক প্রধানমন্ত্রী চরণসিং তো জোর গলায় বলছে, নেহেরু পরিবার ভারতকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। প্রায় চারদশক নেহেরু ও ইন্দিরা তাদের ভুল কর্মপদ্ধতি দিয়ে দেশের সর্বনাশ করেছে। এরাই বিচার করবে রাজীবকে।

শোন অমু, আমরা ক্ষমতা পাগল রাজনীতিকদের হাতের পুতুল। যে ক্ষমতা লাভ করতে পারে না, সে অপরকে দোষী সাব্যস্ত করে। এটা তো নতুন কিছু নয়। ভারতের মত নানা ধর্মের, কালচারের ভাষাভাষীর দেশে কে যে উপযুক্ত কর্ণধার তা বলা কঠিন। জনতা সরকার যখন ভেঙ্গে পড়ছে তখনও প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য লড়াই চলছে। জগজীবনরাম প্রধানমন্ত্রী পদের প্রার্থী। জগজীবনরাম প্রধানমন্ত্রী হতে পারেনি। তার ক্ষোভ স্বাভাবিক। তার কথা হল, তপশীলজাতিভুক্ত কাউকে বর্ণ হিন্দুরা প্রধানমন্ত্রী করতে চায় না। তার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছিল। এই প্রতারণার মূলে ছিল জয়প্রকাশ-

নারায়ণ আর কৃপালনী। যদি নির্বাচন করা হত তা হলে জগজীবনই প্রধান-মন্ত্রী হত, অথর্ব পুরাতনপন্থী মোরারজী প্রধানমন্ত্রী হতে পারত না। পরবর্তী-কালে চরণসিংও প্রধানমন্ত্রী হত না। জগজীবনের মনে সাম্প্রদায়িক চিন্তা দানা বেঁধেছে, মনের দুঃখে নিজস্ব একটি কংগ্রেস স্থাপন করেছে, যার সদস্য সংখ্যা বোধহয় একজন এবং সেটি হল জগজীবন রাম নিজে এবং কংগ্রেস (জ)-এর সেক্রেটারি জগজীবন রাম, প্রেসিডেন্টও জগজীবন রাম। এরকম মনোভাবাপন্ন দেশে যোগ্য প্রধানমন্ত্রী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

জাতিপাতির ধর্মান্ধতা কিভাবে রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে, কিভাবে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেবার উপক্রম করেছে তা তো দেখতে পাচ্ছি। তুই বোধহয় জানিস ইন্দিরা গান্ধীকে পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয়নি পুরীর পাণ্ডারা। তার অপরাধ তার স্বামী পার্সী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। ওরা কি এতই অজ্ঞ যে ইন্দিরার বিবাহটা কিভাবে হয়েছিল তা জানা নেই। বিশুদ্ধ বৈদিক মতে বিয়ে হয়েছিল ফিরোজ ও ইন্দিরার। অর্থাৎ উভয়ে হিন্দুই ছিল। এই যে ধর্মান্ধতা এর জন্য কুসংস্কার কতটা দায়ী তাতো জানিস, কিন্তু এর শেষ কোথায়? কে দায়ী? আমার ওসব বালাই নেই। তীর্থস্থানে আমার স্থান নেই জেনেই ওপথে পা মাড়াই না। শোনা যায় ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন কাশী গিয়েছিলেন তখন বিশ্বনাথ মন্দিরে তাঁকেও প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল, তখন কাশীর পণ্ডিতসমাজ পাতি দিয়েছিলেন রাজার অগম্য স্থান থাকতে পারে না নিজ রাজ্যে। বিশ্বনাথ মন্দিরে রাজার প্রবেশ অশাস্ত্রীয় নয়।

দেবস্থান সবার জন্য উন্মুক্ত থাকা দরকার। ধর্মস্থানে যদি সবাই যেতে না পারে তা হলে সে ধর্মের প্রয়োজন কি থাকতে পারে? প্রস্তর খণ্ড অথবা মাটির মূর্তি তো দেবতা নয়, প্রতীক মাত্র। এটা বুঝতে পারলে এইসব সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। মুসলমান অথবা কৃশ্চানদের কোন বাধা নিষেধ নেই ধর্মস্থানে। সবাই সমান।

বললাম, কৃশ্চান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শীদের পক্ষে এটা প্রযোজ্য, মুসলমানদের পক্ষে নয়। মুসলিম মহিলাকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। হিন্দুদের জাত পাতের কথা তো সবাই জানি।

অমিয়া অতটা না ভেবেই মন্তব্য করেছিল।

বললাম, আমরা বাড়ির কাছে এসে গেছি। এবার আমার ছুটি।

আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে।

বিনা বাক্যব্যয়ে অমিয়ার পাশে পাশে চলতে থাকি।

নিজের ঘরে সবে মাত্র বসেছি এমন সময় শ্যামলী হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে বলল, সারাদিন কোথায় ছিলে কাকা? তোমার জন্য আমার সব পণ্ড হবার উপক্রম। আমার পক্ষে দাঁড়াবার মত এ বাড়িতে আর কেউ নেই।

হাসলাম। কোন উত্তর দিলাম না।

তুমি হাসছ। আজ কি কাণ্ডটা হতে চলেছিল জানো?

হেসে বললাম, তোমার ব্যাপারটা একটু খুলে বল তবেই তো বুঝব।

শ্যামলী চেয়ার টেনে আমার সামনে বসল। আঁচলে মুখ মুছে প্রস্তুত হল।

বল।

চাকরি পেয়েছি।

চল্লিশ লক্ষ বেকার নরনারীর মধ্যে তুমি ভাগ্যবতী। তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ঠাট্টা নয়।

ঠাট্টা কেন করব শ্যামলী। যে রাজ্যে চল্লিশ লক্ষ বেকার, যেখানে সকালে সন্ধ্যায় মিছিল করে মানুষ কাজের দাবী জানাচ্ছে সে রাজ্যে তুমি ভাগ্যবতী নও কি?

শ্যামলী গম্ভীরভাবে বলল, অবশ্যই। পরীক্ষায় পাশ করে কেরাণীর চাকরি পাওয়া নিশ্চয়ই সৌভাগ্য। আমার সঙ্গে আরও অনেকে পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের অনেকেই আমার মত না হলেও মোটামুটি ভাল রেজাল্ট করেছিল কিন্তু তারা চাকরি পায়নি।

কেন? চাকরি নিশ্চয়ই খালি ছিল না।

তা নয় কাকা। কোটা। অর্থাৎ ওদের চেয়ে অনেক কম নম্বর পেয়ে শুধু মাত্র তপসীলি জাতি-উপজাতি এই বিবেচনায় তারা চাকরি পেয়েছে।

হেসে বললাম, আমাদের সংবিধান অনুন্নত, আর্থিকক্ষেত্রে বিপর্যস্ত মানুষদের জন্য এই ব্যবস্থা রেখেছে।

সে তো মাত্র পনর বছরের জন্য।

আবার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

কিন্তু তপসীলি জাতি বলে যাদের চাকরি দেওয়া হয়েছে তাদের অনেককেই আমি জানি। তারা অনুন্নত নয়, আর্থিক দিক থেকে বিপর্যস্ত নয়। যারা সত্যি সত্যি অনুন্নত ও বিপর্যস্ত তাদের ক'জন কাজ পেয়েছে তা বলা কঠিন, হয়ত কেউ-ই পায়নি। এরা কোন মতেই কোটা পেতে পারে না।

আইন এদের সে সুবিধা দিয়েছে।

প্রায় চল্লিশ বছর আগে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল যে পরিবেশকে সামনে রেখে সে পরিবেশ আজ বদল হয়ে গেছে অথচ অযোগ্যতা নিয়েও তারা যোগ্যদের ডিঙিয়ে যাচ্ছে। এতে প্রশাসন ঠিকভাবে চলবে কি? গুজরাটের অবস্থা তাকিয়ে দেখ। স্কুল কলেজে ভর্তিরও কোটা আছে। একজন অযোগ্যপ্রার্থীকে ডাক্তারী পড়তে দিয়ে সমাজের কোন উপকারটা হবে বলতে পার? যেখানে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা সেখানে সাব্‌-স্টাণ্ডার্ড ডাক্তার অথবা ইনজিনিয়ার কি সমাজের উপকার করতে পারবে!

বললাম, এই কোটা পশ্চিমবঙ্গেও আছে।

খুব ভাল নয়। গুজরাটের মত এখানেও যে কোন সময় হাঙ্গামা হতে পারে। মুসলমানরাও দাবী জানাচ্ছে, খৃশ্চানরাও দাবী জানাচ্ছে। অর্থাৎ

প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার স্বীকার করা হচ্ছে না। আমি তোমাদের গণতন্ত্র ঠিক বুঝতে পারি না।

তোমার মনে এসব চিন্তা কি করে এল ?

একবার পরিসংখ্যান নিয়ে দেখেছ কি ? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শতকরা তিরিশ পঁয়ত্রিশ ভাগ চাকরি অবাঙ্গালীরা ভোগ করছে অথচ অবাঙ্গালী সওদাগরী অফিসে বাঙ্গালীদের কাজ দিচ্ছে না। বিহারে যাও, সেখানে বিহারবাসী না হলে কাউকেই কাজ দেয় না সরকার। এসব চিন্তা কেন মনে আসে যখন আমরা দেখি আমাদের মত লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর ছেলেমেয়ে বেকার-জীবনের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে বিপথগামী হচ্ছে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ধর্ষণ প্রভৃতি ঘৃণ্য সমাজবিরোধী কাজে তৎপর হচ্ছে। চিরকাল যুবশক্তিকে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিশাল সম্পদ মনে করা হয় অথচ আমাদের দেশে এই যুবশক্তির অপচয় ঘটছে।

ওসব কথা আলোচনা না করাই ভাল। তোমার বক্তব্য তো চাকরি পাওয়াতে শেষ নয়। আরও কিছু নিশ্চয়ই বলার আছে।

শ্যামলী উত্তেজিত ভাবে বলল, দাদু, মানে তোমাদের হরিশখুড়ো আমাকে চাকরি করতে দেবে না বলেছে। এতেই শেষ নয়, তার নির্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করতে হবে এই নির্দেশ দিয়েছে।

তোমার বাবা কি বললেন ?

বাবা সুবোধ বালকের মত মুখ বুজে রইলেন। বাদ প্রতিবাদ করলেন না।

তোমার কি মত ?

আমি চাকরি করব, বিয়ে করব না। অন্তত দাদুর নির্বাচিত পাত্রকে।

বললাম, দুটোই তো করা যায়। পাত্র নির্বাচনের দায়িত্ব যদি অবিভাবকরা নেয় তাতে তোমার আপত্তি কিসের জন্যে ?

তা হলে তোমার মতও দাদুর মত ?

আচ্ছা রাগ করছিস কেন ? আমি তো কোন মতামত দেয়নি। বিষয়টা তোর সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছি। সব শুনে তবেই তো মতামত দেব।

দরকার নেই তোমার মতামতের। কোথায় তুমি আমাকে সাহায্য করবে, তা না। তুমিও ওই বাহাত্তুরে বুড়োর দলে গিয়ে ভিড়ছ!

শ্যামলী উঠে দাঁড়াতে তার হাত ধরে বসালাম।

কি বলতে চাও ?

বিয়েটা মানুষের জীবনে প্রয়োজন। তাই বিয়ে করব না শুনতে ভাল লাগে না। চিরকুমার সভার সদস্যরা অপেক্ষা করে তিন চারটে বিয়ে করতে। রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা নাটক তো দেখেছিস। অর্থাৎ বিয়ে তোমাকে করতে হবে। To day or tomorrow, তবে পাত্রটি কে হবে সে বিষয়ে পাকা মত দেবে তুমি।

তারপর ?

পিতৃকুলের পকেট খালি করে পৈতৃক বাড়িটি বেহাত দিয়ে তোর বিয়ের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে তুই যে দিন নিজের প্রার্থিত ঘরে যাবি সেদিন তোর কাঁদার দিন নয়। এটাও তুই জানিস। তবে কাঁদবে তোর পিতৃকুল। পাওনাদারের তাগাদায় অস্থির হয়ে নিজেদের অভিশাপ দেবে। ভগবানকে ডেকে বলবে, হে ভগবান কারও যেন মেয়ে না হয়। মেয়ের বাবার জ্বালা যেন সহ্য করতে না হয়।

শ্যামলী গম্ভীর হয়ে গেল।

বললাম, ঠাট্টা নয় শ্যামলী। আমাদের দেশের মেয়ের বাবা হওয়া যে কত বড় পাপ তা অনেকেই হাড়ে হাড়ে বুঝেছে। বিয়ে দিলেও তো শান্তি নেই। যে কোন দিন মেয়ের আত্মহত্যার খবর অথবা বধূ নিধনের সংবাদ এসে দুঃস্থ পিতাকে আরও বেশি বিপন্ন করবে। এতো হামেশাই শুনতে পাস, দেখতে পাস।

কিন্তু চাকরির কথা তো বললে না!

চাকরি করবি।

কিন্তু দাদু?

দাদু তো জুজু নয়। তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে। সে দায়িত্ব আমার।

শ্যামলী কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে উঠে গেল।

কিন্তু যে সমস্যার কথা তাকে বললাম, সে সমস্যার সমাধান কখনও যে হবে এমন আশা করা ভুল। কবে কোন অখ্যাত দিনে কোন এক অখ্যাত ঋষি বলে গেছেন, সালঙ্করা কন্যা দান করতে হবে। সেই tradition মেনে চলতে আজ কত যে বিপন্ন আমাদের সমাজব্যবস্থা তা বলে শেষ করা যায় না। এটাতো আমাদের কথা। মুসলমান সমাজেও এই পাপ প্রবেশ করেছে। তারাও আজ পণপ্রথার ধাক্কায় অস্থির। তাদের ঘরেও বধূ হত্যা হচ্ছে। অথচ মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে যা কিছু প্রাপ্য তা বধূর। পাত্রের নয়।

আর্থিক স্বাধীনতা মেয়েদের জীবনে কতটা প্রয়োজন তা বর্তমান দারিদ্র পীড়িত সমাজের প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করছে। সংবাদপত্রে কর্মে নিযুক্ত নারীদের বিবাহ করতে আগ্রহী আর্থিক সঙ্গতিপন্ন পুরুষদের বিজ্ঞাপন আমরা সব সময়ই দেখতে পাই। রূপলাবণ্য এমন কি পণের চেয়ে উপার্জনশীলা যুবতীর বাজার দর অনেক বেশি। শ্যামলীর বিবাহের জন্য পাত্র সন্ধান করার দুর্ভোগ কাউকেই ভোগ করতে হবে না যদি শ্যামলী কামধেনুর মত অর্থ জোগাতে পারে তার পরিজনকে।

পুঁজিবাদী দেশেই বেকার সমস্যা রয়েছে। সর্বাধিক ধনীদেশ আমেরিকার বেকার সংখ্যা বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে কম করেও সত্তর লক্ষ। পুঁজিবাদী দেশ সামরিক অস্ত্রসম্ভার সংগ্রহে এবং সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুত রাখতে যে পরিমাণ অর্থব্যয় করে তার অতি সামান্য অংশও যদি বেকার সমস্যা সমাধানে ব্যয় করত তা হলে তাদের সামনে অনাহারীরা ভীড় করত না। আমেরিকায় দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে শতকরা পঁয়ত্রিশজন। এদের মুখের অন্ন

কেড়ে, রোজগারের পথ বন্ধ করে অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলছে সে দেশে। শুধু বেকার সমস্যায় আমেরিকা বিপন্ন নয়। সমাজ জীবনের সর্বত্রই আমেরিকার সাধারণ মানুষ বঞ্চিত।

আমাদের দেশের কথা বলে নিজেদের ছোট করা উচিত নয়। কোটি কোটি বেকারকে বিপথে পরিচালিত করে কেন্দ্রীয় সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করছে সামরিক খাতে। এখানেও চলেছে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা। অনাহারী মানুষের মনে চমক জাগাতে ইন্দিরার মৃত্যুবার্ষিকীতে ব্যয় করা হয়েছে অজস্র টাকা, জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের নামে চূড়ান্ত অপব্যয় করতে দ্বিধা করছে না শাসকরা, কংগ্রেসের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবে ঢালাও বিলাস ব্যবস্থা নির্লজ্জভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

খাদ্যে ভারত স্বাবলম্বী।

পানজাব হল ভারতের শস্য ভাণ্ডার।

কিন্তু ভাণ্ডারের চাবিকাঠি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। দেশের মানুষ দু'বেলা খেতে না পেলেও বিদেশে খাদ্যশস্য রপ্তানী হচ্ছে, কারণ দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা নেই। তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনাও নেই। প্রতিটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় করের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সঞ্চিত করের বৃহত্তম অংশ কয়েকটি বিশেষ পুঁজিপতির পকেটস্থ হচ্ছে পরিকল্পনা রূপায়ণের নামে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাধারণ মানুষ পুষ্টিকর খাদ্য তো দূরের কথা অপুষ্টিকর খাদ্যও সংগ্রহ করতে পারছে না। যারা প্রগতিশীল ও দরিদ্রবান্ধব বলে নিজেদের জাহির করে তারাও একচেটিয়া দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের দরজায় হানা দিচ্ছে যৌথ অর্থনীতি সৃষ্টিতে। জওহরলাল যে মিশ্র অর্থনীতির জন্ম দিয়েছিল তার সার্থক রূপায়ণ ঘটাতে দরিদ্র বান্ধব বাম-পন্থীরা দ্বারস্থ হচ্ছে পুঁজিপতিদের দরজায়। এদের বক্তব্য হল, এইভাবেই বেকার সমস্যা সমাধান হবে। যে দেশে দশ হাজার বেকারের কর্মসংস্থান হবার আগেই তিরিশ হাজার বেকার সৃষ্টি হচ্ছে সে দেশে এই সব নেতিবাচক অর্থনীতির ফলাফল মোটেই সুখপ্রদ হয়না।

অনেকদিন পর বিমল এসেছে।

তাকে অভ্যর্থনা করে বসতে দিয়ে বললাম, তোমাদের সমাজসেবা চলছে তো?

বিমল ক্ষুন্নভাবে বলল, সমাজই নেই, সেবা করব কার?

আমাকে অন্য প্রশ্ন করতে না দিয়ে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে বলল, দাদা, চায়ের ব্যবস্থা করুন। বাইরে বড়ই ঠাণ্ডা। এখানে আসতে আসতে জমে গেছি।

ছোটকাকে ডেকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বললাম।

এই দেখছেন দাদা, বিহারে এবারের শীতে প্রায় দেড়শ' জন মারা গেছে। গোটা ভারতে এর সংখ্যা প্রায় দুইশত।

হেসে বললাম, এই তো আমাদের সমাজ। এর সেবা করতে হবে ভাই।

আমাদের তো অর্থ নেই, গতর আছে। গতর খাটিয়ে এসব সমস্যা সমাধান তো সম্ভব নয়। পৃথিবীর কোন স্বাধীন দেশে এভাবে মানুষকে প্রাণ হারাতে হয় তা আমার জানা নেই।

বললাম, জানা নেই ঠিকই। আমাদের দেশে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয় সামরিক খাতে দেশকে বিদেশি শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে। অথচ শীতের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার ক্ষমতা এদের নেই। প্রধানমন্ত্রী একবিংশ শতাব্দীর দিকে লাফ দিচ্ছে, আধুনিক প্রযুক্তি আর কম্পিউটারের কত দরকার তার বাণী দু'বেলা শোনাচ্ছে. শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন এক যুগে নাকি প্রবেশ করেছে ভারতবর্ষ। অথচ মানুষ মরছে, পরমানু বোমায় নয়। মরছে ক্ষুধায় এবং দারিদ্রে।

বিমল বলল, আজ মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে কত না পথ উদ্ভাবন করেছে। শীত প্রতিরোধে আধুনিক বাস্তুকাররা কত নতুন ধরনের বাড়ি তৈরী করছেন। শীত প্রতিরোধের জন্য রয়েছে নানা ধরনের শীত বস্ত্র। বছরের মধ্যে দশমাস যেখানে বরফ জমে থাকে সেখানেও আজ মনুষ্য বসতি। দুর্গম কুমেরু প্রদেশের দুর্জয় দৈত্যও আজ সভ্য মানুষের পদানত অথচ সেই পৃথিবীর বুকে আমাদের এই স্বাধীন ভারতবর্ষে শীতের বলি শত শত মানুষ প্রতি বৎসর।

বললাম. দেশ যাদের অঙ্গুলি হেলনে চলছে তাদের আছে অকাট্য যুক্তি। তারা বেশি চিন্তা করছে দেশ রক্ষার, দেশের মানুষকে রক্ষা করাটা অতি সামান্য ব্যাপার। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো দিল্লীর সুলতানের কাজ নয়। ফিফথ্ জেনারেশন কম্পিউটার পরমাণুশক্তি, উপগ্রহ যোগাযোগ আর ফরাসী দেশের মিরাজ হল ওদের ধ্যান জ্ঞান ও প্রার্থনা। দরিদ্র ভারতের মাটিতে এই চরম বিলাসিতার বিপক্ষে কথা বলার কেউ নেই। দরিদ্র মানুষ-গুলো শীতবস্ত্র সংগ্রহ করতে পারছে না, তাতে তো মিরাজ কেনা বন্ধ থাকতে পারে না।

বিমল চিন্তিতভাবে বলল. কিন্তু দাদা, এরপর কি ?

সেকথা আজ সবাই ভাবছে। গবেষকদের মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে এরপর কি খুঁজে বের করতে। আমাদের মত অভাজন এ নিয়ে সময় নষ্ট করার কোন অর্থ-ই হয় না। তার চেয়ে বল তোমার সমাজ সেবার কথা, তোমার পাঠশালার কথা।

বিমল হাসল।

আমি তার ম্লান হাসির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পাঠশালা নেই দাদা। পুড়িয়ে দিয়েছে।

এমন মূল্যবান কার্যটি কে করল ?

একদল বলল, কংগ্রেস ; আরেকদল বলল, সি-পি-এম।

তুমি কি বললে ?

কিছুই না। আজ মানুষ মরে না, কংগ্রেস কর্মী মরে, না হলে বামপন্থী মরে। তেমনি আজ ঘর পোড়ে কংগ্রেসের অথবা বামপন্থীদের। তাই আমি নির্বাক। তবে হাল ছাড়িনি, আবার পাঠশালা করব, আবার মানুষের মনে চেতনা জাগাবার চেষ্টা করব। তবে সাফল্য সেই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেব।

চা খেয়ে বিমল বলল, আপনার কাছে অন্য কাজে এসেছি দাদা। আমাদের দেশ হল কৃষিভিত্তিক, কৃষি অর্থনীতির উপর আমরা নির্ভরশীল।

এক সময় তা ছিল। এখন আর নয়। গ্রামের মানুষ ছুটছে কলকারখানায় কাজ সংগ্রহ করতে। কৃষি বিশেষভাবে উপেক্ষিত। একসময় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ডেকে এনেছিল মাড়োয়ারীদের। তারা কৃষির উন্নতি না ঘটিয়ে কলকারখানা বসিয়ে নিজের দেশের লোকদের ডেকে এনেছে আমাদের শোষণ করতে।

ঠিক বুঝলাম না আপনার কথা।

তুমি তো জান গোটা বাংলাদেশে অর্থকরী কৃষিপণ্য হল পাট। ইংরেজ পুঁজিপতিরা চটকল বসালো। পাটের জোগান যারা দিত তারা হল মাড়োয়ারী। চট্টগ্রাম থেকে সুন্দরবন অবধি যেখানে পাট উৎপন্ন হত সেখানেই পাট কিনত এই সব মাড়োয়ারীরা। এরা দেশের চটকলগুলোতে বেল বেঁধে পাট যেমন সরবরাহ করত তেমনি দেশের বাইরেও পাঠাত। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর পাটজাত সামগ্রীর চাহিদা বাড়তে থাকে, মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরাও ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। অতি সামান্য সংখ্যক বাঙ্গালী এই ব্যবসায়ে এসেছিল।

অর্থাৎ কাঁচা পাটের ব্যবসাটা করত মাড়োয়ারীরা।

হাঁ। উনিশ শ' আঠার থেকে উনিশ শ' পঞ্চাশ সাল অবধি মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা পাটের বাজার নিজেদের কব্জায় রেখেছিল। এই ব্যবসায়ের সব চেয়ে কৃতী ব্যবসায়ী ছিল ঘনশ্যামদাস বিড়লা, সুরজমল ইত্যাদি মাড়োয়ারীরা। ত্রিশ বত্রিশ বছরের মধ্যে এরা এমন গুছিয়ে নিয়েছিল যার চেহারা আজ দেখতে পাচ্ছ। ভারতের ব্যবসা ক্ষেত্রে এরাই সর্বেসর্বা। কেন ব্যবসা নেই যা এরা একচেটিয়াভাবে পরিচালনা করছে না। পাটের বাজারে ফাটকা খেলা হল শেয়ার বাজারের মত। ইংরেজ পুঁজিপতিরা তাতে বিপন্ন বোধ করে আইন করে তা বন্ধ করতে চেষ্টাও করেছিল, তবে অতি বিলম্বে। ইতিমধ্যেই এইসব ব্যবসায়ীরা শক্ত মাটিতে পা রাখতে পেরেছিল। আজ ভারতের অর্থনীতি এদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হচ্ছে। আর আমরা যে কৃষির জন্য গর্বিত, সেই কৃষিকে অবজ্ঞা করে কৃষিজীবনের বেকারত্ব ঘোচাতে এদের দরজায় দরজায় হা চাকরি জো চাকরি ধ্বনি করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বিমল বোধহয় এমন কঠিন সত্যের মুখোমুখি কখনও হয়নি।

আবার বললাম, কৃষি ধ্বংসের মূলে রয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। জমিদাররা চাষীর ঘরের কড়ি তার খাজানচিখানায় জমা করলেও চাষের উন্নতির জন্য

একটি পয়সাও ব্যয় করেনি। ক্রমাগত চাষের অবনতি ঘটেছে। স্বাধীনতা-লাভের পর জমিদারী ব্যবস্থা উঠে গেলেও আরেকটি পাপ দেখা দিল যার নাম জোতদারী। এই পাপ আরও সর্বনাশা। চাষী কোন মতেই জমি পেলনা। চাষী পরিণত হল ক্ষেত মজুরে। এই মজুরীও বছরে তিন চার মাসের। এতে চাষীর জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছে নরক যন্ত্রণা তুল্য। ভূমিহীন কর্মহীন মানুষ গ্রামের মায়া কাটিয়ে শহরে আসছে মজুরী পাবার আশায়, আশ্রয় নিচ্ছে অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে ফুটপাতে, তাদের বংশধররা হয়ে উঠছে সমাজবিরোধী, এই হল চাষ ও চাষীর পরিণতি। চিন্তা করে দেখ এরপর কি ?

ভারতের সর্বত্রই কি একই চেহারা !

কোথাও উনিশ কোথাও বিশ। শুনেছ তো বোম্বাইয়ে কয়েক লক্ষ লোক বে-আইনী ঝুপড়িতে বাস করে, দিল্লীর পুরাতন শহরেও পাবে হাজার হাজার মানুষ ঝুপড়িতে বাস করছে, মাদ্রাজ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ এর ব্যতিক্রম নয়। তবে পাঞ্জাব, হারিয়ানার অবস্থা কিছুটা ভাল। পাঞ্জাব থেকে একচেটিয়া সৈন্য সংগ্রহ করত ভারত সরকার, স্বাধীনতার পর পাঞ্জাবকে কোটি কোটি টাকা দিয়েছে ভারত সরকার উন্নয়ণ খাতে, বাস্তুহারা পুনর্বাসনে। সেচের ব্যবস্থা করেছে, হারিয়ানায় শিল্প স্থাপন হয়েছে, এই সুবিধা পেয়েছে রাজধানী দিল্লীর নিকট প্রাতিবাসী রাজ্য এই সুবাদে। পাঞ্জাবেও নানা শিল্প গড়ে উঠেছে, সেখানে বেকার সমস্যাও কম। কিন্তু অন্যত্র চেহারা আলাদা। এবার বল তোমার কি কাজ করতে হবে।

কাজ তো অনেক। বড় কাজ হল আপনাকে আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে মাঝে মাঝে যেতে হবে। লোকদের বুঝিয়ে বলতে হবে তাদের প্রকৃত অবস্থা।

কাজ বড় কঠিন। ভেবে দেখব কতটা সাহায্য করতে পারি। আর কি কাজ ?

কিছু টাকা সংগ্রহ করে দিতে হবে।

অর্থাৎ চাঁদার খাতা নিয়ে দরজায় দরজায় ঘুরতে হবে।

না। আমরা একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করব। তার জন্য যোগাযোগ করে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে।

কার সঙ্গে ?

শিল্পীদের সঙ্গে।

এটা পারব না বাপু। আমার জানাশোনা নেই। দ্বিতীয়ত, তোমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানে নানা গীতবাদ্যের আসর, ওতে আমার বড় ভয়। গায়ক কি গান করবেন জানি না। তবে তার সঙ্গে যে ক্যানেস্তারা পার্টি থাকে তাদের আমি সহ্য করতে পারি না।

ক্যানেস্তারা পার্টি আবার কি ?

বাদ্য সম্ভার। দশটা বেহালা, তিনটে জগঝম্প, পাঁচটা ঢোল, চারটে ঝোলানো করতাল তার সঙ্গে আর্কেডিয়ান তবলা ডুগি, উঃ কি ভয়ঙ্কর বাদ্য।

গায়ক কোমর ঘুরিয়ে মাইক হাতে কুৎসিতভাবে নাচবে তার সঙ্গে এইসব একগাদা যন্ত্র বাজবে, সে যে কি ভয়ঙ্কর তা তোমাকে বুঝাতে পারব না। গায়কের গান না শুনে ওই ক্যানেস্তারা পার্টির অসহ্য বাদ্য শোনা অসম্ভব। অন্য কোন কাজ থাকলে বল।

বিজ্ঞাপনগুলো লিখে দিতে হবে।

চেষ্টা করব। তবে ভাই এই ক্যানেস্তারা পার্টি থেকে আয় মন্দ হবে না। যদি আরম্ভ করতে পার আর লোক সমাগম ঘটে তা হলে দেখবে ক্যানেস্তারা পার্টির গায়ক শুধু নাচছে না, সেই সঙ্গে দর্শক শ্রোতাদের কেউ কেউ কোমর ঘুরিযে নাচতে শুরু করেছে। গাযক কিন্তু সব ক্ষেত্রেই রা ভাষা গান করবে। আমরাও হাততালি দেব, বাহবা চিৎকার করব।

বিমল বুঝল এসবে আমার আগ্রহ নেই। বিষণ্ণভাবে বিদায় নিল। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

দিন কাটে রাত আসে, রাত কাটে দিন আসে। মন্থর গতিতে চলে জীবনযাত্রা। নতুনত্ব নেই, আনন্দ নেই, এক ঘেযে। সারাদিন ভেবেছি, এই কি শেষ! এর শেষ কোথায়? উত্তর খুঁজে পাইনি।

বাঙ্গালোর থেকে বাল্যবন্ধু বিটলভাই বাবুরাওয়ের চিঠি পেয়েছি। প্রায় দু' দশক পরে হঠাৎ তার চিঠি। অতি আগ্রহের সঙ্গে চিঠি খুলে পড়লাম।

বাবুরাও লিখেছে, অতি সত্বর যদি পারিস একবার বাঙ্গালোরে আসিস। তোকে খুবই দরকার।

আর কিছু লেখেনি। শুধু তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে মাদ্রাজ মেলে এলে সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাজেই বৃন্দাবন এক্সপ্রেস পাবি। তোর চিঠি পেলে আমি স্টেশনে থাকব।

চিঠি পড়ে যেন ধ্যানে বসলাম। বাবুরাও হঠাৎ বিশ বছর পর কেন চিঠি দিল। পঁচিশ বছর আগে বাবুরাও পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল ডাক্তারী পড়তে। তখন পরিচয়। ছয় বছর বেশ ঘনিষ্ঠ ছিলাম। দেশে ফেরার পর বাবুরাও মাঝে মাঝে চিঠি দিত। কয়েকবার সে জানিয়েছিল, আমি বিলাত যাচ্ছি হায়ার স্টাডির জন্য। বিলেতে গিয়েও সে দু-তিনবার চিঠি দিয়েছে, তারপর চুপচাপ। বাবুরাও বিলেত থেকে নিশ্চয়ই ফিরেছিল যথাসময়ে কিন্তু কোথায় আছে তা জানতাম না, সেজন্য তাকে চিঠি দেবার মত সুযোগও ছিল না।

বাবুরাওকে জিজ্ঞাসা করতাম, তুই ডাক্তারী পড়তে এলি কেন?

দেশে ডাক্তারের বড় অভাব।

দেশে বেকার ডাক্তার অজস্র।

তা হতে পারে। তারা বেকার দুটো কারণে, প্রথমটা হল তারা সাব-স্টাণ্ডার্ডের ডাক্তার আর দ্বিতীয় হল তাদের উদ্দেশ্য অজস্র অর্থ উপার্জন। তাই তারা নিজেদের বেকার মনে করে। আমি যদি পাশ করে ওই

খাঁচের ডাক্তার হই তা হলে আমিও বেকার হব। তবে সমাজকে সব চেয়ে বেশি সেবা করতে পারে ডাক্তার। সেই সেবার মনোভাব নিয়েই এসেছি।

এই মনোভাব কতদিন থাকবে?

এখন তো আছে, ভবিষ্যত নিয়ে জ্যোতিষীরা চিন্তা করে। আমরা করি বর্তমানের দাসত্ব।

বাবুরাও আরও বলেছিল, আমি তাকেই প্রগতিশীল মনে করি যে বর্তমানকে মেনে নিয়ে এগিয়ে চলতে পারে। অতীতের শিক্ষা নেব, তার ছায়াতে বর্তমানকে তিমিরাচ্ছন্ন করব না। এটাই হল নবযৌবনের ধর্ম, আর প্রগতির দ্যোতক।

বাবুরাওকে ভুলতে পারিনি তার বলিষ্ঠ চিন্তার ব্যাপকতার জন্য।

চিঠিখানা হাতে করে বউদির কাছে গিয়ে তার হাতে চিঠি তুলে দিয়ে বললাম, পড়। বাবুরাওয়েও চিঠি।

বউদি চোখ বড় বড় করে বলল, বাবুরাও আবার কে?

তুমি চিনবে না। তোমার বিয়ের আগে সেই ছিল আমার একমাত্র পুরুষ বন্ধু।

আর সবাই বুঝি মেয়ে?

তাতো দেখতেই পাচ্ছ। চিঠিটা পড়।

বউদি পড়া শেষ করে বলল, বেশ তো। ঘরে বসে বসে তোমার দেহে ঘুণ ধরে গেল। কিছুদিন বেড়িয়ে এস না।

ভেবে দেখতে হবে। অনেক টাকার ব্যাপার। ট্রেনের ভাড়া কত বৃদ্ধি পেয়েছে তাতো জান। গাড়িতে পা দিলেই একটাকা। তারপর দূরত্ব।

আচ্ছা ঠাকুরপো একটা কাজ করলে হয় না।

কি কাজ?

সব টাকা আমি তোমার দাদার কাছ থেকে আদায় করে দেব, তবে এই সুযোগে আমাকেও বেড়িয়ে নিয়ে আসতে হবে।

দাদা রাজি হবেন কি?

সে দায় আমার। আমি আর মিণ্টু তোমার সঙ্গে যাব।

ভেবে দেখতে হবে বউদি। আমাদের মুনিঋষিরা বলে গেছেন পথি নারী বিবর্জিতা। অর্থাৎ তোমার ফরমাইস খাটতে পারব না।

তার জন্য মিণ্টু তো রইল।

তোমার দরকার মত পান দোক্তা কিন্তু সেখানে পাবে না।

কে বলল! ভারতবর্ষের যেখানেই যাও পান পাবে। তবে দামের কমবেশী। তার জন্য চিন্তা করতে হবে না।

ভেবে দেখি, বলে পাশ কাটালাম। একবার অমিয়ার সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে। অমিয়া আমাকে গাইড লাইন দেবে।

সন্ধ্যাবেলায় অমিয়ার বাড়িতে হাজির হলাম। অমিয়া বাড়িতে নেই। মাধুরী দরজা খুলে বসতে দিয়ে চা করতে গেল। সামনে পড়েছিল একটা

বিদেশী ম্যাগাজিন। হাতে তুলে নিয়ে চোখ বুলাতে থাকি।

প'ডির শব্দ পেলাম। বুঝলাম, অমিয়া ফিরেছে।

ঘরে ঢু'কই অমিয়া অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলল, নমস্কার, মহাশয়ের বড় দয়া। এই অভাগীকে কৃতার্থ করতে এতদিন পর কেন শুভাগমন।

আমি বললাম, মহাশয়াও তো এই অভাজনকে স্মরণ করে অভাজনের গরীব খানায় একবার পদার্পণও করেননি। অন্তত কুশল সংবাদ জানাতে।

অপরাধ উভয় পক্ষের। তোকে চা দিয়েছে কি?

আনতে গেছে। তুই বস। তোর সঙ্গে জরুরী কথা আছে। একটা চিঠি এসেছে। এ বিষয়ে তোর মতামত জানতে এসেছি।

দে দেখি, বলে হাত বাড়াল। আমি তার হাতে চিঠিটা দিতেই সে চোখ বুলিয়ে বলল, আমি ভেবেছি কোনো অষ্টাদশীর চিঠি। তাও ভাল। তা বাবুরাও মানে আমাদের সেই ইডলি-ধোসা। দু-একবার তোর সঙ্গে দেখেছি। তা আমি কি বলব বল।

আমার যাওয়ার বিষয়।

যাবি। নিশ্চয়ই কোন দরকার রয়েছে তার নইলে এভাবে চিঠি দিত না।

যত সহজে বললি, অত সহজ নয় বন্ধু। অনেক টাকার দরকার।

তোর হাতে টাকা নেই বুঝি?

আছে, তবে এতদূর যাবার মত টাকা নেই। তবে বউদি বললেন তিনি টাকা জোগাড় করে দেবেন একটি সর্তে। তাঁকে এবং তাঁর কন্যা মিণ্টুকে সঙ্গে নিতে হবে।

তাই যাবি।

আমার ভয় করছে অমু। বউদির নানা বায়না শুনতে শুনতে হয়রাণ হতে হবে।

তা হলে কি করবি?

যাব না মনে করেছি।

উঁহু। তোকে যেতে হবে। সব টাকা আমি দেব।

শর্ত নেই তো?

আমার দিক থেকে নেই তবে যদি আমাকে সঙ্গে নিস তা হলে তোর কষ্ট কমবে। আমার সঙ্গে মাধুরী যাবে, পরাণ যাবে। আমাদের পথে ও প্রবাসে কোন কষ্টই করতে হবে না। তবে তোর মর্জি। আমার শর্ত নয়।

মাধুরী চায়ের কাপ সামনে রাখল। অমিয়ার, কথার জবাব না দিয়ে চায়ে চুমুক দিলাম। অমিয়াও চায়ের কাপ টেনে নিয়ে বলল, কি ঠিক করলি?

ভেবে দেখতে হবে।

জরুরী বিষয় খুব বেশি চিন্তার অবকাশ থাকে না। yes বা no, এই দুটোর একটা অবশ্যই করতে হবে। middle term কিছু নেই।

বললাম, তথাস্তু তবে বউদিকে বুঝিয়ে বলতে হবে। শেষে উনি বলবেন,

বেশ তো সবাই মিলেই চল। দেখ অমিয়া, আজ অবধি তোর কাছে হাত পেতে একটা কড়িও কখনও নেইনি।

প্রয়োজন হয়নি।

হলেও চাইনি।

সেটা তোর হীনমন্যতা। আমার আর তোর আর্থিক তারতম্য আছে ঠিকই কিন্তু সমাজে তুই আমার চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত, তোর মর্যাদার মূল্য দিতে কেউ পারবে না। তবুও বলব, আমি কখনও তোকে অমর্যাদা করিনি, কখনও ভাবিনি আর্থিক দিক থেকে তুই দুর্বল। আমার কাছে হাত পাততে হবে কেন? তোর প্রয়োজনটা জানলে আমিই দেবার জন্য এগিয়ে যাব। যাক্ ওসব কথা। তুই বউদির সঙ্গে কথা বলে আমাকে কাল সকালেই জানাবি। বাবুরাওকে দরকার হলে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিবি কবে বাঙ্গালোর পৌঁছাব। কেমন!

আমার অনিচ্ছা থাকলেও এবং বউদির ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত মিন্টুর পরীক্ষার অজুহাতে বউদির যাওয়া স্থগিত রইল। আমার হাতে কয়েকশত টাকা দিয়ে বললেন, বাঙ্গালোর স্বাস্থ্যকর জায়গা, দু-একমাস থেকে এস। তোমার দাদা বলেছেন, এর জন্য যত টাকার দরকার তা দেবেন, বাবুর ঘাড়ে চেপে থেক না যেন।

বললাম, তথাস্তু!

বাবুরাওকে চিঠি দেবার আগে রিজার্ভেশনের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হল দালালরা দশ পারসেন্ট থেকে পাঁচ পারসেন্টে টিকিট দিতে রাজি, আমরা গররাজি। অমিয়া টিকিট করার দায়িত্ব নিল, আমি বাঁচলাম।

বাঙ্গালোর চির বসন্তের শহর। পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় অবস্থিত প্রায় সব শহরের জলবায়ু মনোরম। অমিয়ার উৎসাহে নির্দিষ্ট দিনে গাড়িতে চেপে বসলাম। সঙ্গে অমিয়া, মাধুরী আর খাস বেয়ারা পরাণ। খাবার দাবার, বিছানা, ব্যাগ সব কিছুর দায়িত্ব পরাণ ও মাধুরীর। আমরা খেয়ে দেয়ে সাজানো বিছানায় বার্থে গিয়ে পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম। ছটা বার্থের চারটেই আমাদের। বাইরের লোক মাত্র দুজন, তারাও মাদ্রাজযাত্রী। মোটামুটি নিরাপদ যাত্রাই মনে হল।

সকাল বেলায় চিল্কার গা ঘেঁষে ছুটছিল গাড়ি। গাড়ির গতিবেগও তীব্র। পূর্বদিকের আকাশে লালিমা, ভোরের সূর্য সোনালী ঢেউ খেলাচ্ছে চিল্কার বুকে। দক্ষিণে সমুদ্র, দিগন্ত বিস্তৃত। জানালার পাশে বসে দেখছিলাম পৃথিবীর নতুনরূপ। অমিয়া ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গেছে। মাধুরী সংসার গুছাতে তৎপর। পরাণ সবার অলক্ষ্যে উঠে গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে।

অমিয়া ফিরে আসার আগেই পরাণ মাঝের বার্থটা টেনে আটকে বসার ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিল। অমিয়া ফিরে আসতেই মাধুরী ফ্লাস্ক খুলে সামান্য উষ্ণ চা আর কয়েকখানা বিস্কুট রাখল সামনে।

রাতের ঘুমটা কেমন হল?

ভালই। তোর ঘুম হয়েছে তো?

বললাম, মোটামুটি। তবে কোথায় যেন বেশ গোলমাল হয়েছিল, গাড়িও দাঁড়িয়েছিল অনেক সময়। তখন একটু ব্যাঘাত ঘটলেও মোটামুটি ঘুমিয়েছি।

কিসের গোলমাল শুনেছিস কি?

না। শোনার দরকার হয়নি, কেউ শোনাবে এমন লোকই বা কোথায়! উপরন্তু গোলমাল হয়েছে গাড়ির শেষের দিকে, আমরা আছি সামনের দিকে, খুব জানার আগ্রহও ছিল না।

আমি ভাবছি, গাড়িতো লেটে চলছে। মাদ্রাজ পৌঁছবার আগেই বৃন্দাবন এক্সপ্রেস যদি স্টেশন ছেড়ে যায় তা হলে কষ্ট বৃদ্ধি পাবে। সারাদিন পড়ে থাকতে হবে স্টেশনে, বিকেলের গাড়ি সকালে পৌঁছবে। তুই বরং মাদ্রাজে নেমেই বাবুরাওকে একটা টেলিগ্রাম করে দিস।

যুক্তিটা মন্দ নয়, তবে টেলিগ্রাম আমরা বাঙ্গালোরে পৌঁছবার যদি তিনদিন পরে পৌঁছায় তাতেও আশ্চর্য হোস না। তবুও তোর বাক্য শিরোধার্য।

গাড়ি চলছে তো চলছেই।

আমরা ঝিমুনি কাটিয়ে হাত-পা ঝাড়া দিয়ে বসে তাকিয়ে রয়েছি বাইরের আকাশের দিকে, অমিয়া একটা ম্যাগাজিন বের করে পড়ছে আর ঝিমোচ্ছে।

আমরা কোথায় যাচ্ছি তাতো জানিস, এই দেশটা ছিল হায়দার-টিপুর রাজ্য। অনেক রক্ত দিয়েও দেশ রক্ষা করতে পারেনি ওরা দু'জনেই।

ম্যাগাজিনটা মুড়ে পাশে রেখে দিয়ে অমিয়া বলল, কে না জানে এসব ইতিহাস কিন্তু বিশেষ ঘটনাটা আজও কেউ বিশ্লেষণ করেনি।

বিশ্লেষণ করা ঐতিহাসিকদের কাজ।

সেটাই তো বলছি। ভারতীয় জীবনের কলঙ্ক হল গৃহবিবাদ আর বিশ্বাসঘাতকতা। হায়দার আলি প্রভুকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজ্য দখল করে। রাজকার্যে হায়দার আলি ছিলেন দক্ষ কিন্তু নিষ্কলঙ্ক নয়। তার প্রতিবেশী মারাঠা ও নিজাম তাকে বিশ্বাস করত না। যখন সে বিপন্ন তখন কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনি। বরং নিজাম ও মারাঠা শক্তি ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পরাজিত মহীশূর ভাগাভাগি করতে দ্বিধা করেনি। যদিও ইতিহাস স্বীকার করেছে হায়দারকে দক্ষ প্রশাসক ও সমরবিদ রূপে তবুও রাজনীতির অতি সাধারণ নিয়মটি পালন করেননি। মাদ্রাজ পর্যন্ত এগিয়েও ইংরেজকে দক্ষিণ ভারত থেকে বিতাড়ণের সুযোগটি হারালেন ইংরেজের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে। শত্রুর শেষ রাখতে নেই এই সাধারণ ধর্মটি পালন করলে মহীশূরের মত দাপটে থাকত।

তুই তো সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সমর্থন করছিস।

কে সাম্রাজ্যবাদী নয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে স্বাধীন মহীশূরের রাজার যুদ্ধে কোন পক্ষকেই সমর্থন করাই উচিত নয়। তবে বিশ্বাসঘাতকতা

আর গৃহবিবাদ আজও শেষ হয়নি মহীশূরে তথা কর্ণাটক রাজ্যে। ট্রাডিশ্যান আজও সমানে চলছে।

তোর কথা অনস্বীকার্য। স্বাধীনতার পর থেকে মহীশূরে তথা কর্ণাটক রাজ্য প্রশাসন ছিল কংগ্রেসের হাতে। কংগ্রেস আজ কর্ণাটক থেকে বিতাড়িত বললে অত্যুক্তি হয় না। রামারাও গুণ্ডুরাও ছিল কংগ্রেসের শিরোমণি। পাতিল আর বীরাপ্পা মইলি তার প্রতিদ্বন্দ্বী। ক্ষমতা দখলের লড়াইতে উভয়েই গুণ্ডুরাওয়ের প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। কংগ্রেসের দলীয় কর্মীদের এইভাবে করে তুলেছে কর্মবিমুখ। এদের চক্রান্তে কংগ্রেস (ই) হাইকম্যাণ্ড গুণ্ডুরাওকে তার নিজস্ব বাসভূমি সোমরয়ারপেট নির্বাচন কেন্দ্র থেকে হটিয়ে দিল। ফলাফল সর্বজন বিদিত। গুণ্ডুরাও পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হলেন। অবশ্য জয়লাভ করল পাতিল ও মইলি। জনতা সরকার আঠার মাস রাজ্য পরিচালনা করার পর সংসদীয় নির্বাচনে জনতা দলের পতন দেখে হেগড়ে পদত্যাগ করে আবার জনমত যাচাইয়ের জন্য নির্বাচনে নেমেছিলেন। পাতিল আর মইলি আশা করেছিল সংসদীয় নির্বাচনের প্রভাব পড়বে বিধানসভা নির্বাচনে। যারা আশা করেছিল গুণ্ডুরাও পরাজিত হলে তারা মুখ্যমন্ত্রীর পদলাভ করবে তারা নিরাশ হল। গৃহবিবাদের ফলাফল বড়ই রূঢ়। জনতা দল কংগ্রেস (ই) কে পরাজিত করে গরিষ্ঠতা লাভ করে ওদের আশা ভঙ্গ করল।

গুণ্ডুরাও এই দুরাবস্থা প্রত্যক্ষ করে কংগ্রেস (ই) হাইকম্যাণ্ড তথা প্রধান-মন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে আবেদন করেও কোন ফললাভ করেননি।

ক্ষমতায় এল রামকৃষ্ণ হেগড়ে। জনতাদল সরকার গঠন করেছে। কিন্তু জনতা দল মানে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসী, যারা কয়েক বছর আগেও কংগ্রেসে ছিল তাই তাদের চরিত্রগত কোন প্রভেদ দেখা যায়নি কোথাও। তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল কিষেণগঞ্জের উপনির্বাচন। কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে জনতা সাম্প্রদায়িক স্লোগানকে মূলধন করে সাহাবুদ্দিন জিতে এল। ওই এলাকা মুসলীম প্রধান। শাহবানু আর শরীয়ত দেখিয়ে সাহাবুদ্দিনের জয় নিশ্চিত ভাবে জানিয়ে দিয়েছে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ নয়, এখানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিই হল নীতি। পাকিস্তান থেকে যে হাজার হাজার মুসলমান বাংলাদেশের যুদ্ধের পর এইসব এলাকায় ঘাঁটি করেছে তাদের অনুপ্রবেশ কংগ্রেস বন্ধ করতে তো পারেইনি, উপরন্তু তাদের পরোক্ষ ব্যবস্থায় ওরা ওই এলাকায় ভোটার হয়ে ভারতের সংহতি, ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিপন্ন করেছে। জনতা দলের এই চরিত্রকে কেউ সমর্থন না করলেও তাদের কোন কোন নেতা সমর্থন জানাতে কোন ত্রুটি করেননি।

সবাই মনে করে কর্ণাটকে জনতার জয় একটা নৈতিক জয়।

মোটেই নয় এই জনতা দল কেন্দ্রে সরকার গঠন করলেও তা রক্ষা করতে পারেনি। কংগ্রেসের স্বৈরাচারী চরিত্র এদের মধ্যেও বেশ ভালভাবেই ফুটে উঠেছে। ঘরোয়া বিবাদে এরা কেউ কম নয়। এই চিত্র-ই গোটা ভারতের

মূল চিত্র। ভারতের ভবিষ্যত কি, এটাই সবাই চিন্তা করছে, অতঃপর কি! কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা, সংহতি, সমাজতন্ত্র!

যা ভেবেছিলাম তাই হল, মাদ্রাজে পৌঁছলাম আট ঘণ্টা বিলম্বে। বৃন্দাবন এক্সপ্রেস ইতিমধ্যে বাঙ্গালোর পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই? আমরা পরবর্তী গাড়ির আশায় বসে রইলাম মুসাফিরখানায়।

পরাণ ও মাধুরী আমাদের আহার্য সংগ্রহে ছোটাছুটি করছে কিন্তু ভাষার তারতম্যে তারা এক পা-ও অগ্রসর হতে পারেনি। অবশেষে আমাকেই বের হতে হল আহার্যের সন্ধানে। অনেক চেষ্টা করে কেটারিং থেকে খাবার সংগ্রহ করে সোয়াস্তি পেলাম।

আবার সারারাতের জাগরণ।

অমিয়া স্থানীয় দৈনিক হিন্দু কিনে সময় কাটাতে থাকে। আমি গাড়িতে স্থান সংগ্রহের প্রত্যাশায় রেল কর্মচারীদের খোষামোদ করে চলেছি। বলা বাহুল্য হতাশাই হল আমার প্রাপ্য। হাওড়া স্টেশনে অথবা শেয়ালদা স্টেশনে যেমন অগতির গতি রেল কুলীরা তেমনি সামান্য কিছু অর্থব্যয় করে এখানেও স্থান সংগ্রহ করতে হল। বুঝলাম, ভারতীয় ঐতিহ্য সুদূর মাদ্রাজেও বহন করছে রেল কুলীরা। আমরা দুর্নীতির অভিযোগ করি পশ্চিম বাংলায় বসে, এই দুর্নীতি ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ভারতবর্ষ। মনে হয়, এটাও একটা ট্রেড। এই ট্রেড জমজমাট সারা ভারতেই।

যাকে বলে চিড়ে চ্যাপ্টা। আমরা চারজন চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে কোন রকমে স্থান পেলাম। বুঝলাম, কপালে দুঃখ থাকলে রোধ করার কেউ থাকে না। নইলে মাদ্রাজ পৌঁছতে আটঘণ্টা বিলম্ব নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক, তবুও মেনে নিতে হল, নিরুপায় হয়ে।

সকাল হল বাঙ্গালোর স্টেশ ন।

মাদ্রাজ থেকে টেলিগ্রাম করা হয়নি।

কিন্তু বাবুরাও স্টেশনে হাজির ছিল।

হেসে বাবুরাও বলল, কাল মাদ্রাজ মেলের বিলম্বে পৌঁছানোর খবর পেয়ে বুঝতে পারলাম তোমরা বৃন্দাবন এক্সপ্রেসে পৌঁছতে পারবে না। পরবর্তী ট্রেনটায় সম্ভাব্য আসার সম্ভাবনা। তাই সকালে উঠেই চলে এলাম।

বাবুরাও অমিয়াকে চিনতে পারেনি।

বললাম, ওকে চিনতে পারনি? অমিয়া! আমাদের সহপাঠিনী। তবে সে সময় অমিয়া ছিল মোষ্ট অ্যারিসট্রোকেট, অবশ্য এখনও তাই। সে সময় আমাদের কাছ থেকে দূরত্ব রক্ষা করত, এখনও তাই তবে কিছুকাল যাবত এই অভাজনকে কেমন একটু সদয় দৃষ্টিতে দেখছে।

অমিয়া ভুরু কুচকে বলল, এটা বুঝি পরিচয় করিয়ে দেবার রীতি।

তোর সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে কেন? ওর তো অপরিচিতা নোস।

বাবুরাও আমার কথায় কথা মিলিয়ে বলল, অবশ্য, তবে অনেকদিন পরে

দেখা। চিনতে পারিনি। আমি লজ্জিত। নে চল আমার গাড়ি বাইরে আছে।

সবাই মিলে গাড়িতে উঠলাম।

সুন্দর শহর বাঙ্গালোর। জলবায়ু যেমন মনোরম তেমনি সাজানো শহর। সামরিক বাহিনীর বিরাট অবস্থান শহরের উপকণ্ঠে। সিভিল লাইন সত্যিই সিভিল।

বাড়ি এসে দাঁড়াল বিরাট একটি বাড়ির সামনে।

এটাই আমার গরীবখানা। এবার তোমাদের পায়ের ধুলোতে ধন্য হোক।

বৈষ্ণবীয় বিনয় কিন্তু ভাল নয় বাবুরাও।

বাবুরাও হাসল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা যেন বাবুরাওয়ের বাড়ির লোকে পরিণত হলাম। আমরা অবাধে ঘোরাফেরা করছি। সবাই আমাদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। কেমন লজ্জা লজ্জা ভাব নিয়ে চলাফেরা করছিলাম। বাবুরাও লক্ষ্য করে বলল, এটা তোর বাড়ি। আমার যা অধিকার আছে তোরও সেই অধিকার আছে। বুঝলি। আমার গৃহিনীহীন গৃহে তোরাই মালিক। আমি যথাযথ নির্দেশ দিয়েছি।

তাতো বুঝলাম কিন্তু জরুরী কি কাজে ডেকেছিস তাতো বললি না।

ধীরে বন্ধু ধীরে। সব বলব। একটু বিশ্রাম কর! এদেশের সঙ্গে দেহ মনকে মানিয়ে নে, তারপর শুনবি সব কথা।

বেশ তাই হবে। বর্তমানে বেকার হয়ে বসে থাকতে হবে বুঝি?

না। দেশে অনেক সমস্যা। সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক হাজারো সমস্যা রয়েছে। সে সব আলোচনা সমালোচনা করে বিশ্বজয় করার সুযোগ তো আছে। তারই সদ্ব্যবহার করব।

বাবুরাওয়ের যৌবনের তেজ ও তীব্রতা ক্ষয়িত। বলতে গেলে অতীতের বাবুরাওকে খুঁজে বের করতে বেশ গলদঘর্ম হতে হবে। গবেষণাকার্য শেষ করে বাবুরাও পৃথিবীর নানাদেশ ঘুরে স্বদেশে ফিরে এসে বিরাট ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল, অবশ্য সামান্য থেকেই বিরাটত্ব লাভ। একটি ইহুদী মহিলাকে বিয়ে করে স্বদেশে অনেক আশা নিয়ে ব্যবসার পত্তন করে। যখন তার ব্যবসা জমজমাট তখন হঠাৎ একদিন অতি সামান্য কারণে কলহ সৃষ্টি হল স্বামী-স্ত্রীতে। বাবুরাও সারাদিন তার ল্যাবরেটরিতে আর কারখানায় কাজকর্ম করে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরে, সংসারের কোন কিছুতেই লক্ষ্য রাখে না। টাকার নেশায় তখন সে পাগল। ঘরে শবরীর প্রতীক্ষা করে তার স্ত্রী মরিয়ম। এইভাবেই বোধহয় তার জীবন কেটে যেত, বিঘ্ন ঘটালো সামান্য কলহ, তার উৎস হল মরিয়মের হতাশা বোধ। এই কলহ তাদের জীবনে কাল হল, ভাঙ্গন ধরল, একদিন কাউকে কিছু না বলে মরিয়ম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। বাবুরাও অনেক তল্লাস করে তার হদিস করতে না পেরে ভগ্নমনোরথ ও ভগ্নস্বাস্থ্য হয়ে বিগত বাইশটা বছর একাই কাটাচ্ছে এই বিশাল পুরীতে।

বাবুরাও ব্যবসা দেখে না, তার লোকজনের কর্মচারীর অভাব নেই। তারাই সবকিছু দেখে থাকে। ল্যাবরেটরীর দরজা বন্ধ। বাবুরাও দিন কাটায় বইকেতাব নিয়ে। বিশ্বের যা কিছু পায় তা দিয়ে মনের ক্ষুধা মেটায়। এমন সময় অঘটন ঘটল। সমস্যা যতটা গুরুতর তার চেয়ে বেশি ব্যাপকতা। সেসব ঘটনা পরে বলেছিল বাবুরাও।

আজকের আসর বড় জমজমাট।

দিল্লী থেকে গতকাল এসেছে আপ্পাসাহেব। বাবুরাওয়ের নিকট আত্মীয় কয়েক বছর আগে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পরাজিত হয়েছিল অষ্টমুখী প্রতিযোগিতায়। আপ্পাসাহেব কোন সর্বভারতীয় দলের সদস্য নয়। ঠিক নির্দলীয় নয়। তার পেছনে ছিল বেশ একটি শ্রেণীর সমর্থন। তবে নির্বাচন বৈতরিণী পার হতে যে ছলাকলা কৌশল, অর্থ ও জনবল প্রয়োজন তা ছিল না আপ্পাসাহেবের। নেট রেজাল্ট পরাজয়।

প্রসঙ্গটা তুলেছিল বাবুরাও। সেই বলল, এবার নির্বাচনে তুই দাঁড়ালি না কেন ?

আপ্পাসাহেব হেসে বলল, নির্বাচনে জয়লাভ অসম্ভব। এখনও পরিবেশ ও মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি। নির্বাচনে অর্থব্যয়, শক্তিক্ষয় না করে সংগঠনের পেছনে ছুটে তাকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন বেশি। তাই নির্বাচনে এবার নামিনি তবে ভবিষ্যতে চেষ্টা করব।

তোর সংগঠন কোন কালেই গড়ে উঠবে না। কর্ণাটক ছিল দেশীয় নৃপতির রাজ্য। অবশ্য অন্যান্য দেশীয় রাজ্যের চেয়ে কিছুটা প্রগতিশীল ছিল মহীশূরের মহারাজারা কিন্তু তাদের বেসিক চরিত্র তো পাল্টায়নি, এরই প্রভাব পড়েছিল তার প্রজাদের চরিত্রে। সামন্ততন্ত্র নেই কিন্তু সামন্ততন্ত্রের উত্তরাধিকার কিছু বর্তেছে কর্ণাটকের মূল অধিবাসীদের অধিকাংশ মনে। এই রাজ্যে দক্ষিণপন্থী রাজনীতি হল উপযোগী। এখানে কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি, জনতা পার্টি ইত্যাদি দল বেদল প্রাধান্যলাভ করবে, এমন কি সাম্প্রদায়িক দলও বিস্তারলাভ করবে কিন্তু তোদের বাম চিন্তাধারা নৈব নৈব চ, অন্তত আরও পঁচিশ বছর আশা নেই।

পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটে যা অঙ্ক দিয়ে মেলানো যায় না।

যেমন ?

পাঞ্জাবের কথা ভেবে দেখ। পাঞ্জাবে নির্বাচন যে সম্ভব তা কি তোরা ভেবেছিলি, অথচ তা হল। আসামেও তাই।

আমি বললাম, এটা হ্যাপিও নয়। যা করা হয়েছে তা সুচিন্তিত নয়, পরিণতিও সুফলদায়ক হবে না কখনই।

কেন ? আপাতত তো খুবই সহজ সরল মনে হচ্ছে।

আপ্পাসাহেব বাবুরাওকে বাধা দিয়ে বলল, চকচকে হলেই যেমন সোনা

হয় না তেমনি যাকে সহজ সরল মনে হচ্ছে তার তলায় বিষ জমে যে নেই তা কি নিশ্চিত করে বলা যায়।

অত গভীরে প্রবেশ করার প্রয়োজন আছে কি।

বললাম, নিশ্চয়ই আছে। এটা তো ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সমষ্টির প্রশ্ন।

আপ্পাসাহেব বলল, অবশ্যই। পাঞ্জাবের স্বার্থ জড়িয়ে আছে হরিয়ানার সঙ্গে। পাঞ্জাব চুক্তি হরিয়ানার স্বার্থে আঘাত করবেই এবং করেছেও। হরিয়ানার সাধারণ মানুষ এই স্বার্থহানি সহ্য করতে রাজি নয় এবং পাঞ্জাব চুক্তির অসারতা এবং কংগ্রেসের আদর্শহীন কাজের ফলে হরিয়ানা যে সমস্যার সম্মুখীন তা নিরোধ করার পথও বন্ধ। হরিয়ানা সংঘর্ষ সমিতির মহিলা শাখা মুখ্যমন্ত্রী ভজনলালকে মেয়েদের উপযোগী শাড়ি-ব্লাউজ ইত্যাদি একসেট পাঠিয়ে দিয়ে ভজনলালের অক্ষমতা ও অযোগ্যতার প্রতিবাদ জানিয়েছে। আর সকল বিধানসভার ও সংসদের হরিয়ানার সদস্যদের একজোড়া করে বালা পাঠিয়েছে তাদের নপুংসকতাকে লোকচক্ষের সামনে তুলে ধরতে। এতেই তো বুঝতে পারছ পাঞ্জাব চুক্তি মোটেই সহজ এবং সরল নয়। মনোবেদনা নিরসনের আগেই ভজনের ভজনা বংশীলালের বংশীবাদনই শেষ। যে উগ্রপন্থীদের হাত থেকে পাঞ্জাবকে রক্ষা করতে ইন্দিরা স্বর্ণমন্দির চত্বরে সেনা নিয়োগ করেছিল সেই উগ্রপন্থীদের দমন করা গেছে কি? আজও তারা বিনা বাধায় তাদের কার্যকলাপ গোপনে চালিয়ে যাচ্ছে। অবাধে নরহত্যা লুটপাট চলছে আর লক্ষ্যস্থল হিন্দু। অথচ হিন্দু আর শিখদের সংস্কৃতিগত, ব্যক্তিগত, শ্রেণীগত কোন প্রভেদ ছিল না। এখনও নেই। শুধুমাত্র কয়েকজন বিপথগামী যুবক স্বার্থান্ধ কিছু প্রবাসী শিখদের উস্কানিতে এই অন্যায় কাজগুলো করছে। পাঞ্জাব চুক্তিকে রাজীবের বড় কীর্তি মনে করা হলেও পরিণতিতে যে অপযশ লাভ তা কেউ রুখতে পারবে না।

কিন্তু রাজীব বোধহয় সমষ্টির কথা ভেবেই চুক্তি করেছে। সাময়িক অশান্তি দমিত হলে সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ জীবন ফিরে আসবে পাঞ্জাবে।

বাবুয়াও বাধা পেল আপ্পাসাহেবের কথায়। আপ্পাসাহেব বলল, তুই বীর পূজার অংশীদার। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বীরপূজা হল সব চেয়ে বড় বোকামি। 'আজকে যে গো রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়।' রাজীবের কর্মপদ্ধতি মোটামুটি স্বৈরতন্ত্রী। কানু বিনা যেমন গতি নেই, তেমনি রাজীব বিনা কেন্দ্রীয় সরকার ও ইন্দিরা কংগ্রেসে দ্বিতীয় পুরুষ নেই। অশান্তির প্রথম প্রকাশ কিন্তু উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপে শেষ নয়। হরিয়ানা বর্তমানে উত্তাল। এই উত্তাল রোধ করতে পারবে কি ভজনলাল?

ভজনলাল নিজেও তো গঙ্গাজল ধোয়া তুলসীপাতা নয়। তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। তার বিরুদ্ধে তদন্ত কমিশন বসেছিল। তাতে সে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তদন্ত কমিশন ও আদালতের সামনে যে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা হয় তার ভিত্তিতে বিচার হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হলেও জনমন থেকে অবিশ্বাস দূর হয় না।

আমি বললাম, হরিয়ানার রাজনীতিতে ভজনলাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। বিধায়ক কেনা-বেচা, বিধায়কদের গুম করে নিজের শক্তিবৃদ্ধি হল তার অপূর্ব কীর্তি। এক সময় জনতা পার্টি'তে নাম লিখিয়ে বিধানসভায় এসেই ইন্দিরা গান্ধীর চক্রান্তে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দেবীলালকে কুপোকাৎ করে গদীতে বসা তার বড় কীর্তি। হরিয়ানার তিন 'লাল'—দেবীলাল, বংশীলাল আর ভজনলাল গোটা রাজ্যটাকে লালে লাল করে রেখেছে অপকাজের ফিরিস্তি তৈরি করে। দেবীলাল জনতা পার্টি'র মনোনীত মুখ্যমন্ত্রী হয়েই বংশীলালকে হাত কড়া লাগিয়ে রাস্তা ঘুরিয়ে বংশীলালের বিরুদ্ধে আদালতে নানা অভিযোগ এনেছিল। দেবীলালকে পথে বসিয়ে ভজনলাল যখন ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে নিজের সমর্থকদের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে বিধায়ক কেনা-বেচাতেও সাফল্য লাভ করল না তখন বিধায়কদের গুম (kidnap) করে গদীতে বসল। বংশীলাল ফিরে গেল কেন্দ্রে। দুষ্টবুদ্ধির যুদ্ধে ভজনলাল বিপক্ষকে কাবু করেছিল, সবাই বলল, এই তো রাজনীতি। আদর্শহীন ক্ষমতালোভীর কাজকে যারা রাজনীতি মনে করে তাদের যা কিছুই থাক রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধা থাকতে পারে না।

আপ্পাসাহেব বলল, ভজনলা অর্থলোলুপ নীতিজ্ঞানহীন। তার বিরুদ্ধে যারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ এনেছে তাদের অগ্রগণ্য হলেন চৌধুরী চরণ সিং। তার সঙ্গে রয়েছেন জগজীবন রাম, মধু দণ্ডবতে, লালকৃষ্ণ আদওয়ানী প্রভৃতি। এবাদে অভিযোগ এনেছেন হরিয়ানার বিরোধীপক্ষের একত্রিশজন বিধায়ক, পঁচিশজন সংসদ সদস্য। তাদের অভিযোগ যে সত্য তা জোরের সঙ্গে ব'লতে তারা উল্লেখ করেছে, "Correctness and authenticity for securing monetary gains to himself and relations" এর সঙ্গে উল্লেখ করেছেন কিভাবে তার জামাতা অনুপকুমার বিশনোই বিশাল সম্পদ সৃষ্টি করেছে তার শ্বশুরের কৃপায়। ভজনলালের অর্থলোলুপতা কত গভীর তা বুঝা যাবে এই অর্থ সংগ্রহে দেশের প্রচলিত আইন কানুন দুই পায়ে দলে নিজের ইচ্ছা মত যা ইচ্ছা করে চলেছে, যাকে বলে, taking and framing laws in his own hand, এটা হরিয়ানার মত রাজ্যেই সম্ভব হয়েছে। অন্য রাজ্যে এতটা অন্যায় কাজ করার সাহস কারও বোধহয় নেই। জনসাধারণ জানে ভজনলাল তার মেয়ে রোশনি দেবীর সঙ্গে অনুপকুমার বিশনোইয়ের বিয়ে হয়েছিল একাশি সালে হিসারে দশই জুলাই তারিখ। আলিবাবার মত চিচিং ফাঁকের মন্ত্রট জেনেছিল অনুপকুমার। হিসারে অনুপকুমার পৈতৃক ব্যবসায়ে লোকসানের ধাক্কায় ঝাঁপ বন্ধ করেছিল, কৃষিজমি ও অন্যান্য সম্পত্তি রেহানাবদ্ধ হয়েছিল। ঠিক এই অবস্থার মধ্যেই রোশনির সঙ্গে অনুপকুমারের বিয়ে। একাশি সাল থেকে চুরাশি সালের মধ্যে বিশনোই পরিবার হরিয়ানা ও রাজস্থানে কম করেও পঁচিশটা কোম্পানীর মালিক হয়েছে ভানু স্টিল, ভানু রোলিং স্টিল, ভানু মেটাল, ভানু ফয়েলস্, ভানু ইস্পাত, ভানু ফরজিং, ভানু আয়রণ ও স্টিল, হরিয়ানা ইনডাস্ট্রি, হরিয়ানা ইস্পাত, হরিয়ানা স্টিলস, হরিয়ানা একসট্রুশন, হরিয়ানা বনস্পতি প্রভৃতির

আবির্ভাব এবং গায়ে গতরে বৃদ্ধি হয়েছিল এই সামান্য কয়েকটি বছরে।

বললাম, অর্থাৎ রোশনির সঙ্গে অনুপের বিয়েই এই সৌভাগ্য এনে দিয়েছে।

আরও আছে। এই সব কারখানা একটি বিরাট প্লটে স্থাপিত। এই প্লটের পরিমাপ হল বিরানব্বই কানাল। হিসার থেকে দশ কিলোমিটার দূরে দিল্লী-হিসার রাজপথের ধারে এই জমি। এই জমিই বিশনোই পরিবারের সৌভাগ্যের মূলে। বিশনোইরা এই জমি প্রায় সাড়ে পাঁচলক্ষ টাকায় কিনেছিল। কেনার পরই তা রেহানাবদ্ধ করে হরিয়ানা ফিনান্স কর্পোরেশনের কাছে। এবং সরকার তথা এই কর্পোরেশন তিরিশ লক্ষ টাকার ঋণ দেয় এই রেহানে। এই ঋণ দেবার আগে কর্পোরেশনের উচ্চপদস্থ ম্যানেজার আপত্তি জানিয়েছিল, পরিণতিতে সেই ম্যানেজারকে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর গোপন নির্দেশে। এবাদেও ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর ঋণ দিয়েছিল বিশনোইদের। বিশেষ করে ইনডাস্ট্রিয়াল ডেভোলেপমেণ্ট ব্যাঙ্ক প্রচুর ঋণ দিয়েছিল। সরকারী ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা এর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও এই ঋণ দেওয়া হয়েছিল বিশনোইদের।

বললাম, এ বিষয়ে যত না বলা যায় ততই ভাল।

বাবুরাও বলল, এ বিষয়ে তদন্ত হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণ হয়নি।

বললাম, আশ্চর্য কিছু নয়। সরকার যাদের হাতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা কঠিন। তবে রাজীব এই তদন্ত কমিশন বসিয়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। একসময় জওহরলালের কাছে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছিল। জওহরলাল তদন্তের আশ্বাস দিয়েও তদন্ত করতে পারেননি। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বলেছিলেন, আমার মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কেন্দ্র কেন নাক গলাবে। তারপর আর তদন্ত কমিশন বসেনি। এবার রাজীব তো মুখরক্ষার জন্য একটা কমিশন বসিয়েছিল। এ রকম তদন্ত কমিশনে সত্য ঘটনা জানা যায় না।

আপ্পাসাহেব বলল, ভজনলালের দয়াতে যেমন বিশনোই পরিবার গায়ে গতরে ফুলে উঠেছে শিল্পক্ষেত্রে তেমনি গায়ে গতরে ফুলে উঠছে ভজনলাল নিজেও। তার নজর হেকটরের পর হেকটর জমি স্বনামে, বেনামে, আত্মীয়ের নামে সংগ্রহ করা। এই কাজটি ভজনলাল পরিপাটি করে সম্পন্ন করেছে।

আমি বললাম, আপনি তো দিল্লী হয়ে আসছেন। সেখানকার খবর বলুন।

আপ্পাসাহেব হাসলেন। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বললেন, ফাঁসির আসামী ভিন্ন জীবজগতে কেউ জানে না কবে তার মৃত্যু হবে। তেমনি ইন্দিরা কংগ্রেসের পৃথিবীতে কেউ জানে না কখন কার রাজনৈতিক মৃত্যু হবে। শাহানশাহ রাজীব গান্ধীর মর্জির ওপর মন্ত্রীরা পদচ্যুত হচ্ছে। কংগ্রেসের উপরতলার নেতারা স্থানচ্যুত হচ্ছে। প্রতিবাদ করার সাহস কারও নেই। কুবের ভাণ্ডারের চাবি কাঠি যেমন আছে শাহানশাহের হাতে, তেমনি অবাধ ক্ষমতা রয়েছে তার। হাতে মাথা কাটলেও উঃ শব্দ করার সাহস কারও নেই।

ইন্দিরা গান্ধীর অতি নিকট জন ছিল আবু বরকত আতাউল গণি খান চৌধুরী আর প্রণব কুমার মুখার্জি। রাজীব গদীতে বসেই এদের হটিয়ে দিল, আবার আদর করে ডেকে নিল গণি খানকে। পশ্চিম বাংলার মুসলমানদের খুশী করার চেষ্টা। কিন্তু প্রণব মুখার্জি একেবারে উপরতলা থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে আস্তাকুঁড়েতে। রাজনীতির ক্ষেত্রে যখন যে ক্ষমতায় থাকে তখন তার রমরমা। যখনই সে ক্ষমতাচ্যুত হয় তখন তার আশ্রয় হয় আস্তাকুঁড়েতে। কিছুকাল পরে দেশের লোক তাকে ভুলেই যায়। তার শতসহস্র মহৎ কাজকেও কেউ স্মরণ করে না।

আমি বললাম, ওটা আশ্চর্য কিছু নয়। আবার যখন লোকে ক্ষমতায় আসে তখন এই ভাবেই দ্রুতগতিতে উপরে উঠতে থাকে। ভজনলাল ও তার পরিবার ছিল পাকিস্তানের ভাওয়ালপুর জেলায়। তখন ভাওয়ালপুরে ছিল নবাব। নবাবের প্রজা ছিল ভজনলালের পরিবার। পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভজনলাল সপরিবারে এসে ছিল হিসার জেলায়, স্থান পেয়েছিল আদমপুর মণ্ডীতে। এই ঘটনা হল তিরিশ বত্রিশ ছর আগে। ভজনলাল রুজিরোজগারের পথ না পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় মেয়েদের পোষাক ফেরী করে বিক্রি করত। ফেরীওলা থেকে একেবারে মুখ্যমন্ত্রী, এতো কম কথা নয়। বোধহয়, এই সৌভাগ্যই তাকে ভারসাম্য হারাতে বাধ্য করে। অবশ্য পতনও ঘটেছে আকস্মিক।

পরের ঘটনা হল, বলেই থামল আপ্পাসাহেব। কথার সঙ্গে কথা জুড়ে বলল, মেয়েদের পোষাকের ফেরীওলা নেমে পড়ল ঘিয়ের ব্যবসায়ে। হিসার থেকে ঘি কিনে লুধিয়ানাতে বিক্রয় করত। ভজনলাল টাকার স্বাদ পেল। এই সময় সে বিনা টিকিটে ট্রেনে চলাচল করত। চোরের দশদিন আর কোতোয়ালের একদিন। ফাঁদে পড়ল। টিকিট চেকার ধরল তাকে। চতুর ভজনলাল তাড়াতাড়ি চেকারের পকেটে কয়েকটি টাকা গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে গেল স্টেশন থেকে। ভজনলাল হৃদয়ঙ্গম করল টাকার মহিমা। যার টাকা আছে সে যে কোন কাজ করতে পারে। এই বিশ্বাস নিয়ে ভজনলাল এগিয়ে চলল। আদমপুর শস্যমণ্ডীর বেপারী পোকারমল খাঁটি সোনা চিনতে ভুল করেনি। ভজনলাল সব্জীমণ্ডীর দালালি করতে থাকে পোকারমলের অনুশাসনে। ঘটনার গতি পরিবর্তন হল। পোকারমল আর ভজনলাল মিলিতভাবে শস্যমণ্ডীতে কাজ শুরু করল। পোকারমল তখন ভজনলালের ধর্মভাই। তারা অফিস খুলল 'পোকারমল ভজনলাল' কমিশন এজেন্ট, এভাবে ব্যবসা চললেও ভজনলাল তার অসৎ স্বভাব কখনও ছাড়তে পারেনি। বহুবার ছোট ছোট অপরাধের জন্য তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ, বহুবার আদালতে শাস্তিও পেয়েছে। স্মাগলিং-এর দায়েও তাকে কয়েদ হতে হয়েছে, এমন কি নারীঘটিত ব্যাপারেও তাকে আদালতে দাঁড়াতে হয়েছে। বাষট্টি সালে ভজনলাল ডাকাতি এবং দাঙ্গার দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছিল। ভজনলাল সর্বশেষে উপলব্ধি করেছিল শুধু টাকা নয়, অসৎকার্য করে নিষ্কৃতি পেতে হলে ক্ষমতার অধিকারী রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। রাজনীতি ভজনলালকে দুর্নীতিপরায়ণ করেনি, ভজনলালই

রাজনীতিকে দুর্নীতিপরায়ণ ও বিষাক্ত করেছে। এমন একটি কষ্টিপাথর যথা মেকি সোনা ছিল ইন্দিরা কংগ্রেসের অনুগৃহীত মুখ্যমন্ত্রী যার কার্যকলাপ কেউই ভাল চোখে দেখছে না, অথচ শাহানশাহের কৃপায় আজও সে রাজ্য রাজনীতির শীর্ষে বসে রয়েছে।

বললাম, কম্বলের লোম বাছতে গেলে কম্বল কি আর থাকবে? বিহারের সীতারাম কেশরী বর্তমানে ইন্দিরা কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ। একেও বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

আপ্পাসাহেব হেসে বলল, ভজনলালের মত লোকের কাছে এসব অতি নগণ্য ঘটনা। বংশীলালের মন্ত্রীসভার সদস্য ছিল ভজনলাল। পঁচাত্তর সালে বংশীলাল তাকে মন্ত্রীসভা থেকে বিদায় করেছিল, কারণ, পাণিপথের অনেক মহিলাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ ছিল। কেউ কেউ বলে থাকে এই অপরাধের জন্য ভজনলালের একগালে চুণ আরেক গালে কালি মাখিয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে কুরুক্ষেত্র শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়েছিল। আপনার সীতারাম কেশরী ভজনলালের তুলনায় সদ্যজাত শিশু। শুনুন দামুবাবু, ভজনলালের নাম ভজনা করলে মোক্ষলাভ নিশ্চিত। এমন খাঁটি কংগ্রেসী কোথাও খুঁজে পাবে না কেউ। মহাত্মা গান্ধীর সৌভাগ্য যে এমন বিশ্বস্ত কংগ্রেসীর সাক্ষাৎলাভ ঘটেনি। রাজীব গান্ধী পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের আশ্বাস দিয়েছিল কিন্তু প্রথম রাউণ্ডে জনমতের পরাজয়। কমিশন বলেছে ভজনলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। বোধহয় রাজীব মনে করেছে রত্নাকর যদি বাল্মিকী হতে পারেন, তা হলে ভজনলালও খাঁটি ইন্দিরা কংগ্রেসী হবে না কেন? এই যদি বর্তমান ইন্দিরা কংগ্রেসীদের চেহারা হয় তা হলে দেশের ভবিষ্যত কি, তা গবেষণার বিষয়।

বললাম, রাজীবের পরিচ্ছন্ন প্রশাসন দেবার অঙ্গীকার মস্তবড় ভণ্ডামি। দুর্নীতি সমাজের অনুতে অনুতে। শিরে সর্পাঘাত ঘটলে তাগা বাঁধবার জায়গা থাকে কি? যে দেশের চৌকিদার থেকে প্রশাসক শীর্ষ অবধি সবাই দুর্নীতির গভীরে নাক ডুবিয়ে আছে সে দেশের ভবিষ্যত কি?

বিচ্ছিন্নতাই পরিণতি। কেন্দ্রীয় সরকার ফেডারেল সরকার গড়তে চায় না। সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছে, রাজ্যগুলো দানাপানির জন্য দিল্লীর দিকে তাকিয়ে থাকে, এই অবস্থার অবসান ঘটাতে যদি যুক্তিযুক্ত পথ কেন্দ্রীয় কর্তারা গ্রহণ না করে তা হলে আঞ্চলিকতা দেখা দেবে সর্বত্র। বিশেষ করে দিল্লীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব সর্বত্র। যার ফলে অঞ্চলের ভাষা সংস্কৃতির বর্তমান আন্দোলন বিচ্ছিন্নতার দিকে দেশকে ঠেলে দেবে। পাকিস্তানী ইয়াহিয়া আর ভুট্টোর যুক্তিহীন কাজের ফলেই যেমন বাংলাদেশের সৃষ্টি তেমনটা যে ভারতে হবে না জোর দিয়ে এমন কেউ বলতে পারে কি?

সাইদ মিঞা বিহারের মজঃফর জেলাবাসী।

অনেক কাল কলকাতায় বাস করছে। ঠিক কলকাতা শহরে না হলেও উপকণ্ঠে। চটকলে কাজ করত। চাষের সময় ছুটে যেত নিজের গ্রামে। চাষের

কাজ শেষ করে, ফিরে আসত তার কর্মস্থলে। বছরের ছয়মাস তার বস্তি বাড়িতে সংসার সাজাতো তার স্ত্রী আমিনা। চাষের ফসল ঘরে তুলে তা বিক্রি করে দিত মহাজনদের কাছে। অবশ্য ন্যায্যমূল্য কোন সময়েই পেত না। হঠাৎ তার কর্মস্থলে গোলমাল সৃষ্টি হল; কোম্পানী লক-আউট ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় চার হাজার কর্মীর রুজি-রুটি বন্ধ হয়ে গেল। সবাই আশা করছিল লক-আউট শীঘ্রই প্রত্যাহৃত হবে। কার্যকালে দেখা গেল লক-আউট আর উঠছে না। কর্মীরা সঞ্চয় ভেঙ্গে খেল, তারপর ঘটি-বাটি বিক্রি করে পেট চালাতে থাকে। সাইদ মিঞাও একইভাবে বিপর্যস্ত। বিবি আমিনাকে রোজই আশ্বাস দেয় শীঘ্রই তাদের দুঃখ দূর হবে।

সাইদ মিঞা ফিরে গেল নিজের গ্রামে। তার সম্বল সাড়ে তিন বিঘা জমির ওপর তার সব কিছু নির্ভর করতে হবে। দুটো মেয়ে আর তারা স্বামী-স্ত্রী, মোট চারজন। সাইদ মিঞা ভেঙ্গে পড়েনি। মনের জোর নিয়ে চাষের কাজে নেমে পড়ল কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না। জিনিসপত্রের আকাশ ছোঁয়া দাম, অথচ উপার্জন বলতে কিছুই নেই। সাইদ মিঞা ধীরে ধীরে ঋণগ্রস্ত হতে থাকে। বড় মেয়ে খাদিজার বিয়ে না দিলেও নয়। কলকাতায় থাকাকালে প্রতিবেশী ইউনিস আলির ছেলে হবিবর রহমানের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু কর্মহীন অবস্থায় দেশে ফিরে এসে সাইদ মিঞা অগাধ জলে পড়ল।

বিবি আমিনা প্রায় বলে, দুসরা কোহি জাগামে নোকরি ঢুঁর লেও মিঞা। হাম লোক ভুখে মর জাউঙ্গী।

সাইদ মিঞাও ভেবেছে। সব ভাবনা চিন্তার অবসান ঘটিয়ে সাইদ মিঞা বেরিয়ে পড়ল উত্তর ভারতের পথে নসীব তাকে কোথায় নিয়ে যাবে তার কোন ঠিকানা নেই। সাইদ মিঞা ট্রেনে চেপে বসেও টিকিট কাটতে পারেনি। টিকিট কাটলে পেটে দু'মুঠো চানাও দিতে পারবে না।

রাস্তায় কয়েকবার আটক হয়ে হাজতে বাস করে কোন রকমে রাজধানী এসে পৌছল। সাইদ মিঞা যতটা সহজ মনে করেছিল কাজ পাওয়া অতটা সহজ তো নয়ই বরং হিসাব মত খুবই কঠিন মালুম হল যখন রাজধানী দিল্লীর মায়া ছেড়ে তাকে পাঞ্জাবের দুর্গম স্থানে যেতে হয়েছিল দিন মজুরীর ভিত্তিতে। উপার্জন নেহাৎ মন্দ হয়নি, আমিনাকে টাকাও কিছু পাঠিয়েছিল। ভাগ্যের পরিহাস। বছর শেষে কিছু সঞ্চিত অর্থ নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় আতঙ্কবাদী তথা উগ্রপন্থীদের আক্রমণে যে বাসে সে যাচ্ছিল নিকটবর্তী শহরে, সেই বাসের প্রায় সকল যাত্রীই হতাহত হয়েছিল। আহতদের মধ্যে সাইদ মিঞাও একজন। মাসাধিক কাল বাদে সরকার প্রদত্ত কিছু অর্থ নিয়ে যখন হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল তখন তার ডান পা অবশ হয়ে গেছে, সোজা দাঁড়িয়ে চলার সামর্থ্য তার ছিল না। সাইদ মিঞা ভেবেছিল, সরকারী টাকাটা আমিনার হাতে তুলে দেবে খাদিজার বিয়ের জন্য আর নিজেও চেষ্টা করবে কোন ছোটখাট ধান্দার।

পাঞ্জাব এলাকা পেরিয়ে হরিয়ানা সবে গাড়ি ঢুকছে এমন সময় লোকজনের কথাবার্তায় মনে হল কোথায় কোন অঘটন ঘটে গেছে, গাড়ি বোধহয় আর বেশি দূর যাবে না। সত্যিই গাড়ি হরিয়ানার শেষ সীমানায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। সাইদ মিঞা অন্যান্য যাত্রীদের মত প্ল্যাটফরমে নেবে খাবারের সন্ধানে বেরিয়েছিল। এগোনো আর গেল না। সাইদ মিঞা একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ল। পাগলের মত কতকগুলো মানুষ ছুটছিল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। বেছে বেছে কতকগুলো দোকানে আগুন ধরিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে ছোটাছুটি করছিল ধারালো তলোয়ার আর বল্লম হাতে করে এক শ্রেণীর লোককে খুঁজতে। সাইদ মিঞা প্রথমে কিছুই বুঝতে না পারলেও ভীতসন্ত্রস্ত অন্যান্য যাত্রীদের কথাবার্তায় জানতে পারল ভয়ঙ্কর সংবাদ। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে গুলী করে হত্যা করেছে তার শিখ দেহরক্ষীরা। এই উন্মত্ত জনতা শিখদের খুঁজছে, শিখদের ঘরবাড়িতে আগুন দিচ্ছে, লুটপাট করছে অবাধে, কোথাও কোন পুলিশ নেই। কেউ নেই আক্রান্তদের রক্ষা করতে।

সাইদ মিঞা ভয়ে ছুটল। কোথায় যাচ্ছে তা সে জানে না। শহর ছেড়ে খোলা মাঠে গিয়ে পড়ল। তবুও থাকতে পারল না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর সাইদ মিঞা অবশেষে আশ্রয় নিল গ্রামের একটি মন্দিরের বারান্দায়।

কবে কিভাবে সে দিল্লীতে পৌঁছেছিল তা স্মরণ করতে না পারলেও প্রাণের মায়াতে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছে কিন্তু দিল্লীর অবস্থা আরও ভীতিপ্রদ তবে পুলিশী টহল চলছে। শহরের রাস্তায় জন সমাগম নেই। কিছুকাল আগে যে দিল্লী সে দেখেছে সে দিল্লী হারিয়ে গেছে তার চোখের সামনে। ভাঙ্গাচোরা ঘরবাড়ি। অর্ধদগ্ধ অথবা সম্পূর্ণ দগ্ধ বাড়িঘর। পথে স্তূপীকৃত ভাঙ্গাচোরা আধপোড়া আসবাবপত্র। সাইদ মিঞা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে চলছিল। কোথাও কোন খাবারের দোকান অথবা হোটেল খোলা নেই, তবুও এগোতে থাকে। অবশেষে জুম্মা মসজিদের সিঁড়িতে পা দিয়ে কিছুটা হুঁস ফিরে পেল। পেছনের চকের কিছু কিছু দোকান খোলা দেখে আহার্যের সন্ধানে বের হল। এমনি ভাবে কেটে গেল কটা দিন। শীতের হাওয়া বইতেই সাইদ মিঞা আরও চিন্তিত হল। উপযুক্ত কাঁথাকম্বল তার নেই। বাড়ি ফেরা দরকার। তার সঞ্চিত ও সরকার প্রদত্ত টাকাটা তো ফুটো কলসীর জল, শেষ হতে কতক্ষণ।

সাইদ মিঞা আবার গাড়িতে উঠে বসল।

এবার চেকারের উৎপাত নেই।

সাইদ মিঞা বাড়ি ফিরল।

কিন্তু ততদিন অনেক পরিবর্তন ঘটেছে তার পরিবারে।

আমিনা বলল, সে যে টাকা পাঠিয়েছিল তা পুরোটা সে পায়নি। গ্রামের পিওন তার টিপ নিয়ে বিশটাকা দিয়েছিল, বলেছিল ডাকঘরে পুরো টাকা নেই। কয়েকদিন পরে টাকা দিয়ে যাবে। চার কুড়ি টাকা সে মোট পেয়েছে। আর কুড়িটাকা আজও সে পায়নি। পিওনও আর আসে না।

সততাধর্মী সরকারী ডাকবাবু ও তস্য পিওন অজ্ঞ অশিক্ষিত মুসলমান পল্লীর মহিলাকে কিভাবে বঞ্চিত করতে হয় তা জানে, এইভাবে বহুলোককে তারা বঞ্চিত করতে অভ্যস্ত। অভিযোগ করেও কোন ফল হয় না। সবার আগে প্রাপ্তিস্বীকারটিতে টিপ দিয়ে নিলে দাবী আইনত গ্রাহ্য হয় না। সাইদ মিঞা নিজেও নিরক্ষর, কিন্তু সারা ভারতবর্ষ ঘুরে সাধারণ বুদ্ধিটা কিছুটা প্রখর। বুঝতে পারল। তখন করার কিছু ছিল না।

তবে জওয়ান মেয়ে খাদিজা যে হারিয়ে গেছে সেটাই হল মর্মান্তিক। পাটনা থেকে কয়েকজন মোল্লা মওলবী মাঝে মাঝে গ্রামে এসে মুসলমান পল্লীতে ঘরে ঘরে তত্ত্বতল্লাসী করে তাদের দুঃখ মোচনের আশ্বাস দিত। বিশেষ করে যাদের ঘরে জওয়ান মেয়ে দেখত তাদের ভাল ঘরে বিয়ে দেবার প্রস্তাব রাখত। সেই প্রস্তাব যারা গ্রহণ করত তাদের ঘরে কোন নির্দিষ্ট দিনে পাত্র ও বরাত আসত, বিয়ের সব ব্যয় বহন করত পাত্র পক্ষ। বিয়ের পর পাত্রীকে নিয়ে পাত্র চলে যেত তার গন্তব্যস্থলে। পাত্রীর পিতা-মাতা গন্তব্যস্থলের হদিস আর করতে পারত না। সেই গরীব ঘরের জওয়ান মেয়ের ঠিকানা খুঁজে বের করার সামর্থ্য কারও না থাকায় পাত্রীরা কোথায় যেন মিলিয়ে যেতু।

সাইদ মিঞা বুঝতে পারল ঘটনা। খাদিজাকে বিয়ে করে নিয়ে গেছে। এ বিয়ে বিয়েই নয়। নারীহরণের একটা বিশেষ কৌশল। পাত্রের নাম ধাম নিয়ে সাইদ মিঞা গেল থানায়। থানাদার সব শুনে গম্ভীরভাবে জানাল, তোমার বেটি হজের মুলুকে গেছে, হজ হাসেল করতে।

সে কি হুজুর?

হাঁ মিঞা। এ রকম ঘটনা আগেও অনেকবার ঘটেছে। এইসব মেয়েদের বিয়ে যারা করে তারা দালাল। বিয়ের নাম করে তারা মেয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যায়। তাদের বিক্রি করে আরবের শেখদের কাছে, কাউকে পাঠায় বেশ্যালয়ে চড়া দরে। আমরা তদন্ত করেছি কিন্তু কোন সময়ই মেয়ে খুঁজে পাইনি। অনেক প্রমাণ পেলেও খোদ আসামীকে খুঁজে পাইনি। তোমার মেয়েকেও এইভাবে দালালরা বিক্রি করেছে। তবে তোমার এতেলা দিয়ে যাও। চেষ্টা করব খুঁজে বের করতে।

সাইদ মিঞা তিন শ' বার 'তোবা' খেয়ে, খোদার মর্জি মনে করে ঘরে ফিরে এল। আমিনার হাতে টাকা পয়সা দিয়ে সাইদ মিঞা গেল পাটনায়।

পাটনায় সাইদ মিঞা পেল নতুন জীবনের সন্ধান। আলোর জগত থেকে অন্ধকারের জগতে ধীরে ধীরে ঠাঁই করে নিল। সে পাটনার নিকটবর্তী শহরে চোলাই মদের কারখানায় কাজ পেল, কারখানা মালিক মালাদেবী পাশোয়ান। নিরক্ষর, অসততার নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মহিলা বহুকাল যাবত এই ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের সহযোগিতায়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিল্পে ব্যবহার্য অ্যালকোহল গোপন পথে আনিয়ে তা থেকে চোলাই তৈরি করা মালা পাশোয়ানের ব্যবসা। তার কর্মকেন্দ্রকে বলা হয় 'ভাটা'—বা ভাটিখানা

সরকার তার কাছ থেকে যেমন আবগারী শুল্ক পায় না, তেমনি লাইসেন্স নেবার প্রয়োজনও তার নেই। অন্ধকার জগতের মানুষেরা তার সহচর। সাইদ মিঞা এই অন্ধকার জগতে আশ্রয় নিল। আর্থিক দিক থেকে লাভবানও হল।

আবগারী ইন্সপেক্টার মহম্মদ গফুর মিঞা মালা পাশোয়ানের ভাটিখানা তল্লাসী নিতে গিয়েছিল। মালা পাশোয়ান তার অন্ধকার জগতের সঙ্গীদের নিয়ে এমন ভাবে তাকে প্রহার করেছিল যার তুলনা মেলা ভার। গোফুর মিঞা কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিল।

এহেন মালাদেবী পাশোয়ানকে ইন্দিরা কংগ্রেস বিধানসভার প্রার্থী করে মনোনয়ন দিতে মোটেই দ্বিধা করেনি, ইন্দিরা কংগ্রেসের টিকিট বুকে ঝুলিয়ে নিরাপদে মালাদেবী পাশোয়ান তার নির্বাচন প্রচারে নেমেছিল, সঙ্গে ছিল অন্ধকার জগতের অসংখ্য অনুগামী। মালাদেবী পাশোয়ানকে অনেকেই প্রশ্ন করেছে, আপনি গফুর মিঞাকে ওভাবে মারলেন কেন? মালাদেবী পাশোয়ান হেসে উত্তর দিয়েছে, যে সকল লোক সৎ নাগরিকদের ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে তাদের এই রকম শাস্তি দিতে হয়।

পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে শহর। মালাদেবী পাশোয়ানের ছবির সঙ্গে রাজীব গান্ধীর ছবি। প্রতিশ্রুতি 'পরিচ্ছন্ন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন'। মালাদেবী পাশোয়ান তার প্রবক্তা। যারা বুদ্ধিজীবি সৎ ইন্দিরা কংগ্রেসী তারাও হতবাক্ হল তার মনোনয়ন প্রাপ্তিতে। তারা বলল, ইন্দিরা কংগ্রেসের যাও বা ছিল তাও গেল।

মালাদেবী পাশোয়ান তথা মালাদেবীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে। কিন্তু পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে সাহস পাচ্ছে না। পুলিশের বক্তব্য হল, যে মহিলাকে কংগ্রেস (ই) মনোনয়ন দিয়েছে তাকে গ্রেপ্তার করে নিজেদের চাকরি হারাবার ঝুঁকি নেব কেন? অতএব মালাদেবী নিশ্চিন্তে সমাজ-বিরোধী সঙ্গীদের নিয়ে ঘরে ঘরে যাচ্ছে ভোট ভিক্ষা করতে, না, ভিক্ষা করতে, নয়, ভিক্ষা করতে নয়, ভীতি প্রদর্শন করে ভোট আদায় করতে। শহর ও শহরতলীর মানুষ সমাজবিরোধীদের চেনে ও জানে, তাই মালাদেবীর প্রার্থনা পূর্ণ করতে কেউ অস্বীকার করল না।

সাইদ মিঞা মালাদেবীর সহচর। তার অভাব আর নেই কিন্তু সতত শঙ্কা। যে কোন সময় পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের দায়ে কয়েক বার জেলে থেকে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে জেল সম্বন্ধে, সে জন্য মাঝে মাঝেই সে চিন্তা করেছে বাড়ি ফিরে যাবার। উপরন্তু সে শুনেছে ভাগলপুরের জেলে বহু আসামীকে বিচারের আগেই অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ভীত সন্ত্রস্ত সাইদ মিঞা একদিন তার সঞ্চিত অর্থ নিয়ে ফিরে এল তার গ্রামে এবার সে চাষে মন দেবে। সাড়ে তিন বিঘা জমি চষেই তার সারা বছরের খাবার সংস্থান যাতে হয় সেই ধান্দায় মেতে উঠল।

বাবুরাওকে সেদিনের রাতের মজলিশে ঘটনাটা বলতেই বাবুরাও উত্তেজিত

ভাবে বলল, বিহারের রাজনীতি নিয়ে কোন কথা বলাই উচিত না। বিহার রাজনীতি চলছে লাঠিতে। যার গায়ে জোর তার গদী। কংগ্রেস (ই)-কে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সাধারণ মানুষের শিক্ষাদীক্ষা যদি না থাকে এরকম অনেক মালাদেবীই জনতার রায়ে বিধানসভায় আশ্রয় পাবে, এদের হাতে দেশের শাসন ব্যবস্থা থাকলে দেশের সুদিন কখনও কি আসবে!

আপ্পাসাহেব বলল, আমরা রাজধানী থেকে অনেক দূরে থাকি, রাজধানীর সব খবর আমাদের কাছে পৌছায় না। আমাদের বড় ত্রুটি হল, জাতীয়তা-বোধের অভাব। পৃথিবীর উন্নত যে কোন দেশেই যাও, দেখবে প্রতিটি নাগরিক তার দেশের মঙ্গল চিন্তা করে, দেশের উন্নতির জন্য জীবন দান করতেও ইতস্তত করে না, আমাদের দেশে প্রত্যেকটি লোক নিজের কোলে ঝোল টানতে ব্যস্ত। নিকট প্রতিবাসীর চিন্তাও কেউ করে না, দেশের কথা তো দূরের কথা। এর ফলে সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, বিভিন্ন দল, উপদল এমনভাবে বিস্তার লাভ করেছে যার পরিণামে দেশটা যদি খণ্ড বিখণ্ড হয় তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিদ্বেষ ও হিংসা এমনভাবে পরস্পরকে গ্রাস করেছে যার পরিসংখ্যান অসম্ভব।

বাবুরাও বলল, এখন দেশের জন্য কি করা উচিত?

ওটা দেশ নেতাদের চিন্তার খোরাক জোটাবে। আমরা-সাধারণ মানুষ, আমরা দুটি খেতে চাই, কিছু পরিধেয় চাই, একটা নিরাপদ আশ্রয় চাই, শিক্ষার ব্যবস্থা চাই, রোগ নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা চাই।

এ চাওয়া আর পাওয়ার মাঝে অনেক দূরত্ব। কোন দিন এসব আমাদের দেশের মানুষ পাবে এমন আশা করার মত বাতুলের সংখ্যা বিশেষ নেই। পরিচ্ছন্ন প্রশাসন গড়ার দায়িত্ব নিয়েছে রাজীব, আবার দলকে শক্তিশালী করতেও বদ্ধপরিকর। প্রশাসন পরিচ্ছন্ন করার দায় যাদের উপর সেই সব সরষের মধ্যেই ভূত। ভূত তাড়ানো মোটেই সহজ নয়। আর দলে থাকব আদর্শ কামড়ে এটা বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। এক সময় কংগ্রেস লড়াই করেছিল যাদের নিয়ে তারা ভবিষ্যত চিন্তা করেনি, মৃত্যুকে ভয় করেনি, হাসি মুখে অত্যাচার লাঞ্ছনা সহ্য করেছে, আর সে জমানা নেই। টু-পাইস না হলে দল করে কি কেউ?

বললাম, এই ত্যাগ স্বীকার করেছিল কমুনিষ্ট পার্টি। পরবর্তীকালে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে তারাও ধীরে ধীরে টু-পাইসের ধান্দায় নেমে পড়েছে। আর বামপন্থী দলে নাম লেখাবার যাদের আগ্রহ তাদের লক্ষ্য অবস্থা ফেরাবার। সেজন্য বাস্তবে দেশের কোন উন্নতি হচ্ছে না। দলের কর্মীরা লাভবান হচ্ছে, সমাজবিরোধীরা ঘাঁটি বাঁধছে প্রত্যেক দলে। উদ্দেশ্য একই, টু-পাইস পকেটস্থ করা। সবাই ভাবছে, এরপর কি!

বাবুরাও বলল, এরপর কি সেটা গভীর চিন্তার বিষয়। তবে কংগ্রেস(ই)-কে যে কারণে আলোচনা কর তা অন্যান্য দল ও নির্দলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। শ্রীমতী সালিমান কংগ্রেস (ই) মনোনীত প্রার্থী। মনোনয়ন পত্রও যথাযথ

জমা দিয়েছিল। সকালবেলায় তার বাড়ি ঘেরাও করল তৎকালীন মন্ত্রী রঞ্জিত সিং যাদবের অনুচররা। রঞ্জিত সিংকে কংগ্রেস (ই) মনোনয়ন দেয়নি। তার বদলী প্রার্থী শ্রীমতী সালিমান। তাকে তাড়াবার ফন্দী করেছিল রঞ্জিত সিং। জোর করে শ্রীমতী সালিমানকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল নির্বাচনী অফিসে। তাকে দিয়ে নাম প্রত্যাহার করাতে নানারকম ভীতি প্রদর্শনও করেছিল। শ্রীমতী সালিমান কোন রকমে নির্বাচনী অফিসারকে জানিয়ে দিল রঞ্জিত সিং-এর উদ্দেশ্য। নির্বাচনী অফিসার সব শুনে বলল, মনোনয়ন প্রত্যাহার করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং বিফল হয়ে ফিরতে হল সবাইকে এমন ঘটনাও ঘটে। বিরোধী দলগুলো এমন সব প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে যাদের বিরুদ্ধে ডাকাতির অভিযোগ আছে, কারও বিরুদ্ধে বহু নরহত্যার অভিযোগ আছে, কারও বিরুদ্ধে নারী ধর্ষণের অভিযোগও আছে। সব দলেই প্রচুর সমাজবিরোধী আশ্রয় পেয়েছে। রাজনীতির ছাতার-তলায় মাথা দিয়ে এরাই দুর্নীতি আর পরিচ্ছন্ন প্রশাসনের কথা বলছে। দেশের মানুষ সত্যকার মানুষ চিনতে পারে না প্রচারের কালো ছায়াতে। তাই জনমত এদের স্বপক্ষেও যায়। এরা নির্দলরূপে বিধানসভায় স্থানও পায়। তখন ক্ষমতাসীন দল এদের সাহায্য করে। এরাও সাহায্য করে ক্ষমতাসীন দলকে। (The relationship works smoothly to the benefit of both sides). বিহারে নির্বাচনে অবাধে গোলাগুলী চালায় প্রার্থীরা ও তাদের অনুচররা। নরহত্যা এদের কাছে কিছুই নয়। এদের পকেট-ভর্তি টাকা থাকায় এরা টাকা দিয়ে পুলিশের মুখ বন্ধ করে রাখে।

বললাম, শোনা যায় বিহার বিধানসভায় সদস্যদের শতকরা পঞ্চাশজনই কোন না কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী। রফিগঞ্জের কংগ্রেস (ই) প্রার্থী সাগির মহম্মদ। এক সময় জগন্নাথ মিশ্রের মন্ত্রীসভার সদস্যও ছিলেন। সমাজ-বিরোধী কাজের জন্য তাকে মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দিতেও বাধ্য হয়েছিলেন জগন্নাথ মিশ্র। অথচ এবারও সে বিধায়ক। এদের সঙ্গে যুক্ত করতে পার সত্যদেও সিং ও হরিলাল রামের নাম যারা হরিজন নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। আরেকজন হল সঞ্জয় মঞ্চের প্রার্থী বিনোদ সিংহ। নরহত্যাই এর পেশা ও আনন্দ। প্রকাশ্য দিবালোকে নরহত্যা করেও এ নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ায়, পুলিশ অফিসারও প্রাণভয়ে এর কাছে ঘেঁষে না। অবশ্য জনতা পার্টিও বহু মাফিয়া সর্দারকে মনোনয়ন দিয়েছে বিহারে। শাহবানু মামলার বিরোধী জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাহাবুদ্দিন কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িকতা ছড়ায় না, উপরি হিসেবে তার বক্তব্য হল নির্বাচনে যে কোন লোকের সাহায্য নেওয়া যায়। সে ভাল মানুষ হোক, আর সমাজবিরোধী হোক তাতে কিছু আসে যায় না। দলীয় আদর্শ মান্য করা যে বাধ্যতামূলক, এই শিক্ষা এদের নেই।

আপ্পাসাহেব বলল, বিহারের জমিদাররা বিশেষ করে যারা রাজপুত শ্রেণীর তাদের সঙ্গে প্রায়ই ভূমিহীন অন্ত্যজ শ্রেণীর সংঘর্ষ হয়ে থাকে। এইসব সংঘর্ষে বহু নরহত্যা ঘটে। নরহত্যায় অংশ গ্রহণ করে পুলিশও। জমিদাররা পুলিশের

সহায়তায় নরহত্যা করে। পুলিশ বয়ান দেয় ওরা নকশালপন্থী। ওরা গ্রামে গ্রামে অরাজকতা সৃষ্টি করছিল, মানুষের জীবন সম্পদ বিপন্ন হয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখী লড়াইতে তথাকথিত নকশালদের প্রাণ গেছে অথচ বন্দুকধারী এই সব তথাকথিত নকশালদের গুলীতে একটিও পুলিশ নিহত অথবা আহত হয়নি। এমন অবিশ্বাস্য প্রচার কেউ বিশ্বাস করে না। বিশেষ স্বার্থের লোকদের প্ররোচনায় ডজন ডজন নিরপরাধ অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে হত্যা করা হয়। তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এর বিচার কেউ পায় না।

বাবুরাও বলল, নকশালরা কি এখনও আছে এদেশে? তোদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বোলপুর নির্বাচনী সভায় বলেছিলেন পনরদিনে আমি নকশাল দমন করেছি। তা হলে নকশাল আবার গজিয়েছে, নয় কি?

বললাম, বোধহয়। তবে সিদ্ধার্থশঙ্কর খুব গুণীলোক। তার কথার মূল্য বেশি কিন্তু যাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে তারা জানে নকশাল আন্দোলন আরও জোরদার হয়েছে অতি ধীর পদক্ষেপে। সিদ্ধার্থশঙ্কর সমাজবিরোধীদের নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কিছুটা ফায়দা উঠিয়েছিলেন ঠিকই তবে তার জন্য আড়াই তিন হাজার যুবক-যুবতীর প্রাণ দিতে হয়েছিল পুলিশের ও সমাজ-বিরোধীদের হাতে। তখনও একই কথা শোনা গেছে, মুখোমুখী লড়াইতে নকশালরা মারা গেছে কিন্তু পুলিশ কেউ মরেনি। গোটা পশ্চিমবঙ্গে যে জহ্লাদ বাহিনী তৈরি হয়েছিল সেই সময় তাদের অনেকেই নানাভাবে অনায্য উপার্জনও করেছে ধনীর সন্তানদের নকশালপন্থী বলে প্রচার করে। শোনা যায় এদের মধ্যে যারা খুবই ধূর্ত তারা বিদেশের ব্যাঙ্কে হাজার হাজার ডলার জমা রেখেছে নানা নামে গোপন পথে টাকা পাচার করে।

বাবুরাও বলল, এবিষয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

তদন্ত করেছিল নিরপেক্ষ কমিশন। কোন ফললাভ হয়নি। যারা প্রভুর নির্দেশে বেআইনী ভাবে সন্দেহজনক যুবক-যুবতীদের ঠাণ্ডা-মাথায় খুন করেছে তারা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি চতুর। তাদের অন্যায় কাজগুলোকে আইনের প্রলেপ দেবার ক্ষমতা আছে। শুধু তাই নাকি? যারা জহ্লাদের কাজ করছে তাদেরই আবার বামপন্থী সরকার নিযুক্ত করেছে নকশাল আন্দোলন দমন করতে। অনেকের প্রমোশনও হয়েছে। নকশাল আন্দোলন বামপন্থী আন্দোলন, কার্যপদ্ধতি আলাদা, বিশেষ করে নরহত্যা কারও অভিপ্রেত নয়। জনসংগঠন গড়ে তুলতে পারলে হাতিয়ারের প্রয়োজন কমে যায়। সেই পথে নকশাল আন্দোলন চললে ভীতির তো কিছুই নেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কিন্তু বর্তমান শাসকরা পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থাকে আস্তাকুঁড়েতে ফেলে ক্ষমতার লোভে এমনই পাগল যে ওরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকেও ভয় পায়। যদি দেশের মানুষ বাম-পন্থীদের স্বরূপ জানতে পারে তা হলে তারা ক্ষমতাচ্যুত হতেও পারে। তাই ওদের শত্রু কংগ্রেস নয়। নকশালরা।

কিন্তু এরা সাফল্যলাভ করবে কি?

সময় সাপেক্ষ। বামপন্থীরা যে বিপ্লবের বুলি শোনায় তা কোনক্রমেই সংসদীয় রাজনীতিতে সম্ভব নয়। যারা এটা বুঝে নকশাল আন্দোলনে মেতে উঠেছিল তাতে ছিল সি-পি-এম পার্টির কয়েকজন প্রথম সারির নেতা। তাদের তাত্ত্বিক ভুল হয়েছে এটা মনে হয় না, তারা সংগঠন শক্ত না করে যে কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল তাতে ছিল ভ্রম। ভারতবর্ষের মাটিতে বৈপ্লবিক দল গড়ে তোলা খুবই কঠিন। এই কঠিন কার্যটি করার প্রযোজন সর্বাগ্রে। আমরা যেসব সংবাদ পাই তা পরিবেশন করে বিশেষ শ্রেণীর একদল মানুষ, তাদের প্রচারযন্ত্র অতিশয় শক্তিশালী সে জন্য ওই সব লোকের কথা আমরা বেদবাক্য মনে করি। আরও তলিয়ে দেখতে হবে। নইলে এদের কথা নিয়ে ধাঁধা থেকেই যাবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাত্ত্বিক আলোচনা করে, নেতৃত্ব দেয় বন্ধনহীন সর্বহারা শ্রেণী। এই ঘাটতি পূরণ যতদিন না হচ্ছে ততদিন ব্যারিস্টোক্রাট কমুনিষ্ট পার্টির মত নিশ্চিত পথ না পেয়ে কখনও সংশোধনের পথ নিতে হবে, কখনও পুঁজিপতিদের সঙ্গে আপোষ করে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে।

আজ অতি গোপনে নিভৃতে বাবুরাও তার জরুরী কথা বলছিল।

বললাম, তোমার সমস্যা সমাধানের পথ দেখাতে পারে অমিয়া। তাকে আমাদের আলোচনায় ডাকলে কেমন হয়?

অমিয়াকে ডেকে আনলাম।

বাবুরাও বলতে থাকে তার নিজস্ব কথা।

তুই তো জানিস আমি ইউরোপে যাবার পর বিয়ে করেছিলাম একটি ইহুদি মহিলাকে। আমি তখন কৃষি বিষয়ে গবেষণা করছিলাম। আমাকে প্রায়ই যেতে হত শহরের বাইরে সরকারী খামারে, কখনও কখনও কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির খামারে। দু'চারদিন পর পর যখন ফিরে আসতাম তখন খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়তাম। কদিন আর ঘর থেকে বের হতাম না। বসে শুয়ে বই পড়ে সময় কাটাতাম। কিন্তু বয়স তো বেড়েই চলেছে। হঠাৎ একদিন মনে হল আমি বড়ই নিঃসঙ্গ। সুযোগ এল সঙ্গী পাবার। পরিচয় হল মরিয়মের সঙ্গে। কি করে হল তাই বলব! ঘটনার মধ্যে রোমাঞ্চ নেই, ছিল আকস্মিকতা?

মরিয়ম জেনারেল স্টোরের সেলস্ গার্ল। জানিস ইউরোপে কেউ বসে থাকতে চায় না। সবাই চায় স্বাবলম্বী হতে। মরিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে কোন কাজ না পেয়ে ওই কাজটি সংগ্রহ করেছিল। অন্য সব ইউরোপীয় মেয়েদের মত একজন মরিয়ম। তার জাতধর্ম আমাদের কাছে এমন কিছু বিচার্য বিষয় নয়। আমার সহকর্মী ও বিশেষ বন্ধু এণ্ডরুজ আসত মাঝে মাঝে। তার সঙ্গে ছিল মরিয়মের পরিচয়। একদিন ছুটির পর দু'জনে বেড়িয়ে ফিরছি। রাত বেশি হয়নি। সবেমাত্র দোকানপাট বন্ধ হতে আরম্ভ করেছে। হঠাৎ আমাকে থামতে বলে এণ্ডরুজ একটা লাইট পোষ্টের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল একটা মেয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, নয় কি?

বললাম, হতে পারে। এদেশের কোন মেয়ে কি উদ্দেশ্য নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে তা কে জানে। ওদিকে গিয়ে কাজ নেই। পাশের রাস্তাটা দিয়ে কেটে পড়ি। বিশ্বাস নেই, আমাদের ঘাড়ে যদি চেপে বসে তা হলে আজ রক্ষা নেই।

এগুরুজ আমার হাত টানতে টানতে বলল, চল না বন্ধু। তেমন কিছু হলে আজ রাতটা মন্দ কাটবে না।

এগুরুজের টানাটানিতে যেতে হল।

লাইট পোস্টের কাছে এসে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ওঃ, তুমি। এখানে কি করছ?

খুন!

কোথায়? তুমি খুন হতে দেখেছ? ওকি, তুমি কাঁদছ কেন? ভয় করছে? আরে আমরা তো আছি।

মেয়েটা যা বলল তা থেকে জানা গেল সে যে দোকানে কাজ করে তার মালিক সারাদিনের উপার্জন নিয়ে তার আগে আগে চলছিল। কোথাও কিছু নেই, দুটো লোক অন্ধকারের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে মালিককে খুন করে সব টাকা নিয়ে পালিয়েছে। পেছন থেকে দৃশ্যটা দেখে পাশের অন্ধকার গলি দিয়ে ছুটতে ছুটতে এই লাইট পোস্টের তলায় এসে দম নিচ্ছে।

এগুরুজ বলল, আর ভয় নেই। চল আমাদের সঙ্গে।

কিন্তু সাড়ে নটার গাড়ি ধরতে হবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, মাত্র সাতমিনিট সময় আছে। দৌড়ে গেলেও গাড়ি ধরতে পারব না। শেষ গাড়ি রাত সোয়া এগারটায়। বাড়ি পৌছতে পৌছতে প্রায় একটা বাজবে।

একটা ট্যাক্সি ডেকে দিই।

না। রাতের বেলায় একা ট্যাক্সিতে যাওয়া নিরাপদ নয়।

তা হলে রাত সোয়া এগারটার গাড়িতেই যেতে হবে। কোথাও কোন বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে আজকের মত থাকার ব্যবস্থা তো করতে পার।

মেয়েটা কিছু ভেবে বলল, না দরকার নেই। আমি স্টেশনে বসেই রাত কাটাব। আচ্ছা, গুড নাইট।

গুড নাইট শোনার পরও এগুরুজ একপাও এগোল না। নিজেই বিড় বিড় করে বলল, আমি থাকি হোস্টেলে সেখানে রাত কাটাবার মত জায়গা নেই। তবে রাও থাকে নিজের ফ্ল্যাটে, একটা রাত সেখানে থাকা খুব অসুবিধাজনক হবে না। শোন মরিয়ম, ইচ্ছে করলে তুমি আজ রাতটা রাওয়ের ফ্ল্যাটে থাকতে পার। থাকার কোন সমস্যা নেই।

বাধা দিয়ে বললাম, সমস্যা না থাকলেও ভেবে দেখতে হবে।

ভাববার কিছু নেই। একটা রাত তোমার ফ্ল্যাটের কোন একটা কোণায় বেশ কাটাতে পারবে। কেমন? মরিয়ম মাথা নেড়ে হ্যাঁ অথবা না, কি যে বলল বুঝতে পারলাম না।

আমি বেশ লজ্জায় পড়ে গেলাম। মুখ ফুটে নিজের অনিচ্ছাটা জানাতেও

পারছিলাম না। অথচ আমার নারীবর্জিত ফ্ল্যাটে একটি রূপসী যুবতীকে নিয়ে বাস করতে যে মানসিক শক্তির প্রয়োজন তা আমার ছিল না। অথচ আমার সম্মতি না নিয়েই এওরুজ দায় চাপালো আমার মাথায়।

এওরুজ তার হোস্টেলে ফিরে গেল। মরিয়মকে রেখে গেল আমার ফ্ল্যাটে। হাসতে হাসতে বলে গেল, আশা করি তোমরা সুখে ও শান্তিতে রাত্রি যাপন করবে, কাল আবার দেখা হবে।

ছ'তলার উপরে উঠলাম লিফট্ চেপে। তালা খুলে ঘরে ডেকে নিলাম মরিয়মকে। এদিক ওদিক তাকিয়ে মরিয়ম বলল, তুমি একা থাক বুঝি?

হাঁ! একা! তুমি বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে এস, আমি খাবার জোগাড় করি।

মরিয়মকে বাথরুমের দরজা দেখিয়ে দিয়ে টেবিলে খাবার সাজানো আরম্ভ করলাম। মরিয়ম বাথরুম থেকে বেরিয়ে আমার কাজের বহর দেখে হেসে বলল, তুমি থামো, আমি ব্যবস্থা করছি। কোথায় কি আছে বলে দাও। তুমিও বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এস।

কথা শেষ করেই তোয়ালেতে হাত মুছে মরিয়ম কাজে লেগে গেল।

ওদেশে বহুদিন ছিলাম। মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে কিন্তু কাউকেই এমন ভাবে পাশে পাইনি। সুন্দরী মরিয়ম আমার দেহের প্রতি রোমকূপে কিসের একটা প্রবল ক্ষুধা জাগালো। এতদিনের নিঃসঙ্গতাকে পূর্ণ করতে তাকে মনে হয়েছিল দৈব প্রেরিত কোন মহিলা যার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিতে পারি। মরিয়ম কি ভাবছিল জানি না। মাথা নীচু করে কাজ করে চলছিল। যাকে বলে love at first sight তা কিন্তু নয়, মনে তার সুপুষ্ট যৌবন ভারাক্রান্ত দেহটার ওপর ছিল প্রবল লোভ। ওসব দেশে প্রাক বিবাহ যৌন সহবাস সমাজে দোষণীয় বলে গণ্য হয় না। অপ্রার্থিত সন্তানকে প্রতি-পালনের দায়িত্ব নেয় সরকার। মরিয়ম বোধহয় ব্যতিক্রম নয় তবুও সে সময় সে ছিল কুমারী।

সে রাতে খাবার টেবিলে বসে গল্পে এমন মেতে উঠেছিলাম যে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকাবার অবসর পাইনি। যখন খেয়াল হল তখন রাত একটা বেজে গেছে। বললাম, এবার ওঠা যাক্। পাশের ঘরে তোমার বিছানা আছে। শুয়ে পড়, অবশ্য আমার ইচ্ছা ছিল আরও কিছুক্ষণ তার সঙ্গে গল্প করি। সে কথাটা মুখ দিয়ে বের হল না।

মরিয়ম বলল, আমার খুব ভয় করছে। ও ঘরে একা শুতে পারব না। বরং কথা বলতে বলতে রাতটা কাটিয়ে দিতে চাই।

কিন্তু আমার যে খুব ঘুম পেয়েছে। আমি শুতে যাচ্ছি। তুমি চেয়ার নিয়ে আমার ঘরে বসে রাত কাটাও। আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আজ খুব শীত। বসে থাকতে হবে ফায়ার প্লেসের সামনে।

তথাস্তু।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মনে হল কে যেন আমার গায়ের কম্বল টেনে নিচ্ছে। ঝিমুনির মাঝেই মনে হল কে যেন আমার পাশে শুয়ে রয়েছে। ধরমর করে উঠে বসে আলো জ্বালাতেই দেখলাম আমার কম্বলের মধ্যে পা ঢুকিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে মরিয়ম। তাকে কম্বল দিয়ে ভাল করে ঢেকে আবার শুয়ে পড়লাম। ঘুম আর হল না। নিজের অজান্তে মরিয়মকে নিজের কাছে জাপটে নিলাম।

রাতের শেষ কয়েক প্রহর দু'জনেই বিনিদ্র। সে রাতের কথা আর বলতে চাই না।

একটু বেলা হলে দু'জনেই বিছানা ছেড়ে উঠলাম। মরিয়ম কাপড়-জামা সামলে নিয়ে বাথরুমে গেল। আমি চায়ের ব্যবস্থা করতে লেগে গেলাম।

চা খেয়ে অনিদ্রার ক্লান্তি ঘুচলো।

মরিয়ম বলল, তুমি একবার আমার কর্মস্থলটা দেখে আসবে কি? সেখানকার অবস্থাটা জেনে এস। তোমার কাছে খবর পেলে তবে যাব সেখানে।

মরিয়ম রয়ে গেল আমার ঘরে। আমি গেলাম তার কর্মস্থলে। ফিরে এসে জানালাম, তার কর্মস্থল দোকানটি বন্ধ। পুলিশ ঘিরে রেখেছে এলাকা। গোয়েন্দারা নানাভাবে পরীক্ষা করছে। লোকের ফিস্‌ফিসানিতে জানা গেল দোকানের মালিকের সঙ্গে তার একটি মহিলা কর্মচারী ছিল। পুলিশ তাকে খুঁজছে।

আমার কথা শুনে মরিয়মের মুখ শুকিয়ে গেল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ধপাস করে খাটের উপর বসে পড়ল। আমি বোকার মত তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

আমি কি করব? প্রশ্ন করল মরিয়ম।

কিছুটা নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, দুটো পথ আছে। একটা হল পুলিশের কাছে গিয়ে সব কিছু বলা। তা হলে পুলিশ খুনীকে খুঁজে বের করতে পারবে। দ্বিতীয় পথ আত্মগোপন করা। আমার মনে হয় প্রথমটাই ভাল।

আমার মনে হয় দ্বিতীয়টা ভাল।

কোথায় যাবে?

তোমার কাছে। এইখানে।

মরিয়ম ঘর ছেড়ে আর বের হয় না। তার উষ্ণ স্পর্শ সারারাত ভোগ করে সকালে উঠে নিজের কাজে বেরিয়ে যেতাম। কেমন একটা অশান্তি ছায়ার মত আমার পেছন পেছন ঘুরে বেড়াত। মরিয়মকে যদি পুলিশ আমার বাড়িতে খুঁজে পায় তা হলে আমিও জড়িয়ে পড়ব গুরুতর একটি মামলার সঙ্গে।

একদিন বললাম, এভাবে জীবন কাটানো সম্ভব কি?

কিন্তু আমাকে তো বাঁচতে হবে। এভাবেই আমাকে থাকতে হবে।

বললাম, এদেশের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বেশি দিন থাকতে পারবে না মরিয়ম। আমি জানি তুমি খুনের বিষয় কিছু জান না, তবে আততায়ীদের

চেহারাটা হয়ত মনে করতে পার কিন্তু আমার কথা ভেবেছ কি? সন্দেহ বশে তোমাকে ধরলে আমাকেও নিষ্কৃতি দেবে না। আমাদের এমন একটা পথ খুঁজতে হবে যাতে কেউ অনর্থক কোন হাঙ্গামায় জড়িয়ে না পড়ি।

তুমি-ই ভেবে ঠিক কর।

ভেবেছি। ভেবে দেখেছি তোমার আমার দৈহিক সম্পর্কটা আইনসিদ্ধ করলে তুমি পাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা আর পাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব। তখন আমরা এদেশ ছেড়ে নিরাপদে নিজের দেশে ফিরে যেতে পারব। আমি ভারতে চাকরির চেষ্টা করছি। পেয়েও যাব শীঘ্রই। তাতে উভয়েরই সুবিধা হবে। আমাদের দেশ খুবই রক্ষণশীল, তোমাকে গৃহবধূর মর্যাদা সবাই দেবে কিনা সন্দেহ, তবুও আমি সচেষ্ট থাকব তোমাকে মর্যাদার আসনে বসাতে। তুমি তো রাজি।

নিশ্চয়ই।

মরিয়ম হল মেরী ক্যানটাকি, তাকে নিয়ে গেলাম রেজিস্ট্রারের অফিসে, শপথ নিলাম ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অফিসে। আইন সিদ্ধ বিবাহের পর বন্ধু-বান্ধবদের প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করলাম তবে এণ্ডরুজকে ডাকিনি। একমাত্র এণ্ডরুজই মরিয়মকে চেনে। মেরী ক্যানটাকির আসল চেহারা ফাঁস হবার ভয়। শাড়ি সংগ্রহ করে দিলাম মরিয়মকে খাঁটি ভারতীয় করে তুলতে।

তারপর একদিন মরিয়মকে নিয়ে আকাশ পথে এসে পৌঁছলাম বোম্বাইতে। বিদেশে উপার্জিত টাকা ভারতীয় টাকায় রূপান্তরিত করে আমি অন্যতম ধনী বলেই পরিচিত হয়েছিলাম। বাড়ি করলাম, শ্রীরঙ্গপত্তমে কয়েক একর জমি কিনে খামার করলাম।

সুখেই দিন কাটছিল।

সুখ বড় মেকি। কারও সুখ স্থায়ী হয় না। কিন্তু আমাদের সুখের হানি ঘটল অন্য কারণে। পাঁচ বছরেও কোন সন্তান না হওয়াতে মরিয়মের বিশ্বাস জন্মেছিল আমি নপুংসক। আমি নপুংসক কিনা সে প্রশ্ন অবান্তর। মরিয়মের বিশ্বাস অপনোদন করতে সচেষ্ট হলাম। বিশেষজ্ঞদের মতামত নিলাম কিন্তু প্রবোধ মানল না মরিয়ম।

একদিন আমাকে বলল, আমি ইস্রায়েল যাব পবিত্র তীর্থে মানত করতে।

মরিয়মের ইহুদি রক্ত পিতৃভূমিতে টানছিল। আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে মরিয়ম চলে গেল। পৌঁছো সংবাদ দেবার পর অনেক দিন চুপচাপ।

আমি তাকে ফিরে আসার প্যাসেজ মানির ব্যবস্থা করলাম। চিঠি দিলাম ফিরে আসতে। মরিয়ম ফিরে আসেনি। মাস তিনেক পরে জানাল তার সন্তান সম্ভাবনা। প্রসব কাল অবধি সে ইস্রায়েলে থাকতে চায়। ইস্রায়েলে তখন খুবই অশান্তি। সহজ পথে আসা যাওয়া বন্ধ। ভারত সরকারও ইস্রায়েলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না সেজন্য চোরা পথেই তাকে ফিরতে হবে। সব জেনে চুপ করে রইলাম। And after ten months চিঠি দিল তার একটি

মেয়ে হয়েছে। হিসাব করে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলাম মরিয়মের গর্ভজাত সন্তান আমার সন্তান নয়। তাকে চিঠি দিলাম, এ সন্তান আমার নয়।

অশান্তি আরম্ভ হল।

নানা ভাবে সে প্রমাণ করতে চাইল তার সন্তানের পিতা আমি। তার এই দাবী আমি কোনদিন স্বীকার করিনি, আজও করি না। মরিয়ম আর ফিরে আসেনি। এতেই শেষ হয়নি। বিশবছর পর সন্তানের দাবী নিয়ে চিঠি দিয়েছে মরিয়মের কন্যা। এ এক মহাসমস্যাও বলতে পার। বিপদও বটে। এখন কি করি বলতে পারিস। এসব কথা তো কাউকে বলা যায় না। তাই তোকে ডেকে পাঠিয়েছি। কোন পথ বাৎলে দিতে পারিস।

বাবুরাওয়ের বলা শেষ হল। আমরা ভেবে পেলাম না এর সমাধান কি ভাবে হতে পারে। মরিয়মের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদও ঘটেনি, আইনত আলাদা বসবাস করার কোন ডিগ্রীও নেই। সব চেয়ে কঠিন সমস্যা সন্তানের দাবী স্বীকার করলে বাবুরাওয়ের সমস্ত সম্পদের উপর তার দাবী প্রতিষ্ঠিত হবে।

বললাম, তোর কথা শুনলাম। আমি আর অমিয়া এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তোকে বলব। তবে খুব সহজ সরল এর গতি নয়। তাই ভাবতে হবে গভীর ভাবে। তবে এখন মরিয়ম কন্যা পরভীনের চিঠির কোন জবাব দিস না।

রাত বারটা অবধি আমি আর অমিয়া বারান্দায় পাশাপাশি চেয়ারে বসে আলোচনা করে যা স্থির করেছিলাম তা বললাম বাবুরাওকে।

তোমরা যা বলছ তা আমিও ভেবে দেখেছি। ঠিক করেছিলাম, মরিয়মকে চিঠি দিয়ে ডেকে পাঠাব। লিখব, আমি তো পরভীনকে চিনি না। তুমি সঙ্গে করে এনে আমার কাছে দিয়ে যাও।

অমিয়া বলল, কথাটা ঠিক কিন্তু ওভাবে লিখবে না। লিখবে। পরভীন নামে একটা মেয়ে লিখছে, সে আমার ও তোমার মেয়ে। এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, তুমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে পরিচয় করে দাও।

বাবুরাও চিঠি দিয়েছিল পরদিনই তাতে সময় দিয়েছিল একমাস।

আমার বিশ্বাস মরিয়ম কাউকে নিয়েই আসবে না।

বাবুরাও বলল, এটা সব চেয়ে জরুরী নয়। আমি ট্রাস্ট করব। তোকে ট্রাষ্টি হতে হবে। সেই জন্যেই ডেকে এনেছি। মরিয়ম যা মনে করেছে তা আমি হতে দেব না। পরভীনকে হাজির করতে চায় আমার সম্পদ লাভের আশায়। তা হতে দেব না। তুই সম্মতি দিলে আমি দলিল রেজেস্ট্রী করতে পারি।

তুই আমাকে সম্পদের সঙ্গে জড়াতে চাস? জানিস তো পরমহংসদেব বলেছেন বিষয় বিষ।

বাবুরাও হেসে বলল, এক সময় তাই মনে হত। উনি বলতেন টাকা মাটি,

মাটি টাকা। সে জমানা নেই। মাটিকে উনি তুচ্ছ মনে করেই ওকথা বলেছেন। কিন্তু মাটি যে তুচ্ছ নয় তা আজ কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। টাকাও তুচ্ছ নয়। মাটিও তুচ্ছ নয়। আর বিষয়কে বিষ মনে করলে পৃথিবীটা বনজঙ্গলে ভরে উঠত। সবাই সন্ন্যাস নিয়ে তপোবনে বাস করত। যাই হোক তোর সম্মতি চাই।

বললাম, আমাকে না জড়িয়ে অমিয়াকে ট্রাস্টি করে নে। ওর পক্ষে মাঝে মাঝে এখানে এসে দেখা শোনা করা সম্ভব। আমি কি পারব?

তুই মত দে। পারিস কি না পারিস সেটা পরে দেখব। তোদের দু'জনকেই ট্রাস্টি করলে আপত্তি করবি কি?

হেসে বললাম, তোর ইচ্ছা, তবে তো জানিস সারা ভারতে একমাত্র তোদের এই কর্ণাটকে দ্রব্যমূল্য সব চেয়ে বেশি। কোন রকমে গাড়ি ভাড়া জোগাড় করলেও খাবার পয়সা শেষ অবধি থাকবে না। তিরিশ সালের এক পয়সা এখানে তিন টাকা। ষাট সালের হিসাবে এক টাকার দাম নতুন দশমিক চোদ্দ পয়সা। এসব ভেবে দেখেছিস?

ওসব ভাবতে হবে না। তোরা দু'জনেই তো ট্রাস্টি হবি না। একটা বোর্ড থাকবে। তাদের সাহায্য করবি। বোর্ড তোদের যাতায়াত ও আহার্যের ব্যবস্থা করবে।

মাস পেরিয়ে গেলেও মরিয়ম অথবা পরভীন এল না। আমাদের অবস্থান কাল দীর্ঘ না করে একদিন বৃন্দাবন এক্সপ্রেসে জায়গা করে নিলাম।

রাস্তায় অমিয়াকে বললাম, তোমরা তো শুধু বধূহত্যা নিয়ে ব্যস্ত। এ রকম মরিয়ম আর বাবুরাওয়ের ঘটনা তো জান না। নারী কেমন সবলা ও ছলনাময়ী তাতো শুনলে।

ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম দিয়ে কোন জিনিসের সিদ্ধান্ত হয় না। মরিয়ম আরও চায়। তার মনে আর দেহের ক্ষুধা মেটাতে পারেনি বাবুরাও এটা তারই পরিণতি।

বললাম, তুমি বলতে চাও বাবুরাও এসব বুঝতে পারেনি।

পেরেছিল কিন্তু সেতুবন্ধন হয়নি পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসতে পারেনি।

হয়ত তাই। যার কিছু থাকে না তার আকাঙ্খাও সীমাবদ্ধ হয়, আর যে পায় তার আকাঙ্খা হয় গগনচুম্বী। মরিয়মের অভাব ছিল না বলেই তার ক্ষুধার পরিতৃপ্তি ঘটেনি। কোন একটা অছিলায় সে ইস্রায়েলে গিয়েছিল তার দেহের ও মনের ক্ষুধা মেটাতে অথচ বাবুরাওয়ের সম্পদের ওপর তার লোভ ছিল। তাই বাহানা করে সে পরভীনকে দাঁড় করিয়েছে বাবুরাওয়ের সামনে। মরিয়ম বিশ বছর নিশ্চয়ই একক জীবনযাপন করেনি অথবা করছে না, হঠাৎ তার পক্ষে আসাও সম্ভব নয়।

এটা তো স্বাভাবিক।

অস্বাভাবিকও তো কিছু ঘটে। যেমন তোমার ক্ষেত্রে।

অমিয়া কোন উত্তর না দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। আমি খবরের কাগজ খুলে মুখের সামনে ধরে টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম।

মাদ্রাজে আবার গাড়ি বদল।

আবার সেই ক্লান্তিদায়ক পথ পরিক্রমা।

মাধুরী আর পরাণ দু'জনেই আমাদের পথের ক্লান্তি ঘোচাতে নানা ভাবে সেবা করে চলেছে। তাদের হাসিমুখে কাজ করতে দেখে আনন্দ অনুভব করছিলাম। মাধুরীর গৃহিণীপণা ভাল লাগছিল। মাধুরী নিশ্চিত একটা সুখের সংসারের প্রত্যাশা করেছিল, সে প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। অমিয়ার সংসারে মাধুরী সর্বময়ী কর্ত্রী। সে অন্য সবাইকে হুকুম করে কাজ করায়। পরাণ তার অনুগত সহচর। বয়স কম, কর্মে উৎসাহ আছে। মাধুরীকে বড় বোনের মত সম্মানও করে। আমাদের এই দূর যাত্রাপথের উভয় দিকে তাদের নিঃস্বার্থ সেবা সত্যই অভাবনীয়।

এই দু'জনের কথাই ভাবছিলাম।

দিন কাটে, রাত কাটে, আবার দিনের আলো দেখা দেয়।

সারা পথ অমিয়ার সঙ্গে গুরুতর কোন আলোচনা করার সুযোগ হয়নি

আমি অমিয়াকে ভেবেছি। তার জীবন ধারার সব কিছুই আমার কাছে স্পষ্ট।

কয়েক বছর একটা বসা করেও কখনও তার মুখে অরিন্দমের নাম শুনিনি। প্রথম জীবনে অরিন্দম ও সন্তানের কথা বলত, সে সব বর্তমানে ভুলে গেছে। এখন সে সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি নিয়ে ব্যস্ত। তার জীবনের প্রথম অধ্যায়ের বিমর্ষ দিবস অতিক্রান্ত, বর্তমান জীবনের অধ্যায়গুলো মনে হয় না সব সময় পূর্ণাঙ্গ। কোথাও কোন ছেদ থেকে গেছে, সেই ছেদ ও তার অনুচ্ছেদগুলো বাইরের আভরণ দিয়ে গোপন করতে চায়। আমিও বোধহয় তার জীবনে ব্যতিক্রম। আজ তারও যেমন নেই পেছনের জীবনকে ফিরে পাবার সহজ-সরণি, তেমনি আমারও। শুধু স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকা ভিন্ন আর কি থাকতে পারে! বয়সটা বড়ই গোলমেলে। নতুন জীবনের রক্ত শীতল হয়েছে, মনের প্রতিটি স্তরে রয়েছে অভিজ্ঞতার বোঝা। একদিন ছিল বাঁচার তাড়না, আজ তাড়নার কষাঘাত সহ্য করছি ফিরে যাবার। এ হল রবীন্দ্রনাথের সেই কথা। প্রথমে স্কুলে যাবার জন্য কেঁদেছি, পরে স্কুলে না যাবার জন্য কেঁদেছি। প্রথমে অনেক কিছু পাবার আশায় ক্ষিপ্ত হয়েছি, এখন অনেক কিছু পরিহার করতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছি। গাড়ির দোলানিতে অমিয়া ঘুমিয়েছে, আমি জেগে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি। তার সারা মুখে বয়সের যে ছাপ তাকে সুন্দর করছে তার প্রশান্তি। অবাক হয়ে ভেবেছি। এত কাছ থেকে এর আগে তো তাকে দেখিনি, আজ দেখলাম তার সব সৌন্দর্য যেন প্রশান্ত মুখ অবয়বে ভেসে উঠছে। এও এক নতুন সঞ্চয়।

বাড়ি ফিরতেই শ্যামলী বলল, এত দেরী করলে বাবা!

কোন অসুবিধা হয়েছে কি তোর?

অসুবিধা নয় চিন্তা। রোজই খবরের কাগজ খুলি আর দেখি বধূহত্যা, পুলিশের গুলী, দলের সঙ্গে বেদলের মারামারি আর ট্রেন দুর্ঘটনা।

বুঝেছি, ট্রেন দুর্ঘটনার ভয়।

তা বইকি। গত কয়েক মাসে কত লোক মারা গেছে জান? কত লোক জখম হয়েছে জান? তেমনি দুর্ঘটনায় তোমারও তো প্রাণ যেতে পারে।

ওটা হল অনুমান। অনুমান কোন সিদ্ধান্ত নয়।

অনুমানও সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে।

সেটাও দৈব।

আচ্ছা তোমরা কখনও কি ভেবেছিলে, তল্পীতল্পা নিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিক্ষাপাত্র নিয়ে এই বাংলায় আসবে! তোমরা কি কখনও ভেবেছিলে রাষ্ট্র নেতাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে দেশত্যাগী আশ্রয়প্রার্থীদের বিদেশী বলা হবে। এসব তো অনুমান নির্ভর। অথচ তাও ঘটেছে, ঘটছে ও ঘটবে। এত অনাসৃষ্টি, এত সমাজবিরোধী কাজের মাঝেও মেয়েদের মর্যাদা রক্ষা করতে কাউকে প্রাণ দিতে হবে এটাও কি ভেবেছিলে!

বললাম, তুই এত কথা শিখলি কোথায়?

সেটাই বলতে চাই তোমাকে।

অঘটন ঘটলে তাকেই ঘটনা বলে মেনে নিতে হয়। ইন্দিরা গান্ধীকে কেউ হত্যা করতে পারে এটা কেউ ভাবতে পেরেছিল কি? অথচ ঘটেছে। যারা তাঁর জীবন রক্ষার দায়িত্ব বহন করত তারাই তাঁকে হত্যা করেছিল নির্মমভাবে। ইন্দিরার সঙ্গে আমরা একমত নাও হতে পারি কিন্তু দেশের ঐক্য ও স্বাধীনতা রক্ষায় তার অবদান অস্বীকার করা কি সম্ভব। হয়ত ঐক্যবদ্ধ দেশ ভবিষ্যতে নাও থাকতে পারে কিন্তু ইন্দিরাকে তার কাজের জন্য স্মরণ করতেই হবে। অবশ্য রাজীব গান্ধী যেভাবে তার মত্যুকালকে স্মরণীয় করতে উঠেপড়ে লেগেছে, তেমন কিছু ভবিষ্যতে হবে না। তবুও তাকে রাজনীতির আস্তাকুঁড়েতে ফেলে দেওয়া যাবে না। এই অঘটনও একটা মনে রাখার মত ঘটনা।

শ্যামলী কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল।

বললাম, যারা ইন্দিরাকে হত্যা করেছে তাদের বর্বরতার চয়ে মূর্খতাই বেশি প্রমানিত হয়েছে। ইন্দিরা হত্যার পর সারা দেশে যেভাবে নরহত্যার তাণ্ডব শুরু হয়েছিল তার দায়িত্ব ওই খুনীদের। তাদের মূর্খতা ও হঠকারিতায় বহুজনের প্রাণ গেছে। এরা তো রাজনীতির দালাল নয়, নিরীহ শান্তিপ্রিয় নাগরিক। এতেই শেষ নয়। হত্যাকারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের মৃত্যুদণ্ড আরও স্পষ্ট করে দিল একটি অনৈতিক হত্যা আরও বহুজনের প্রাণ বিপন্ন করে। জীবনটা অনুমান নির্ভর নয় রে শ্যামলী। জীবনটা হল বাস্তবের সংঘাত।

কিন্তু হত্যার ও আতঙ্কের অবসান ঘটাতেও তো প্রাণ দিতে হয়েছে, গুলীর শিকার হতে হয়েছে অনেকের। সন্ত হরচান্দ সিং লাঙ্গোয়ালকে পূজার বেদীতে

হত্যা করে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে যুক্তিবুদ্ধি বিবেক যখন মৃত তখন হিংসাকে অবলম্বন করতে অনেকেই অগ্রসর হয়।

এটাই শেষ কথা নয় শ্যামলী। হত্যাকারীদের শহীদের সম্মান দিয়েছে অনেকে। এরা যে ধর্মের কথা বলে থাকে সে ধর্মকে এরা সম্মান করে না। সেজন্য সাহেব সিংকে হত্যার চেষ্টা, সেজন্য বিলাতে নরমপন্থী শিখনেতা তারসেন সিং তুরকে হত্যা, এসব ঘটে চলেছে। বিপথগামী এই সব আতঙ্কবাদী উগ্রপন্থীদের সংযত করার মত নেতারও অভাব, শিক্ষারও অভাব। পাঞ্জাব চুক্তির এইটিই প্রথম পরাজয়। এবার নির্বাচনে অকালি দল রাজ্য প্রশাসন পেয়েছে তাতে তো হত্যার রাজনীতি বন্ধ হয়নি। এরপর চণ্ডীগড়ের লড়াই। চণ্ডীগড়ের শতকরা ষাট ভাগ অধিবাসী হিন্দীভাষী, চণ্ডীগড় পাঞ্জাবের রাজধানী হলে সেখানকার হিন্দীভাষীদের কি অবস্থা হবে তা কেউ ভেবে দেখেছে কি! যাক এসব কথা। তোর বিয়ের কি হল?

দাদুর পার্টি ক্যানসেলড্।

তোমার পার্টির অবস্থা ও অবস্থান কি?

আমার কোন পার্টি নেই। আমি স্থির করেছি বিয়ে করবই না।

এটা একটা পুরানো প্রতিশ্রুতি। রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা তোমার অপঠিত থাকার কথা নয়। তার সঙ্গে একটি সংযোগ হল এই সব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যুবক-যুবতী যদি একাধিকবার পরিণয়সূত্রে নিজেদের বন্ধন করে প্রতিশ্রুতিকে সম্মান করে তাতে কেউ আশ্চর্য হবে না।

শ্যামলী মুখ-চোখ রাঙা করে, তুমি কি জ্যোতিষী?

তা নয়। প্রণয় ক্ষেত্রেও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটছে, বধূহত্যাও হচ্ছে; অভিভাবকদের মনোনীত ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটছে। এটাও অনুমান। তবে ঘটলেই ঘটনা।

শ্যামলী পালিয়ে বাঁচল।

খবরের কাগজটা তুলে নিলাম।

পড়ার মত এমন কিছু থাকে না আজকাল। খবরের কাগজ হয়েছে বিজ্ঞাপন পত্র। যারা পয়সা দিয়ে বিজ্ঞাপন দেয় তারা ভোগ্যপণ্যের ব্যবসায়ী, প্রমোদ বিতরণের ব্যবসায়ী আর সংবাদ পত্রের মালিকরা হল কোন না কোন রাজনৈতিক দলের মতামত বিতরণের ব্যবসায়ী। এ বাদে যা থাকে তা হল বধূহত্যা, নারীধর্ষণ, ডাকাতি, বিকৃত রুচির খুনের সংবাদ। জ্ঞাতব্য ও সত্যকে খুঁজে নিতে বেশ কষ্ট হয় এই সব সংবাদপত্র থেকে। অবশ্য এরা সাংবাদিকের স্বাধীনতা নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামায়। কখনও স্বীকার করে না মালিকের ইচ্ছাকে কার্যকরী করার স্বাধীনতা তারা চায়। মালিকানা ভিত্তিক সংবাদপত্র দলীয় মারামারির ঘটনা প্রচার করে, বিভিন্ন দলের অপকীর্তিকে প্রচার করে থাকে। তাতে পাঠকের মনে কতটা প্রভাব বিস্তার করে তা স্থির করা খুবই কঠিন।

পড়ছিলাম রাজীব গান্ধীর নয়া ফতোয়া। একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের পৌঁছে দেবার জন্য তার দৃঢ়তা।

নিজে নিজেই হাসছিলাম।

ভাগ্যি সে সময় ঘরে কেউ ছিল না। থাকলে পাগল মনে করত।

রাজীবের আঠার দফা আচরণ বিধি। বিধির বিধান অপ্রতিরোধ্য।

আমার নিজের কথাই সবার আগে ভেবেছি। কংগ্রেস, আমাদের নির্দেশ দিল পিকেটিং কর। আমরা স্কুল কলেজ ছেড়ে কোমর বেঁধে গাঁজা মদের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ করলাম। মাদক দ্রব্য দেশের সর্বনাশ করছে। গান্ধীজি তাড়ি বিক্রি যাতে না হয় তার জন্য তালগাছ কাটার নির্দেশ দিয়েছেন। নিজেদের স্বাবলম্বী করতে এবং বিদেশী বস্ত্র বয়কট করতে চরকা কেটে খদ্দর তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা সেই নির্দেশ পালন করেছি। বিলাসিতা বর্জন করতে বলেছেন, আমরা জুতো পর্যন্ত পায়ে দিতাম না। পায়ে হেঁটে মাইলের পর মাইল পথ অতিক্রম করে গ্রামে গ্রামে স্বদেশী চিন্তা প্রচার করলাম। আমাদের চরিত্র, কর্ম ও কথায় ছিল আত্মীয়তা, সত্যের প্রতি অনুরাগ। আমরা জেনে গেছি, যারা ফাঁসির দড়িতে গলা দিয়েছে তারাও হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করেছে দেশবাসীর সামনে কেবল মাত্র শহীদের সম্মান পেতে নয়, আর্দশ স্থাপন করতে, একটা দুর্বল জাতিকে শক্তিশালী করতে। আর আজ? ভাবছিলাম, অতঃ কিম্।

পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, কংগ্রেস হল মদ্যপ সমাজ বিরোধীদের আড্ডাখানা। তার উক্তির কতটা সত্য কতটা মিথ্যা তা যাচাই হয়নি। তবে কংগ্রেসীরা সত্যই কংগ্রেসের আদর্শে আস্থাবান কিনা সেটা যাচাই করা কঠিন নয়।

আমরা ত্যাগ করেছি পাওয়ার আশা নিয়ে নয়। অন্তত যদি বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত না হত তা হলে দেশকর্মীরা ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরতে বাধ্য হত না। বাঙ্গালী চরিত্র হল আত্মসম্মান ও অভিমানে পূর্ণ। তারা আত্মাহুতি দিতে জানে। কিন্তু আত্মমর্যাদা হারাতে চায় না। ত্যাগের পুরস্কার ভিক্ষা-পাত্র। এটা ছিল অকল্পনীয়। স্বাধীনতা উত্তর যুগে অর্থের কৌলীণ্যে এই সব ত্যাগী নরনারী বিভ্রান্ত ও মর্মাহত।

আজ কংগ্রেসের সেই চরিত্র কোথায় গেল। আজ কংগ্রেসীদের মুখেই শোনা যায় নিছক লাম্পট্য হল প্রেমের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে বিলাসবহুল অমিতাচারী জীবন যাপন করতে এরা মোটেই লজ্জিত হয় না। পরম দার্শনিকের মত 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' এই ধর্ম পালন করছে, ভোগের নিম্নস্তরে নিজেদের টেনে নিয়ে চলেছে।

কংগ্রেসের নামে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী এক সামিয়ানার তলে হাজির হলে নাগপুরের কুৎসিৎ ঘটনা ঘটে থাকে হামেশাই। এতে এরা কেউ লজ্জিত হয় না, আইন এদের প্রতিরোধ করতে অগ্রসরও হয় না।

দিল্লী হল সকল পাপ সৃষ্টির বিরাট কারখানা। সংসদ সদস্যরাও এই পাপের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। এদের কেউ কেউ লাইসেন্স পারমিট বিক্রির দালালী করছে! অনেক অনেক রাঘব বোয়াল জাল ছিঁড়ে দিব্য ভদ্রলোক সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিহারের কোন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে বারবনিতালয়ে প্রমোদ অভিযানের অভিযোগ পুলিশের খাতায় লেখা হয়। আদালতে তার প্রমাণ দাখিল হলেও কেউ লজ্জা বোধ করে না। এদের ধামাধরা বুদ্ধিজীবিরা এই শ্রেণীর কংগ্রেসীদের অপকীর্তিকে সভ্যো'চিত ঘটনা বলে প্রচার করতে সংকোচ বোধ করে না।

আমার চিন্তার ছেদ টানতে হল অমিয়ার উপস্থিতিতে।

তোর টিকিও দেখতে পাচ্ছি না কদিন, কি হয়েছে তোর?

শুদ্ধি।

সে আবার কি? হিন্দু মিশন শুদ্ধি করে ধর্মান্তরিত করে। আর্য সমাজীরাও শুদ্ধি করে। তোর শুদ্ধির প্রয়োজন হল কেন?

বললাম, আমাদের দেশে একটা কথা আছে, হঠাৎ নবাব। দৈববশে কেউ যদি অর্থ ও ক্ষমতা পায় তার চেহারা কি হয় তা কল্পনা করে নিতে পারিস। ভারসাম্য রক্ষা করা খুবই কঠিন। আমাদের হঠাৎ নবাব ও তার পারিষদরা যা বলছে তার গলিতার্থ হল শুদ্ধি। অর্থাৎ যারা নবাবের অনুচর তাদের শুদ্ধ হতে হবে। তার জন্য আঠার-বিশদফা ফতোয়া জারী করা হয়েছে। হুকুম হয়েছে খাদি পড়তে হবে।

অমিয়া হেসে বলল, খাদি? বাবা। ধোপার খরচ দিতে দিতে যে পকেট খালি হবে তার চেয়ে টেরিকটের প্যান্ট তৈরি করতে পারলে চুটিয়ে চার বছর পরা যায়। অভিজাত সমাজে বর্তমানে ধুতি পাজামা অচল। প্যান্ট, নেকটাই না হলে ইজ্জত থাকে না। অতএব প্রথম প্রস্তাব বাতিল। দ্বিতীয় হুকুম মানার কি আছে?

বললাম, মাদক দ্রব্য বর্জন করতে হবে, মদের দোকানের মালিকানা নিতে পারবে না কোন কংগ্রেস সদস্য।

অমিয়া বলল, ঠিক বলেছিস বন্ধু। জানিস তো কম্বলের লোম বাছলে কম্বল থাকে না। মদ্যপান বন্ধ করলে কংগ্রেস ই উঠে যাবে। খাওয়ার টেবিলে দামী মদ যদি না থাকে তা হলে আভিজাত্য থাকে কি? কংগ্রেসী বলে আভিজাত্যহীন হতে পারি কি। বিনা মন্তব্যে বলা যায় কংগ্রেসী মন্ত্রীদের প্রায় সর্বাংশই মদ্যপান করে থাকে, কখনও প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে। আমাদের এই ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে গিয়েছিল ভারতের ক্রিকেট টিম। অষ্ট্রেলিয়াতে বিশ্ব-বিজয়ী খেতাব লাভ করার পর তারা শুধু শ্যাম্পেন পান করেই ক্ষান্ত হ বোতল বোতল শ্যাম্পেন মাথায় ঢেলে স্নান করেছে, কারণ, সেখানে হবার মত গঙ্গাজলের অভাব ঘটেছিল। ফতোয়া দিলেই তা মে হবে এমন কথা কি কংগ্রেসী সংবিধানে অথবা ভারতীয় সংবিধা ...াকরোধ করে

অতএব বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত মন্ত্রী, যাদের বিদেশী স্ত্রী আছে তারা মদ্যপানকে জীবনের চিরসঙ্গী করে রেখেছে। অতএব দ্বিতীয় হুকুম বাতিল। তারপর তৃতীয় হুকুমের কথা বল।

সবাইকে জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য সব রাজ্যেই এই রোগ থেকে রোগ বিকার ঘটতে হামেশাই আমরা দেখতে পাই। বিশেষ করে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে জাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতার হাঙ্গামা স্থায়ী সমস্যা। এর জন্য বহু নরহত্যা ঘটছে, সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। কংগ্রেসীরা তা রোধ করতে এগিয়ে এসেছে এমন নজীর এখনও পাওয়া যায়নি। এটাও বাতিল। তারপর ?

জমিজমার উচ্চসীমা মেনে চলতে হবে।

অমিয়া আঁতকে উঠে বলল, ওরে বাপ্ রে। কংগ্রেস চলছে প্রাক্তন দেশীয় নৃপতি আর জমিদার ও শিল্পপতিদের সমর্থনে এবং তারাই হল বর্তমান কংগ্রেস। তারা বেনামে যে সম্পদ রেখেছে তার হিসাব হয়ত বেনামদার এই সম্প্রদায় নিজেরাও বলতে পারবে না। এদের বাদ দিয়ে কংগ্রেস কল্পনা করাও যায় না। এটাও বাতিল। তারপর !

অতি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে হবে।

বাহবা। তা হলে উন্নত প্রযুক্তির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য রাম রহিম বুঝি ভোগ করবে ? এরা ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। গোটা বাড়ি সাজায় নানা মূল্যবান বস্তুতে। এসব যদি না করা হয় তা হলে তারা সমাজে স্থান পাবে কি করে ? ফরোয়ার্ড ব্লকের একজন সংসদ সদস্য ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরত, মানুষের দুঃখ দুর্দশার মোকাবিলা করার চেষ্টা করত। নির্বাচনে সে হেরে গেল। জিতল শিল্পপতির সন্তান। কংগ্রেসীরা এই উদাহরণকে কি বিস্মৃত হয়ে মুটেমজুরের দলে নাম লেখাবে ? তা হয়না দামোদর। অতএব, এটাও বাতিল। তারপর ?

তুই সবই বাতিল করলি। আর বলে লাভ কি ?

আঠার দফার শুদ্ধিকে আন্তরিক ভাবে কংগ্রেসীরা গ্রহণ করেছে, অথবা সেসব মেনে চলার চেষ্টা করছে, কংগ্রেসের মহাশত্রুরাও এ দুর্নাম দিতে পারবে না তবে আজ তরুণ সমাজের যে অধঃপতন আমরা দেখছি তার জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের। তাদের আচার আচরণ নব প্রজন্মকে অধঃপতনের শেষ সীমায় টেনে নিয়ে গেছে। তার ওপর এদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব হল আরও ভয়ঙ্কর। কাকে শুদ্ধ করবে বলতে পারিস ? এক ব্যক্তির জন্য একটি মাত্র পদ, এই নীতি কংগ্রেসের সর্বেসর্বা রাজীব গান্ধীও মান্য করে না। সে নিজেই প্রধানমন্ত্রী, নিজেই
হয় ন. 'সের প্রেসিডেণ্ট। তার প্রয়াত জননীও দুইটি পদ আঁকড়ে ধরেছিল।
ভোগের জননীর ঐতিহ্য গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ তার শুদ্ধিকরণের প্রস্তাব বাতিল না
কংগ্রে উপায় নেই। আঠার দফা নীতিকথা যে দিন ইন্দিরা কংগ্রেসীরা
হলে নাগপুরে াজে অভিন্ন প্রমাণ করবে সেদিন ইন্দিরা কংগ্রেসের অস্তিত্ব বিপন্ন
হয় না, আইন

হবে। এসব জটিল রাজনীতি বাদ দিয়ে চল বেরিয়ে আসি।

তুই তো সবাইকে বরবাদ করতে চাস। সেটাও ঠিক নয়। ব্যতিক্রম তো থাকে।

থাকে থাকুক। বরং আমরা বেরিয়ে আসি। আমার বান্ধবী হোসেনারার বাড়িতে চল। সেখানে মজলিস বসবে। বেশ ভোজনের ব্যবস্থা আছে। আর ব্যতিক্রম যা বললি, সে হল ছাগীমুখে দাড়ির মত। পুরুষের দাড়ি থাকে। কেবলমাত্র অজ সম্প্রদায়ের নারীদের মুখে দাড়ি থাকে, সেটাও ব্যতিক্রম বলা চলে না। স্বাভাবিক। নে চল। আজ গুরুত্বর আলোচনা হবে হোসেনারার বাড়িতে। আসবে বড় নামী দামী ব্যক্তি।

গাড়ি এনেছিস কি?

না। ট্রেনে শিয়ালদহ, সেখান থেকে ট্রাম অথবা বাস অথবা পদব্রজন। গাড়ি গ্যারেজে। আর গাড়ি চড়ব না দাদু। গাড়ি পোষা আর হাতি পোষা একই ব্যাপার।

ঠিক বলেছিস অমু। গাড়ি থাকবে তাদের যাদের প্রচুর কালো টাকা আছে, অথবা যারা মন্ত্রী অথবা সমতুল্য ব্যক্তি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মার্সেডিজে বেরিয়ে যারা ক্লান্ত হয়, যাদের একদিনের জন্য ব্যয় হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা তাদেরই গাড়ি থাকা উচিত। আমার তোর মত লোকের গাড়ি পোষা আর হাতি পোষা একই কথা।

বেরিয়ে পড়লাম দুজন।

রাস্তায় চলতে চলতে বললাম, এটা কেন সম্ভব হয়েছে জানিস?

কেন হয়েছে একথা রাস্তার যে কেউ বলতে পারবে। আমরা বাস করছি স্বৈরতন্ত্রী দেশে। এখানে একমাত্র দেবতা হল প্রধানমন্ত্রী। তার ইচ্ছা সমগ্র জাতির ইচ্ছা। তার কাজই জাতির কাজ। সর্বাধিক আশ্চর্য হল কং-ই-এর সদস্যরা। তাদের ব্যক্তিত্ব মনুষ্যত্ববোধ ইত্যাদি সব হারিয়ে সার্কাসের জোকারের মত হাততালি কুড়াচ্ছে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা ও সাহস কারও নেই। তারা ইন্দিরা গান্ধীর সেই অমোঘ সাবধানী you will feel the consequence কথাটা আজও ভোলেনি।

বললাম, ওসব কথা ছেড়ে দে, জোরে পা চালা। ট্রেন এসে গেছে প্রায়।

ট্রেনের উপচে ওঠা ভীড়ের দিকে তাকিয়ে দু'জনেই থমকে গেলাম।

পরের ট্রেনটা দেখতে হবে। এটায় ওঠা অসম্ভব।

অমিয়া আমার হাত ধরে টানতে টানতে ভীড় ঠেলে গাড়িতে উঠতে না উঠতেই ভোঁ। গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

ফিস ফিস করে বললাম, তোর বুকের মাপ কমে যাবে রে অমু।

অমিয়া বলল, আখ মাড়াইয়ের মত তোরও রস নিঃসারিত হবে।

দু'জনেই হাসলাম।

রাস্তায় কোন কথা বলার অবসর কম। বলাও উচিত নয়। বাক্‌রোধ করে

শিয়ালদহ পৌছে আরও ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়লাম। গাড়ি থেকে যাত্রীরা নামবার আগেই কয়েকডজন যাত্রী হুড়মুড় করে উঠতে আরম্ভ করল। দুপক্ষের মনোরম দেহের শক্তির পরিচয় লাভ করে অনেকে উঠল অনেকে নামল শুধু আমাদের মত কিছু যাত্রী তখনও গাড়ির কোনায় দাঁড়িয়ে এই প্রাণঘাতী শক্তির বহিঃপ্রকাশ অপলক নয়নে দেখছিলাম আর আঁতকে উঠছিলাম। মিনিট পাঁচসাত পর লড়াইয়ের প্রথম পর্ব শেষ হতেই আমরা ধীরে ধীরে নেমে পড়লাম।

স্টেশন এলাকা পেরিয়ে উড়াল পুলের তলা দিয়ে ট্রামে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছি।

অনেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। না পাচ্ছি ট্রাম, না পাচ্ছি বাস।

বললাম, চল হেঁটে যাই।

অনেক দূর।

কতটা? এক দেড় মাইল?

তা হবে।

দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে হেঁটে গেলে অনেক আগেই পৌছাতে পারব।

একটা ট্যাক্সি ডাক।

অগত্যা ট্যাক্সির জন্য চিৎকার ও হস্তোত্তলনের কসরৎ আরম্ভ করলাম। যাত্রীবিহীন ট্যাক্সির অধিকাংশই লাল কাপড় দিয়ে মিটারকে 'ঘোমটা' পড়িয়ে ডাকা মাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করছে বিনা দ্বিধায়। একজন বিশেষ করুণা বশতঃ দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবেন? গন্তব্যস্থল শুনেই বলল, ওদিকে যাব না। ব্যস! ট্যাক্সি দ্রুত দৃষ্টির বাইরে।

সরকারী পরিবহনের বাস দুটো দেখলাম। তাতে পা রাখারও কোন উপায় নেই।

অমিয়া বলল, ডাক্তার বিধানচন্দ্র কলকাতা শহর থেকে প্রাইভেট বাস তুলে দিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সরকারী বাসই একমাত্র চলবে কলকাতা শহরে। সে গুড়ে বালি। দিল্লী পরিবহনের পাঁচ হাজার বাস চলে দিল্লী শহরে আর কলকাতায় মেরে কেটে ছয় শ। এটাই তো দুরবস্থার আসল চিত্র। পরিবহন সমস্যা মেটার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। তবে পাতাল রেল ও চক্র রেল কিছুটা সুরাহা করতে পারে। পাতাল রেল শেষ অবধি পাতালে আশ্রয় নিলেও কোন দুঃখ থাকবে না। চক্র রেলের জন্য বহু চক্রান্ত প্রস্তুত। এর কিছুটা কলকাতায় কিছুটা দিল্লীতে। আশা প্রকাশ নিরর্থক। হলে ভাল, না হলে দুঃখ করার কিছু নেই।

হোসেনারার বাড়িতে যারা উপস্থিত ছিল তাদের বৃহদাংশই বাঙ্গালী মুসলমান নারী ও পুরুষ, বাঙ্গালী হিন্দু নারী পুরুষ লঘিষ্ঠ হলেও সংখ্যায় নেহাৎ কম নয়। আলোচ্য বিষয় নারী মুক্তি। অমিয়া উদ্যোক্তাদের অন্যতম। নারীপক্ষের বক্তব্য সবারই প্রায় এক। বধূহত্যা, পণপ্রথা, নারী পীড়ন,

সমাজবিরোধীদের অত্যাচার ইত্যাদি। সবাই গবেষণা করছে নারীর দুর্গতির কারণ কি কি, তা থেকে মুক্তির উপায় কি, ইত্যাদি।

আমরা যারা পুরুষ তারা নীরব শ্রোতা। পুরুষের সংখ্যা নগণ্য হলেও তাদের মতামতের মূল্য থাকা উচিত এবং সেই মতামতকে সম্মান করা উচিত। কিন্তু কোন মহিলার সেদিকে নজর দেবার অবসর ছিল না। তাই মৃতসৈনিকের ভূমিকায় আমরা মঞ্চে প্রবেশ করেছি এবং মহিলাদের নির্দেশে মৃতের অভিনয় করছি।

বধূহত্যা কেবল মাত্র হিন্দু সমাজে হয়, একথা মনে করা ভুল। মুসলমান, খৃষ্টান সমাজেও হয় এবং পৃথিবীর প্রায় সর্ব দেশেই হয়। সভ্যতার বড় দাবীদার ইউরোপীয় দেশগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়।

অমিয়া প্রসঙ্গকে ঘোরালো করে তুলেছিল। সে শুধু বধূহত্যা নয় বধুর আত্মহত্যা নিয়ে আলোচনা করতে চায়। তার বক্তব্য হল যখন পুরুষ প্রধান সমাজ লাঠিতে স্ত্রীদের শায়েস্তা করতে পারে না তখন তারা স্ত্রী হত্যাকেই শ্রেয় মনে করে। আমেরিকায় প্রতি বছর চার লক্ষ ছাপান্ন হাজার গৃহবধূ লাঠির শিকার হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার মোট বধূ সংখ্যার অর্ধেকই এই লাঠির আপ্যায়ন লাভ করে। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একমাত্র দিল্লীতে বছরে সতের থেকে আঠার শত মহিলা আত্মহত্যা করে। অবশ্য এই অত্যাচার সব সময় দৈহিক নয়। মানসিকও। প্রেমে ব্যর্থতাও এই মানসিক অত্যাচারের একটি অংশ। কোন কোন সময় কঠিন রোগের জন্যও অনেক নারী আত্মহত্যা করে থাকে। বধূহত্যা খতিয়ান নেহাৎ কম নয়, কারণ স্বামী-স্ত্রীর মতানৈক্য, অবৈধ প্রেম, পণপ্রথা এবং দৈহিক অসুস্থতা। উপরি পাওনা হল স্বামীর মাতা-ভগ্নী ইত্যাদির দুর্ব্যবহার।

জাহান আরা বেগম বলল, মেয়েদের আর্থিক নিরাপত্তা থাকে না বলেই পুরুষরা অত্যাচার করার সুযোগ পায়

হোসেনারা বাধা দিয়ে বলল, সর্বাংশে এটা ঠিক নয়। চাকরিজীবি মহিলাদের এই অত্যাচার সহ্য করতে হয়। প্রাথমিক ভাবে স্বামী কর্মরতা স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হয়। অকথা কুকথা বলে থাকে অথচ তার উপার্জনের উপসত্ব সে ভোগ করে। এতে নারীর কঠিন অবমাননা ঘটলেও মেয়েরা স্বামীর ঘর ছাড়ে না। ছাড়লেও আত্মীয়স্বজন তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার পতিগৃহে পাঠায়। নিরুপায়ের মত তাকে স্বামীর ঘরে বাস করতে হয়। এমন কি স্বামী যদি মত্তপ লম্পটও হয় তাতেও কেউ ভ্রুক্ষেপ করে না। নারী তখন খুঁজে নেয় আত্মহত্যার পথ।

মনসুর আলি জাহান আরার স্বামী। এক কোনায় বসে মহিলা মহলের বক্তব্য শুনছিল। চেয়ার টেনে এগিয়ে এসে বসল।

জাহান আরা বলল, সামনে এসেছ কোন মতলব নিয়ে, কেমন ?

মনসুর বলল, অবশ্যই। তোমাদের কতকগুলো কাল্পনিক অভিযোগের জবাব দিতে।

কিন্তু এই মজলিসে পুরুষদের বক্তব্য শোনা হবে না।

জাহান আরার কথা শেষ হতেই হোসেনারা বলল, তা কেন হবে। এখানে নিজের নিজের বক্তব্য সবাই রাখতে পারে, মনসুরভাইকে বলতে দিতে হবে।

জাহান আরা হেসে বলল, বেশ, মঞ্জুর।

মনসুর বলল, বধূহত্যা হয় ঠিকই কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই পুরুষ তার জন্য দায়ী নয়। এতে মেয়েদের ভূমিকাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। শাশুড়ি, ননদ, এমন কি অন্য ভাইদের স্ত্রীরাও বেশ বলিষ্ঠ অংশ নেয়। কিন্তু এরা সবাই মহিলা। পুরুষশাসিত সমাজে মহিলাদের কোন ভূমিকা নেই, এটা সত্য নয়। দ্বিতীয় অভিযোগ পণপ্রথা। এর জন্য পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা কম দায়ী তা মনে কর না, তুমি তোমার ছেলের বিয়ে দিতে মনোমত যৌতুক না পেলে কি খুশি হও? তোমার পরিবার ও সমাজের উপযুক্ত করে মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠাবার নেপথ্য নির্দেশ কি দাও না? আর এই পাপ মধ্যবিত্ত সমাজেই বেশি এবং মধ্যবিত্ত সমাজেই বধূহত্যা, পণপ্রথা প্রশাসনকেও পঙ্গু করে রেখেছে। তোমরা যখন বধূ তখন তোমরা অভিযোগ কর, তোমরা যখন গৃহিণী হও তখন তোমরাই অভিযুক্ত হও।'

আমিও এগিয়ে বসলাম। মনসুরের মৃদু প্রতিবাদ ভালই লাগছিল। মনসুর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, জাহান আরা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। উভয়েই শিক্ষিত ও রুচি-সম্মত। তাদের বাক্‌পটুতাকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়।

মনসুর থেমে গিয়েছিল। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, আর কিছু বলব?

জাহান আরা হেসে বলল, বল।

পণপ্রথা। এই পাপ ছিল হিন্দুসমাজে, বর্তমানে এই পাপ কঠিনভাবে প্রকট হয়েছে মুসলমান সমাজে অর্থাৎ মানসিকতায় কেউ কারও চেয়ে কম নয়, বরং সমান সমান। নারী পীড়ন? সেটাও একপক্ষীয় নয়, পুরুষ পীড়নও কম হয় না। অন্দরমহলে যা ঘটে বাইরের কম লোকই তা জানতে পারে, কিন্তু যেখানে নারী অত্যাচারিত হয় সেখানে তার প্রকাশ যেভাবে ঘটে পুরুষ পীড়ন সেভাবে প্রকাশ পায় না। একটা মেয়ে জেনেশুনেই আসে তার স্বামীর গৃহে। স্বামীর ঘরই তার নিজের ঘর, বোঝাপড়া করে থাকাই উভয়ের ধর্ম। কিন্তু নারী মাত্রেই মনে করে তার স্বামী একজন অল্পবুদ্ধির লোক, সে নিজেই সবজান্তা এবং প্রথম থেকেই সে তার ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার চেয়ে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কটু কথা, বাক্যবান অতিষ্ঠ করে পুরুষকে। এ রকম উদাহরণ যথেষ্ট আছে। অবশেষে সমাজবিরোধীদের অত্যাচার? সমাজবিরোধীরা নারী-পুরুষ বিচার করে না। তাদের অত্যাচার পুরুষের অর্থহানি, জীবনহানি ঘটায়, নারীদের মর্যাদাহানি ও জীবনহানি ঘটায়। এই যা পার্থক্য।

অমিয়া এগিয়ে এসে বলল, অবশ্যই। তবে মনসুর যা বলল সেগুলো ব্যতিক্রম।

আমি প্রতিবাদ করার সুযোগ খুঁজছিলাম। অমিয়া বুঝতে পেরে বলল, তুই কোন কথা বলিস না দামু, তোকে উপসংহার লিখতে হবে।

তার আগেই যে তোরা পুরুষদের সংহার করছিস। তোরা তো অন্দরমহলে থাকতেই চেয়েছিস জন্মাবধি। বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ তোদের পুরুষরাই তো দিয়েছে। সেজন্য কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আর কথা নয়, বেগম হোসেনারার বিশেষভাবে নিযুক্ত বাবুর্চি বিশেষ ধরণের রন্ধন শিল্পসম্ভার হাজির করেছে, সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা হোক।

ছেদ পড়ল আলোচনার।

অমিয়া পাশে এসে বসল।

বললাম, তোরা নারী সমাজের কথা বলছিস। নারীরা তো নানা মানসিকতা নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত। তাদের একদল প্রগতিকে আলিঙ্গন করছে, আরেক দল গাড়ির পেছনে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে পেছনে চলার চেষ্টা করছে, আবার একদল মুখে প্রগতির কথা বললেও কাজের বেলায় প্রতিক্রিয়াশীল। আবার হিন্দু মেয়েদের রুচি, মুসলমান মেয়েদের রুচি আলাদা। কৃশ্চান মেয়েদের রুচি যে কোনটা তা বুঝা ভার।

অমিয়া বলল, এর জন্য দায়ী কে? দায়ী আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অশিক্ষা, আর্থিক বৈষম্য, বেকার সমস্যা, নীতিজ্ঞানের অভাব, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহেলা। আমরা বলে থাকি, নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা কৃষ্টির সমাবেশে গড়ে উঠেছে ভারতীয় ঐক্য ও সংহতি। এটা হল বাত কা বাত। তাকিয়ে দেখ। সারা ভারতের চিত্র ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী।

হোসেনারা বাধা দিয়ে বলল, আমি এটা স্বীকার করি না।

তাহলে ভারতের প্রতিটি রাজ্যের হিসাবটা দেখ। পানজাব উগ্রপন্থীদের দমন করতে পারেনি। প্রতিদিন নির্বিচারে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা হিন্দু এবং বিরুদ্ধ মতাবলম্বী শিখদের হত্যা করে চলেছে নির্বিবাদে। প্রশাসন সেখানে প্রায় পঙ্গু। খলিস্তান চায় উগ্রপন্থীরা। ১৯৪৮ সালে জওহরলাল বুঝেছিলেন, পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। জওহরলাল বিধানচন্দ্রকে লিখেছিলেন, "East Bengal will continue to feel neglected and by-passed so long as the centre of gravity is in Western Pakistan. That centre of gravity is bound to continue in the West and will lead to Eastern Pakistan drifting farther and farther away."— জওহরলালের এই ভবিষ্যৎ বাণী সফল হয়েছিল এবং পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল শক্তিকে ইন্দিরা যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশ সৃষ্টিতে। এই বেদনা পাকিস্তান ভুলতে পারেনি, পারবেও না সহজে। এই জন্য পাকিস্তান একদল বিপথগামী শিখকে মদত দিচ্ছে পানজাবকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। পরিণাম কত ভয়ঙ্কর তাতো দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু এই পাপকে সৃষ্টি করেছিল কংগ্রেস। ভারতকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করেছিল, তারা চিন্তাও করেনি অন্য কয়েকটি ধর্মাবলম্বী লোক এদেশে বাস করে। তাদের অন্যতম শিখ, তারা স্বাধীন খলিস্তান দাবী তুলেছে কংগ্রেসের বিকৃত রাজনীতির ফলস্বরূপ।

হোসেনারা বলল, আমরা এটা চাই না অমিয়াদি।

না চাইলেও তা ঘটছে, যা ঘটেছে তা বাস্তব। এরপর এস কাশ্মীরে। কাশ্মীরের পাকিস্তানপন্থা মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধায় কথায় কথায়। কারফিউ আর গুলী চালান হল নিত্যকার ঘটনা। হিন্দু নিধন আর হিন্দুর মন্দির ধ্বংসের কালাপাহাড়ী সংবাদ তো নিত্যকার ঘটনা। ওরা চায় কাশ্মীর পাকিস্তানে যুক্ত হোক। ওখানেও বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা দিয়েছে কংগ্রেসের ভ্রান্ত নীতিতে। কাশ্মীর যখন প্রায় মুক্ত তখন বৃটিশের পরামর্শ তথা নির্দেশে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে কাশ্মীর সমস্যাকে স্থায়ী সমস্যা করে গেছে স্বয়ং জওহরলাল নেহেরু। তারই ফল ভোগ করছি আমরা। গুজরাটে জাতিপাতির দ্বন্দ্ব থেকে আরম্ভ হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জন্য চাকুরি, শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দান ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এক শ্রেণীর উন্নতির জন্য অপর শ্রেণীর নায্য দাবী উপেক্ষা করা হচ্ছে। এই রিজার্ভেশন ছিল পনর বছরের জন্য তা করা হয়েছে চল্লিশ বছর। আমরা নিশ্চয়ই অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সমর্থন করি কিন্তু উচ্চবর্ণে যাদের জন্ম তারা সবাই উন্নত এমন ধারণা ভুল। আর্থিক ক্ষেত্রে যারা অনুন্নত তাদের জন্য রিজার্ভেশন থাকাই সঙ্গত। তা করা হয়নি সেজন্যই অশান্তি।

মনসুর বলল, সংখ্যালঘুদের দাবীও তো গ্রাহ্য হয়নি।

অমিয়া বলল, এটা ঠিক নয়। ভারতে কেউ সংখ্যালঘু অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। সবাইকে ভারতীয় বলে চিন্তা করতে হবে। তাতেই ভারতের ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকবে। মহারাষ্ট্রের দিকে তাকাও, সেখানেও বিদর্ভ আন্দোলন ভালভাবে দানা বেঁধেছে। বোম্বাইয়ে সর্বশ্রেণীর ও সর্বপ্রদেশের মানুষ বাস। মহারাষ্ট্রের মূল সংস্কৃতির কেন্দ্র হল পুনে। বোম্বাই গায়ে গতরে বৃদ্ধি পেলেও মারাঠিরা খুশি নয়। জন্ম নিয়েছে শিবসেনা। তাদের দাপটে প্রশাসনও উদ্বিগ্ন। এবার উত্তরপ্রদেশের দিকে তাকাও। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সেখানে নিত্যকার ঘটনা। লক্ষ্ণৌতে শিয়া-সুন্নীর দাঙ্গা, বেনারসে, মীরাটে দাঙ্গা। এতে অগ্নিসংযোগ করেছে রাম জন্মভূমি। কতজনকে জন্মের মত বিদায় নিতে বাধ্য করবে তার নিশ্চয়তা নেই। রামের জন্মস্থান বলে যাকে বলা হয়েছে তা যে একসময় হিন্দু মন্দির ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কাল্পনিক রামের সেখানে জন্ম না হলেও হিন্দুদের বিশ্বাস ওখানে জন্ম নিয়েছিলেন রামায়ণ কথিত রামচন্দ্র। বাদশাহ বাবর এই মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরি করেন, এটা ঐতিহাসিক সত্য তবে তার সঙ্গে হিন্দু ভাবাবেগের যথেষ্ট সংযোগ ছিল। এই মন্দির তথা মসজিদ দখল করতে উভয় সম্প্রদায় 'রণং দেহি' ভাব। মোঘল রাজত্বকাল অবধি ভারতের শতকরা আশীটি মসজিদই নির্মিত হয়েছিল হিন্দুদের মন্দির ভেঙ্গে এবং মন্দিরের মালমশলা দিয়ে। এসবের ঐতিহাসিক সত্য কেউ অবিশ্বাস করে না। সে সব মসজিদকে মন্দির বলে দাবী করলে ভারতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি থাকবে কি? আর অন্য সব মসজিদের ওপর দাবী ছেড়ে অযোধ্যায় রামমন্দির

নিয়ে মাথাব্যথা হওয়াটা সুস্থ মানসিকতার পরিচয় নয়। আর শুনতে চাও।

মনসুর বলল, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী সচেষ্ট ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষকে একবিংশ শতাব্দীতে পৌছবার অগ্রগতি দিতে।

জাহান আরা বলল, তারই প্রথম পদক্ষেপ বোধহয় মুসলমানদের তালাকি আইনের সংশোধন ?

হোসেনারা বলল, আইন যদি সংবিধান বিরোধী হয় তাহলে তা নাকচ হবে। রাজীব খোয়াব দেখছেন। মুসলীম লীগের বনাতওয়ালা'র অনুসরণে মুসলমান মেয়েদের নায্য অধিকার ধ্বংস করাই রাজীবের উদ্দেশ্য। একসময় জ্যোতিবাবু বলেছিলেন, রাজনীতিতে 'নভিস' এই প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করা বাতুলতা। ভারতের সর্বনাশ করেছিল মুসলীম লীগ। দেশ ভাগ হবার পর পাকিস্তানে মুসলীম লীগ কবে স্থান পেলেও কংগ্রেসের দয়াতে ভারতের মুসলীম লীগ সাইনবোর্ড পাল্টে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। অবশ্য ভারতের কমুনিষ্ট পার্টি প্রথমাবধি পাকিস্তানের স্বপক্ষে প্রচার করেছে। পাকিস্তান সৃষ্টিতে তাদের অবদান নেহাৎ কম নয়। পাকিস্তানের ঝাণ্ডার সঙ্গে লাল ঝাণ্ডা বেঁধে কমুনিষ্ট পার্টি ভারত বিভাগকে সমর্থন করেছে, প্রকাশ্যে প্রচার চালিয়েছে (the Communist had been among the most vocal advocates of Pakistan—The Statesman.) দেশ ভাগ হবার পর কমুনিষ্ট পার্টি কেরলে সরকার গঠন করল। কেরলে জন্ম নিল ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলীম লীগ। এই লীগের সাহায্যে সরকার পরিচালনা করছে বর্তমান কংগ্রেস। সেই মুসলীমলীগের দাবীকে রাজীব কি করে গ্রহণ করল না ভেবে দেখার বিষয়।

জাহান আরা বলল, এমন একটা আইন করার আগে জনমত যাচাই করা উচিত। এই মতামত নিতে হবে মুসলমান মেয়েদের। আর রাজ্য ভিত্তিক এবং ভাষা ভিত্তিক। যে রাজ্যের মুসলমান মহিলারা এটা গ্রহণ করবে তারা কোন ভাষাভাষী বিচার করে কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগ করতে হবে। আর যে রাজ্যের মুসলমান মেয়েরা তা গ্রহণ করবে না তারা কোন ভাষাভাষী তা বিচার করে এই আইন প্রয়োগ করা হবে না। বাংলা ভাষাভাষী এবং মারাঠী ভাষাভাষী মুসলমান মেয়েরা এই আইন চায় না। তাদের ওপর এই আইন প্রয়োগ করা চলবে না। কট্টরপন্থী কিছু উর্দুভাষী মহিলা যদি এই আইন চায় তাদের এই আইনের আওতায় আনা উচিত, অন্যকে নয়।

অমিয়া বলল এটা রাজীব করবেন না, করা খুব সহজও নয়। তবে এই আইন বিচারালয়ে নাকচ হয়ে যাবে। রাজীব যতই তড়িঘড়ি আইন পাশ করুন তাতে সুফল হবে না। এর জন্য মাথা ব্যথা করে লাভ নেই।

মাথা ব্যথা হবার যথেষ্ট কারণ আছে অমিয়াদি, বলল সরমা চাকলাদার। আবার বলল, হিন্দুদের উদার সহনশীলতাকে মূলধন করে হিন্দু কোড পাশ করেছে সরকার। হিন্দু মেয়েরা উপকৃত হয়েছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু হিন্দু

পুরুষরা যদি দাবী করে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইন। তার পশ্চাৎ ধরে হিন্দু কোড করে বহুবিবাহ রোধ, মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকারদান ও বিবাহ বিচ্ছেদ যদি করা যায় তা হলে প্রত্যেক ভারতীয় যেখানে আইনের চক্ষে সমান সেখানে মুসলমানদের জন্য যদি বিশেষ আইন করা হয় তাহলে হিন্দু কোড বাজেয়াপ্ত করতে হবে। হিন্দু পুরুষদের দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা আইন অনুসারে এবং মনুসংহিতার নির্দেশ মেনে চলতে দিতে হবে। তখন শুরু হবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সেই ভয়াবহ অবস্থা কি আমরা চাই। ফৌজদারী কার্যবিধির ১২৫ ধারা সংশোধন করলে সংবিধানের ১৫ ধারায় তা সংবিধান বহির্ভূত হবেই হবে। তা যদি না হয় তা হলে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দু ভারত ও মুসলীম ভারত সৃষ্টি হবেই হবে। রাজীবের ক্ষমতা নেই তা রোধ করার।

হোসেনারা বলল, রাজীব কি শুনবেন এই যুক্তি? সে এখন একছত্র ভারত সম্রাট। তার অঙ্গুলি হেলনে ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হচ্ছে। তবে প্রতিবাদ আমরা জানাব। তার অর্থ ভবিষ্যতে আরও অসন্তোষের বীজ রোপন করা হবে। যদি কোন দিন দেখা যায় প্রগতিশীল মুসলীম মেয়েরা মুসলীম বিবাহ আইন অনুসারে বিয়ে করছে না কোন মুসলমান পুরুষকে। তারা বিশেষ বিবাহ আইনের আশ্রয়ে যে কোন ধর্মাবলম্বী পুরুষকে বিবাহ করছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। মুসলীম নারী মুক্তির এটাই হবে তখন প্রধান পথ। কট্টরপন্থীরা যদি সংযত না হয় তা হলে এটা ঘটবে। কেউ রোধ করতে পারবে না।

উপসংহারে আমি বললাম, ভারতের বড় দুর্দিন। এই দুর্দিনে রক্ষা করার মত নেতার বড় অভাব।

অনিমা বলল, ভুঁই ফুরে নেতা জন্মাবে। তবে সময় সাপেক্ষ। রাজীব যদি বিষকে অমৃত মনে করে মুসলীম লীগের বনাতওয়ালার জালে জড়ায় তা হলে তুই মনে করিস না দেশকে রক্ষা করার মত লোকের অভাব ঘটবে। তবে সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য যদি কঠিন হাতে না ধরা যায় তাহলে ভারতের সংহতি বিপন্ন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। মুসলমান কট্টরপন্থীরা তাদের আবদার রক্ষা করতে রাজীবকে বাধ্য করার যে চেষ্টা করছে তার পরিণতি এখনই দেখা যাচ্ছে। আরিফ মহম্মদ খান মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন এই বিলের সঙ্গে একমত না হওয়াতে, ইতিমধ্যেই শাসানি আসছে লিখিত ভাবে। প্রাণহানি ঘটাবার হুমকি আসছে টেলিফোনে। এগুলো হল side issue, কট্টরপন্থীরা গায়ের জোরে প্রগতিবাদীদের মুখবন্ধ করার যেমন চেষ্টা করছে তেমনি রাজীবের সন্তুষ্টি বিধান করতে সংসদের কংগ্রেসী সদস্যরা বিরুদ্ধ মত প্রকাশের সুযোগ হারিয়েছে। তারা জানে রাজীব অখুশি হলে তাদের চাকরি রক্ষা সম্ভব হবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনার দিকে চোখ ফেরাও দেখবে শান্তি কোথাও নেই। সুইডেনের মত শান্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীকে প্রাণ দিতে হয়েছে ঘাতকের হাতে। মার্কোসের মত দুঁদে প্রেসিডেন্টকে পালাতে হয়েছে দেশ ছেড়ে সর্বত্র-ই পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ

এগিয়ে চলার বেগ দিচ্ছে, আর আমরা পিছিয়ে চলার জন্য ব্যস্ত হয়েছি।

মনসুর বলল, তা হলে আজকের আলোচনার বিষয়গুলো অমীমাংসিত-ই থেকে গেল।

দৃঢ়স্বরে হোসেনারা বলল, না। মীমাংসা সহজ না হলেও মীমাংসার পথগুলো চেনার চেষ্টা আমরা করেছি নিছক আলোচনাতেই তা শেষ হবে না। এরপর কি সেটাই প্রশ্ন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে ছাত্ররা নানা দলে বিভক্ত হয়ে নানা রকম শ্লোগান দিচ্ছে। পুলিশ দু'পাশের ফুটপাতে লগুড় হস্তে দাঁড়িয়ে। যে কোন সময় পরস্পর বিরোধীরা লড়াইতে নামলে তাদের বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্ব তাদের। ট্রাম বাস প্রায় অচল। পদব্রজীরা ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছে।

অবস্থা বিশ্লেষণ করল একজন পথিক।

লেখাপড়ার আর দরকার নেই, শ্লোগান লিখতে যারা এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা সফল। দেবী ভারতী হাতের বীণা ফেলে দিয়ে বোমার কারবারে নেমেছেন, তাঁর হাঁস উড়ে গেছে, পায়ের তলায় রয়েছে কতকগুলো দানব।

শ্যামলী বলেছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতি নিয়ে প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছে কয়েকটি ছাত্রসংস্থা। অথচ রাজ্যের শিক্ষানীতির সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধচারণ যে সব সংস্থা করেছে তাদের প্রতিবাদে কর্ণপাত করেনি বামপন্থী সরকার। তারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে আন্দোলন করছে, আবার ছাত্র পরিষদ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে আন্দোলন করেছে। কোনপক্ষই দলীয় চিন্তার বাইরে কোন সুস্থ যুক্তিকে স্থান দিতে নারাজ। এরজন্যই শিক্ষা ক্ষেত্রে অরাজকতা।

শ্যামলীকে থামিয়ে দিয়ে তার সহপাঠিনী বর্তমানে ঘোরতর সংসারী রেবেকা বলল, কোথায় অরাজকতা নেই বলতে পারিস? অরাজকতা সারা পৃথিবীময়। এশীয় দেশের দিকে তাকিয়ে দেখ, পশ্চিমে লেবানন থেকে পূর্বে জাপান, উত্তরে চীন থেকে দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়া অবধি সর্বত্র অরাজকতা। লড়াই চলছে নতুনের সঙ্গে পুরাতনের। সেই লড়াই শিক্ষা ব্যবস্থায়, সমাজ ব্যবস্থায়, ক্ষমতা লাভের চেষ্টায় অর্থাৎ সর্বত্র। তবে অন্যদেশে কতটা কি হচ্ছে জানিনা, আমাদের দেশে রথের চাকা পেছনে ঘোরাবার চেষ্টা হচ্ছে। আমাদের বামপন্থী সরকার বলেছে, ইংরেজি হটাও, দক্ষিণপন্থীরাও বলছে ইংরেজি হঠাও। বামপন্থীরা বলছে পরীক্ষা নেবার দরকার নেই। সবাইকে উত্তীর্ণ বলে ঘোষণা কর। দক্ষিণপন্থীরা বলছে, কর্মক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ শিক্ষাটা আমার তোমার জন্য নয়। ওটা শ্রেণী বিশেষের জন্য জমা রইবে। আমরা কোন রকমে খুঁটে খেতে যদি পাই সেটাই যথেষ্ট। বেশি শিখলে ওদের দুর্নীতি, অপকীর্তি, অক্ষমতা, অযোগ্যতা ফাঁস করে দিতে পারি তার চেয়ে সবাই কম জানুক, কম শিখুক এটাই তো ভাল। পাঠশালার শিক্ষকরা

বেতন পাবেন, তারা পড়াবেন না। পড়িয়ে কি হবে? যেথায় যেখানে প্রয়োজন নেই সেখানে বইয়েরই দরকার কি! নাম লিখতে পারে তো নিজের ভাষায়? ওই যথেষ্ট!

শ্যামলী হার মানবার মেয়ে নয়। সে বলেছিল, তোর কথা ঠিক তবে কিছুটা অতিরিক্ত বলেছিস। অ-টা না বললেও চলত।

তা বটে! আমরা বামপন্থার র জন্যে বাস করি। আমরা পুঁজি বিরোধী গরীবের বন্ধু। শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ আমরা ডেকে আনছি পুঁজিপতিদের যৌথ উদ্যোগের জন্য, কারণ এদিয়ে সমাধান হবে বেকার সমস্যা। তিন কোটি বেকার যুবক-যুবতীর মুখের অন্নের জন্য আমরা কতটা ব্যস্ত তা কি তোমরা জাননা, আর এই সমস্যার মীমাংসা করতেই তো পুঁজিপতিদের সঙ্গে গাঁট ছড়া বেঁধেছি। আমরা গরীবের বন্ধু, তাকিয়ে দেখেছ কি কলকাতার ফুটপাত! হাজারেও ব্যাজার হবার নেই। নিরন্ন, রুগ্ন, নীতি-হীনতায় জর্জরিত মানুষগুলোকে নিশ্চয় ধনাঢ্য মনে করা যায় না, তাদের বাঁচাতে কতটা আমরা অগ্রসর হয়েছি তাকি হিসাব করেছ কখনও। তবে হাঁ, বামপন্থীদের প্রশাসনে শান্তি শৃঙ্খলা না থাকলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হতে পারেনি। কলকাতায় কিছু সংখ্যক অবাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান দাঙ্গা বাধাতে চেয়েও তা করতে পারেনি কারণ বাংলার মানুষ দাঙ্গা চায়না, তাই অঙ্কুরেই তা উৎপাটিত করা সম্ভব হয়েছে। এর কৃতিত্ব যেমন বামপন্থী প্রশাসনের তেমনি কৃতিত্ব জনসাধারণের। শিক্ষা ক্ষেত্রের নৈরাজ্য যারা সৃষ্টি করছে তারা সবাই কিন্তু ছাত্র নয়, তাদের বৃহদাংশ বহিরাগত এবং অনেক ভাড়াটে অশান্তি সৃষ্টিকারক।

শ্যামলী বলেছিল, অশান্তি শিক্ষাক্ষেত্রের চেয়েও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেই বেশি। কোথায় রাম আর কোথায় অযোধ্যা তার ঠিকানা নেই অথচ জম্মু কাশ্মীরে অর্ধাংশের ওপর মন্দির ভেঙেছে, হিন্দুদের বাড়িঘর লুট করেছে, আগুন দিয়ে বাড়িঘর পুড়িয়েছে এবং পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে উল্লাস করেছে। কোটি কোটি টাকার সম্পদ ও কিছু জীবন হানির পরও এই উন্মত্ততা থামেনি। পেছনে বসে পাকিস্তান সীমান্তের দুটি রাজ্য পাঞ্জাব ও জম্মু কাশ্মীরে অশান্তি নেপথ্য থেকে পরিচালনা করছে। এই অশান্তির চেয়ে বড় অশান্তি আর কি থাকতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রের অশান্তির মূল হল শাসকরা চায় তাদের শাসন কায়েম রাখতে, সেটা চিরকাল সম্ভব হবেনা কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করার পরও যে ভাবে সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে পড়েছে তার নিবৃত্তি কোন কালে হবে বলে আশা করা বাতুলতা মনে হয়।

তাকিয়ে দেখ মনিপুরের দিকে, ত্রিপুরার দিকে, মিজোরামের দিকে। সীমান্তের এইসব রাজ্যে যা ঘটছে তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এইসব অশান্তিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে সীমানার ওপারের রাষ্ট্র। তাদের ওপর খবরদারী করার অধিকার তো আমাদের নেই। প্রতিবাদ জানাচ্ছি, প্রতিবাদ গ্রাহ্য করছে না। 'চলছে,

চলবে অথবা চলবে না চলবে না' শুনেই আমরা আঁতকে উঠি আর এ'সব রাজ্যের মানুষ বাড়ির বাইরে এলে ফিরে যাবার ভরসা পায়না কোন সময়ই। আমাদের ছবিটা একবার দেখে নাও। বর্তমানে আসামেও শান্তি নেই। ওখানেও যারা অসমীয়া ভাষী নয় তারা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নিজেদের নিরাপদ মনে করতে পারছে না। আজ আমরা ভাবতে বাধ্য হচ্ছি, এরপর কি !

শ্যামলী রেবেকার আলোচ্য বিষয় ও যুক্তিগুলো ঠেলে ফেলা যায় কি? তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, এরপর কি? রাজনীতির খেলায় পাকা দাবারুর মত গুঁটি চালিয়ে কখনও বামপন্থা, কখনও দক্ষিণপন্থীরা যেভাবে কিস্তিমাৎ করতে উদ্যোগ নিয়েছে তাতে না আছে দেশপ্রেম, না আছে মানবতাবোধ, আছে শুধু ক্ষমতা লাভের জন্য নীতিহীন কাজের ফিরিস্তি।

ইন্দিরার পতন ঘটেছিল। কেন? জরুরী অবস্থায় যে স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার জন্য। ইন্দিরার সহকর্মীরাও তার এই জরুরী অবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেনি। ক্ষমতাচ্যুত হবার ভয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা দেশবাসীও চায়নি। অথচ রাজীব গান্ধী গদীতে বসেই জরুরী অবস্থাকে সমর্থন করেছে এবং প্রয়োজন হলে সেও জরুরী অবস্থা ঘোষণা করবে এমন ইঙ্গিতও দিয়েছে। অর্থাৎ রাজীব যখন বুঝবে তার ক্ষমতাচ্যুত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তখনই সে তার গর্ভধারিণীর পথ অবলম্বন করবে। কিন্তু তারপর! সে কথাটা রাজীব চিন্তা করবার অবসর পায়নি, তার পারিষদরাও এর গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়নি।

অমিয়া বলেছিল, জানিস একটা মজার ঘটনা?

বললাম, অনেক মজার ঘটনা জানি, শুধু তুই যেটা বলবি সেটাই জানিনা, এবার বলে ফেল।

আমাদের গান্ধীবাদী কোন এক মন্ত্রী লোক সমক্ষে মদ্যপান করে না। তার নোকর নোকরানীরা তাকে মদ পরিবেশন করে লিমকার বোতলে। বোতলের অর্ধাংশে লিমকার পানীয় ফেলে দিয়ে শূন্যস্থান হুইস্কি দিয়ে পূর্ণ করে পান করে থাকে। লোকে দেখলে মনে করবে মন্ত্রীমহোদয় ঠাণ্ডা পানীয় সেবন করছে। এই রকম সদাচারী মন্ত্রীর অল্প বয়স্কা নাতনী দাদুর বোতল থেকে ঠাণ্ডা পানীয় খাবার পর বেহুঁস হয়ে পড়েছিল। তখন ডাক্তার বৈদ্য নিয়ে ছোটাছুটি।

এটা বললাম, এই ঘটনা। রাজীব যে তালাক আইন করেছে তার বিরুদ্ধবাদীরা কতকগুলো বাস্তব ঘটনা তুলে ধরে রাজীবকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছে। তারা বলছে ধনীর ঘরে তালাক একটা বিলাস। এইসব তালাকি স্ত্রীরাও পিতৃগৃহে আশ্রয় পায় কিন্তু গরীবদের কি সর্বনাশ হয় তার কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছে এই বিরোধীরা। কোন এক মুসলিম মহিলা চার বছরে তিনবার বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য চতুর্থবার সে আর বিয়ে করেনি। প্রথম বিবাহের বিশ দিন পরে মিঞাসাহেব স্ত্রীকে তালাক দিল, কেন? তা উহ্য। দ্বিতীয়বার মহিলাটি বিয়ে করল। দ্বিতীয় স্বামীর প্রহার সহ্য করেও ঘর করার চেষ্টা সে করেছিল কিন্তু যখন সে জানতে পারল তাকে বোম্বেতে নিয়ে গিয়ে

বিক্রী করার চক্রান্ত হয়েছে তখন আত্মরক্ষার জন্য স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু পেটের দায় বড দায়। আবার সে বিয়ে করল। তার তৃতীয় স্বামী মদ্যপ লম্পট, জুয়ারী। তার ভরণ পোষণের পরিবর্তে পেষণ করত বেশি। সন্তান নিয়ে সে আবার তালাকের শিকার হল। এর চেয়ে দুঃখের ঘটনা আর কি হতে পারে। সবচেয়ে মজার কথা হল ধর্মনিরপেক্ষ দেশে যেখানে আইনের চোখে সবাই সমান সেখানে দেশের প্রধানমন্ত্রী মুসলীম নারীদের রক্ষা করার নামে মুসলীম লীগ ও কট্টরপন্থীদের পরামর্শে, 'তালাক' আইন পাশ করেছে মুসলীম মেয়েদের সর্বনাশ করতে, এর চেয়ে মজার ঘটনা আর আছে কি? এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভোটের ধান্দা। ভোট মানেই ক্ষমতার লড়াই। এই লড়াইতে জিততে হলে ভোট চাই। ভোটের অনুপাত বৃদ্ধি করতে দরকার সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধি। সেই সর্বনাশা ক্ষমতার খেলায় মেতেছেন রাজীব গান্ধী, পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, ইতিমধ্যেই তা আরম্ভ হয়ে গেছে।

রাজীব তার অপরিণত বুদ্ধি, দূরদৃষ্টির অভাব এবং অকালপক্ক চার পারিষদ নিয়ে অভ্যন্তরীণ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা সম্পূর্ণভাবে হতাশাব্যঞ্জক।

পানজাব চুক্তি? চুক্তির উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, চুক্তির ফলাফলই বলে দেয় চুক্তির সার্থকতা। মুখ্যমন্ত্রী বারনালা ব্যর্থ হয়েছেন পাঞ্জাবে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে। প্রতিদিন গড়ে পাঁচজন উগ্রপন্থীদের গুলীর শিকার হচ্ছে। তাদের লক্ষ্যস্থল হল হিন্দু। শোনা যায় শিখরা বীর ও সমরবিশারদ, অথচ তারা কাপুরুষের মত নরহত্যা করে খলিস্তান কায়েম করার খোয়াব দেখছে কিন্তু প্রশাসন কোন রকমেই তা প্রশমন করতে পারছে না। পাঞ্জাবের আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সঙ্গে। রাজনীতি একটি বিজ্ঞান, এর ছকে ছক মেলাতে না পারলে বিপর্যয় ঘটে চিরকাল, এখনও ঘটছে। পাঞ্জাব চুক্তি যে উদ্দেশ্যে তাকে ব্যর্থ করতে উগ্রপন্থীরা আদাজল খেয়ে নেমেছে। আজ অবধি আসল অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা গেছে এমন সংবাদ পাওয়া যায়নি। বারনালা ক্ষমতা পেয়েই সন্দেহভাজন বন্দীদের ছেড়ে দিয়ে যে উদারতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিল তার মাশুল দিচ্ছে পাঞ্জাবের হিন্দুরা।

এই সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি জন্ম দিয়েছে শিবসেনা, হিন্দু সুরক্ষা সমিতি। বিচ্ছিন্নতাবাদের বিষবৃক্ষকে রোপণ করা হয়েছে তার বিষফল রাজীবকেই ভক্ষণ করতে হবে। উগ্রপন্থীরা বিদেশী সাহায্য পুষ্ট, তাদের জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কোন চেষ্টাই হয়নি, উপরন্তু উগ্রপন্থী সমর্থক একটি বৃহদংশ থেকে গেছে প্রশাসনে।

আসাম চুক্তির ফলাফল অতি ভয়ঙ্কর। দেশ স্বাধীন হবার পর অসমীয়া রাজনীতিবিদরা হুঙ্কার দিয়েছিল, আসাম অসমীয়াদের। এই হুঙ্কার শুনে

গান্ধীজি বলেছিলেন, তা হলে ভারত কাদের? উগ্র অসমীয়া চিন্তা প্রসারের জন্যই মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মনিপুরে ইংরেজ আমলের যুক্ত আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। আবার অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা চলছে। ঠিক এইভাবেই বাঙ্গালীদের মাতৃভাষা বদল করে অসমীয়াকে বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টায় কাছাড়ে ভাষা আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। এই আন্দোলনে কয়েকটি তরুণ প্রাণদানও করে। আবার পুরাণো সেই খেলা খেলতে উদ্যত আসাম সরকার। আবার যদি কোন হাঙ্গামা ঘটে তার দায়িত্ব রাজীবকেই নিতে হবে তার ভ্রান্ত আসাম নীতির জন্য। কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বরাক উপত্যকায় স্থাপনের দাবী অগ্রাহ্য করে একটি সম্প্রদায়ের ইচ্ছা অপর সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া গণতন্ত্র সম্মত নয়। একেই হিন্দীর দাপটে অহিন্দীভাষী এলাকায় নাভিশ্বাস উঠবার উপক্রম উপরন্তু বাঙ্গালীদের ওপর এবং তাদের মাতৃভাষার ওপর এই চাপ সৃষ্টি শুভ পরিণতির চেয়ে অশুভ পরিণতিকে ডেকে আনবে।

কাশ্মীরে ফারুক সরকারকে হটিয়ে সেখানে ফারুকের ভগ্নীপতি গুলাম মহম্মদ শাহকে গদীতে বসবার চক্রান্তের মূলনায়ক ছিল রাজীব। ইন্দিরা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রাজীব গান্ধী জননী ইন্দিরা গান্ধীকে দিয়ে ফারুক সরকারকে ভেঙ্গে দিয়ে যে সরকারকে গদীতে বসিয়ে ছিলেন, সেই সরকারের অযোগ্যতা ও দুর্নীতি শেষ পর্যন্ত রাজীবকে বাধ্য করেছিল রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করতে। গুলাম মহম্মদ শাহের প্রশাসনিক অযোগ্যতায় কাশ্মীরের মত সীমান্তরাজ্যে পাকিস্তানীদের প্রভাব বৃদ্ধি পেল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হল। সংখ্যালঘু হিন্দুদের কয়েক হাজার বাড়িঘর লুঠ করে আগুন লাগিয়ে দিল। হিন্দুরা প্রাণভয়ে কাশ্মীর ছেড়ে নিরাপদ এলাকায় আশ্রয় নিতে আরম্ভ করল। হিন্দুদের অর্ধশতাধিক মন্দির ভেঙ্গে ফেলল কাশ্মীরের উগ্রসাম্প্রদায়িক মুসলমান জনতা যা বিগত পঞ্চাশ বৎসরে সারা ভারতে সম্ভব হয়নি। রাজীবের দলীয় স্বার্থে কাশ্মীরকে কব্জা করার অপচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতা ও ব্যঙ্গে পরিণত হয়েছে। অথচ সামান্য উদারতা ও দূরদৃষ্টির অভাবে এই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিপর্যয়।

কাশ্মীরে একটি শ্রেণীর মুসলমান আজও পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে, আজও তারা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দেয়, আজও তারা পাকিস্তানী গুপ্তচরদের সাহায্য করে, আজও তারা পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজে সাহায্য করে, এহেন একটি রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টির মূলে দিল্লীর বাদশাহের রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব ভিন্ন অন্য কিছু নয়। রাজনীতির শিক্ষা লণ্ডনের স্কুল কলেজে হয় না, কারণ তার সঙ্গে ভারতের জনমানসের কোন সম্পর্ক থাকে না। পৃথিবীর সকল দেশেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা সাফল্য লাভ করেছেন তাদের শিক্ষার সাফল্য স্কুল কলেজে হয়নি, সাফল্য ঘটেছে স্বদেশের জনসাধারণের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে, অনভিজ্ঞতাকে অভিজ্ঞতার সোপানে তুলতে অনেক

কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। হঠাৎ বাদশাহী তারা লাভ করেনি, তাদের ধাপে ধাপে উঠতে হয়েছে গৌরবের চুড়ায়। রাজীবের সঙ্গে ভারতীয় জীবনের পরিচয় কতটুকু? ভারতের স্বাধীনতালাভের ইতিহাসে রাজীবের অবদান শূণ্য। জননীর কৃপায় সংসদে পদ লাভ। জননীর মৃত্যুতে মোঘল বাদশাহের মত সিংহাসন আরোহণ করাটা গণতান্ত্রিক দেশে বাদশাহ হবার যোগ্যতা নয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাজীবের দলের সভ্যদের ভেড়ার পাল বিশেষণে বিভূষিত করায় ইন্দিরা কংগ্রেসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে বিধানসভায় মিষ্টভাষায় বলেছি, বামপন্থীরা বরাহনন্দন অবশ্য প্রত্যুত্তরে বামপন্থীরাও ইন্দিরা কংগ্রেসীদের রাসভনন্দন বলতে ত্রুটি করেনি। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করলে মনে হয় জ্যোতিবাবু আংশিক সত্য কথাই বলেছিলেন। বাংলা ভাষায় গড্ডালিকা শব্দটি ব্যাপক ভাবে আত্মসম্মানহীন, ব্যক্তিত্ব বিহীনদের উপর প্রয়োগ করা হয়। এর অর্থ একটি মেষ যে পথ দিয়ে যায় অন্যান্য মেষ তার পিছু ধাওয়া করে বিনা দ্বিধায়। তেমনি একজনের ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়, শুভ অথবা অশুভ নির্দেশ যখন দলের অন্য সবাই চলতে থাকে তখন তাকে গড্ডালিকা প্রবাহ বলা খুব দোষের হয় না। রাজীব মানেই কংগ্রেস, রাজীব মানেই ভারত সরকার। তার ইচ্ছাই দলের সবার ইচ্ছা। অতএব ক্ষমতা, অর্থ সম্পদ হারাবার বিরাগভাজন হবার মত দুঃসাহস কংগ্রেসী একটি ব্যক্তিরও নেই। যার ফলে ভারতের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে রাজীব প্রশাসনে।

রাজীবের ইচ্ছার খেলায় বিহারে মুখ্যমন্ত্রী বদল, মধ্যপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী বদল, মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী বদল তার ব্যর্থতাই প্রমাণ করে। অথচ কোথাও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় নেই। কতিপয় কট্টরপন্থী মুসলমানকে তোষণ করতে রাজীব এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছেন যার পরিণতিতে গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মীরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বেনারসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার অপচেষ্টা, হায়দারাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে। ঘটছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে। ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজবাদী গণপ্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষে যেটি সব চেয়ে বড় প্রয়োজন সেটি হল প্রত্যেক নাগরিকের মনে ভারতীয় চিন্তার উন্মেষ। রাজীব প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় চিন্তাকে সমর্থন ও জনমনে শক্ত বুনিয়াদে গড়ে না তুলে, মুসলমান, হিন্দু ও শিখ প্রভৃতি চিন্তাকে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করেছে।

মুসলীম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন উত্থাপন করায় প্রতিবাদে আরিফ মহম্মদ খাঁ মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। আরিফের বক্তব্য ও রাজীবের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। রাজীব বলছেন, আরিফ এই বিলকে শরীয়ত অনুযায়ী নয় মনে করে পদত্যাগ করেছে। এই বিলকে আরো কঠোর করার পক্ষপাতী। আরিফ বলছে, এই বিল মানবতা বিরোধী এবং নারীসমাজের অসম্মানকর। এদের মধ্যে কে সত্য কথা বলছে তা জনসাধারণ বিশেষ ভাবে অনুধাবন করতে পেরেছে। রাজীবের ব্যর্থতার এটাও একটা নজীর। অবশ্য রাজীবের সমর্থক

কতকগুলো কায়েমী স্বার্থের কিছু উর্দু পত্রিকা আছে তাদের সঙ্গ দিয়েছে আমাদের বাগবাজারী পত্রিকার ভাড়াটিয়া তথাকথিত সাংবাদিকরা। এদের একজন স্ববিরোধী মত ছেপে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার অপচেষ্টাও করেছে। এই পত্রিকার মালিকগোষ্ঠীর এক ধুরন্ধর ব্যক্তি মাঝে মাঝে রং বদল করে বর্তমানে খাঁটি ইন্দিরা কংগ্রেসী। ভাড়াটিয়া সাংবাদিক মালিক তোষণের জন্য বিলকে সমর্থন জানিয়ে বলেছে, গরীব মুসলমান তার তালাক স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করবে কিভাবে! এই ভাড়াটিয়া ব্যক্তির ধারণা, গরীব মুসলমানরা আমীর ওমরাহের মেয়েদের বিয়ে করে, সেজন্য তালাকের পর তাদের কোন কষ্ট হতেই পারে না। কিন্তু গরীবের গরীব বউ তালাক নামক মহাবস্তু লাভের পর কোথায় যাবে, কি ভাবে তারা জীবিকা অর্জন করবে সেকথা এই ভাড়াটিয়া ব্যক্তি বলেনি, অবশ্য বলার মত যোগ্যতাও তার নেই।

হিন্দুদের তালাকপ্রাপ্ত বউদের সম্বন্ধে বলেছে, আইন থাকা সত্ত্বেও গরীবরা আইনের সাহায্য নেয় না। তারা এই অবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। ভাড়াটিয়া ওই সাংবাদিকের যুক্তি হল, যেহেতু হিন্দু নারীরা আইনের সুযোগ নেয় না, সেজন্য আইনের প্রয়োজন নেই। কারও গৃহে চুরি হলে অথবা পথে পকেট মার হলে অনেক ক্ষেত্রেই নিগৃহীত ব্যক্তি থানায় যায় না। তারা মনে করে, এই ব্যাপারে থানায় গেলে তাদেরই হয়রাণি হবে। অতএব থানার প্রয়োজন নাই। অতএব ভারতীয় দণ্ডবিধির প্রয়োজন নেই। হাস্যকর অনেক যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেয়েছে রাজীবের বিল খুবই উচ্চস্তরের এবং তা চালু হওয়া উচিত। এ রকম ভাড়াটিয়া লোকের অভাব আমাদের দেশে কম নেই। আমরা যে ভারতীয় এই চিন্তা লোপ পেয়ে অদূর ভবিষ্যতে মুসলীম ভারত, শিখি ভারত, অমুসলমান ভারতের পত্তন হবে। এটা চিন্তা করার মত মগজ এই সব ভাড়াটিয়া লোকদের থাকলেও তা মালিকের অন্নদাসের প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই।

রামের জন্মস্থান নতুন সাম্প্রদায়িক উপসর্গ। রাম নামক কোন মহান পুরুষ ছিল কিনা তা নিঃসন্দেহে কেউ বলতে পারেনি আজও। রামায়ণের পাতায় আমরা রামকে দেখেছি। অযোধ্যার কোথায় তার জন্ম হয়েছে তাও কারও জানা নেই। তবে যে মসজিদ বা মন্দির নিয়ে হাঙ্গামা তা যে হিন্দুদের মন্দির ছিল এ বিষয় কারও কোন সন্দেহ নেই। পরধর্ম অসহিষ্ণু বাদশাহরা মোঘল রাজত্ব কাল অবধি বহু হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরি করেছে এটা সর্বজন বিদিত। মথুরার মন্দির, কাশীর মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ তৈরী হয়েছে। মোঘল রাজত্ব কাল অবধি ভারতে যতগুলো মসজিদ নির্মিত হয়েছে তার শতকরা আশী ভাগই হয়ত হিন্দুর মন্দির। আজ যদি হিন্দুরা দাবী করে ওই সব মসজিদ ভেঙ্গে আবার মন্দির করতে হবে তাহলে দাবীদারদের সুস্থ মস্তিষ্ক সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ জন্মাবে। তবে অযোধ্যায় এক্ষেত্রে আদালতের রায়কে সম্মান করাই উচিত। গণতান্ত্রিক দেশে আদালত হল সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। তার রায়কে অমর্যাদা করার কোন কারণ থাকতে পারে না।

অথচ আদালতের রায়কে মনে করা হল ধর্মব্যবস্থা আক্রমণ। এরই পরে যুক্তিহীনভাবে কাশ্মীরে ছাপান্নটা মন্দির ভেঙেছে উগ্র মুসলমানরা। এই ধর্মান্ধতা তো মধ্যযুগের ঘটনা নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দশকের। মুসলমানদের ধর্মান্ধতাকে কিভাবে পরিপুষ্ট করছে পাকিস্তান তার অপর উদাহরণ হল করাচিতে এই একই কারণে হিন্দুদের দোকানপাট লুট ও অগ্নিসংযোগ। এটা সর্বজন বিদিত যে পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হলেই ভারতে তার প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। পাঞ্জাবে শিখরা কাপুরুষের মত হিন্দুদের হত্যা করে চলেছে, তার প্রতিক্রিয়াতে যদি ভারতের অন্যান্য অংশে হিন্দুরা শিখ হত্যায় মেতে উঠে তা হলে তার ফলাফল কি হতে পারে এটা উগ্রপন্থী ধর্মান্ধ শিখরা কেন চিন্তা করেনা, এটাই আশ্চর্য। এর কারণ হল আমাদের দেশে কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থা ভারতীয় চিন্তার উন্মেষ ঘটতে শেখায়নি, তারা ধর্মান্ধদের তোষণ করে ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে বিভক্ত করে তুলছে। সাধারণ মানুষ চিন্তা করছে এরপর কি?

কেরলে মুসলীম লীগকে সহচর করে কংগ্রেসী সরকার গড়লেও সেখানে প্রশাসনিক ব্যর্থতা স্পষ্ট কাশ্মীরের গুলাম মহম্মদ শাহের সরকারের স্থলে রাষ্ট্রপতি শাসন, বিহারে উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে মহারাষ্ট্রে ঘনঘন মুখ্যমন্ত্রী বদল কংগ্রেসী ঘরোয়া কলহ আর অযোগ্যতার পরিচায়ক।

মহারাষ্ট্র এদের মধ্যে সেরা। এখানে একজন উপমুখ্যমন্ত্রী চরিত্রহীনতার দায়ে পদত্যাগে বাধ্য হয়। অপরজন বন্যার ভবিষ্যৎ তৈরি করতে প্রভাব বিস্তার করায় পদত্যাগ করে, আর আনতুলের কথা বলার অপেক্ষা করেনা। ইন্দিরার নামে যথেষ্ট টাকা সংগ্রহের দায়ে কংগ্রেস (ই) থেকেই বহিষ্কৃত।

রাজস্থানেও মুখ্যমন্ত্রীর গদী বড়ই পিচ্ছিল। ভরতপুর রাজপুত্রকে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে বিদায় করতে জল্লাদ দিয়ে তাকে হত্যা করানোর পেছনে যাদের চক্রান্ত ছিল তারা কংগ্রেসী ভিন্ন আর কেউ নয়। সেখানেও পরপর অনেক মুখ্যমন্ত্রীকে গদী ছাড়তে হয়েছে।

কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এই কারণেই কংগ্রেসে বোধহয় কোন নির্বাচন হয় না। পশ্চিম বাংলায় পরপর বহু কংগ্রেস সভাপতিকে রাজীবের ইচ্ছায় পদ ছাড়তে হয়েছে। দলে উপদল কোঁদল জনমনে কংগ্রেস সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মূলে স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী। হঠাৎ আঙুল ফুলে কলাগাছ হবার মত হঠাৎ বাদশাহী পেয়ে রাজীব ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছে না।

প্রশাসনের অপদার্থতা প্রমাণ করে শোভারাজ নামক কট্টর সমাজবিরোধীর তিহার জেল থেকে নিরাপদে বিনা বাধায় পলায়ন। খাস রাজধানীর জেল খানার যে লজ্জার জনক চিত্র জন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হয়েছে তার তুলনা নেই। জেলখানায় মাদক দ্রব্য, নারী থেকে সর্বপ্রকার অবৈধ বস্তু ও প্রাণীর অবাধ

যাতায়াত তো আছেই আর আছে ঘুষের রাজ্য। এমন ঘুষ দেবার ও ঘুষ নেবার ব্যবস্থা রয়েছে জেলখানায় যার বিকল্প কিছু নেই।

জেলখানায় খাবার বাহির থেকে এলেই তা পরীক্ষা করা হয়। এমন কি প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে পাকা কাঁঠাল ভেঙ্গে দেখা হত তার ভেতর কোন আগ্নেয়াস্ত্র আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে। অথচ উত্তর স্বাধীনতা যুগে জেলের বাহির থেকে আমদানী করা খাদ্য দ্রব্য নির্বিবাদে জেলকর্মচারীরা খেয়েছে। মানুষের নিম্নতম মনুষত্ববোধ থাকলে কোন মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব হত না। চার্লস শোভারাজের পলায়ন একটা ইতিহাস। এরজন্য দুর্নীতিযুক্ত প্রশাসন অথবা দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন কোনটার প্রশংসা প্রাপ্য। শোভরাজ সমাজবিরোধী বিশ্বত্রাস হলেও তার বুদ্ধিমত্তা। প্রশংসা তার শত্রুরাও করবে। এরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যদি সুপথে চালিত হত তা হলে বিশ্বের বহু মঙ্গলদায়ক কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হত কিন্তু দিল্লীর বাদশাহের জমজমাটি দরবারকে ফাঁকি দিয়ে নাকের ডগা দিয়ে যে পালাতে পারে তার কৃতিত্ব স্বীকার করলেও সপারিষদ বাদশাহের অযোগ্যতা অস্বীকার করা যায় না। এর সঙ্গে রয়েছে গুপ্তচর চক্র। এরা যে ভাবে জাল বিস্তার করে রেখেছে তাকে সংযত করতে হিমশিম খাচ্ছে প্রশাসকরা এরপর রয়েছে পাকিস্তানের এজেন্ট যার সংখ্যা এক কোটির কম নয়। যে কোন সময় সুযোগ পেলে এই সব এজেন্টরা ভারতের ঐক্য ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে ছিনছি করে দিতে পারে। অথচ প্রশাসন তথা স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী এই সব এজেন্টদের পরোক্ষে তোষামোদ করে চলেছে। অনেকের সন্দেহ যাদের ঘরে বিদেশী বউ আছে তারাই বেশি বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। এই পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী কোন ব্যতিক্রম নাও হতে পারে।

আমরা এসেছিল অনেকদিন পর।

সংবাদ মাধুরী গৃহত্যাগ করেছে।

বললাম, মাধুরী তোর বাড়ির কাজ করত, তার ইচ্ছে হয়েছে চলে গেছে। এতে ভাবনা চিন্তা করার কি আছে।

ঠিক বলেছ দামু। আমি অবসর নিচ্ছি। ভেবেছিলাম আমার অবসর জীবনে মাধুরী সঙ্গী হয়েই থাকবে।

অর্থাৎ মাধুরী ব্রহ্মচারিণী বেদপ্রভা হয়ে তোর ঘর আলোকিত করবে। অতি সহজেই তুই মানুষের স্বাভাবিক ধর্মগুলো ভুলে যাস। এই মেয়েটাকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েও তার মনোধর্ম ও দেহধর্মকে কি আটকে রাখতে পারিস। যাক সে সব কথা, মাধুরী গেছে কোথায়?

কোথায় গেছে তার কোন চিহ্ন রেখে যায় নি। পরাণকে বলে গেছে, আমি যাচ্ছি। বাবাকে খবরটা দিও। জানিস দামু, মাধুরী কাজটা ঠিকই করেছে। তবে ওকে নিয়ে অনেক দিন বাস করেছি। আশঙ্কা রয়েছে, ও যেন দুর্জনের হাতে না পড়ে। আজ বাস্তবত আমার কোন সঙ্গী নেই। মাধুরীই ছিল সঙ্গী। কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে গেছে। কৈশোর ও পরবর্তীকালে

পুরুষ ও নারী পরস্পরের সঙ্গী এটা বোধহয় ভুলে গিয়েছিলাম। পাঠ্য জীবনের সঙ্গীদের সঙ্গে ঘর বাঁধতে পারতাম কিন্তু সমস্যা ছিল বয়সের। সমবয়সী নারী-পুরুষের বন্ধুত্ব গড়ে উঠলেও স্বামী-স্ত্রী হবার জন্য যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ দরকার তা থাকে না। নইলে তোকেই তো বিয়ে করা ছিল স্বাভাবিক। আমার সেদিনের মানসিকতা মোটেই ভুল নয় তা বোধহয় বুঝতে পারছিস। আমাদের বন্ধুত্বের গাঢত্ব স্বামী-স্ত্রী হবার পর্যায়ে পৌছলে বিপর্যয় ঘটত।

আমি চুপ করে শুনছিলাম। বললাম, পৃথিবীর সব কিছুই পরিবর্তনশীল।

অবশ্যই হবে সামাজিক প্রয়োজনে। এক সময় দাসত্ব প্রথাকেও আরিস্টটলের মত মহাদার্শনিক সমর্থন করে গেছেন। তৎকালীন সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে হয়ত এই অন্যায় প্রথাকে সমর্থন করা হয়েছিল। তারপর হাজার হাজার বছরের শিক্ষায় মানুষ বুঝেছিল এই প্রথা অমানুষিক তাই তার অবসান ঘটাতে মানুষই এগিয়ে এসে এই প্রথা রদ করেছে। এক সময় ধর্ম ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে রাজনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনীতি মানব সমাজকে পরিচালনা করেছে। এখনও বহু দেশে এই পরিচালনা ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু ধীরে ধীরে ধর্মকে বাদ দিয়ে মানব সমাজ এগিয়ে চলতে চাইছে। আজও যারা ধর্মকে রাজনীতির চালক মনে করে তারা ধর্মান্ধর পক্ষ বাহ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় নানা ভাবে। আমাদের দেশ ব্যতিক্রম নয়। ধর্মের নামে যে কায়েমী স্বার্থ গড়ে ওঠে তাকে বজায় রাখতে কত না চেষ্টা। আমাদের দেশে মাঝে মাঝেই যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় তার পেছনেও কাজ করে কায়েমী স্বার্থ আর বিদেশীর গোপন সাহায্য যা ধর্মের নামে সমাজের স্থায়িত্ব বিপন্ন করে।

বললাম, ঠিক বলেছিস। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামাকে আমরা মনে করি সমাজ বিরোধীদের কাজ। গভীরে প্রবেশ করলে জানা যায় এই হাঙ্গামা সৃষ্টির পেছনে রয়েছে অদৃশ্য হাত। এই তো কয়েক মাস আগে হঠাৎ কলকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা স্থানীয় ভাবে দেখা দিয়েছিল। হাঙ্গামা সৃষ্টির জন্য এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীকে দায়ী করলেও এরা কায়েমী স্বার্থের জন্য এই হাঙ্গামা সৃষ্টি করেছিল। আবার দ্যাখ, বেনেপুকুরে মুসলমান যুবক সাইকেল দিয়ে ধাক্কা দিল একজন মুসলমান মহিলাকে। হাঙ্গামা হল। তার ধাক্কা পড়ল হিন্দুর মন্দিরে। মন্দিরের শিবঠাকুরকে অপবিত্র করল কারা? সমাজবিরোধিরা? তাদের সঙ্গে রয়েছে এমন কিছু লোক যারা বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত পাকিস্তানী। এই সব পাকিস্তানীরা বেনেপুকুর, রাজাবাজার, গার্ডেনরিচ এলাকায় ঘাঁটি করে ভারত বিরোধী কাজ করে চলেছে স্থানীয় অবাঙালী কিছু মুসলমানের সাহচর্যে। এরই পরিণাম হল ডেপুটি কমিশনার বিনোদ মেহতা হত্যা, কলেজ স্ট্রীট বাজারে অগ্নিসংযোগ, বেনেপুকুরে মন্দির অপবিত্র করা। প্রশাসন জানে সবই কিন্তু সত্যকে গোপন করে ভোটের দায়ে এবং নিজেদের অক্ষমতা গোপন করতে। কাশ্মীরে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তার পেছনেও পাকিস্তানী চররা কাজ করেছে। অথচ প্রশাসন চুপ করে রয়েছে। পাঞ্জাবের অশান্তির মূলেও রয়েছে পাকিস্তানী

হাত। অথচ ভারত রাষ্ট্র নিরুপায়ের মত তাকিয়ে দেখছে। কোন কঠিন ও যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অশক্ত।

অমিয়া বলল, এসব থাক। চল বেরিয়ে পড়ি অবসর নেবার আগে পাওনা ছুটিটা উশুল করতে বেরিয়ে পড়ি।

কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু পথের সঙ্গী মাধুরী নেই। একা পরাণ কি আমাদের পরাণ ঠাণ্ডা রাখতে পারবে।

শ্যামলীকে সঙ্গে নিতে পারিস।

তার বিয়ে। আর হরিশখুড়ো রাজি হবে কেন। মনে করবে দাসীবৃত্তির জন্য শ্যামলীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অমিয়া কোন জবাব দিল না।

বললাম, আমি ঠিক আদৃত অতিথি নই আমার গৃহে। নেহাৎ অর্দ্ধচন্দ্র দেয় না আমার উপার্জনের উপসত্ব পায় বলে। অনাদৃত ব্যক্তির ভালটাও অনেকে ভাল চোখে দেখে না। তবে কিছুকাল বিলম্ব করলেই মাধুরী ফিরে আসবে।

হঠাৎ এই কথা কেন তোর মনে হল?

ভুল সংশোধন করার সুযোগ সে চাইবে। মানুষ মাত্রেই জন্মগত ভাবে স্বস্থানে ফিরে আসার প্রবল আকাঙ্খা পোষণ করে। এই সুপ্ত আকাঙ্খা হল মানবজাতির ধর্ম। বংশ পরম্পরায় এই বৃত্তি মজ্জাগত হয়। ব্যক্তিগত ভাবে, পরিবারগত ভাবে, এমন কি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপকরাও পুরাতনের ভগ্ন বিপদজনক দেউলে ফিরে আসতে চায়। তা যুগোপযোগী নয় জেনেও তারা সচেষ্ট হয়।

কিন্তু মাধুরী তো ঘরপোড়া। সে কেন গেল বুঝি না। তোর কথা বুঝেছি।

বুঝিসনি। দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝতে পারবি। রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখ। ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেছিলেন, রাশিয়া সমাজতন্ত্রের পথ অতিক্রম করে সাম্যবাদ বা কমুনিজিমের পথে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু আমরা কি দেখছি? রাশিয়া তার অনুসৃত সাম্যবাদের নীতি থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। শোষণমুক্ত অভাবমুক্ত, সুখী সমাজের চিন্তা এখন সুদূর পরাহত হয়েছে। এখন রাশিয়া সচেষ্ট সমাজতন্ত্রের গতি ও পথের উন্নতি ঘটাতে। মূল লক্ষ্য অনেক দূরে। তবে এখন রাশিয়া অবাস্তবকে সামনে রেখে মোহাচ্ছন্ন থাকতে চায় না, তারা বাস্তবকেই স্বীকার করে নিচ্ছে। মানুষ মজ্জাগত ভাবে তার দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে বাধ্য হয়।

সাম্যবাদে রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকে না। এই প্রয়োজন এইভাবে মিটবে কি?

না। তবে পদক্ষেপ মাত্র। কবে প্রয়োজন থাকবে না তার হিসাব আজ অসম্ভব। তবে পৃথিবী ধীরে ধীরে সেদিকে এগোচ্ছে। সবাই ঐতিহ্যকে সম্মান করে। ঐতিহ্যের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই এগোচ্ছে। তাই বলছিলাম মাধুরীও বাস্তবকে স্বীকার করে ফিরবে। হয়ত তোর কাছে ফিরবে না কল্পনার আবেশ কাটলে বাস্তবের পথ খুঁজবে।

অমিয়া হেসে বলল, সেই কারণেই বোধহয় পশ্চিম বাংলার বামপন্থীরা

বাস্তাবাস্থুগ পথ খুঁজতে সংশোধনবাদীতে পরিণত হয়েছে।

কারণ এর নেতৃত্বে রয়েছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ধর্ম হল স্রোতে গা ভাসানো। লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছতে এবা আদর্শকে মূল্য দেয় না। তাই বার ব ব ভুল করে। আবার ভুল স্বীকার করে। নতুন ছন্দে এগোতে চায়। আবার ভুল করে আবার ভুল স্বীকার করে। নতুন ছকে চলতে চায়। এই ভাবেই চলছে ওরা। সাফল্য? সেটা বাস্তব তাই 'আঁখে দেখা হাল' হল সাফল্যের বিচার। সবাই ভাবছে, এরপর কি?

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীকে গ্রাস করতে চায়। তাদের ভয়ঙ্কর অসাফল্য ঘটেছে ইন্দোচীনে। এবার তারা লাটিন আমেরিকা নিয়ে ব্যস্ত। হণ্ডুরাস গ্রাস করার পর নিকারাগুয়াতে তাদের খেলা আরম্ভ করেছে। লিবিয়াতে তাদের আক্রমনের মহড়া চলেছে। পাকিস্তানে নৌবহরের ঘাঁটি করে ভারতকে চোখ রাঙাচ্ছে। লেবাননে অশান্তি সব সময়। সমগ্র বিশ্বই অশান্ত। অর্থের কৌলীন্য আর ক্ষমতার মোহ বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। আনবিক হাতিয়ার অনেকেরই গোপন অস্ত্রাগারে। তারপর?

সবাই ভাবছে এরপর কি?

যে কোন সময় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। বিশ্বের বৃহৎ শক্তি তবুও ময়দানে নামেনি লড়াই করতে। নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে নানাভাবে দুর্বল রাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে চলেছে। পরবর্তী ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা একবারও ভেবে দেখছে না কেউ।

শুধু বৃহৎ রাষ্ট্রের কথা বললেই দোষ হয় না। ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোও বৃহৎ রাষ্ট্রের গোপন সাহায্যে অপর রাষ্ট্রের উপর হামলা চালিয়ে চলেছে। ইরাক-ইরাণ লড়াইতে নেমেছে, পাকিস্তান আফগানিস্থান সীমান্তকে অশান্ত করেছে। ভারত সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে নতুন করে যুদ্ধের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করতে চাইছে। এতেই শেষ নয়। বিদেশী গুপ্তচরেরা অন্যের দেশে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করে চলেছে অতিশয় নিপুণতার সঙ্গে। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মূলে রয়েছে এইসব বিদেশী চর। এখন যা সামান্য মনে হচ্ছে তাই ভবিষ্যতের গুরুতর হতে পারে। এই সামান্যকেই মূলধন করে ভয়ানক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ডেকে এনেছিল ছয়চল্লিশ সালে, যার পরিণতি ভারত বিভাগ। আবার ভারত বিভাগ করার চেষ্টায় ভারতীয় এক শ্রেণীর মুসলমানকে উস্কানি দিচ্ছে বিদেশী শক্তির অনুচররা। সিংহলে তামিল নিধন চলছে। সিংহলকে তামিল নিধনে সহায়তা করছে আমেরিকা ও পাকিস্তান। তামিলরা ছুটে আসছে ভারতে। উদ্দেশ্য ভারতে অশান্তি সৃষ্টি করা। দক্ষিণ আফ্রিকা নামিবিয়াতে তাদের অত্যাচার অব্যাহত রেখে বর্ণ বিদ্বেষের উৎকট দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। দুটি সমাজতন্ত্রী দেশ রাশিয়া ও চীন তাদের খেলা দেখাচ্ছে কম্পুচিয়াতে। সুইডেনের মত অতি

শান্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীকে প্রাণ দিতে হয়েছে ঘাতকের অস্ত্রে। উত্তর আয়র-ল্যাণ্ডে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অশান্তি। মার্কিন সাহায্যপুষ্ট ইস্রায়েল হয়েছে পশ্চিম এশিয়ার স্থায়ী ক্ষত। গ্রানাডার মত ক্ষুদ্র স্বাধীন দ্বীপও মার্কিন লালসার বলী হয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতারা রক্তপিপাসায় মেতেছে। এই মারণ যজ্ঞে প্রাণ দিচ্ছে দেশের নিরীহ নাগরিকরা। প্রাণ যাচ্ছে, সম্পদ যাচ্ছে, নারীর মর্যাদা যাচ্ছে, তবুও এই সব রাষ্ট্রপ্রধানদের হুঁস ফিরে আসছে না। এরা উল্লাসে আত্মহারা। এরা চায় ক্ষমতা, সম্পদ, তাদের লালসা দেশের মানুষকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দিকে ঠেলে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করা।

সংবাদপত্রের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হরিশখুড়ো হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, দেখলি তো দামু, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকই রসাতলে যেতে বসেছে। তোরা বলিস যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেয়না। এবার দেখ কত জায়গায় ছোটখাট হাঙ্গামা হয়ে গল।

হরিশখুড়ো কথা শেষ করার আগেই হাপাতে থাকে।

বললাম, ও সব পরিচালনা করছে বহিবঙ্গের মানুষ। তবে উভয় পক্ষই সমান তৎপর। শোষণের ক্ষেত্রে এরা প্রতিযোগী। যখনই এক পক্ষের স্বার্থহানি ঘটার উপক্রম হচ্ছে তখনই অপর পক্ষের বিরুদ্ধে ভাড়াটিয়া সমাজবিরোধীদের লেলিয়ে দিচ্ছে। কোন পক্ষই নিজেদের ভারতীয় বলে মনে করে না।

হারশখুড়ো বলল, এটা আজকের ঘটনা নয়। ইতিহাস পড়েছিস তো? মহব্বত খাঁ বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে বন্দী করেছিল তাতো জানিস। মহব্বত খাঁর সৈন্য দলে ছিল রাজপুত সৈন্য বেশী। বাদশাহের অতি প্রিয় বেগম নুরজাহান সুযোগ বুঝে হিন্দু আর মুসলমান সৈন্যদের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে লড়াইতে নামিয়েছিল কৌশলে এই লড়াইয়ের সুযোগে নূরজাহান বাদশাহকে নিয়ে পালিয়ে গেল। তখন থেকেই হিন্দু মুসলমানের লড়াই চলছে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। ইংরেজ রাজত্ব বরং শায়েস্তা করেছিল কিছুটা। আজ থেকে একশ বছর আগেও লাহোরে দোলের উৎসবে হিন্দু মুসলমানের প্রচণ্ড দাঙ্গা হয়ে গেছে। এর জন্য ইংরেজ সৈন্য নামাতে হয়েছিল দাঙ্গা দমন করতে। সহনশীলতার অভাব ঘটল কেন? এর উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা আজও কেউ করেনি।

বললাম, করে লাভ নেই খুড়ো। পৃথিবীর সকল দেশই পুরুষের প্রাধান্য স্বীকার করেছে। পুরুষরাই সমাজ পরিচালনার জন্য ধর্মের নামে, ন্যায়নীতির নামে নিয়ম প্রণয়ন করেছে, তাদের আইনের জালে ধার্মিকের চেয়ে ধর্মান্ধ বেশি তৈরি হয়েছে। এই ধর্মান্ধদের সর্বাধিক অংশই অশিক্ষিত অথবা অর্ধশিক্ষিত। শিক্ষিত বলে যারা দাবী করে তাদের একাংশ স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে ধর্মান্ধদের। তাই অশান্তি দাঙ্গা হাঙ্গামা মিটেও মেটে না। সুবুদ্ধির উদয় হয়না, মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসারে হত্যা করে। এরপর কি, সটাই চিন্তনীয়। হারশখুড়ো কথা না বাড়িয়ে উঠবার উপক্রম করতেই বললাম, পৃথিবীর সব দেশেই ধর্মের বিভিন্ন নির্দেশ কার্যকরী করতে নারীদের দ্বিতীয়

শ্রেণীর নাগরিক মনে করা হয়। পুরুষরা যে সব অধিকার ভোগ করে নারীদের সেসব অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে শতাব্দী ধরে। এর পরিণতি হল নারীকে পণ্য রূপে ব্যবহার করছে দুষ্টজনরা, তার দৃষ্টান্ত দেখা যায় সর্বত্র, চোখের সামনে রয়েছে বাংলাদেশ থেকে পাচার করা, উনিশজন মুসলীম মহিলা। এদের অধিকাংশই তালাকী বিবি। এদের রক্ষা করার দায়িত্ব পরিবার সমাজ রাষ্ট্র কেউ-ই গ্রহণ করেনি। এরা পেটের দায়ে পালিয়ে চলেছে বিদেশে। ভাগ্য তাদের অনিশ্চিত, তাদের বিক্রী করার চক্রও ধরা পড়েছে। এতো একটা ঘটনা, এরকম হাজার হাজার ঘটনা ঘটছে যা আমাদের অজ্ঞাত। আমরা মেয়েদের মায়ের জাত বলি আর তাদেরই বিক্রী করি দেহপণ্য সাজাতে। এসব অনাচার ঘটে থাকে ধর্মের নামে।

হরিশখুড়ো বলল, সবই সত্যি কিন্তু যখন পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র এদের দায়িত্ব নেয় না তখন এরা জীবন ধারণের জন্য কুৎসিত জীবিকা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়।

বললাম, এ সব হালকা কথা সবাই জানে ও বলে। এদের রক্ষা করার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু আজ পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র-ই পরিচালিত হচ্ছে সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে। অস্ত্র যাদের রাষ্ট্র পরিচালনা করে তারা অস্ত্রহীন নাগরিকদের দিকে তাকাবার অবসর পায় না। অথচ রাষ্ট্র নায়করা গালভরা অনেক কথাই বলে থাকে। যখন তাদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন হয়, বিক্ষুব্ধ নাগরিকদের কোন ক্রমেই সংযত করার যোগ্যতা থাকে না তখন তারা ধর্মের নামে দাঙ্গা বাধায়, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘাত সৃষ্টি করে, দল উপদলে কোঁদল সৃষ্টি করে, যখন এই সব সেকেলে অস্ত্রও ভোঁতা হয় তখন যুদ্ধের জিগীর দেয়। পুরুষ প্রধান সমাজে পুরুষদেরই রক্ষা করতে পারে না, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মেয়েদের রক্ষা করা অসম্ভব চিন্তা।

হরিশখুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আমাদের প্রধানমন্ত্রী মুসলীম মেয়েদের রক্ষার জন্য ওয়াকফের হাতে তালাকা মেয়েদের দায়িত্ব তুলে দিতে চেয়েছেন। অর্থাৎ সমাজের হাতে দায়িত্ব দেবার আইন করতে চায়।

বললাম, আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বাস্তবজ্ঞান বর্জিত বললে অন্যায় করা হবে, তবে ওয়াকফকে বাঁচাতে প্রয়োজন হবে কয়েক শ কোটি টাকা। ওয়াকফ বাঁচালে তবেই তো মেয়েরা বাঁচবে। এবং কিভাবে ওয়াকফ মেয়েদের বাঁচাবে তার কোন নির্দেশ নেই এই আইনে। এটা বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন কোন দায়িত্বপূর্ণ লোকের কাজ বলে মনে করা ভুল। আমরা শুধু হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে চিন্তা করি কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা সমাজের সর্বত্র। নারী ও পুরুষ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বিস্তার চায়। উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ তাদের প্রাধান্য রক্ষা করতে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধিকে জোরালো করে এবং তা করে রাষ্ট্রের অনুমোদনে। এই রকম নানা ভাবে আমাদের সমাজব্যবস্থা সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট।

হরিশখুড়োর কাশির বেগ বৃদ্ধি পাওয়াতে কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ চলি রে দামু। পরে কথা হবে। তবে শ্যামলীকে একটু বুঝিয়ে বলিস। কেমন?

হরিশখুড়ো বিদায় হল। নিশ্চিন্তে খবরের কাগজ পড়ার আগেই বউদির হুঙ্কার শুনলাম। বুঝলাম, গর্জন দাদার ওপর, এরপর বর্ষণ আরম্ভ হলে দাদা বেচারা ল্যাজে গোবরে হবে। বউদির হুঙ্কারে আমার সংবাদ পড়ার ইতি ঘটল। কাগজ একপাশে সরিয়ে রাখলাম।

গভীরভাবে চিন্তা করছিলাম নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে। অতীত ঝাপসা, বর্তমান অস্থির আর ভবিষ্যত বলছে, এর পর কি? অতঃ কিম্!

টেলিভিশনের পর্দায় মাঝে মাঝেই দেখি, 'উলোক কাঁহা গয়া' আর ভাবি ওই সব মহান ব্যক্তি। আজ সমাজ থেকে লোপাট হয়ে গেছে কি করে! বিপ্লবী ভগৎ সিংহের লেখা শেষ চিঠিখানায় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। ফাঁসির কদিন আগে ভগৎ সিং তার সাথীদের লিখেছিলেন, "সুন্দর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ইচ্ছা আমার ছিল। একথা গোপন করতে আমি চাই না। কিন্তু আমার বেঁচে থাকার একটি শর্ত আছে। কারাবদ্ধ শৃঙ্খলিত জীবন আমি বহন করতে চাই না।

"আজ আমার নাম বিপ্লবীদের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। বিপ্লবী দলের আদর্শ এবং আত্মদান আমাকে এক মহৎ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ যেখানে আমার স্থান, বেঁচে থেকে হয়ত সেই উচ্চতায় আমি কোন দিনই পৌঁছতে পারতাম না

"সানন্দে হাসিমুখে এমন ভাবে ফাঁসির রজ্জুকে বরণ করতে চাই, যা দেখে ভারতের ঘরে ঘরে মায়েরা প্রার্থনা করবে তাঁদের সন্তান যেন ভগৎ সিং এর মত হয়ে ওঠে। আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মদান করতে এত মানুষ এগিয়ে আসবে যে, সাম্রাজ্যবাদ সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও বিপ্লবের অগ্রগতিকে রুখতে ব্যর্থ হবে। (২২শে মার্চ ১৯৩১ সালে লেখা, তার ফাঁসির পূর্বদিনে।)"

'উলোক' কোথায় গেল। ভগত সিং-এর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করার মত একটি লোকও কি আজকের ভারতে নেই? সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ দেশ ছাড়লেও স্বদেশীয় সাম্রাজ্যবাদীদের উচিত শিক্ষা দেবার মত মহৎ প্রাণ আজ আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? এর পর কি? বামপন্থীদের বিপ্লব চিন্তা ঢাকা পড়েছে খুঁজিবাদের পদ সঞ্চারিত ধুলিতে। এটাই দুর্ভাগ্য। আর সবাই ব্যস্ত আঞ্চলিক ও ধর্মীয় চিন্তায়। ভারতীয় চিন্তার ক্ষেত্র ক্রমশই মিইয়ে যাচ্ছে কেন? এসবের উত্তর কি পাওয়া যাবে কোনদিন? ভারত অনুন্নত দেশ। অনুন্নত-দেশের যে সব ব্যাধি তা উৎকটভাবে প্রকট। আত্মচিন্তায় মগ্ন সাধারণ মানুষ তাদের কাছে জাতীয়তাবোধ পেটের চিন্তার কাছে কোন বিষয়ই নয়। কোটি কোটি বেকার যুবক কর্মসংস্থানে বিফল হয়ে দেশজাতিধর্ম সবকিছু ভুলে বাঁচার

জন্য সদাসদ্ নানা উপায় গ্রহণ করে শান্তিপ্রিয় মানুষদের যেমন বিব্রত করছে, তেমনি নিজেরাও জাহান্নমের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ হারাচ্ছে মানুষত্ববোধ, অমর্যাদা গ্রাস করছে ভারতীয় সমাজকে। দলীয় রাজনীতি দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে বাম ও অবামের কোন পক্ষই পিছু হটছে না। বরং প্রতিযোগিতা চলছে কে স্বীকৃতি পাবে অনাচারের তালিকায়। খুনজখম, রাহাজানি, দস্যুতা, নারী ধর্ষণ নিত্যকার সংবাদ। সবাই শঙ্কিত। সবাই ভাবছে এরপর কি!

নবদ্বীপ থেকে ফিরে এসে অমিয়া বলল, মহাপ্রভুর জন্মোৎসবে গিয়েছিলাম। মনে হল জীবন সার্থক। অনাহুতভাবে পাঁচ লাখের ওপর জনসমাগম সত্যিই একটা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং চিরস্মরণীয়।

আমি চুপ করেই ছিলাম। কোন মতামত না দেওয়াতে অমিয়া নিরুৎসাহ হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। যাবও কিছু তার বলার থাকলেও আমার অনাগ্রহে সেও চুপ করে রইল। এই নীরবতা ভঙ্গ করে আমি বললাম, মাধুরীর কোন সংবাদ পেয়েছিস?

না। মনে করেছিলাম নবদ্বীপে ওকে দেখতে পাব। এতই ভীড় ওকে খুঁজে পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। অবশ্য সে যে নবদ্বীপ গেছে এমন কোন নির্দিষ্ট খবরও ছিল না। ছোটবেলায় দেখতাম আমাদের ওখানকার বোষ্টম বোষ্টুমিরা নদে যেত তীর্থ করতে। এখনও যায়। তাই আশা করেছিলাম মাধুরী সেখানে যেতেও পারে।

তা হলেও তো তার হিল্লে হয়েছে।

তা বটে কিন্তু মাধুরীর টাকা পয়সা গয়না সব কিছু আমার কাছেই রয়ে গেছে। সেটার ব্যবস্থা করাও তো দরকার। যার জিনিস তাকে ফেরৎ দেওয়া আমার কর্তব্য।

সময় মত সে ঠিক আসবে তার সব কিছু ফেরত নিতে। তারপর কি দেখলি চৈতন্যদেবের পঞ্চশত জন্মবার্ষিকীতে? যাবার আগে আমাকে বললে আমিও যেতাম।

আমার সব কিছুই হঠাৎ করতে হয়। সময় পাইনি। তবে যা দেখলাম তা ভুলবার নয়। দলে দলে মানুষ এসেছে, হরিনাম করেছে, প্রসাদ পেয়েছে হিংসাদ্বেষ যেন নিমেষে লোপ পেয়েছে। সবাই যেন ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ। বাম অবাম সবাই সামিল হয়েছে এই উৎসবে।

পাঁচশত বছর পর আবার মূল্যায়ণ হচ্ছে শ্রীচৈতন্যের শিক্ষার? কি বলিস?

তাই মনে হয়।

চীনেও নতুন করে ভাবনা শুরু হয়েছে কনফুসিয়াসকে নিয়ে। এক সময় চীনে কনফুসিয়াস অপাংক্তেয় হয়েছিল, বর্তমানে তার প্রচারিত মানবধর্মবোধ চীনের মানুষকে নাড়া দিয়েছে। শ্রীচৈতন্যের মহিমা ম্লান হয়ে এসেছিল, এমন

সময় তার প্রেমধর্মকে নতুন করে মূল্যায়ন করছে দশের মানুষ। তার প্রগাঢ় মানবপ্রেম, সাম্যচিন্তা, শ্রেণী বিভেদহীন শিক্ষা আজ গোটা ভারতকে নতুন আদর্শের পথ খুলে দিয়েছে। শুধু তাই যদি না হত তা হলে অতুল বৈভব ত্যাগ করে পশ্চিমী দেশের মানুষ আজ চৈতন্যের প্রেমধর্মকে স্বীকার করে আজ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে চৈতন্যবোধকে প্রাধান্য দিত না।

হিন্দুধর্মের প্রসার ঘটছে, এই তো?

না তা হচ্ছে না। সাম্প্রদায়িক চিন্তা দিয়ে বিচার করিস না। হাজার হাজার বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র, ও পুঁজিবাদ মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, এই শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থার অবসান ঘটার পথে নতুন ভাবে মানুষ পদক্ষেপ করতে চাইছে, যদিও ধর্মের আবরণে তবুও মনে হয় তার চেয়ে বেশি মানব সমাজকে শ্রেণীহীন গড়ে তোলার মন্ত্রে। হয়ত আজও তার রূপ দেখা যাবে না, এইরূপ দেখার জন্য আরও কয়েক শত বৎসর অপেক্ষা করতে হবে? চৈতন্য চিন্তা এটাই বোধহয় বড় তাৎপর্য। তুই তো দেখেছিস বাইরের সাজ, অন্তরের পরিচয় কি পেয়েছিস?

অন্তরের পরিচয় পেতে তো যাইনি। মানুষ ধর্মের নামে কতটা উন্মাদ হয় তারই ছবি দেখে এসেছি। এই ভাবেই মানুষের চৈতন্যবোধ হয়ত কোন সময় সামগ্রিক ভাবে গড়ে উঠবে। এটাও আমার মনে হয়েছে।

পৃথিবীর সব দেশই সমাজ সংস্কারকদের শ্রদ্ধা জানিয়েছে সেই সব দেশের মানুষ তবে ঠিক ঠিক মূল্যায়ণ বোধহয় হয়নি, তাই হঠাৎ একটা কিছু উপলক্ষ্যে মানুষ মেতে উঠে, আবার ঝিমিয়ে পড়ে। আমরা তো ব্যতিক্রম নই। তাই উৎফুল্ল হবার কিছু নেই শুধু একজনকে দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে। আজ সমগ্র বিশ্ব আণবিক অস্ত্রের ভয়ে ভীত। আজ মানুষ জানতেও পারছে না কোথায় সে ছুটে যাচ্ছে, এই ছোটার পরিণতিই বা কি। এই অস্থির মানসিকতাকে অনেকেই শান্ত করতে চাইছে ধর্মের আশ্রয় নিয়ে, তাই ত্যাগ তিতিক্ষা দিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়তে চায় ধর্মের বন্ধনে। এটা অবশ্যই ঠিক পথ নয়, শুধু সাময়িক বিরতির পথ।

আমাদের আলোচনায় ভাটা পড়ল।

অমিয়া গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করছিল। আমিও পেছনে তাকিয়ে দেখছিলাম অতীত সংস্কৃতি আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যেতে পারছে কিনা। কেমন একটা স্ববিরোধী ঘটনার মুখোমুখী হতে হচ্ছে বারবার। আমরা যা বলি তা করি না। যা করি তা বলি না। আমরা যা শেখাতে চাই তা নিজেরা শিখতে চাই না। এই ভাবে প্রবঞ্চনা করেছি, প্রবঞ্চিত হয়েছি তবুও আমরা সৎ ও মানবধর্মীর ভেক নিয়ে বিশ্বের দরবারে হাজির হই।

আমার চিন্তায় বাধা দিয়ে অমিয়া জিজ্ঞাসা করল। কি ভাবছিস দামু?

ভাবছি, আমরা কোথায় আছি। আমাদের লক্ষ্য বস্তু কি? এবং তারপর। চিন্তার রেখা ফুটে উঠল অমিয়ার কপালে। অতি মৃদু স্বরে বলল, মনে কর।

আমরা একটা প্রতিষ্ঠানের কর্মী। আমাদের প্রতিষ্ঠানের মালিক অত্যন্ত চতুর ও শোষক। আমরা তার আজ্ঞাবহ। অর্থাৎ মালিকের চরিত্র কিছুটা প্রভাব বিস্তার করবে আমাদের চরিত্রেও। রাজনীতির পাণ্ডারা বর্তমানে দেশের মালিক, তাদের প্রভাব নিশ্চয়ই জনসাধারণের ওপর কিছু ছায়া পাত করবে। আমাদের মালিক হল অসত্যের পূজারী ভণ্ড, শোষক, মানবতা বিরোধী, আমরাও এই পাপের কিছুটা অংশ নিশ্চয়ই রপ্ত করতে বাধ্য।

কি বলতে চাস? সোজাসুজি বল।

অমিয়া বলল, আমরা সম্প্রসারণ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। এটাই সগবে আমরা প্রচার করে থাকি কিন্তু সিকিমকে নানা ছলছুতায় দখল করে ভারত রাষ্ট্রভুক্ত করাটা কি আমাদের সেই গর্বিত নীতিকে মিথ্যা প্রমাণিত করেনি। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নিন্দা করছি, আবার নিজের দেশে রেখেছে জাতপাত বর্ণবৈষম্য। এক এক ধর্মাবলম্বীদের জন্য আলাদা আইন করে বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিদ্বেষ জিইয়ে রাখছি। খলিস্থানের দাবীদার কিছু উগ্রপন্থী যখন বেপোরোয়া নরহত্যায় মেতে উঠেছে তখন আমরা ভারতের অখণ্ডতার চিন্তা করি। অথচ এই সমস্যা মেটাবার সহজ পথ পরিহার করি। আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে পাকিস্তান হস্তক্ষেপ করছে বলে চিৎকার করি কিন্তু পাকিস্তানকে দুর্বল ও খণ্ড বিখণ্ড করার কাজে বাংলাদেশকে যথেষ্ট সাহায্যও আমরা করেছি। শ্রীলঙ্কার প্রশ্নে আমরা বড়ই ভাবছি কিন্তু তামিলনাড়ুতে সিংহল থেকে পলাযি• •ামিলদের নানাভাবে সাহাযাও করছি। আমরা আনবিক বোমার বিরুদ্ধে মত প্রচার করছি অথচ পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তি করেছি কোন পক্ষই অপরপক্ষের আনবিক গবেষণা কেন্দ্রে হামলা করবে না। পরোক্ষে পাকিস্তানের আনবিক বোমা তৈরিকে সমর্থন করেছি এই ভাবে। তাই ভাবছি আমাদের মালিকরা স্ববিরোধী এই কাজ করে চলেছে, অথচ আমরা গঙ্গা জল ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে থাকি কি করে। আমরা মার্কস লেনিনের শিক্ষাকে সব চেয়ে বড় শিক্ষা মনে করেও চৈতন্য লীলায় দুবাহু তুলে নৃত্য করি। আমরাও স্ববিরোধী হয়েছি রে দামু। এই স্ববিরোধী মানসিকতাই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল নবদ্বীপে।

তুই তো আমেরিকার কথা বললি না? আমরা আমেরিকাকে যত অশান্তির মূল বলেই জানি। আমাদের দেশের প্রভুরাও আমেরিকাকে খুব পছন্দ করে না তবুও চীন যখন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিল তখন আমরা আমেরিকাকে সাদরে ডেকে এনে দিল্লীর কোটা হাউসে বসিয়ে ছিলাম। আমেরিকার সাহায্যে চীনের মোকাবিলা করার এর চেয়ে ভাল উপায় পণ্ডিত জহরলালের জানা ছিল না। ভারতে কমুনিষ্ট আন্দোলন দমন করতে প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী কম পক্ষেও দুবার আমেরিকার অর্থ সাহায্য নিয়েছিল। চীনের গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে আমেরিকার সাহায্যে নন্দাদেবীর মাথায় আনবিক যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে।

অমিয়া হেসে বলল, এত করেও আমরা ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্রী, গণতন্ত্রী, বিশ্বের দরবারে আমরা মর্যাদা সম্পন্ন রাষ্ট্র, এর চেয়ে হাস্যকর কিছু আছে কি? এর সঙ্গে বামপন্থীদের আচরণও যুক্তিযুক্ত মনে করার কারণ নেই। আমরা যৌথ উদ্যোগ মেনে নিয়ে দেশী পুঁজিপতিদের শোষণের দরজা খুলে দিয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী শিক্ষানীতিকে মেনে নিয়েছি? পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক বেকারকে পথে ছেড়ে দিয়ে শান্তি শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে সাহায্য করছি, দলের লোকদের পাইয়ে দেবার নীতিতে বিশ্বাস করি। তবে বাম দলের কৃতিত্ব যে কিছু না আছে তা নয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখতে কঠিন হাতে সমাজবিরোধীদের শায়েস্তা করতে মোটেই ত্রুটি করেনি। অবশ্য এই কৃতিত্বের সিংহভাগের অংশীদার বাঙ্গালী চরিত্র। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের মনে সাম্প্রদায়িক চিন্তা খুঁটি গাড়তে পারেনি বহু যুগ যাবত। সব সময়ই দেখা গেছে মৌলপন্থী বহির্বঙ্গের হিন্দু-মুসলমানরাই এই সব অশান্তির স্রষ্টা এবং পোষক। এখনও বামপন্থীরা প্রকাশ্যে বলেনি, মদ্যপান না করা অনৈতিক, তারা সংযত হবার চেষ্টা করে। বিশেষ করে কোন কোন বামপন্থী দলের শৃঙ্খলাবোধ যে কোন দলের চেয়ে অনেক বেশি। এই সব দলের অনুগামীরা একটা লৌহ চরিত্রের অধিকারী। এটাই বামপন্থীদের মর্যাদা ম্লান হতে দেয়নি।

বললাম, সবই ঠিক তবুও এরা যেই প্রগতির কথা বলুক। কিছুতেই পিছু হাঁটা বন্ধ করতে পারেনি। বিশেষ করে মার্কসবাদী কমুনিষ্টদের ভূমিকা খুবই প্রশংসনীয় নয়। কেরলে মুসলীম লীগের সঙ্গে অবিভক্ত কমুনিষ্টপার্টি যেমন গাঁটছড়া বেঁধেছিল ঠিক তেমনি গাঁটছড়া বেঁধেছে মার্কসবাদী কমুনিষ্টরা বার বার। মার্কসবাদীদের যুক্তি হল, কংগ্রেস বিরোধীগোষ্ঠী গঠন করে কেরল থেকে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করা। পঁয়ষট্টি সাল থেকে পঁচাশি সাল অবধি মুসলীম লীগের সঙ্গে আঁতাত করে সাতটি সালে মার্কসবাদীরা সরকার গঠন করেছিল। মুসলীম লীগ হল ভারতের সব চেয়ে আপত্তিজনক সাম্প্রদায়িক দল। তাদের সঙ্গে আঁতাত করা কোন মার্কসীয় নীতিতে সম্ভব তা ব্যাখ্যা করতে পারেনি কেউ-ই। মুসলীম লীগের নীতি হল বাজারী দোকানদারের মত রাজনীতি, এরা পণ্য সাজিয়ে রেখেছে যারা যথাযথ মূল্য দেবে তাদেরই সঙ্গে সহযোগিতা করবে। (The league's position was as always in Kerala dictated by practical politics, the unlhibitedly bazaar approach to politics of the league's leadership in Kerala—business with anybody if the price was right,—T. J. Nossiter.) কিন্তু এই ভাব ভালবাসা চিড় খেল। সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখার পবিত্র নীতিতে আস্থা রেখে মার্কসবাদীরা লীগকে তালাক দেবার পরও হঠাৎ দেখা গেল তামিলনাড়ুতে মার্কসবাদীরা মুসলীম লীগের সঙ্গে আঁতাত করে নির্বাচনে নেমেছে। অবশ্য এদের প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করল শাহাবানু। মার্কসবাদীরা সুপ্রীম কোর্টের বিচার ফলকে সমর্থন করল, মৌলবাদী কট্টর মুসলীম লীগ একে পরিত্যাগ করল

মার্কসবাদী দলকে। তারা গাঁট ছড়া বাঁধল কেবল কংগ্রেসের সঙ্গে। যৌথ উদ্যোগকে সমর্থন করে যতটা নীতিহীনতার পরিচয় দিয়েছে তার চেয়ে বেশি নীতিহীনতার পরিচায়ক হল দলের কর্মী ও অনুরাগীদের বীরপূজা'র দিকে নজর দেওয়া। এদের মুখ্য নেতৃত্ব যাদের হাতে তারাও চায় তাদের বীরত্ব পূজিত হোক অনুগামীদের দ্বারা।

অমিয়া বলল, এতকাল দেখেছি অংশীদারীর হক পাওনা মেটাতে কংগ্রেসীরা রাস্তা ঘাটে লড়াই করে মরছে, এখন দেখছি বাম এবং অবাম কেউ কম নয়। ক্ষমতা হারাবার উপক্রম হলেই দলের কায়েমী স্বার্থের পোষকরা একইভাবে অনুগামীদের সঙ্গে কলহে মেতে উঠে। কেরলের এম-ভি-রাঘবন, পশ্চিমবঙ্গের মণ্টু সান্যাল ইত্যাদি কেন মার্কসবাদী নেতৃত্বের বিরোধিতা করতে মাঠে ময়দানে নেমে পড়েছে তা অনুধাবন করলে সহজভাবেই জানা যায় ক্ষমতার লড়াই চলছিল এই পার্টিতেও তা-ই ধীরে ধীরে বাইরে প্রকাশ পেয়ে চলেছে। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা বৃথা। সবাই বলে আমরা রাজনৈতিক দল, কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এরা সবাই রাজ্য পেয়ে ভাগ্য ফেরাবার দল। এরা সবাই চায় দেশের ও দশের মঙ্গল কিন্তু কার্যকালে দেখা যাচ্ছে এরা সবাই নিজের ও দলের মঙ্গল ছাড়া আর কিছুই চায় না। জনসাধারণ গালে হাত দিয়ে ভাবছে, এরপর কি! ভাগ্য তাদের কোথায় নিয়ে যাবে?

বললাম, অশোক মিত্র হঠাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করে রাজপাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল কেন? অশোক মিত্র বলে থাকে, আমি কমুনিষ্ট! কবে মিত্তিরমশাই কমুনিষ্ট হয়েছিল তা কারও জানা নেই। ইন্দিরার দরবারে শোভা পেতে পেতে হঠাৎ কমুনিষ্ট হয়ে পড়ে কেমন যেন গোষ্ঠীছাড়া পথ ধরেছিল। বোধহয় এটাই তার পরিণতি। কমুনিষ্ট হতে যে চরিত্র দরকার তা বিকাশ ঘটানো যে সহজ নয় তা যেমন অশোকবাবু বোঝেন, তেমনি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের লোকজন কমুনিষ্টরাও বোঝে। মার্কসের নাম নিয়ে সাইনবোর্ড টাঙালেই মার্কসবাদী হওয়া যায় না এটা বুঝতে এরা চায় না, এই যা দুঃখ।

শ্যামলী বলল, জানো কাকা কি একটা রোগ হয় যাকে ইংরেজিতে বলে ফোবিয়া। এই ফোবিয়া প্রথম দেখা দিয়েছে রাজীবের। তারপর সংক্রামক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোর বক্তব্যটা কি?

আমাদের মার্কসবাদী মুখ্যমন্ত্রীকে ফোবিয়া পেয়েছে। এই ফোবিয়া হল নকশাল ফোবিয়া। বামপন্থী বিরোধী হলেই ওরা যে বিশেষণ ব্যবহার করে তা হল নকশাল। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে অন্য সবাই নকশাল, এমন কি সোস্যালিষ্ট ইউনিট সেন্টারকেও বামপন্থী দল বলে থাকে, এস-ইউ সি আর নকশাল এক হায়। এই ফোবিয়া ওদের কতটা অপ্রিয় করে তুলছে তা ওরা ভেবেও দেখে না। একসময় কংগ্রেস যা করেছে এরাও তাই করছে। মহাজনের

পদ অনুসরণ করে এরা কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেনি, বরং লোকচক্ষে হেয় হচ্ছে দিনের পর দিন।

ওটা তোর অনুমান।

না অনুমান নয়। আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল যে সব পাশব প্রকৃতির পুলিশ কর্মচারীদের সিদ্ধার্থশঙ্কর নরহত্যায় প্ররোচিত করেছিল তাদেরই অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে বামপন্থীরা। অথচ তদন্ত কমিশনে এদের বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করেছিল বামপন্থীরা। এত তাড়াতাড়ি মানুষ সব কিছু ভুলে যেতে পারে কি? সিদ্ধার্থশঙ্কর ও তার দুই সাগরেদ বিজয় গুপ্ত আর দেবী রায় নকশাল দমনের মিথ্যা আস্ফালন আজও করে থাকে, যদি তা দমন করা হয়েই থাকে তা হলে নকশাল ফোবিয়া বামপন্থী দর রাতের ঘুম কি করে কেড়ে নিতে পারে!

পাগলের মত কথা বলছিস শ্যামলী।

বোধহয় পাগল হইনি, যেভাবে প্রশাসন চলছে তাতে আমি কেন আমার মত হাজার হাজার মানুষ পাগল হয়ে যাবে শীগগীরই। এক সময় জ্যোতি বসু বিরোধী নেতারূপে জিগীর দিতেন, পুলিশ রিপোর্টকে কংগ্রেস সরকার বেদবাক্য মনে করে, তাই প্রতিবাদ মুখর হয়েছে তার দল। এখন পুলিশ রিপোর্টকে বেদবাক্যের চেয়েও ভগবানের বাক্য মনে করছে সেই জ্যোতি বসু ও তার দল।

নকশাল ফোবিয়ায় আক্রান্ত রাজীবের নির্দেশে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস আমলে যে সব পুলিশ কর্মচারী নরহত্যায় মেতে উঠেছিল তাদেরই আবার ডেকে পাঠিয়েছে। এই সব ভাড়াটিয়া পুলিশ কর্মচারীদের না আছে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, না আছে সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, এরা শুধু অনুগত প্রভুর প্রতি। যখন যারা এদের প্রভু তখন তাদের তোষণ করে সর্বপ্রকার বেআইনী কাজ করেও। যারা সমাজকে বদল করে সুস্থ নাগরিক জীবন গড়তে চায় তাদের এরা বলে দেশদ্রোহী অথচ যারা সর্বপ্রকার দুর্নীতিকে আশ্রয় করে দেশবাসীর সর্বনাশ করছে তারা এদের অভিধানে হল দেশপ্রেমী। তাই সমাজ বদল যারা করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা মামলা খাড়া করে প্রভু তোষণ করতে এরা জোর জুলুমের বাক্য চালাতে চায়।

এরপর আমরা দু'জনেই চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। খবরের কাগজের পাতা উল্টাতে উল্টাতে শ্যামলী বলল, আমাদের সিদ্ধার্থবাবু পানজাবের রাজ্যপাল হয়েছে। তার যোগ্যতার মাপকাঠি বোধহয় পশ্চিমবঙ্গের নকশাল দমন। রাজীব ঠিকই পছন্দ করেছে। মাণিকে মাণিক চেনে, শালিখে চেনে ভেজা ছোলা। কিন্তু পানজাব বড় কঠিন ঠাঁই। পশ্চিমবঙ্গের মুষ্টিমেয় নকশালপন্থীদের হত্যা করে নকশাল আন্দোলনের জোয়ার কিছুটা বন্ধ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তাতে দমন হয়েছে বলা মিথ্যা স্তোকবাক্য। তা যদি হত অতি বিপ্লবী বামপন্থী সরকার নকশাল ফোবিয়াতে ভুগতো না। নানা অজুহাতে ডাক্তার সুবোধ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করে প্রমাণ করত না নিজেদের অসহায় অবস্থা এবং সিদ্ধার্থশঙ্করের

হ.দবাব) ও আত্মপ্রসাদকে মিথ্যা প্রমাণিত করত না। এ হেন সিদ্ধার্থশঙ্কর বিলাতী ব্যারিষ্টার আর তার নিয়োগ কর্তা বিলাতী পাইলট সেজন্য রাজনীতির ক্ষেত্রে খুবই মাটো বলেই মনে হচ্ছে। বক্তৃতায় রাজনীতি হয় না, দম্ভ রাজনীতির পারিপূরক নয়।

বললাম, তুই যে ক্ষেপে উঠেছিস শ্যামলী।

না কাকা। হাসি পায় এদের কাজ দেখে। পশ্চিমবঙ্গের মুষ্টিমেয় নকশালরা যে ভাবে বিস্তৃতিলাভ করেছে ও করছে তাতে নকশাল দমন করাটাই ভাঁওতা-বাজী। আর পানজাবের যারা উগ্রপন্থী তারা হল ধর্মান্ধ এবং তাদের প্রত্যক্ষ সাহায্যকারী পাকিস্তান। পশ্চিম বাংলার নকশালরা রাজনীতির সেবক এবং তারা বিদেশী কোন সাহায্যই পায়নি। পানজাবীদের পক্ষে যত বেশি সক্রিয় হওয়া সম্ভব, তার কণিকাও নকশালদের পক্ষে হয়নি। পানজাবী শিখদের একটা বিরাট অংশ উগ্রপন্থীদের সমর্থক, কিন্তু রাজনীতির ছাত্র বাঙ্গালীদের অতি ক্ষুদ্রাংশও নকশালদের সমর্থক ছিলনা। পানজাবী শিখরা চায় স্বাধীন খালিস্তান আর নকশালরা চেয়েছিল স্বাধীন ভারতেই তারা প্রতিষ্ঠা করবে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা। পানজাবের শিখরা অস্ত্র চালনায় দক্ষ, অস্ত্রও তাদের হাতে রয়েছে যথেষ্ট, আর বাংলার নকশালরা দেশী ছুরি কোদাল নিয়ে নেমেছিল বিপ্লব ঘটাতে এবং তারা অস্ত্র ব্যবহারে সম্পূর্ণ অদক্ষ। এই পার্থক্যটা হল বস্তুগত। মনের দিক থেকে পানজাবী শিখরা কাপুরুষ ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন কিন্তু বাংলার নকশালরা মৃত্যুভয়ে ভীত হয়নি তারা সাম্প্রদায়িকও ছিল না। এই পার্থক্যগুলো যারা অনুধাবন করেছে তারাই বলবে, সিদ্ধার্থশঙ্করকে রাজীব পানজাবে পাঠিয়েছে তার রাজনৈতিক জীবনের যবনিকা টানতে।

পানজাবী শিখরা কাপুরুষ? বলিস কি?

হাঁ কাকা ওরা কাপুরুষ। ওরা গোপনে এসে নিরীহ নরহত্যা করে পালিয়ে বেড়ায় কিন্তু বাংলার নকশালরা পুলিশের মুখোমুখী হতে ভয় পায়নি। সিদ্ধার্থ-শঙ্কর রাজ্যপাল হবার পর কত নরহত্যা ঘটেছে তার হিসাব জান কি? হত্যাকারীরা পরিকল্পিতভাবে এই সব ঘটিয়ে পালিয়ে যায়, তারা বিরুদ্ধপক্ষকে যেমন ভয় করে তেমনি গোপন হত্যা দিয়ে নিজেদের কাপুরুষ প্রমাণ করে। তবে পানজাব পুলিশেও মানসিক বিকার ঘটেছে। এটা তোমরা মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সময় নিশ্চয়ই যুক্তবাংলায় তা লক্ষ্য করেছে। মুসলমান অফিসাররা মুসলমানদের সাহায্য করেছে, হিন্দু অফিসাররা হিন্দুদের সাহায্য করেছে। এই অবস্থা যখন ঘোরতর আকারে দেখা দেয় তখনই মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভাগ অবশ্যম্ভাবী বলে স্বীকার করে নেয়। ঠিক এই অবস্থাই চলছে পানজাবে। সাধারণ শিখরা উগ্রপন্থীদের সাহায্য করছে, অসহায় হিন্দুরা শিখদের শিকারে পরিণত হচ্ছে, অন্যত্র বিদ্বেষ ধূমায়িত, তার স্ফুরণ ঘটছে এইটাই আশঙ্কার কথা। এমনও সন্দেহ করার কারণ আছে যাতে মনে হয় অকালী মন্ত্রীসভার বর্তমান সদস্যদের কেউ কেউ গোপনে উগ্রপন্থীদের সাহায্য করছে।

তোর কথাটা অসমীচিন নয় শ্যামলী। শিখদের উগ্রপন্থা ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার একটা নিদারুণ অপপ্রয়াস। আবার মুসলীম লীগ ব্যক্তিগত আইন নিয়ে যে আন্দোলন করছে তার পেছনেও রয়েছে হিন্দু ভারত আর মুসলমান ভারত সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস। রাজীব গান্ধী দলের ভোটের জন্য মুসলমান তোষণ করছেন, তার পরিণতি ভয়াবহ হবে এমন চিন্তা করার অবসর তার নেই। তার পরিষদরা সুবুদ্ধি না দিয়ে কুবুদ্ধি দিয়ে চলেছে।

শ্যামলী হেসে বলল, আমাদের দেব-দেবতার মত হলেন রাজীব গান্ধী। বিধর্মীরা যখন দেবমন্দির অপবিত্র করে অথবা ভেঙ্গে ফেলে তখন সর্বশক্তিমান দেব-দেবতা নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, অথচ তাদের কাছে আমরা আমাদের মোক্ষ মুক্তির প্রার্থনা করি। যে দেবতা নিজেকে রক্ষা করতে পারে না সে দেবতা অপরকে রক্ষা করবে কি করে, এটা একবারও ভাবি না। রাজীব নিজের দেশকে নিয়ে বিভ্রান্ত ব্যতিব্যস্ত। পানজাবে হাঙ্গামা, গুজরাটে হাঙ্গামা, উত্তরপ্রদেশে হাঙ্গামা, নাগাল্যাণ্ডে হাঙ্গামা, মিজোরামে হাঙ্গামা, আসামে হাঙ্গামা —এত হাঙ্গামা যার ঘরে তিনি চলেছেন লিবিয়ায় আর ইরাণ-ইরাকের হাঙ্গামা মেটাতে। রাজীব খ্যাতির কাঙ্গাল, যেমন কাঙ্গাল ছিলেন তার মাতামহ জওহরলাল। এই ভুয়ো খ্যাতির লোভে দেশে অপরিমিত অনাচার ঘটাতে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন জওহরলাল, রাজীবও পিছিয়ে নেই। আমরা ভাবছি, এরপর কি? আমি কিন্তু কারও প্রশংসা করতে পারছি না। বাংলার বামপন্থীরাও কংগ্রেসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দুই নম্বর কংগ্রেসে পরিণত হয়ে চলেছে।

মনে হচ্ছে যুদ্ধের ছায়া ঘনীভূত হচ্ছে।

শ্যামলী বলল, যুদ্ধের প্রয়োজন আছে কাকা। ব্যাপক যুদ্ধের। স্থানীয়ভাবে নয়। পৃথিবীর চাকা যেভাবে ঘুরছে, অত্যাচার, অনাচার, শোষণ, মিথ্যাচার যেভাবে গ্রাস করেছে মানব সমাজকে এ থেকে মুক্তি পেতে হলে, নতুন সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করতে হলে ব্যাপক যুদ্ধের প্রয়োজন। ধীরে ধীরে সেই সম্ভাবনার দিকে এগোচ্ছে।

পরিণতি?

ব্যাপক মৃত্যু, সম্পদনাশ সেই সঙ্গে নির্বংশ হবে শোষক ও অত্যাচারীর দল। নতুন জীবনের সন্ধান পাবে জীবিত মানবগোষ্ঠী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে রাশিয়াতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক নরনারী সমাজতান্ত্রিক দেশে বাস করার সুযোগ পেয়েছে। আরেকটা বিশ্বযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

হেসে বললাম, সেই নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লোক থাকবে কি?

থাকবে। সবাই তো মরবে না।

যারা থাকবে তারা বর্তমান বিজ্ঞানের দয়াতে পঙ্গু প্রতিবন্ধী হয়ে বাঁচতে বাধ্য হবে। আজ যারা যুদ্ধের চিন্তা করে তারা উন্মাদ। লিবিয়াতে আমেরিকা

বোমা বর্ষণ করে যুদ্ধের সূচনা করেছে। অন্যায় করেছে। আমেরিকা ভিয়েতনামে যুদ্ধ জিইয়ে রেখেছিল, তার দেশের বেকার সমস্যা যাতে না দেখা দেয় তার জন্য। ভিয়েতনামকে অস্ত্র সাহায্য করেছে, খাদ্য দিয়েছে, অর্থ দিয়েছে নেহাৎ করুণার বশবর্তী হয়ে নয়। তার দেশের অস্ত্রের কারখানাগুলো বন্ধ হলে লক্ষ লক্ষ লোক বেকার হবে, দেশে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই করবে বেকার বুভুক্ষুরা। ঠিক একই কারণে হণ্ডুরাসকে সাহায্য করেছে আমেরিকা নিকারাগুয়াতে অশান্তি বজায় রাখতে। ইস্রায়েলকে অকৃপণ সাহায্য দিচ্ছে মধ্যে প্রাচ্যে তার ঘাঁটি অক্ষত রাখতে, দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাহায্য করছে যাতে সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রভাব বিস্তার না হয় নামিবিয়াতে, পাকিস্তানকে সাহায্য করেছে নিজের ঘাঁটি শক্ত করতে আর রাশিয়া যাতে আফগানিস্থান পেরিয়ে পাকিস্তানে প্রভাব বিস্তার না করে তার জন্য। সেই সঙ্গে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ শক্তি ভারতকে শায়েস্তা রাখতে। যেখানে আমেরিকার পায়ের ছাপ পড়েছে সেখানেই অশান্তি। এই অশান্তি তার বেনিয়া বুদ্ধির অবদান। অশান্তি থাকলে তার ব্যবসা বাণিজ্যে জোর থাকবে, দুর্বলরা তার আশ্রয় নিয়ে দাসানুদাসে পরিণত হবে। এই সব নানা মহান উদ্দেশ্য সাধন হল আমেরিকার রাজনীতি। অথচ ঘৃণ্য এই রাজনীতি।

তোর কথাই বলছি শ্যামলী। এত যে সাজগোজ বাব্যব্যয় এর পরিণতি কি?

আমরাও সেই কথা ভাবছি কাকা। এরপর কি?

আমরা বিশ্বজয়ী, গৃহ আমাদের অনাহারী।

আমরা প্রাচীন সভ্যতার উত্তর পুরুষ, অথচ অসভ্যতার প্রতীক মার্কিন সভ্যতার পরিপোষক।

জ্ঞানে বিজ্ঞানে আমাদের সমকক্ষ কেউ নেই, শুধু নো-হাউয়ের জন্য অপর দেশের কৃপাপ্রার্থী।

আমরা খেলাধূলায় অসীম উৎসাহী, আমাদের প্রতিনিধিরা সর্বক্ষেত্রেই আমাদের কলঙ্কবাহক।

আমরা নানা ভাষা নানা ধর্মের মহান ধারক, অথচ আমাদের গৃহ বিবাদ সাম্প্রদায়িক অমিল ইতিহাসের একটি কলঙ্কময় অধ্যায়।

তবুও আমরা ভাল, আমরা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির দাবীদার।

আমাদের মন্ত্রীরাও চুরি করে, উৎকোচ গ্রহণ করে, নারীর অমর্যাদা করে, মদের ফোয়ারায় স্নান করে। সত্যকে মিথ্যা বলে, মিথ্যাকে সত্য বলে। আমাদের প্রতিনিধি যারা তাদের বৃহদাংশকেই কোন রুচিসম্মত সভ্যদেশের নাগরিক বলা কঠিন।

এই তো আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার নিদর্শন। অথচ আমরা বলে থাকি মহাত্মা গান্ধীর নাম, আমরা বলে থাকি অতীতের মহান পুরুষদের গৌরব কথা।

আদর্শবান কোন এক কংগ্রেস কর্মী আবেদন জানিয়েছেন বর্তমান কংগ্রেস

প্রেসিডেন্ট তথা প্রধানমন্ত্রীকে। উল্লেখ করেছেন কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রকে। বলেছেন, খাদি পরিধান ও মদ্যবর্জন-ই কংগ্রেসের সদস্য হবার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় গুণ। রাজীব এর উত্তর কি দিয়েছেন তা জানা যায়নি। তবে সবাই জানে কম্বলের লোম বাছতে বাছতে কম্বল থাকে না। এককালে ভয়ঙ্কর মদ্যপায়ী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেস নেতৃত্বে এসে মদ্যপান চিরকালের জন্য বর্জন করেছিলেন। অতিমূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ দান করে খাদি বস্ত্রকে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। এমন আদর্শবান ব্যক্তি আজকের কংগ্রেসে একজনও পাওয়া সম্ভব কিনা তা ইন্দিরা সৃষ্ট কংগ্রেসীরাই বলতে পারবে। দেশের মানুষ যখন অষ্ট্রেলিয়ায় বেনসন হেজেস ক্রিকেট কাপ জিতে খেলোয়াড়দের প্রকাশ্যে শ্যামপেন খেতে ও শ্যামপেনে স্নান করতে দেখে তখন ততদুঃখিত হয় না যখন তারা দেখে তাদের প্রতিনিধিরা কংগ্রেসী আদর্শের নিম্নতম নীতিও মানছে না তখন বেশি দুঃখিত হয়। নীতিবোধ হারিয়ে ভারতের রাজনীতির বিজয়রথ যে ভাবে চলছে তাতেই ভারতের টালমাটাল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। খেলোয়াড়রা টাকার কাঙ্গাল, জাতিপ্রেম, জাতির সম্মান রক্ষার জন্য তো তারা আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে পারেনা। সাধারণ মানুষের সমাজ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করেছে অর্থের প্রলোভন।

এই তো সেদিন কিছু লোক বিষাক্ত মদ খেয়ে প্রাণ হারাবার পর কংগ্রেস কর্মীরা থানা ঘেরাও করেছিল। তাদের বক্তব্য বিষাক্ত ও ভেজাল মদ বিক্রি বন্ধ করতে হবে। যে গান্ধীজির ডাকে মদের দোকানে পিকেটিং করে হাজার হাজার যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণী জেলে গিয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল মদ্য বর্জন। বর্তমান কংগ্রেসীদের মুখে মদ্য বর্জনের কথা শোনা যায় না, তাদের বক্তব্য অতি পরিষ্কার। তারা মদ খাবে কিন্তু বিষাক্ত ও ভেজাল মদ খেয়ে তারা মরতে চায় না। কারও মুখে শোনা গেল না মদবর্জন করতে হবে। থানা অবরোধ করার কোন আদর্শগত যুক্তি সাধারণ মানুষ আজও বুঝে উঠতে পারছে না।

আর খাদি? সে তো কর্পোরেশনের মেথর ধাঙ্গরদের উপযুক্ত পোষাক। কোন সভ্য ভদ্র দেশসেবী কংগ্রেসীদের পক্ষে ওটা অসম্মান সূচক পরিধেয়। এটা তো দেশনেতারা সহ্য করতে পারেনা। তাদের প্যান্ট আর কোট! এটাতো সারা বিশ্বে স্বীকৃত ভদ্ররুচি সম্পন্ন পোষাক। চীনদেশের মানুষ বিশেষ কোন কারণ ভিন্ন দেশীয় পোষাককে বর্জন করেনা, জাপানীরা তাদের জাতীয় পোষাকে গর্বিত হয়, আর হায় ভারত! আমরা নিজেদের পরিচ্ছদ ছেড়ে বিদেশীদের অনুকরণ করে চলেছি। আমাদের ঘরের মেয়েরা শাড়ি পড়তে চায়না, মায়েরা মাম্মী হয়েছে, পুরুষরা ঘরে বাইরে বিদেশী পোষাককে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে, বাবারা ড্যাডী হয়েছে। এই অপপ্রচারের গৌরব অর্জন করেছে বোম্বাইয়া হিন্দী সিনেমা, আর আমরা 'তালিয়া' দিয়ে তাদের প্রশংসায় মুখর। তাদের স্টার, সুপার স্টার খ্যাতিতে তুলে ধরতে অক্লান্ত প্রচার করে চলেছি। যে ভাষাকে সর্বভারতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে উত্তর ভারতের হিন্দীওলারা রাজ-

কোষ থেকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে, সেই হিন্দীভাষার যে রূপ দেখা যায় হিন্দী সিনেমায় তাতে ঘৃণা ভিন্ন আর কিছু অহিন্দীভাষার জন্য জমা থাকতে পারে কি! আমাদের দুর্ভাগ্য হিন্দীওলারা পাকচক্রে আমাদের ভাগ্যবিধাতা।

অমিয়া কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিয়েছে।

মাধুরী আজও ফিরে আসেনি।

ছয় সাতটি সংবাদপত্র সামনে নিয়ে দিন কাটে অমিয়ার।

অরিন্দম মেয়েকে বিদেশে পাঠিয়েছে শিক্ষালাভের জন্য।

গৃহকর্মের জন্য লোকের তার অভাব নেই। তবুও যখনই সময় পায় তখনই গৃহস্থালীর কাজে হাত দেয়। নিজেকে সব সময় ব্যস্ত রাখে নিজের কর্মক্ষমতা অটুট রাখতে, মনকে প্রফুল্ল রাখতে।

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তার মেয়েটাকে কেন বিদেশে পাঠালি?

মেয়েটা তো আমার একার নয়। আর মেয়ের বাবা আর আমি তো ঐক্য-মতাবলম্বী নই, সেজন্য মেয়েকে তারইচ্ছা মত জীবন গড়বার সুযোগ দিয়েছি।

যে মেয়েকে পাঠিয়েছিস সে মেয়ে কি ফিরে আসবে?

তা আসবে না। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই মেয়ে বড় হয়েছে, তাকে পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে কোনক্রমেই টেনে আনা সম্ভব নয়, আর সে আসবেই বা কেন? সে মা পায়নি পরিপূর্ণভাবে; বাবাকে পায়নি পরম স্নেহপরায়ণরূপে, তার জীবন যে ছন্নছাড়া হবে তাকি তুই বুঝিস না দাদু।

বর্তমানে স্বামী-স্ত্রী কাজে বের হয়। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে এটাই মোটা-মুটি চিত্র। মায়েরা সন্তানদের ক্রেশে রেখে কর্মস্থানে যায়। ধীরে ধীরে সেখানেই তারা বড় হয়।

অমিয়া হেসে বলল, বড় হয় ঠিকই তবে মানুষ হয় কিনা সে খবরটা নিয়েছিস কি? ব্যতিক্রম থাকতে পারে। ব্যতিক্রমটা স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম নয়। বাস্তব জীবনের অভাবকে জয় করতে স্বামী-স্ত্রী কাজ করে, আমরাও করতাম। সন্তান হবার পর বুঝলাম, বাস্তব জীবনের অভাবকে জয় করতে সন্তানের জীবনে ভয়ঙ্কর একটা অভাব আমরা সৃষ্টি করে চলেছি। সেই অভাব পয়সা দিয়ে পূর্ণ করা যায় না। তাই সন্তান পরিচয় দেবে পিতা-মাতার কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে নয়। তার মানসিক অভাব তাকে বিক্ষিপ্ত করবে, পৃথিবীকে সে নানাভাবে চিনতে চাইবে, অভিযোগ তার মনের কোণায় গুমরে গুমরে ক্ষত বিক্ষত সৃষ্টি করবে, তাকে সহজে মানুষ করা যাবে না।

অমিয়া মা। মা যেভাবে সন্তানকে জানে, বোঝে, চেনে সেভাবে জানা-বোঝা-চেনা সম্ভব কি পুরুষদের পক্ষে। অমিয়ার যুক্তি তার নিজস্ব নয় বিশ্বের সকল মায়ের। বাদ প্রতিবাদ নিরর্থক। কথার মোড় ঘোরাতে বললাম, চল কিছুকালের জন্য বেড়িয়ে আসি। আর ভাল লাগছে না। কলকাতার উপকণ্ঠ আর কলকাতা। একঘেয়ে জীবন।

আমিও সেই কথাই ভাবছি। কোথায় যেন ছন্দপতন ঘটছে আমাদের

জীবনে। আমরা সাদরে গ্রহণ করতে পারছি না এই সমাজ জীবন, আর্থিক অনৈক্য, রাজনীতির চাটুকারিতা। বাইরে কোথাও গিয়ে দুদণ্ড হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চাই।

আমি রাজি। তবে এবার আমরা দুজন আর কেউ নয়, কি বলিস?

বয়সটা বেশি হয়েছে, সব সামলাতে পারবি তো?

হয়ত কষ্ট হবে, অসুবিধা হবে, তাতে কিন্তু দেশ ভ্রমণে আনন্দ বৃদ্ধি করবে, সহজ জীবন যাত্রার চেয়ে কঠোর জীবনযাত্রা হবে শিক্ষণীয় এবং আত্মবিশ্বাসের পরীক্ষা।

তোর যত সব বড় বড় কথা। আত্মবিশ্বাস নিয়েই তো এ-টা কাল কাটালাম। এরপর আর পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। আর শিক্ষণীয়? তার বয়সও অতিক্রম করেছি। এবং স্ট্রাইক্ দি টেণ্ট এণ্ড মার্চ ফরওয়ার্ড।

অবশ্যই।

গাড়ি চলছে তো চলছেই। গাড়িতে তিনটি প্রাণী, কিছু খাবার আর দুটো আগ্নেয়াস্ত্র অবশ্য বেআইনী নয়। চালক অতি পুরাতন ও বিশ্বস্ত। আরোহী দুজন অতি পরিচিত অথচ স্বজন নয়। সকাল থেকে দুপুর অবধি অবিরাম গাড়ি চলবে। দুপুরে কোন জনবহুল গ্রাম গঞ্জে গাড়ি দাঁড় করিয়ে স্নানাহার, দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হলে আবার গাড়ি ছুটবে. তারপরই সন্ধ্যার আগে অথবা কিছুপরে নিরাপদ স্থান দেখে রাত্রিবাস। এটাই প্রোগ্রাম। গন্তব্যস্থল অনির্দিষ্ট। যখন ক্লান্তি আসবে তখন প্রত্যাবর্তন। মনোমত স্থান পেলে দু-চারদিন বিশ্রাম।

বললাম, দার্জিলিং চল অমিয়া।

অমিয়া কি যেন ভেবে বলল, না। দার্জিলিং ধীরে ধীরে অগ্নিস্তূপে পরিণত হতে চলেছে। ওখানে শান্তিতে দুদণ্ড থাকা চলবে না দামু।

গোর্খাল্যাণ্ডের ভয়ে।

তাও মনে করতে পারিস। ভাবছি, যারা গোর্খা তারা দাবী করে নিজেদের নেপালী বলে। যারা নেপালী তাদের দেশ নেপাল। তারা যদি ভারতবর্ষকে নিজের দেশ মনে না করে, তারা যদি নিজেদের ভারতীয় মনে না করে তাহলে তাদের উচিত তাদের মাতৃভূমি অথবা পিতৃভূমি নেপালে ফিরে যাওয়া। ভারতে বাস করব আর স্বাধীন গোর্খাল্যাণ্ড গড়ে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করব এটা তো নীতি সম্মত নয়। ভারতের চতুর্দিকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যে ভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে তাতে ভীত হবার কারণ যথেষ্ট আছে।

বললাম, এই অশান্তি সৃষ্টির মূলে রয়েছে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে বামপন্থীরা ও কংগ্রেস। যতদিন কংগ্রেস পশ্চিম বাংলার গদীতে ছিল ততদিন কোন অশান্তি দেখা দেয়নি। প্রথমেই দেখা দিল গোর্খা লীগ। তাদের সাদরে কোলে তুলে নিয়ে যুক্তফ্রণ্ট তাদের জন্য মন্ত্রীত্ব দিয়ে গোর্খা লীগকে ক্রমেই দানা বাঁধতে দিল। কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হতেই গোর্খাদের গোপনে উস্কানি দিয়ে বামফ্রণ্ট বিরোধী করতে সাম্প্রদায়িক স্লোগান শোনাতে আরম্ভ করেছে, গোর্খা তথা নেপালীদের।

আর এই তাদের প্রথম পার্বত্য এলাকার কুকার্য নয়, ইন্দিরা গান্ধী সিকিমের সঙ্গে ভারতের যে চুক্তি ছিল তা নস্যাত করে সিকিমকে ভারতের কোলে টেনে নেবার পেছনে যে চক্রান্ত ছিল তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে দার্জিলিং জেলায়। সিকিমের আদি বাসিন্দাদের সংখ্যা ক্রমেই সংখ্যা লঘু হতে থাকে নেপালীদের অনুপ্রবেশে। হঠাৎ একদিন সিকিমে নেপালীদের সংখ্যা মূল বাসিন্দাদের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে গেল। ইন্দিরা এই সুযোগে সিকিমে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে গণভোটের ব্যবস্থা করার উপদেশ দিলেন চোগিয়ালকে। চোগিয়ালের সাধ্য ছিল না ইন্দিরার নির্দেশ অমান্য করা। গণভোট হল। ভোটারদের ষাট শতাংশের অধিক হল নেপালী। তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে গণভোটে স্থির হল সিকিমের ভারতভুক্তি। ইন্দিরা গান্ধী মহানন্দে নর্তন করলেন দেশবাসী যারা ইন্দিরার চালাকি বুঝতে পারল না, তারাও নর্তন করল। নেপালীদের মাথায় তুলে আজ তাদের দাবীর কাছে মাথা নত করার সুযোগ তো কংগ্রেসই সৃষ্টি করেছে। গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনের সামিল হয়েছে কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী সবাই। যে বিষবৃক্ষ ইন্দিরা রোপন করেছেন তার ফল খেতে হবে গোটা দেশ-বাসীকে। তুই বোধহয় জানিস, ভুটানে স্থায়ীভাবে নেপালীদের বসবাস করতে দেওয়া হয় না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের বাস করতে দিলেও তাদের নাগরিক অধিকার দেওয়া হয় না। সিকিমের শিক্ষা তাদের খুবই সজাগ করেছে।

এই সব-ই তো ভাবছি। ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা হল সারজায়। শেষ বল মেরে পাকিস্তানী খেলোয়াড তার দেশকে বিজয়ী করল। এই খেলোয়াড়ের নাম হল মিযাদাদ। এই জয়ের উল্লাস পাকিস্তানে কতটা প্রকট হয়েছে তা ঈশ্বর জানে। কিন্তু কাশ্মীরে তার প্রতিফলন ঘটল বিজয় মিছিল বের করে। কাশ্মীরের ছাত্ররা যখন ভারতের অন্য অংশে যায় পড়াশোনা করতে তখন তাদের সহপাঠীদের গর্বের সঙ্গে বলে, Look, we are Kashmiris, not Indians, তারপর কি বলতে হবে কাশ্মীরের বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ পাকিস্তানী। তাদের প্রতিরোধ করতে, অথবা ভারতীয় করে গড়ে তুলতে প্রশাসন তো কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে না। এরাও পাকিস্তানের খোয়াব দেখছে, তাই ভারতের অভ্যন্তরে অশান্তির সৃষ্টির সুযোগ খুঁজছে। কখনও হজরত বাল, কখনও বাবরি মসজিদ, কখনও মিযাদাদ, একটা কিছু সুযোগ পেলেই কাশ্মীরি মুসলমানদের একটা অংশ হিন্দুদের মন্দির ভাঙ্গছে। হিন্দুদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে সম্পদ লুট করছে, হিন্দু নারীদের অমর্যাদা করছে, হিন্দুদের হত্যা করছে। তাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে কিছু বিপথগামী উগ্রপন্থী শিখ। বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির অপচেষ্টা এগিয়ে চলেছে। অথচ মুসলমান তোষণের জন্য ভোটের কাঙ্গাল রাজীব শাহবানুর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন আইন করেছেন। তবুও ভবি ভুলবে না। পরবর্তী পর্যায়ে মুসলীম ভারত ও হিন্দু ভারতে বিভক্ত হবার আশঙ্কা থেকে গেছে রাজীবের এই আত্মসমর্পণের মধ্যে।

অমিয়া স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি দিয়ে বলল, এর পরিণতি ?

তাইতো ভাবছি, এরপর কি ! উত্তরে কাশ্মীরে পাকিস্তানী খোয়াব, পার্বত্য এলাকায় গোর্খাল্যাণ্ড, মধ্যভূমিতে খলিস্তান, ত্রিপুরায় স্বাধীন ত্রিপুরী, মণিপুরে মৈতরী আন্দোলন, আসামে অসমীয়া, সমতলের জনজাতি। বাঙ্গালী অবাঙ্গালী বিবাদ ক্রমেই শক্ত শেকড় গাড়ছে। এর পরিণতি ভাবছি। এরপর কি ?

দু'জনেই চুপ করে গেলাম।

গাড়ি ছুটছে।

সামনে সোনাপুর ঘাট। পশ্চিম দিনাজপুরের শেষ। দার্জিলিং-এর আরম্ভ।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে পড়লাম।

গাছতলায় চাদর বিছিয়ে খাবারের পৌটলাপুটলি বের করে অমিয়া গেল মহানন্দার জলে স্নান করতে। সাঁকোর তলায় মহানন্দা তখন ক্ষিপ্রবেগে ছুটছে। যদিও শীতের শেষ, জলের পরিমাণ ও গভীরতা কম কিন্তু বেগ নেহাৎ কম নয়। স্বচ্ছ কাঁচের মত জল, শীতল অথচ ভীতিপ্রদ।

অমিয়াকে বললাম, এই পাহাড়ী নদীকে বিশ্বাস করিস্ না। সাবধানে স্নান করিস।

অমিয়া হাতে বালতি আর মগ দেখিয়ে বলল, জলে নামব না। বালতিতে জল নিয়ে ডাঙ্গায় বসে স্নান করব। শরীরটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। তুইও স্নান করে নে। আমরা স্নানের উপযোগী এমন পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল আর সহজে পাব না।

অমিয়া চলে গেল বালতি মগ গামছা নিয়ে।

বসে রইলাম।

চোপড়া থেকে খাবার সংগ্রহ করে এনেছি। স্নানাহার শেষ করে বিকেল পর্যন্ত শিলিগুড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করতে পারব। ত্বরিতগতিতে এগিয়ে চলার প্রয়োজন আর নেই।

খেতে বসে অমিয়া বলল খবর শুনেছিস ?

শুনেছি।

ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটছে হরিদ্বারে।

কুম্ভমেলায় ? বহুলোক পায়ের চাপে মারা গেছে।

অমিয়া গম্ভীরভাবে বলল, ধর্মের নামে পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ যেমন পাগল হয়ে ওঠে তারই জলজ্যান্ত উদাহরণ।

বললাম, এটা তো নতুন কিছু নয়। ধর্মরক্ষা করতে পৃথিবীতে যত যুদ্ধ হয়েছে আজ অবধি এবং প্রাণ ও সম্পদ নাশ হয়েছে তা বিগত আনবিক যুদ্ধেও ঘটেনি। ধর্মের নামে অপমৃত্যু যত ঘটে থাকে এটা হল তারই সামান্য অংশ মাত্র। আজও এর শেষ হয়নি। আগামী কয়েক শতাব্দীতে আরও ঘটবে, মানুষ ক্লান্ত হবে না কোন কালেই ধর্মের নামে রক্তপাত ঘটাতে।

কিন্তু হরিদ্বার কুম্ভমেলায় এই মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ রূপে দায়ী প্রশাসন। বিভিন্ন রাজ্যের তিনজন মুখ্যমন্ত্রীর স্নানের ব্যবস্থা করতে যেভাবে পথ অবরোধ করা হয়েছিল তারই পরিণামে ধর্মোন্মাদ লক্ষ লক্ষ মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হীনের মত অপর

পূণ্যপ্রার্থীদের পদতলে পেষণ করে পূণ্যলাভ করতে গিয়েছিল। এর জন্য যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ দায়ী তাদের বিচার হওয়া উচিত।

তা বটে। কিন্তু তা হবে না। বরং আমরা আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারি, মৃত পুণার্থীরা সজ্ঞানে পরিবারকে আর্থিকভাবে বিপন্ন করে স্বর্গলাভ করেছে, এটা যেমন মৃতের পক্ষে পরমার্থলাভের সহজ পথ, তেমনি তার পরিবারের পক্ষে পরম সন্তোষ। রামরাজত্বে এর চেয়ে বেশি আর কি সঞ্চয় হতে পারে?

অমিয়া বিরক্তির সঙ্গে বলল, তুই ঠাট্টা করছিস। এই মৃত্যু যে কত মর্মান্তিক তা বুঝি তুই স্বীকার করিস না?

নিশ্চয় স্বীকার করি। বহুকাল আগে শরৎ বসু জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তাকে অভ্যর্থনা জানাতে দেশবন্ধু পার্কে যে বিশাল জন সমাবেশ হয়েছিল তাতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটেছিল কয়েকজনের। এই তো সেদিন খেলা পাগল একদল তরুণ ইডেন উদ্যানে জনতার পায়ের চাপে প্রাণ হারিয়েছিল। এদের জন্য আমরা শোকাশ্রুপাত করেছি। ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা যাতে না ঘটে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু চোর চলে যাওয়ার পর গৃহস্থ সাবধান হওয়ার মত এই সব ব্যবস্থা। যেখানে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে, বিশেষ করে বেষ্টন করা জায়গায় সেখানে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এটা অনুমান করে সর্বাগ্রে ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল। কুম্ভমেলায় দশলক্ষাধিক জন সমাগম হবে জেনেও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা কেন হয়নি, কেন অন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা স্বর্গলাভের আশায় সেখানে গিয়েছিল এসবের তদন্ত হবে কিন্তু মৃতরা জীবন ফিরে পাবেনা বন্ধু। যাদের কাঁদার তারা কাঁদবে। তাদের চোখের জল শুকোবার আগেই আরো দু'একটি এরকম ঘটনা ঘটবে। চক্রাকারে ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। হরিদ্বারের চেয়েও বড় দুর্ঘটনা ঘটেছিল এলাহাবাদে, সেখানে পাঁচ শতাধিক লোক মারা গিয়েছিল পূণ্যলাভের আশায়।

অমিয়া গম্ভীর ভাবে বলল, আমরাও তো পূণ্যলাভের আশায় বেরিয়েছি।

বললাম, তা বটে। এবার গাড়িতে উঠে বসি তারপর পাপপূণ্যের হিসাব করব। হিন্দু সমাজে ধর্মের চেয়ে আনুসঙ্গিক আচার আচরণ কঠোরভাবে এরা পালন করতে চায় যার পরিণতিও হয় অতি ভয়ঙ্কর। সব দেশেই অলিখিত কিছু আইন আছে। মনে হয় ভারতীয় ধর্মব্যবস্থায় তার সংখ্যা নিরুপণ অসাধ্য, বিশেষ করে বাঙ্গালী হিন্দু সমাজে। উচ্চ শিক্ষিত মেয়েরাও এই সব অবান্তর আচার আচরণের দাসত্ব করে। তারাও যুক্তি-বুদ্ধির ধার ধারে না। যেহেতু মা-ঠাকুমা এসব করেছে, সেই হেতু তাকেও তা করতে হয়।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিতে এসব ঘটে। শুনেছি আমাদের দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। প্রত্যহ এক ডজন দেবতার ভজনা করলেও একজন মানুষের স্বল্প পরিসর জীবনে এই তেত্রিশ কোটিকে একবার স্মরণ করাও সম্ভব নয়। অথচ আমরা সারাজীবন তেত্রিশ কোটির সন্ধান করতে করতে ক্লান্তিতে জীবনের শেষ দিনে পৌছে হা-হুতাশ করি। এটাই বোধহয় বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে।

দু'পাশে চা বাগান। মাঝ দিয়ে পিচ বাঁধানো জাতীয় সড়ক। কিছু দূরে দূরে শালবন। প্রকৃতির অকৃপণ শ্যামলিমা নয়ন-মন স্নিগ্ধকর। উদাসভাবে দেখছিলাম। ঘন বনানীর মাঝ দিয়ে মাঝে মাঝে হিমালয়ের শৃঙ্গগুলো দেখা যাচ্ছিল। উদাসভাবে দেখছিলাম: আমার পাশে অমিয়া হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে। পুরোপুরি ঘুম নয়, তন্দ্রাচ্ছন্নভাব। মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে আমার কাঁধে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে পথ চলছিল। গাড়ির ঝাঁকুনিতে হঠাৎ তন্দ্রাভাব কাটলেই আবার সোজা হয়ে বসছিল। শাড়ির আঁচলে মুখ মুছে আবার ঝিমিয়ে পড়ছিল।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসে অমিয়া জিজ্ঞাসা করল, আমরা কতদূর এসেছি?

বললাম সামনেই নকশালবাড়ি।

অমিয়া তড়িতাহতের মত সোজা হয়ে বসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ওঃ।

জিজ্ঞাসা করলাম, মানে?

অনেক কথাই মনে পড়ল, তাই। একটা ছোট গ্রাম। তার নামের কি যাদু। সারা ভারতের শোষক শ্রেণীর কাছে বিভীষিকা। অথচ কত সামান্যতে এর সৃষ্টি অথচ কত গভীরে এর শেকড়। জানিস দামু, ওরা জানে আজকের দিনের হ্যাভস্-এর দল হ্যাভ নট্‌সদের এই চরমপন্থাকে এখনও ভীতির সঙ্গে স্মরণ করে।

কারণ নকশালপন্থীদের আন্দোলন আজও শেষ হয়নি। অবশ্য নকশাল-পন্থীদের আন্দোলন দমন করতে আমাদের অহিংস সরকার অদ্যাবধি কমপক্ষে দশ হাজার তরুণকে হত্যা করেছে। সেকস্‌পীয়রের নাটকে ভৌতিক চরিত্র রয়েছে অনেক। ডাকিনী যোগিনীর ছড়াছড়ি। আমাদের দেশেও মৃত নকশালপন্থীদের প্রেতাত্মা শোষকদের আজও তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ওরা মনে করেছিল, নরহত্যা করে মানুষের শাশ্বত বাঁচার দাবীকে নির্মূল করবে, কিন্তু তারা কখনও ভাবেনি নকশালপন্থীদের কর্মপন্থায় ভুল থাকলেও তাদের মতবাদের কোথাও কোন ভুল নেই। তাই যে নকশাল আন্দোলন এই ছোট্ট গ্রামে জন্ম নিয়েছিল তা আজ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। রাজীব তো রাজ্যসরকার-দের বিশেষ নির্দেশ পাঠিয়েছেন নকশালদের দমন করতে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কিছু কুখ্যাত কর্মচারী দিয়ে নকশাল সেল গঠন করতে বাধ্য হয়েছে।

অমিয়া সোজা হয়ে বসে বলল, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। কমুনিষ্টদের কথাই শোন। একটা কমুনিষ্ট পার্টি ভেঙে দুটো হল, আবার তথাকথিত মার্কসবাদী কমুনিষ্ট ভেঙ্গে নকশালপন্থী মার্কস-লেনিনপন্থী কমুনিষ্ট পার্টি হল। নকশালপন্থীরাও ঐক্যবদ্ধ হতে পারল না তারাও কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হল। এ-সব যা ঘটল তা হল আদর্শ ও মতবাদের পার্থক্যের দরুণ। আবার কংগ্রেস ভাঙল। হল আদি কংগ্রেস আর নব কংগ্রেস। তাও রইল না। আদি হল কংগ্রেস (স) আর নব হল কংগ্রেস (ই)। কংগ্রেস (ই) তথা ইন্দিরা

কংগ্রেসকে আইন স্বীকৃতি দিল কংগ্রেসের উত্তরাধিকারী বলে। এই ভাঙ্গা-ভাঙ্গিতে আদর্শ ও মতবাদের দ্বন্দ্ব কোথাও নেই। দ্বন্দ্ব হল ক্ষমতা ও অর্থের বণ্টন ব্যবস্থার। সেখানেও গোলমাল। কংগ্রেসের যারা নেতা তারা ক্ষমতা ও অর্থ কুক্ষিগত কর'য় লড়াই আরম্ভ হল নীচের তলায়। নীচের তলার কর্মীরা দেখল, তাদের নেতারা ফুলে ফেঁপে উঠেছে অথচ তাদের কপালে জুটছে ছিটেফোঁটা। উগ্র কংগ্রেসী ও কংগ্রেসের অনুগত সেবক অর্জুন সিং ষাট লাখ টাকা দিয়ে মার্বেল প্যালেস নির্মাণ করছে আর ছাতালাঠি বহনকারী কংগ্রেস কর্মীরা হাতের তেলো শুঁখছে কোন্ প্রাচীন যুগে তার পূর্বপুরুষ ঘৃত সেবন করেছে তার গন্ধ পেতে। অর্থাৎ ঘরোয়া লড়াই চলছে ও চলবে। তারপর কংগ্রেস চিরতরে লোপ পাবে ভারতবর্ষের বুক থেকে। এই লড়াই চলছে জনতা পার্টিতেও। মধু দণ্ডবতে, মোরারজি দেশাই প্রমুখ নেতারা রাজীবের মৌলবাদী মুসলীম তোষণ বিল সমর্থন না করলেও তাদের নেতা সাহাবুদ্দিন তা করছে। অর্থাৎ দলের কোন আদর্শ আছে এমন প্রমাণ নেই। এর পরিণতি হল দলের ভাঙ্গন এবং শেষ অবধি অবলুপ্তি। বড় বড় দলগুলিতেই এরকম লড়াই কখনও প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে চলছে। তার ফল ভোগ করছে সাধারণ মানুষ যাদের বলা হয় নেগেটিভ ভোটার।

বললাম, সারা ভারতে প্রতিষ্ঠানগতভাবে শক্ত সংগঠন করেছে দক্ষিণপন্থীদের ভারতীয় জনতা পার্টি, আর বামপন্থীদের মার্কসবাদী কমুনিষ্ট পার্টি ও সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার। এদের মধ্যে আদর্শগতভাবে মার্কসবাদী কমুনিষ্টরা সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের তুলনায় সংগঠন হিসেবে দুর্বল, অথচ তাদের ব্যাপ্তি বেশি কারণ রাষ্ট্রক্ষমতা তাদের হাতে।

অমিয়া বলল, অনেক আঞ্চলিক দলও বেশ শক্ত সংগঠনের দাবীদার।

এদের মাঝেও ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। খেয়োখেয়ি চলছে, চলবে। শাসন-ক্ষমতায় যারা আছে তারা ক্রমশই দুর্বল হবে। এটাতো স্বাভাবিক ভাবেই ঘটবে। আবার চোল-পল্লব সাম্রাজ্য তো গড়ে উঠবে না, ভারতের বর্তমান সাংবিধানিক ও সামাজিক অবস্থায় তা সম্ভব নয় তাই ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটবে। ঘরোয়া লড়াই চলবে। আশার কোন কারণ নেই, এদের পেছনে নৈরাশ্য তাড়িয়ে বেড়াবে। ভাঙ্গন ধরবে, আবার নতুন নতুন দল গজাবে। তবে ভারতের পক্ষে বিপদজনক হল মুসলীম লীগ। ভবিষ্যতে এরা ভয়ঙ্কর অনাসৃষ্টি ডেকে আনবে সংহত ভারতে, তার লক্ষণ এখনই দেখা যাচ্ছে।

আমরা ফিরে এসেছি আমাদের বাসস্থান কলিকাতার উপকণ্ঠে।

অমিয়া কেমন নীরব এবং উদাস। এবারকার ভ্রমণটা বোধহয় মোটেই প্রীতি-কর হয়নি। বাড়িতে ফিরে আসার পর অমিয়ার সঙ্গে দেখা করিনি। অমিয়াও ফোন করে যোগাযোগ করেনি।

আমার নতুন সঙ্গী হয়েছে রামভরস। রামভরসের পেছনের ইতিহাস মনে

রাখার মত। অবশ্য সে এমন কেউ-কেটা নয়, পাশের বাড়ির মাধব দত্তের দোকানে কমবাইণ্ড হ্যাণ্ড। সব কাজই করে। ঝাড়ুদারও নয়, রাতের ওয়াচম্যানও নয় অথচ সবই। বাড়ি ছিল বিহারের কোন গ্রামে। সে গ্রামের নাম সে জানে না, কোন জেলায় সেই গ্রাম তাও জানে না, তবে জিজ্ঞাসা করলে স্পষ্ট করে বলে, আমি হিন্দুস্থানী। শুধু তাই নয়, উত্তরবঙ্গের যে স্থানে সে বড় হয়েছে সেই স্থানের বাংলা অপভ্রংশজাত ভাষা বিনা বাধায় সে বলে থাকে। উত্তরবঙ্গ থেকে গড়াতে গড়াতে কোন একসময় দক্ষিণবঙ্গের কিনারায় নোঙ্গর ফেলেছিল, সেটাও তার কাছে স্পষ্ট নয়। বাংলা বলতে পারে, পড়তে পারে, লিখতে পারে এমন কি বাঙ্গালী ঘরের আচার আচরণও তার অজানা নয়। এহেন রামভরসের সান্নিধ্যলাভ নেহাৎ ভাগ্যগুণেই ঘটে থাকে। রামভরস আত্ম-সচেতন, বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে মোটামুটি খবরও রাখে। সেজন্য তাকে কাছে পেয়ে অনেক কিছু জানার ও শিক্ষার অবসরও পেয়েছি।

রামভরসকে রোজই দেখি কিন্তু তার সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহ ছিল না। কোন কোন সময় মাধববাবু দোকানে না থাকলে তার কাছে জিজ্ঞাসা করেছি, মাধববাবু কোথায় গেছে, এর বেশি বাক্যালাপের প্রযোজন হয়নি। একদিন দেখি, রামভরস মাধববাবুর দোকানের সিঁড়িতে জরসড হয়ে শুয়ে আছে।

ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে রামভরস?

জ্বর হয়েছে বাবু, বলেই উঠে বসতেই দেখলাম তার অধরোষ্ঠের সংযোগস্থলে লাল হয়ে রয়েছে একটা মাংস পিণ্ড। বললাম, তোমার জ্বরটা কেন হয়েছে তা কি ডাক্তারবাবু বলেছে?

ডাক্তার দেখাইনি বাবু। কয়েকদিন ধরেই জ্বর হচ্ছে। ভাবছি হাসপাতালে যাব।

বললাম, রোগটা ভাল মনে হচ্ছে না রামভরস, তুমি কলকাতায় ভবানীপুরে ক্যানসার হাসপাতালে যাও। সেখানে দেখাও।

আমার তো কেউ জানা চেনা নেই।

দরকার হবে না। একটা চিঠি দিচ্ছি। ওখানে ডাক্তার সরকার আছেন। তার সঙ্গে দেখা করবে কেমন?

রামভরস কি যেন ভেবে চুপ করে গেল। পরের দিন সকাল বেলায় আমার চিঠি নিয়ে গেল। তারপর চার পাঁচ মাস তার দেখা পাইনি। মাধববাবুর কাছে শুনেছিলাম রামভরস ক্যানসার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

একদিন বিকেলে এক প্যাকেট সন্দেশ হাতে করে আমার ঘরে এসে ঢুকল রামভরস।

আরে রামভরস যে, কি খবর?

রামভরস বিনীতভাবে বলল, আপনি না থাকলে মরে যেতাম বাবু। কেউ তো বলতে পারেনি আমার কি রোগ। আপনিই প্রায় বুঝেছিলেন, দয়া করে

চিঠি দিয়েছিলেন, তাই বেঁচে ফিরে এসেছি। এই মেঠাই এনেছি আপনাকে প্রণামী দিতে।

অবাক কাণ্ড! ফিরিয়ে দিতে পারিনি। বললাম, রেখে দাও।

এরপর রামভরস শোনাল তার চিকিৎসার কথা। হাসপাতালের ভালমন্দ ব্যবস্থার কথা।

রামভরস মাঝে মাঝেই আসে। সুখ দুঃখের কথা বলে।

একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বাড়ি কোথায় রামভরস?

আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, বাড়ি কোথায় জানিনা। বিহারের কোথাও হবে। তবে জন্মেছিলাম সেরপুরে। বোগুড়া জেলার সেরপুর, মা ভবানীর মন্দির যেখানে। আমার বাবা ছিল মন্দিরের জোগাড়ে। থাকতাম মন্দিরের চত্তরে একটা ঘরে। সেটাই আমাদের পরিচয়।

রামভরস চুপ করে গেল। অতীতের কোন স্মৃতি মন্থন করছিল মাথা নীচু করে। আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। গভীরভাবে নিঃশ্বাস ছেড়ে রামভরস উঠে দাঁড়াল। কোথাও কোন ক্ষতে আঘাত লেগে রামভরস কেমন হয়ে পড়েছিল। আমি আর কোন প্রশ্ন না করলেও রামভরস তার জীবন বৃত্তান্ত যে-ভাবেই হোক টুকরো টুকরো ঘটনা দিয়ে শুনিয়েছিল।

একদিন বলছিল, আমরা হিন্দুস্থানী।

বললাম, হিন্দুস্থানী নয় হিন্দীস্থানী।

আমার কথা বুঝতে পেরে হেসে বলল, তা ঠিক বাবু কিন্তু আমি হিন্দীটাই শিখতে পারিনি।

আরেকদিন প্রশ্ন করেছিলাম, তুমি বিয়ে করনি রামভরস?

কেমন লজ্জা পেল রামভরস মুখ নীচু করে বলল, করেছিলাম বাবু, টিকলো না।

মরে গেছে বুঝি?

না, কেড়ে নিয়ে গেছে। সেই যে সাতচল্লিশ সাল। আগের বছর বিয়ে করেছিলাম সেরপুরের শ্যাম্ মিস্তিরির মেয়ে পদ্মরাণীকে। পনর ষোল বছরের কচি মেয়ে। বেশ কেটেছিল একটা বছর। তারপর কি যে হয়ে গেল কে জানে। ঘর ছেড়ে পদ্মকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সান্তাহারে কি যে কাটাকাটি। উঃ। আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল পদ্মকে, আর আমি মাথায় আর পিঠে জখম নিয়ে পড়ে রইলাম রেল লাইনের ধারে। সে কথা ভাবতেও পারি না আজ। কতদিন হয়ে গেল। পদ্ম হারিয়ে গেল। তা কত মানুষ হারিয়ে গেল, এতো শুধু আমার পদ্ম। কিন্তু কেন এসব হল বাবু। আমরা কি এটা চেয়েছিলাম? তবুও হল। যা হয় তা রোধ করবার ক্ষমতা কারও নেই।

বাধা দিয়ে বললাম, মাধববাবু বোধহয় এসে গেছে। দোকান খোলার সময়।

রামভরস বুঝল তার এসব কাহিনী শুনতে আগ্রহী নই। সেও চুপ করে বেরিয়ে গেল।

আরেকদিন এসে বলল, একটা বিচার করতে হবে বাবু।

কিসের বিচার ?

আরে এদিকে আয় চিতুয়া। এই হল চিতুয়া রিকসা টানে। ভালই ক মাই করে। এদিকে আয় সনুঝরিয়া। সনুঝরিয়া হল চিতুয়ার মা। চিতুয়ার যখন চার বছর বয়স তখন চিতুয়ার বাবা খামখেলান মারা যায়! চিতুয়ার মা আশ্রয় নিল চিতুয়ার কাকা রামপীরিতের বাড়িতে। চিতুয়া বড় হতেই হঠাৎ একদিন গাঁয়ের লোকের সামনে সনুঝরিয়া বিয়ের পিঁড়িতে বসল, বিয়ে করল রামপীরিতকে।

আরও বার বছর পরের ঘটনা।

রামপীরিত আর সনুঝরিয়ার পীরিতে ভাটা পড়তেই এক হাতে চুলের মুঠি আরেক হাতে ঝাঁটা নিয়ে উঠোনে নামল বনাঙ্গণে। হাজার হোক গর্ভধারিণী মা। তার লাঞ্ছনা আর অপমান চিতুয়ার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠতেই আজ সকালে চিতুয়া মাকে রক্ষা করতে কাকার মাথায় লাঠি মেরেছে।

তাই বিচার করতে হবে।

এমন বিপন্ন কখনও আমাকে হতে হয়নি। সনুঝরিয়াকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি ছেলের কাছে থাকবে না তোমার স্বামীর কাছে থাকবে ?

সনুঝরিয়া নিশ্চিন্তভাবে বলল, মরদ কা পাশ।

বিচার শেষ।

অপরাধীর মত মুখভঙ্গী করে চিতুয়া এক পাশে বসে রইল। সনুঝরিয়া রামপীরিতের হাত ধরে চিতুয়ার সামনেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

রামভরস চিতুয়ার পাশে গিয়ে বলল, চল চিতুয়া।

চিতুয়া গামছায় চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল।

এখানেই চিতুয়া নাটকের শেষ হল না। রামভরস কয়েক মাস পরে এসে জানিয়ে গেল চিতুয়া ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়েছে। কোন বড়লোকের প্রাইভেট গাড়ি চালাচ্ছে। তার মা বর্তমান পতির সঙ্গে ফিরে গেছে তার মুলুকে।

অনেক কাজের চাপে আর বাংলার বাইরে ঘোরার জন্য চিতুয়ার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তার কথা মনে করিয়ে দিল রামভরস।

চিতুয়ার বড় বিপদ।

কেন ? কি হয়েছে ?

চিতুয়া তো ভালই চাকরি করছিল, বিয়ে করেছিল। সবই ভালই চলছিল। হঠাৎ তার জ্বর হল ডাক্তার দেখাল, হাসপাতালে গেল। হাসপাতাল বলল, চিতুয়ার টিবি হয়েছে। চিতুয়ার চাকরি নেই। হাসপাতাল থেকে ওষুধ দিয়েছে। চিকিৎসা হচ্ছে কিন্তু খেতে পাচ্ছে না বাবু। বোধহয় খাবারের অভাবেই ছেলেটা মারা যাবে।

বললাম, জ্বর ছেড়েছে ?

হাঁ বাবু। কিন্তু শরীর ভাল হচ্ছে না। খাবার চাইতো।

জ্বর ছাড়লেও কিন্তু টি-বি সারে না। দেড় দু'বছর চিকিৎসা করলে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। সেটা ওকে বলে দিও। ওষুধ যেন এক দিনের জন্যও বন্ধ না করে। যারা এ রোগ সম্বন্ধে কিছু জানে না তারা মনে করে জ্বর ছেড়েছে আর ভয় নেই। সাবধান।

কি সাবধান হবে বাবু। ওষুধ খাচ্ছে খাবার পাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ ভেবে বললাম, দিনের বেলায় আমাদের বাড়িতে খাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি কিন্তু রাতের ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।

রামভরস রাজি হয়ে গেল।

সকালবেলায় আমার বাড়িতে খাবার ব্যবস্থা করলেন বউদি, আর রামভরস রাতের ডালরুটির ব্যবস্থা করল।

ছয়মাস পেরলো না। রামভরস এসে বলল, চিতুয়া ভাল হয়ে গেছে, আবার সে ড্রাইভারির কাজ নিয়েছে।

বললাম, সর্বনাশ করেছে। ওর রোগ সারেনি। আবার রোগ দেখা দেবে। ওকে কাজ ছেড়ে বিশ্রাম করতে বল রামভরস, নইলে বাঁচবে না।

রামভরস চলে গেল।

বড়বউদির কাছে শুনলাম চিতুয়া আর খেতে আসে না।

চিন্তায় পড়লাম। ছেলেটা যে মরণকে ডেকে আনছে তা বুঝতে কষ্ট হল না। রামভরস একদিন এসে বলল, চিতুয়া দেশে গেছে বাবু। আবার ওর জ্বর হয়েছে, এবার সে গেছে হাওয়া বদল করতে।

হাওয়া বদল করে চিতুয়া আর ফিরে আসেনি। রামভরসের কাছেই শুনেছি চিতুয়া দেশে যাবার ষোল দিন পরে মারা গেছে।

দুঃখিত হলাম। করার কিছু নেই। অজ্ঞতা ওর মৃত্যুকে ডেকে এনেছে। তাকে সাবধান করেও কোন ফল হয়নি। নিরাময় যোগ্য রোগের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে মৃত্যুকে ডেকে আনা কোন ক্রমেই সহ্য করতে পারছিলাম না।

রামভরস কিন্তু তার সামর্থ্য মত সাহায্য করেছে চিতুয়াকে। কোন দিন কোন অনুযোগ করেনি। মনে মনে রামভরসের প্রশংসা করেছি।

অনেক সময় ভেবেছি এরকম চিতুয়া আর রামভরসের সংখ্যা কত। কলকাতার ফুটপাতে যে হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছে তাদের কি কোন দিনই কোন আশ্রয় ছিল না অথবা তারা আশ্রয় বঞ্চিত হয়ে ছুটে এসেছে শহরের ফুটপাতে বাঁচার তাগাদায়। সারা ভারতে চলছে মাৎস্যন্যায়। সবল দুর্বলকে বঞ্চিত, শোষিত, অত্যাচারিত করে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করছে। মধ্যযুগে লগুড় হস্তে দুর্বলের কণ্ঠরোধ করা হত, বর্তমানে দুর্বলকে নিরন্ন ও নিরাশ্রয় করে কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। মধ্যযুগে ছিল অস্ত্রের ঝনঝনানি, বর্তমান যুগে রয়েছে মুদ্রার ঝনঝনানি। মুদ্রা যার কুক্ষিগত সেই সর্বশক্তিমান। মুদ্রার ব্যাপারীরা সহজ সরল ন্যায়সম্মত পথে অর্থোপার্জন করে না, তাদের লোভের পরিসীমা নেই, তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করার সাহসও নেই দুর্বলের। এই ভারতের

কুৎসিত চিত্রের চিত্রা আর রামভরস সামান্য নগণ্য একটা উদাহরণ মাত্র।

বংশ পরম্পরায় রাজ্য পরিচালনা করে এসেছে মধ্যযুগের রাজা বাদশাহরা অস্ত্রের শক্তিতে। বর্তমান যুগেও একই ঘটনা ঘটে চলেছে অর্থের শক্তিতে ও চাতুরীতে। ভারত তার ব্যতিক্রম নয়। রাজীব আমাদের উপহার দেবেন পরিচ্ছন্ন প্রশাসন, নিয়ে যাবেন প্রগতির পথ বেয়ে একবিংশ শতাব্দীতে। হায়, রাজনীতি! ক্ষমতা হাতে পেলে ভারসাম্য রক্ষা কত কঠিন তার দৃষ্টান্ত রাজীব তুলে ধরেছেন জনসমক্ষে। তিনি যে পথে চলছেন তা যেমন তার পতনের পথ উন্মুক্ত করছে, তেমনই জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার পথ খুলে দিয়েছে।

কংগ্রেসের কোন এক স্তাবক এক সময় চিৎকার করে বলেছিল, India is India and Indira is India. এহেন স্তাবককে আশ্রয় নিতে হয়েছে রাজনীতির ডাস্টবিনে। তাকে মনে রাখার মত একজনও নেই সারা ভারতে। বর্তমানে আরেকজন স্তাবক বলছে, দশ বছর, মাত্র দশ বছর পর রাজীবের মূল্য বুঝবে দেশের লোক। এই স্তাবক আবার ডিগবাজী বিশারদ। ক্ষমতার লোভে দল বদল, মত বদল এর কোষ্ঠীর লিখন। ইন্দিরা কংগ্রেসে যোগ দেবার চেয়ে আত্মহত্যা করা যে সহজ, এই ঋষি কথিত বাক্য এই স্তাবক শুনিয়ে এসেছে অনেক কাল। তারপর? ক্ষমতার লোভ, অর্থের সুগন্ধ তাকে ন্যায়নীতি থেকে হটিয়ে শুধুমাত্র একটি যোগ্যতার অধিকারী করেছে, তা হল স্তাবকতা। পরিচ্ছন্ন প্রশাসন গড়বে রাজীব! হাঁ, তার অতি নিকট সহচর অর্জুন সিং যখন প্রথম বিধানসভায় এসেছিল তখন তার সম্পদ ছিল মাত্র আড়াই হাজার টাকা আর আজ সে ষাট লক্ষ টাকা ব্যয় করে মার্বেল প্যালেস তৈরি করেছে কি পরিচ্ছন্নতায় রথে আরোহণ করে তা নিশ্চয়ই রাজীব জানেন, তাই অর্জুন সিংহের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে অতি নিকটজন করে নিয়েছেন রাজীব। একবিংশ শতাব্দীতে প্রগতিশীল পদক্ষেপ করতে প্রথমেই তালাকি মুসলীম নারীদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন, তা একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষকে সংহত রাখতে পারবে কিনা সেটাও ভাল করে ভাববার সময় এসেছে। একবিংশ শতাব্দীতে হয়ত হিন্দু ভারত আর মুসলীম ভারত জন্ম নেবে, তার জন্য উত্তরপুরুষদের প্রস্তুত থাকতে হবে। রাজীবের সুচিন্তিত অপরিণামদর্শী রাজনীতিজ্ঞান সমগ্র ভারতে সৃষ্টি করেছে অশান্তির দাবানল। এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে পাইলটগিরি আর ভারতীয় রাজনীতির পাইলটগিরি এক কথা নয়। সুদর্শন রাজীব কর্মক্ষেত্রে সুদর্শন কতদিন থাকবেন সেটাই চিন্তার বিষয়।

তবে রাজনীতি বড় কঠিন বস্তু। আজ যে শত্রু কাল সে শয্যাসঙ্গী, এতো হামেশাই দেখা যায়। রাজীবের বাল্যস্মৃতি ক্ষীণ নইলে সে সতর্ক হত। রাজনীতির খেলায় ভারতের সর্বাধিক ক্ষতিকারক মুসলীম লীগকে শয্যাসঙ্গী করা কংগ্রেসের পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হত না। সাইনবোর্ড পাল্টালে চরিত্র বদল হয় না এটা জানা উচিত ছিল। শুধুমাত্র ইন্দিরা কংগ্রেসেই নয়, বামপন্থীরাও পুর নির্বাচনের প্রয়োজনে এস-ইউ-সি'র সঙ্গে সমঝোতায় এসেছে অথচ বিধানসভায়

এই দুই দল ভিন্নমুখী। এ যেন দরকারে প্রেম করব, কিন্তু বিয়ে করব না। আমার প্রেমের সঙ্গী, গৃহের গৃহিণী নও। এমনই একটা মনোভাব নিয়ে রাজনীতির দাবাখেলায় বামপন্থীরাও মেতেছে। ভারতীয় রাজনীতিতে দলীয় আদর্শ বলে কিছু নেই, আছে ক্ষমতালাভের জন্য প্রযোজনের দাসত্ব। বামপন্থী ঐক্যের জন্য যখন এস-ইউ-সি আন্দোলন করেছে তখন তথাকথিত বামপন্থীরা নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে অথবা ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে হতে পারে এই চিন্তায় অথবা অপচিন্তায় এস-ইউ-সি'র ডাকে সাড়া দেয়নি পুব নির্বাচনে হঠাৎ তারা ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারল পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করতে হলে একক-ভাবে তাদের যোগ্যতা নেই তাই তারা ধর্ণা দিয়েছে এস-ইউ-সি'র দরজায়।

বিচিত্র রাজনীতি।

বিচিত্র সমাজনীতি।

বিচিত্র অর্থনীতি!

এগুলোই তো জনজীবনের সব কিছু। জনজীবনে দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োজন বিন্দুমাত্র নেই, জনসাধারণ বুঝেছে কোনটা abstract আর কোনটা concrete জনসাধারণ যখন দেখে সেদিনের শত্রু আজ শয্যাসঙ্গী তখন শ্রদ্ধাটা ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে। তারা ভেবেই ঠিক করতে পারে না, এরপর কি হবে।

বিবেক আর আত্মসম্মান বিসর্জন না দিলে নাকি রাজনীতির খেলোয়াড় হওয়া যায় না! মলয়া বলে, রাজনীতির ওরা খেলোয়াড় নয়, ওরা রাজনীতির ব্যবসায়ী। অল্প মূলধনে অধিক মুনাফা লোটার ধান্দাবাজ।

তবুও মলয়া বলল, এরা চালিয়ে যাচ্ছে কাকা। কত কাল চলবে বলতে পার?

জানি না। কালের সীমা টানতে না পারলেও এটা জানি, অন্যায়কারীকে মানুষ কখনও ক্ষমা করে না। আমি-তুমি তো মানুষের প্রতীক মাত্র, মানুষ জাতি হিসাবে ধ্বংস হয় না। উত্তরপুরুষরা ধীরে ধীরে সজাগ হয়, প্রতিরোধ করে, প্রতিবিধান করে, প্রতিশোধ নেয়, সুদে আসলে উশুল করে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা।

রামভরস মাঝে মাঝে আসে। নানা কথার মাঝ দিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা দেখে ক্ষোভ জানায়।

একদিন বলল, কলকাতায় ছিলাম বাবু। যে বারান্দায় রাত কাটাতাম তার সামনে ফুটপাতে এক বৃদ্ধা, সঙ্গে তার জওয়ান মেয়ে আর নাতনী নিয়ে রোজ রাতে ঘুমোত। ক'দিন পরে দেখলাম বৃদ্ধা আর তার নাতনীটা রয়েছে, মেয়েটা নেই। দশ বারদিন পর মেয়েটা ফিরে এল। আবার কয়েক দিন পর জওয়ান মেয়েটা অদৃশ্য হল। আবার দশ বারদিন পর ফিরে এল। এ যেন চাকার মত ঘুরছে। এরা যে কি করে তা বুঝতে কষ্ট হয় না, কষ্ট হয় ওদের এই জীবন যাত্রা দেখে।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। রামভরস বুঝল প্রসঙ্গটা আমার রুচির বাইরে। এই সব বিষয় বিশ্লেষণ করা আমার অভিপ্রেত নয়। রামভরস রণে ভঙ্গ দিল সেদিনের মত।

কয়েক মাস পরে রামভরস এসে আমার ঘরের দরজায় বসল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি খবর রামভরস ?

খবর কিছু নেই। কলকাতায় ছিলাম। আসতে পারিনি। এসে দেখা করলাম। হাসপাতালে চেকিং-এর জন্য যেতেই হয়। তা কলকাতায় একটা কাজের তালাস করছিলাম।

কাজ পেয়েছ কি ?

পেয়েছিলাম, ছেড়ে দিয়ে এলাম। কলকাতায় থাকলে গুণ্ডাদের হাতে প্রাণ দিতে হবে বাবু। বড় নক্কারজনক জায়গা।

কি বলছ রামভরস, কলকাতার মত জায়গা ভারতে আর দ্বিতীয়টি পাবে না। সারা পৃথিবীর মানুষ এখানে আসছে, বাস করছে, জীবিকা খুঁজে পাচ্ছে, স্বল্প ব্যয়ে দিন গুজরান করছে, আর তুমি বলছ নক্কারজনক। আশ্চর্য !

না বাবু আশ্চর্য নয়। আপনি জানেন তো হাজার হাজার মানুষ কলকাতার ফুটপাতে বাস করে। কেউ কেউ বউ ছেলেমেয়ে নিয়েও বাস করে। কেউ ঠেলাওলা, কেউ রিক্সাওলা কেউ ছেঁড়া কাগজ কুড়োয়, কেউ রাস্তার পোড়া কয়লা কুড়িয়ে পেট ভরায়। এদের মধ্যে ভাল লোকও আছে আবার দুষ্ট লোকও আছে।

বললাম, জানি। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় এ রকম হাজার হাজার মানুষ এসে আশ্রয় নিয়ে ছিল ফুটপাতে। দরজায় দরজায় যেন ভিক্ষা করেছে। দাঙ্গার সময় প্রাণের ভয়ে বেশির ভাগই ফিরে গিয়েছিল তাদের পুরানো আস্তানায়। দেশ স্বাধীন হবার পর আবার অনাহারীর স্রোতে কলকাতার ফুটপাত ভর্তি হয়েছে। এদের একসময় ঘর ছিল, সংসার ছিল, এখন কিছু নেই। হয়ত গ্রামে পনর হাত জমির ওপর হোগলাপাতায় ঢাকা একটা ঝুপড়ি কারও কারও আছে। আর কিছুই নেই।

এদের মানসম্মান ইজ্জতও নেই বাবু। সে এক ভয়ঙ্কর রাত। আমি মালিকের দোকানের দরজায় শুয়ে আছি। কিছুটা দূরে একটা জওয়ান ছেলে আর তার বউ শুয়ে আছে। রাতের বেলায় ধাক্কা দিয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গাল চার পাঁচজন জওয়ান ছেলে। একজন একটা ছুরি বের করে বলল, চুপ করে শুয়ে থাকবি। শব্দ করলেই জান যাবে। আর চার পাঁচজন গিয়ে জওয়ান ছেলেটাকে ছুরি দেখিয়ে বলল, চুপ করে শুয়ে থাক, নহলে তোরও জান যাবে। দুজন ছুরি আর বোমা হাতে করে আমাদের দু'জনকে পাহারা দিচ্ছিল, আর তিনজন জওয়ান মেয়েটাকে তার স্বামীর কাছ থেকে মুখ চাপা দিয়ে অন্ধকার গলির মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ পর, দুজন ফিরে এসে আমাদের পাহারা দিতেই আগের দুজন গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

আমার মাথা বোঁ-বোঁ করে উঠল। তার শেষের কথাগুলো শুনতে পাইনি ভাল করে। চুপ করে চেয়ে রইলাম রামভরসের মুখের দিকে।

রামভরস বলল, আমি ভয় পেয়েছিলাম বাবু। শেষ রাতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে মেয়েটা ফিরে এল। সে কি কান্না! না বাবু। কলকাতা ভাল নয়।

নক্কারজনক জায়গা।

ওরা পুলিশে খবর দিয়েছিল কি?

দিয়ে কি হবে, কাউকেই তো ওরা চেনে না। তবে খুব দূরের লোক নয়। কাছাকাছি কোনো বস্তির লোক। কিন্তু ওরা কি অসহায়। ঘুটিয়া শরীফের কাছের কোন গ্রামে ওদের বাড়ি। ছেলেটার নাম তমিজ। মেয়েটার নাম বিজলী বিবি। যে শহরে প্রকাশ্য রাজপথ থেকে বউকে স্বামীর কাছ থেকে টেনে তুলে নিয়ে যায় ধর্ষণ করতে সে শহরে মানুষ বাস করে ঠিকই কিন্তু মানুষের চেয়ে জানোয়ারের সংখ্যাই বোধহয় বেশি। তাই চলে এসেছি আপনাদের আশ্রয়ে।

মাধববাবুর দোকানে কাজ পেয়েছ কি?

পাব বাবু। মাধববাবুর মনটা বড় দরাজ। আমার জন্য অনেক কিছু করেছেন। করবেনও। তবে এখনও তার কাছে যাইনি।

রামভবসের কাহিনী শুনিয়েছিলাম অমিয়াকে।

অমিয়া গম্ভীরভাবে বলল, আমরা আর বিংশ শতাব্দীর এই সব ছোটখাট কথা ভাবতে পারছি না। ভাবনা চিন্তার সময় নেই। আমরা একবিংশতি শতাব্দীর কর্ম তালিকা তৈরি করছি। প্রথম তালিকায় রয়েছে ধনীকে আরও ধনী হবার সুযোগ দাও, বাইরের পুঁজি ডেকে এনে দেশকে সমৃদ্ধ কর। বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে ভারতের সব সম্পদ রেহান দিয়ে আত্মসুখ ভোগ কর। হিন্দু ভারত আর মুসলমান ভারতের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন কর। মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা বলে প্রচার চালাও, গরীবকে নিরন্ন কর। এই সব মহান কাজ যাদের করতে হবে তাদের কি কোন এক ঘুটিয়ারী শরীফের তমিজ আর বিজলী বিবির কথা ভাবার সময় অথবা সুযোগ আছে? স্বাধীন দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা আর সমাজবাদ যখন এসে গেছে তখন আর ওসব বাজে জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার কি?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অমিয়া বলল, তুই তো জানিস, স্কুল কলেজের মেয়েরা নিরাপদে স্কুল কলেজে যেতে পারে না। আমাদের দেশের বীরপুঙ্গবরা এই সব অসহায় মেয়েদের লাঞ্ছিত করার সব সময় চেষ্টা করে কিন্তু নিরুপায় অবিভাবকরা আপশোষে মরে, কিছুই করতে পারে না। মাঝে মাঝে ছাত্রী অপহরণের সংবাদ কাগজে পড়ে আমরা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। সমাজের অবস্থা রোধ করার সামর্থ্য আমাদের নেই। প্রশাসন চোখ বুজে থাকে। এরপর কি তাই ভাবছি। হিন্দী সিনেমার নায়ক নায়িকা আর ভিলেনরা এরপর প্রকাশ্যে রাজপথে যদি নেচে নেচে বেড়ায় তাতেও বিস্মিত হোস না।

আমি চুপ করে ছিলাম। অমিয়াকে উত্তেজিত মনে হল।

কুম্ভমেলায় জীবননাশের ঘটনা সবাই জানত। কেউ কোন মন্তব্য করেনি। রাতের বেলায় খেতে বসে শ্যামলী বলল, জানো কাকা অলকানন্দার পথে বাস চাকা পিছলে নদীতে পড়ে গেছে। বহু তীর্থযাত্রী মারা গেছে।

হেসে বললাম, এরকম মৃত্যু অর্থাৎ তীর্থযাত্রীদের মৃত্যু প্রতি বৎসরই হয়ে

থাকে। বছরে হাজারখানেক নারী-পুরুষ এইভাবে প্রাণ হারায়।

এটা কি হাসির ব্যাপার।

না দুঃখের কিন্তু যারা তীর্থযাত্রী তারা তো মুক্তির পথ খুঁজতে যায়। তাদের এই মৃত্যু মুক্তির দুয়ার খুলে দেয়। ভাগ্যবান ভাগ্যবতী। সশরীরে মুক্তিলাভ ক'জন করে। বিশেষ করে ধর্মের নামে তীর্থপথের এই মুক্তি শুধু মুক্তি নয়, স্বর্গদ্বারে বিনা বাধায় ও বিনা ব্যয়ে পৌঁছানো অর্থাৎ ভাগ্যের সুকৃতি।

শ্যামলা রাগ করে মুখ ফিরিয়ে বসল।

আমি মোটেই ক্ষুব্ধ হলাম না। কারণ, বহুবার শ্যামলাকে বলেছি ধর্মের নামে যত জীবনহানি ঘটেছে পৃথিবীতে তার অর্ধাংশও সাম্রাজ্যবাদীর তলোয়ারে ঘটেনি।

আরেকদিন অমিয়া বলেছিল, জানিস দাদু, আমাদের দেশটা হল ভিখারীর দেশ। দেশের অভ্যন্তরে নর্দমার পোকার মত সীমাহীন দরিদ্ররা কিলবিল করছে. যারা অর্থের চাকচিক্য নিয়ে বড়াই করে তারাও চাকচিক্য বজায় রাখতে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে পৃথিবীর ধনীদেশগুলোর দরজায় দরজায় ঘোরে। চিয়াং কাইশেকের চীনে এই ভয়াবহ অবস্থা দেখা গেছে। বর্তমানে আমাদের দেশেও তারই সূচনা সর্বত্র। সে সময় চীন দেশে একটা দেশলাই ক্রয় করতে যে অর্থের প্রয়োজন হত বর্তমানে আমাদের দেশেও সেই রকম মুদ্রাস্ফীতি ও ও মুদ্রামূল্য হ্রাস হয়ে চলেছে। উন্নয়নের নামে আমাদের অবনমনের পথটা প্রশস্ত করে তুলেছে বর্তমান আর্থিক ব্যবস্থা।

আরেকদিন বলেছিল, তোর সেদিনের কথাগুলো আজও মাঝে মাঝে ভেবে কেমন একটা অবসাদ অনুভব করি। ভারতে পঙ্কিল সমাজ-ব্যবস্থার কথা ভাবতে ভাবতে চিয়াং কাইশেকের চীনের কথা মনে পড়ে যায়। চীনের লর্ড, ল্যাণ্ডলর্ড আর ওয়ার লর্ডদের জীবন আর চীনের সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে কত না গল্প কাহিনী উপন্যাস রচনা হয়েছে। এইসব কাহিনীর সবটাই সত্য নয়, তবুও এইসব কাহিনী বাস্তবের অতি কাছাকাছি। চীনের এই সব লর্ডদের থাকতো অসংখ্য রক্ষিতা। গরীব ভূমিহীন শ্রমদাসদের ঘরে যুবতী মেয়ের খবর পেলেই এই সব লর্ডরা টেনে আনত তাদের সংরক্ষিত হারেমে, যেখানে থাকত আরও বহু রক্ষিতা। অপর দিকে চীনের গরীব ভূমিহীন শ্রমদাস পুরুষরা কুমারী কন্যা পেত না বিয়ে করতে। জমিদার বাড়ির প্রায় বিগত যৌবনা নারী যখন ভোগের অযোগ্য মনে হত তখন তাদের বিদায় করে দেওয়া হত হারেম থেকে। সেই সব নারীকে সাদরে পর্ণ কুটিরে স্থান দিয়ে ভূমিহীন শ্রমদাসরা সংসার পাততো বোধহয় পুরুষ জীবনের সব চেয়ে মোক্ষলাভের পথ খুঁজে পেতে।

আমি অমিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছিলাম, অমিয়া এত সূক্ষ্মভাবে সমাজকে বিচার করার মনটা কোথা থেকে পেল।

অমিয়া আরও বলেছিল, আজ আমরা নারীর সম অধিকারের দাবীর কথা বলে থাকি কিন্তু এই অধিকার আদায় করতে যে শিক্ষা ও পরিবেশ প্রয়োজন তাকি আছে আমাদের দেশে? তা যদি থাকত তা হলে পতিতালয় থাকত কি

দেশে? এরা কারা? আমাদের ঘরের মা-বোন সামাজিক অনাচারে অথবা সাময়িক ভ্রমে এই পথে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয় বা হচ্ছে। সেদিন তোকে বলেছিলাম চীনের গরীব ভূমিহীন শ্রমদাসদের যে কুৎসিৎ সংসার জীবনের কথা তার সঙ্গে যোগ দিতে পারিস, এই সব পুরুষরা তো ঈশ্বরের বিশেষ অনুকম্পা-লাভের জন্য ব্রহ্মচারী তপস্বী নয়, তারাও নারীসঙ্গ কামনা করে। তাদের শ্রমলব্ধ অর্থ কণামাত্র সঞ্চয় করে মাসে দু'মাসে এক আধবার পতিতালয়ে গিয়ে স্বর্গীয়সুখ এবং পার্থিব রোগের জ্বালা একই সঙ্গে উপভোগ করতে। চিয়াং-কাইশেকের রাজ্যে অসংখ্য পতিতালয় ছিল চীনের শহরে, গ্রামে, গঞ্জে।

বলেছিলাম, এসব তো আমিও শুনেছি।

অমিয়া বলেছিল, শোনা কথা আইনে সত্য বলে স্বীকার করে না। মার্কিন মহিলা সাহিত্যিক পার্ল বাক তার যে গ্রন্থটি লিখে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন সেই 'গুড আর্থ' বইটা ভাল করে পড়িস। যদিও সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টি ভঙ্গীতে লেখা ওই বইটি তবুও সত্যকে কোন ক্রমেই গোপন করা সম্ভব হয়নি। আমাদের দেশেও এই অবস্থা দেখা দিচ্ছে। আমরা পথে ঘাটে নারীর অবমাননা দেখে চমকে উঠি, বলি এইসব ছেলে সমাজ বিরোধী কিন্তু মনে হয় এরাও বিভ্রান্ত হতাশাগ্রস্থ ছেলে যাদের ভবিষ্যত হল ঘোরতর অন্ধকার। এই অন্ধকারকে উপলব্ধি করেই এরা বিপদে পা বাড়ায়।

বলেছিলাম, এর পরিমাণ কি?

সেটাই তো ভাবছি। মার্কিন সৈন্য জাপান দখল করে জাপানী মেয়েদের নিয়ে পাশবিক খেলায় মেতে উঠেছিল। তৎকালে এদের সৃষ্ট জারজ সন্তানদের জাপানী সমাজ পুনর্বাসন দিয়ে সমাজ রক্ষা করেছে, কিন্তু আমাদের দেশে তা কি সম্ভব! রাজীব মুসলীম তালাকি আইন যা করেছেন তাতে সন্তান পালনের দায়িত্ব বর্তমানে মায়েদের ওপর। এই সব সন্তান কি মানুষের মত মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। আর তালাকি মহিলাদের ভরণপোষণের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে নারীর মর্যাদা কতটা রক্ষিত হবে তা গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখা দরকার। ভবিষ্যতে রেড লাইট এলাকা বিস্তৃত হবে।

বলেছিলাম, বাংলাদেশ থেকে আগত বহু মহিলাদের ভারতে আটক করা হয়েছে। তাদের পাচার করা হচ্ছিল আরবীয় দেশে। এই সব মহিলাদের অধিকাংশই তালাকি নারী। এদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কেউ নেয়নি, তাই তারা অজানা ভ্রমাত্মক পথে পা বাড়িয়েছিল। এমন অবস্থার ভারতীয় মুসলীম নারীরা যে শিকার হবে না, কে বলতে পারে। সরকারী নীতি জনসংখ্যা হ্রাস। এই ভাবে জনসংখ্যা হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি পাবে, তখন রুটিরুজিতেও টান পড়বে। এ সব কথা ভেবে মনে হচ্ছে, এরপর কি! এটাই শেষ কথা নয়। রাজীব তার মুখোমুখি তালাকি বিলের সমর্থন করেনি এমন বহু কংগ্রেস কর্মীকে দল থেকে খারিজ করে দিয়েছে, অর্থাৎ এই বিলের জন্য কংগ্রেসে যে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে তার গতি রোধ করা রাজীবের সামর্থ্য নেই।

ক্ষমতার মোহ রাজীবকে উন্মাদ করেছে। ভাবছি, এরপর কি !

শ্যামলীর সঙ্গে কথা বলছিলাম। সে বলল, জানো কাকা, যে ব্যক্তি এক সময় ভারতের অর্থভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করত সেই ব্যক্তি রাজীব কংগ্রেসে অপাংক্তেয় কারণ রাজীবের হঠকারিতার সমর্থক নয়। আমরা তো হিটলার আর মুসোলিনীর ডিকটেটারীর কথা বলে থাকি, এই হঠকারিতা কি তার চেয়ে লঘু ডিকটেটরী। বরং বলা যায়, এত বড় দেশ যে ভাবে রাজীব শাসনকার্য পরিচালনা করতে চান তা ভবিষ্যতে হিটলার মুসোলিনীকে টেক্কা না দেয়।

গোলমাল কোথায় জানিস শ্যামলী। উপোসী লোক প্রচুর খাদ্যসম্ভার দেখে যেমন আত্মসংযম করতে পারে না, সেই অবস্থা হয়েছে রাজীবের। রাজীব বিমানের পাইলট থেকে ভারতবর্ষের মত বিমানের পাইলট হতে গিয়ে সব গুবলেট করে ফেলছে। তার অভিজ্ঞতা রাজনীতির ব্যাপারে চোখে পড়ছে না। বিশেষ করে তার কো পাইলটরা পরিষ্কার তার মস্তক ভক্ষণ করছে। কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। আমরা অপেক্ষা করছি রাজীব কি ভাবে শেখে তাই দেখতে।

চিত্রা মরেছে। রামভরস চাকরি করছে কলকাতায়। অরিন্দম হারিয়ে গেছে অমিয়ার জগৎ থেকে, বিমলের বয়স হয়েছে, আজকাল বিশেষ আসতে পারে না। মলয়া বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে দিল্লীতে চলে গেছে। শ্যামলী এখন আমার সঙ্গী। মাধুরী ফিরে আসেনি। অমিয়া তার প্রত্যাবর্তনের আশা ছেড়ে দিয়েছে। আমার জীবনে আঘাত এল মাতৃসমা বড়বউদির বিয়োগে। দুঃখ পেয়েছি, প্রবোধ দিয়েছি নিজেকে। সবাই তো যাবে। আসাটাই তো যাওয়ার জন্যে। স্থিতিটা হল লীলাখেলা। খেলা ফুরোবার আগেই ছুটতে হয় সবাইকে। অসমাপ্ত খেলায় আবার স্থান করে নেয় পূর্বকে অগ্রাহ্য করে উত্তর। এই তো মানুষের জীবন ও পরিণতি। তবুও স্মৃতি বড়ই বেদনাদায়ক।

পৃথিবীর ভৌগোলিক কোন চিত্র স্থির নয়। ভূগোল বদল হচ্ছে, ইতিহাস বদলা হচ্ছে, মানুষ বদল হচ্ছে, বদল হচ্ছে মানুষের জন্মগত বৃত্তিগুলো। এরই ছবি প্রতিনিয়ত আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সত্যকে অস্বীকার করতে মিথ্যার বেসাতি করছি, যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতে প্রলেপ না দিতে পেরে মুখে হাসির প্রলেপ দিতে বাধ্য হচ্ছি।

শ্যামলীকে বলেছিলাম, দেশের এই অবস্থা দেখে ঘাবড়ে যেওনা শ্যামলী। তুমি নিশ্চয়ই জানো, ধনতন্ত্রী অথবা স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থা একটা নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে পারে না। যখন প্রান্তদেশে এই রাষ্ট্রব্যবস্থা পৌঁছে যায় তখন যা প্রকটিত হয় তা হল অন্তর্দ্বন্দ্ব, শাসক বিরোধীদের ওপর চরম অত্যাচার, যখন এগুলোও ব্যর্থ হয় তখন তাদের নজর পড়ে প্রতিবেশীদের দিকে। যুদ্ধের সম্ভাবনাকে জোরদার করে। এই সবই হল স্বৈরতন্ত্রী ও ধনতন্ত্রীদের দেউলিয়া হবার লক্ষণ, এরপর সামান্য আঘাতেই দেউলিয়া প্রশাসন তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে যায়। আঘাত দেয় দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গরীব ভূমিহীন শ্রমজীবিরা

এগিয়ে আসে আঘাত দিতে।

শ্যামলী প্রশ্ন করেছিল, তোমা এই বক্তব্য ভারতবর্ষে প্রযোজ্য কি ?

হ্যাঁ। কংগ্রেস বিভক্ত হয়েছে বার বার। নিজেদের মধ্যে মারামারি ঝগড়া নিত্যকার ঘটনা যখনি দলে বিরোধ দেখা দেয়, যার হাতে ক্ষমতা থাকে তখন তারা বিরোধীদের উচ্ছেদ করতে নেমে পড়ে। কংগ্রেসী শাসনকালে ভারতের দুঃখ দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছে, দেশরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে, পর পর তিনবার পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইতে নেমেছে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে। এ করেও জনমানসে প্রভাব বিস্তার করতে না পেরে সাম্প্রদায়িকতাকে জিইয়ে রেখে সমস্যা আরও ঘোরালো করে তুলেছে। রাজনৈতিক দেউলিয়াপণার এগুলো হল প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ভারতের পক্ষে এটা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। চারিদিকে বিচ্ছিন্নতার হুঙ্কার, জনসাধারণের নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও শোষিত অংশ ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

শ্যামলীর প্রশ্ন, এরপর কি ?

আমার উত্তর, আমিও ভাবছি, এরপর কি।

ভূগোলের চিত্র বদল করতে পাঞ্জাবে পাঁচপন্থী স্বাধীন খলিস্তান সরকারের ঘোষণা বেশ টালমাটাল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। হরমন্দিরের চত্বরে অকালতখত দখল করে স্বাধীন খলিস্তান করার ঘোষণার অর্থ দেশদ্রোহিতা বিচ্ছিন্নতাকে স্থায়ী রূপ দেবার প্রচেষ্টা। কোন সার্বভৌম সরকারের পক্ষে এত বিচ্ছিন্নতা, সন্ত্রাস সৃষ্টি, নরহত্যা ও দেশদ্রোহিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। অকালতখতে পুলিশ পাঠিয়ে এই সব দেশদ্রোহী খলিস্তানপন্থীদের গ্রেপ্তার করা সরকারী কর্তব্য। মুখ্যমন্ত্রী বারনালা পুলিশ পাঠিয়ে অকালতখত থেকে ওই সব দেশদ্রোহীদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করায় পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। কারণ, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতিকে এমনভাবে জড়িয়ে রেখেছে কিছু সংখ্যক শিখ, যার জন্য প্রতিক্রিয়া মোটেই সুখকর হয়নি। তার মন্ত্রীসভার কিছু সদস্য পদত্যাগ করেছে কারণ পুলিশ হরমন্দির চত্বরে প্রবেশ করে তাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছে। যারা পদত্যাগ করেছে তারা একবারও বলেনি যে অকালতখতে দেশদ্রোহীদের ঘাঁটি করতে দেওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ এরাও গোপন দেশদ্রোহী। ধর্মের নামে পবিত্র মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে দেশে অশান্তি বৃদ্ধি করে। বিশেষতঃ নিরীহ হিন্দুদের অকারণে হত্যা করে যারা খলিস্তান চায় তাদের মূর্খতাকে এরা অনুমোদন করে থাকেন গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে।

সাবধান !

আহাম্মদশাহ আবদালী হরমন্দির অপবিত্র করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। ইন্দিরা গান্ধী সৈন্য পাঠিয়ে অপবিত্র করেছিলেন বিগত চুরাশি সালে আর ছিয়াশিতে অপবিত্র করেছেন সুরজিত সিং বারনালা। অতএব ইন্দিয়ার ভাগ্য লেখা আছে বারনালার কপালে।

অদ্ভুত যুক্তি, জঘন্য রক্ত পিপাসা নিয়ে যারা রাজনীতিকে বধ্যভূমি করতে

চায় তাদের মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সবারই সন্দেহ রয়েছে। এইভাবে গুপ্ত হত্যা দিয়ে কোন রাষ্ট্রের পত্তন সম্ভব নয়। মধ্যযুগে গুপ্ত-হত্যা করে রাজ্য দখল করা সম্ভব হয়েছে, বিশেষ করে সাম্রাজ্য পতনের যুগে। এমন এক সময় ছিল যখন মোঘল মসনদের দাবীদার হত জহ্লাদরা। তারা যে কোন উপায়ে বাদশাহকে কোতল করে বাদশাহী মসনদ দখল করত। সেই যুগে সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগাযোগ ছিল না। কে রাজা হল, আর মরল তা নিয়ে রামায়ণ মহাভারত রচনা হত না কিন্তু আজ জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ, রাষ্ট্রকে গুপ্তহত্যা দিয়ে দখল করার জমানা অনেক কাল আগেই শেষ হয়েছে। সে স্বপ্ন যারা দেখে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করে। তাদের সুমতি হোক, যতদিন তা না হবে ততদিন সাধারণ মানুষকে কিছু দুর্ভোগ সহ্য করতেই হবে। ভারত সরকার অসহায়ের মত চেয়ে রয়েছে, যে ব্যবস্থা আজ অবধি গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলাফল দেখে সাধারণ লোক ভাবছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেন অতীতের রোম সম্রাট নিরোর ভূমিকা নিয়েছেন। যখন পানজাবে, ত্রিপুরায়, নাগাল্যাণ্ডে, মণিপুরে, কাশ্মীরে, মিজোরামে বিচ্ছিন্নতার আগুন জ্বলছে তখন রাজীব গান্ধী ব্যস্ত হয়ে মুসলীম বিবাহ-বিচ্ছেদের মত বিল পাশ করাচ্ছেন ভোটের পাল্লা ভারী করতে, ভারতের স্বীকৃত নীতি আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার নস্যাৎ করতে। এর চেয়ে ভয়াবহ ট্রাজেডি আর কি থাকতে পারে।

শ্যামলীর প্রশ্ন, রাজীব গান্ধী আমাদের প্রগতি ও প্রযুক্তির পথ ধরে একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে যাবেন। আমরা কতটা অগ্রসর হয়েছি?

বললাম, আমরা একবিংশ শতাব্দী থেকে ছয় সাতশত বৎসর পিছিয়ে যাচ্ছি সেটাই হল বাস্তব অভিজ্ঞতা। মুসলীম বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন পাশ করানো হল প্রথম অবিস্মরণীয় পদক্ষেপ।

তারপর?

মোঘল পাঠান রাজত্বকালে জায়গীরদারী ও অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক প্রথা বর্তমান ছিল। এরা দিল্লীর অধিপতিদের নানাভাবে সাহায্য করত সেজন্য তাদের অনাচার ও অবিচার, শোষণ ও শাসন রাষ্ট্রের চোখে উপেক্ষণীয় ছিল। এই সব সামন্ত ও জায়গীরদারদের ছিল নিজস্ব সৈন্যবাহিনী। বাদশাহ-সুলতানদের অনুগৃহীত এই সব পরগাছা দশহাজার পর্যন্ত সৈন্য পোষণ করত। সে যুগ আর নেই কিন্তু বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বর্ণহিন্দু জমিদারেরা আজও ব্যক্তিগত সৈন্যবাহিনী পোষণ করে। এদের কাজ হল দরিদ্র ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরদের দাসত্বের বন্ধনে স্থায়ীভাবে রাখা। বিশেষ করে অন্ত্যজশ্রেণীর উপর নানাভাবে শোষণ কায়েম রাখাই এদের উদ্দেশ্য। এই সব জমিদার শ্রেণী প্রয়োজন মত গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে নরহত্যা করে নিজেদের অধিকার কায়েম রাখে। পুলিশ এদের তাঁবেদার এবং প্রশাসনের উঁচু তলার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এদের হাতের মুঠোয় থাকে। এই তো সেদিন সংবাদপত্রে দেখেছ, বিহারের আরওয়ালে দ্বিতীয় জালিনওয়ালাবাগের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মন্দিরের চৌহদ্দির

মধ্যে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালিয়ে সরকারী মতে দুই ডজন গ্রামবাসীকে হত্যা করেছে এবং সরকারী মতে এরা সবাই নকশাল। বে-সরকারী মতে মৃত্যুর সংখ্যা তিনশতাধিক, আহতের সংখ্যা নির্ণয় সম্ভব হয়নি, আর এরা জমিদারের বেসরকারী সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের শিকার হয়েছে তাদের রুটিরুজির দাবী জোরদার করতে এবং ঘটনার সূত্রপাত ব্যক্তিগত আক্রোশ। বর্ণহিন্দুরা অর্থবান, তাদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে হরিজনরা পুলিশের সাহায্যে।

তারপর ?

সংবাদ দিল্লীর দরবারে পৌচেছে কিন্তু বে-সরকারী সৈন্যবাহিনীকে নিষিদ্ধ না করে জহ্লাদের বিচার না করে লোকসভায় কথার প্লাবন বয়ে গেছে। কিন্তু নিহত ও আহতদের জন্য বাদশাহ ও পারিষদরা সামান্য অশ্রুপাত করেননি, এমন কি রাষ্ট্রপতি জৈল সিংহ অকুস্থল পরিদর্শন করতে চাইলে তাও করতে দেওয়া হয়নি।

অনেক দিন পর আখতার দরবেশ এসে উপস্থিত।

আখতারের সে চেহারা আর নেই।

তোর এমন অবস্থা কেন রে আখতার ? কোথায় ছিলি ?

আর দুঃখের কথা বলে লাভ নেই রে দামু। দরবেশের কি থাকার কোন ঠিক আছে। যেখানে রাত সেখানে কাত! এই ভাবেই দিন কেটেছে। আর অবস্থা ? একটা গান মনে আছে তোর। 'আজকে যে গো রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়। চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।' আমার বেলায় নয়, সবার বেলাতেই তাই। দেখছিস না দিল্লীর বাদশাহের আমীর ওমরাহদের ভাগ্য। আজ যে মহা পরাক্রমশালী মন্ত্রী, কালকেই তাকে গদী থেকে নেমে আসতে হচ্ছে একজনের ইচ্ছায়। ইচ্ছাময় ব্যক্তিটি হল ওদের ভগবান ও ভাগ্য নিয়ন্তা। হঠাৎ দেখা গেল প্রণব মুখুজ্যে প্রবল শক্তিমান। তারপরই প্রপাত ধরণীতলে। পড়ল আর মরল। তারপরেই কবির লড়াই। গণি বলে, ঠাকুরমশাই বঙ্গ বিরোধী। প্রণব বলে, ওটা চাটুকার। ব্যস্‌। লড়াই চলছে! চলবে।

বললাম, কারণ ওদের আইডিয়াল নেই, ইউটিলিটি আছে। ইউটিলিটি ফুরোলেই পদাঘাত। রাজনীতিতে নাকি এমনটা হয়। রাজতন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্রে এসব সম্ভব, কিন্তু গণতন্ত্রে ? দলের আদর্শ থাকলে এমন ঘটনা ঘটা সম্ভব কি ? ধান্দাবাজিতে এসব হয়। ওসব কথা থাক। তোর কথা বল। ক'দিন থাকবি ?

আমার কথা ? খোদা মালুম। খোদার রহমে জিন্দা আছি। এন্তেকাল না হওয়া অবধি যমযন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। থাকার কথা বলছিস ? যতদিন আমার পোটলাপুঁটলি তোর ঘরে দেখতে পাবি ততদিন আছি। যেদিন দেখবি নেই, সেদিন জানবি আমিও নেই। তবে বয়সটা বেশি হয়েছে দৌড়াদৌড়ি করা সহ্য হচ্ছে না। ভাবছি কোথাও একটা ঘর খুঁজে নিয়ে শেষের দিন কটা কাটাব।

বললাম, গোটা জীবনটা ফাঁকি দিয়ে কাটাতে চাস, এই তো? অবশ্য সবার চিন্তাধারা ও কর্মধারা তো কস্মিনকালেও এক নয়। আমি মনে করি মানবসৃষ্টি শুধু সৃষ্টি বৃদ্ধি করা নয়। প্রত্যেকের জীবনে রয়েছে সমাজকে কিছু দিয়ে যাবার দায়িত্ব। জন্মের পেছনে থাকবে মহৎ উদ্দেশ্য। নইলে মনুষ্য জীবন আর পশু জীবনে কোন পার্থক্য থাকে না। যারা তা করে না তারা দু'জাতের মানুষ, এক দল কাপুরুষ, অপর দল অমানুষ।

তোর দার্শনিক তথ্য মেনে নিচ্ছি কিন্তু অসহায় মানুষ মানুষকে কি দিতে পারে বলতে পারিস? আমি সহায় সম্বলহীন পথচারী। আমার তো দেবার কিছু নেই।

নেই বললেই নেই হয় না আখতার যাচাই করে দেখেছিস কি? দেবার ইচ্ছা কি কখনও তোর মনে জেগেছে, আর যদি জেগেই থাকে তার জন্য কতটা মেহনত করেছিস আজ অবধি। ভেবে দেখিস আখতার। আর কথা নয়। আমাদের ছোটকু তোর গন্ধ পেয়েছে। জল খাবার হাজির। এবার সদ্ব্যবহার করে কৃতার্থ কর।

এক ঘটি পানি নিয়ে এস ছোটকু। হাতমুখটা ধুয়ে নিতে চাই।

নমাজ পড়বি কি?

না। নমাজ আমি পড়ি তবে নিয়ম মত নয়। আর সারাদিনটা তো আল্লাহতালার নাম প্রচার করে বেড়াই, নতুন করে বেশি করে আর আল্লাহকে ডাকার প্রয়োজন থাকে না। যারা নেক কাম করে তারা পাক। যারা পাক তারা সাক্ষাৎ খোদার খাদেম, তাদের নমাজী হতেই হবে, এমন তো নয়। তারা যে সব সময়ই নমাজের আয়াত জপ করে।

হাতমুখ ধুয়ে আখতার খেয়ে নিল। বলল, এবার একটু বিশ্রাম। কি যেন বলতে চাইলাম। ও হাঁ। দেখ দামু পৃথিবীর সর্বাধিক মুসলমান বাস করে ভারতে অথচ অল্প সংখ্যক কায়েমী স্বার্থে মুসলমান পাকিস্তান হাসিল করল অধিক সংখ্যককে অপরের কৃপাপাত্র করে। যদি ভারতীয় সংবিধান মানবধর্মী না হত তাহলে আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর জিম্মিরূপে বাস করতে হত। তাই যখনই ধর্মের জিগীরে দাবী আদায় করতে চায় আমার ভাই বেরাদাররা তখনই শঙ্কিত হই, আবার বুঝি প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের রক্তের স্রোতে বইবে।

বিকেল বেলায় আখতার বলল, চল দামু বেরিয়ে আসি।

কোথায় যেতে চাস?

রেল লাইনের ধারে। কোন একটা নির্জন কালভার্টে গিয়ে বসব।

তা মন্দ নয়। তবে আঁধার নামার আগেই ফিরতে হবে। দেশকাল ভাল নয়।

আখতার বলল, গোটা ভারতের একই অবস্থা। জম্মু-কাশ্মীর পাকিস্তানের চরে ভর্তি। তাদের মুখে পাকিস্তানী শ্লোগান। পাঞ্জাবে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট খলিস্তানীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, বিহারে ঝাড়খণ্ডীদের দাপাদাপি, মহারাষ্ট্রে বিদর্ভের দাবী, পশ্চিমবাংলায় গোর্খাল্যাণ্ডের হুমকি, আসামে বাঙ্গালী—

অসমীয়া লড়াই, নাগাল্যাণ্ডে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দৌরাত্ম্য, মণিপুরের লিবারেশন আর্মির নিরীহ হত্যা ও উপদ্রব, মিজোরামের স্থায়ী অশান্তি, ত্রিপুরায় সমান্তরাল সরকার গঠনের অপচেষ্টা এই সব মিলিয়ে ভারতকে নরককুণ্ড করে তুলেছে। উপরি পাওনা চল বিহারে সুপরিকল্পিত ভাবে পুলিশের সহায়তায় হরিজন নিধন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ। দেশের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উত্তরপ্রদেশে রামজন্ম স্থান বনাম বাদশাহ বাবরের মসজিদ। কাশীতে, নাসিকে, মীরাটে, শ্রীনগরে, অনন্তনাগে ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দিল্লী আর বোকারোতে অহেতুক নিরীহ শিখদের রাজনীতির জহ্লাদদের হাতে ছেড়ে দেওয়া। আর কত বলব বল। এই সবের পরেও দেশে য সব দাঙ্গা, হাঙ্গামা, লুটতরাজ, ডাকাতি, রাহাজানি ঘটছে অবাধে তার হিসাব না দেওয়াই ভাল। এসবের পরও তোরা ভাল আছিস দামু। শান্তি না থাকলেও কিছুটা সোয়াস্তি আছে। তবুও সাবধান থাকা উচিত। নে, চল।

যেতে যেতে বললাম, আমাদের এখানে দলীয় হাঙ্গামাটাই বেশি! ক্ষমতা আর অর্থের লোভ মানুষকে অমানুষ করে তোলে। দেহ যখন খাবার পায় না তখন সে দেহকে ভক্ষণ করে। রাজনৈতিক দলের কর্মীরা যখন রসদ আদায় করতে পারে না তখন তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে, রক্তপাত ঘটায়। এটাই ঘটছে আমাদের আশেপাশে। এরপর কি হবে তা ভেবে পাচ্ছি না। নেতারা অনেক মিষ্টি মিষ্টি বুলি শোনায় অনেক বড় বড় আশ্বাস দেয় কিন্তু কার্যকালে সবই ফাঁকা কথায় পরিণত হয়। সমঝোতার অভাবে দেশ আরও এগিয়ে চলেছে জাহান্নমের পথে। একদল কায়েমী স্বার্থের দালাল আরেক দল কায়েমী স্বার্থের দালালদের সঙ্গে অবিরতভাবে লড়াই করে চলেছে। লক্ষণ ভাল নয় আখতার।

আমি দরবেশ। আমার কোন বিকার নেই। মনে মনে ভাবি যা হচ্ছে তা হোক। মানুষ চায় খেয়ে পড়ে নিজের সত্তা বজায় রেখে যদি বাঁচতে পারে তার বেশি কি চাও বল।

রেল লাইনের ধারে ঘাসের ওপর বসে পড়লাম। রেল রক্ষীবাহিনীর সেপাইরা বন্দুক কাঁধে নিয়ে পেরিয়ে গেল। আখতারের বেশভূষা কটমট করে তাকিয়ে দেখে এগিয়ে গেল।

কি ভাবছিস আখতার?

ভাবছি, তবুও রেলের মাল পাচার হয়, তবুও ডাকাতি হয়, তবুও নিরাপত্তার অভাব রেলপথে।

কারণটা এই সব সত্যধর্মীদের কর্তব্যবোধ। রেল লাইনটা কার? ভারত সরকারের। গাড়ি ও যাত্রাদের দায়িত্ব কার? রেল পুলিশের। রেল লাইনের নিচে কিছু ঘটলে তার দায়িত্ব কার? রাজ্য পুলিশের। রেলের সম্পত্তিরক্ষার দায়িত্ব কার? রেল রক্ষীবাহিনীর। এই ত্রিমুখী দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে কিনা তা দেখবার দায়িত্ব কারও নেই। নেই এই তিনটি মহা পরাক্রমশালী বাহিনীর মাঝে বোঝাপড়া। অর্থাৎ মগের মুলুকের অবস্থা। এই অবস্থা সর্বত্র। তোর

কথায় বলছি, এরপর কি !

তাই তো মলয়া চলে গেছে নিজের ঘরের সন্ধান পেয়ে। শ্যামলীর আজকাল কেমন যেন ভাব। অমিয়া অরিন্দম আর কিটিকে ভুলে কেমন যেন উদাসীন। বয়সের ভারে অমিয়া ধীরে ধীরে ন্যুব্জ হতে চলেছে। অবশ্য তার মন অতটা ন্যুব্জ হয়নি। বড়দা অবসর নিয়ে শয্যায় বিশ্রাম নিচ্ছেন, রেলের চাকা ঘুরছে। কোথাও তার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে। কেউ রেখে যাচ্ছে মনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ক্ষীণ রেখা তাও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। একদিন আমাকেও যেতে হবে। কিন্তু কি রেখে যাব পেছনে ?

নতুন নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হচ্ছে সমাজে। রাজনীতির আবর্তে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখছি সর্বত্র বাঁচার নেশায় বঞ্চনার ইতিহাস, আর কিছুই নাই কোথাও।

এই তো সদিন লিবিয়াকে ধাক্কা দিল আমেরিকা লিবিয়ার সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে, জঙ্গী ব্যবস্থার প্রতিবাদ করল না বিশ্বজন সমুদ্রে। এরই পরিপূরক হল দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় সরকারের নির্মম ও অন্যায় আক্রমণ জিম্বাগোয়ে জিম্বাবে ও বতসোয়ানায় হানা। সমগ্র বিশ্ব আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার এই আক্রমণকে সুচক্ষে না দেখলেও কেউ-ই সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ অথবা প্রতিবাদ জানাতে সাহস পায়নি। সারা বিশ্বে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে আমেরিকা অথচ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকায় সবাই এর-ওর মুখ দেখাদেখি করছে।

ভারতেও নতুন ইতিহাস তৈরি করছে কংগ্রেস সরকার। তারা একবিংশ শতাব্দীর প্রগতি পথে নিয়ে যাবার পরিবর্তে পঞ্চদশ শতাব্দীতে টেনে নিয়ে চলেছে। সুদানের মত মুসলীম রাষ্ট্রে শরীয়তি আইন রদ করে নতুন আইনের প্রচলন করা হচ্ছে যা গণতন্ত্র সম্মত এবং সর্বজনের মঙ্গলের জন্য। আর ভোটের কাঙ্গাল কংগ্রেস এখানে শরীয়তের নামে দুটি ভারত সৃষ্টির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করছে মুসলীম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন জারী করে, যা মুসলীম নারীদের অধিকারের নামে নির্যাতনের পথে ঠেলে দিয়েছে।

রাজনীতি একটি বিজ্ঞান। তাতে ভুল করলে মানব সমাজ ক্ষমা করে না। এই তো সেদিন মহাকরণ অবরোধের নামে যে প্রহসন পশ্চিমবাংলার মানুষ প্রত্যক্ষ করল তা থেকে একটা জিনিস বিশেষভাবে সবাই লক্ষ্য করেছে, এই প্রহসনের উদ্যোক্তাদের আর যে কোন গুণ থাকুক তারা রাজনীতির গর্ভে ভ্রূণ মাত্র, তাদের পরিপক্কতার অভাব। দ্বিতীয়ত তারা নিজেদের হঠকারিতাও প্রমাণ করেছে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের স্থান ধীরে ধীরে শূণ্যে পৌঁছাতে চলেছে। যারা ঝগড়ায় পটু তারা ঘরের ঝগড়া না মিটিয়ে অপরের সঙ্গে লড়তে গেছে ঢাল তলোয়ার বিহীন নিধিরামের মত। দলের শক্তি জনসাধারণ। তাদের উপর প্রভাব সৃষ্টি না করে, সংগঠন জোরদার না করে যারা হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দেয়

তাদের কেউ প্রশংসা করতে পারে না।

তবে এটাও ঠিক, মানুষের আশা আকাঙ্খা যে সরকার পূরণ করতে পারবে না তাদের প্রশাসন থেকে আজ হোক কাল হোক বিদায় নিতে হবে। আমলা নির্ভর প্রশাসন ভেঙ্গে পড়বে যে কোন সময়ই। তার জন্য ভাগ্যদেবতার দোহাই দেওয়া মূর্খতা।

পাঞ্জাব আজও গুরুতর বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন। বিপথগামী এতদিন শিখ যুবকরা লুটপাট, অগ্নিসংযোগ আর হিন্দু হত্যা করে চলেছিল অবাধে। এবার হিন্দুরা বদলা নিতে নেমেছে। এর পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা ভারত সরকার কি বুঝতে পারছেন না। যদি এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে তা হলে ভারতের মুষ্টিমেয় শিখদের ভবিষ্যত কি। মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখ রাজ্য ভেঙ্গে পড়েছিল গৃহবিবাদে, এবারও সেই অবস্থা দেখা দিয়েছে। সে সময় হিন্দু শিখ মিলিতভাবে যেমন মোঘলরাজ্য ধ্বংস করেছিল ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করেছিল তারই বিপরীত চিত্র হল হিন্দু শিখের লড়াই। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন শিখ নেতারা ধর্মের নামে যদি এই অনাচার দমন না করে তবে ভবিষ্যত অন্ধকার।

এই অন্ধকারকে দূরে ফেলে আলোর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার লোকের বড়ই অভাব ঘটেছে ভারতে।

সমগ্র পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা আর দুর্নীতির প্রবল স্রোত বয়ে চলেছে। কোথাও শান্তি নেই। অথচ শান্তির জন্য চিৎকার করছে সবাই। কেউ বলছে আনবিক অস্ত্র বন্ধ কর। কেউ বলছে, উত্তর দক্ষিণের সমস্যা সমাধান কর। কেউ বলছে অনুন্নত দেশগুলোকে উন্নত দেশ সাহায্য করে উন্নত করুক। সবই শোনা যায় কিন্তু কার্যকালে কিছু হচ্ছে না। শান্তির পারাবত কঠিন হিমে মৃতপ্রায়।

তারপর কি ?

সবাই গালে হাত দিয়ে ভাবছে, অতঃ কিম্।

এই চিন্তায় হাঁসফাঁস করছে ভারতের কয়েক লক্ষ বেকার যুবক যুবতী যারা না পাচ্ছে ঘরে ঠাঁই, না পাচ্ছে বাইরে ঠাঁই তাদের চোখের সামনে বড় প্রশ্ন, অতঃ কিম্।

তারা পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তাই বিপথে পা দিতে মোটেই ইতস্তত করছে না। সেখানেও প্রশ্ন হল অতঃ কিম্। বিপথ ই তো শেষ কথা নয়। মনুষ্য জীবনের শেষ লক্ষ্য নয়। বাঁচার মত বাঁচা, মানুষের মত বাঁচা, এসবই তো ছেঁদো কথা। যারা গুছিয়ে নিয়েছে তাদের নতুন ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে মনে ঈর্ষা জাগা স্বাভাবিক, তারা ঘৃণা করতে শিখছে মানুষকে, সমাজব্যবস্থাকে, সমাজের প্রতি জীবকে, এর পরিণাম যে কত ভয়ঙ্কর তা ভেবে দেখার জন্য কেউ কি আছে! কোটি টাকা ব্যয় করে অর্জুন সিংহের মার্বেল প্যালেসের দিকে তাকিয়ে যদি কেউ হাহুতাশ না করে বিক্ষুব্ধ হয়, সমাজবিরোধী হয় তাকে

কতটা দোষী করা উচিত তাও ভেবে দেখা দরকার। এই হতভাগ্যের দলও ভাবছে, এরপর কি! অতঃ কিম্!

একদিকে ধর্মের নামে বঞ্চনা, রাজনীতির দোহাই দিয়ে বঞ্চনা, আর্থিক ক্ষেত্রে বঞ্চনা, পারিবারিক জীবনে বঞ্চনা, যৌথ জীবনে বঞ্চনা, এই সব নানাবিধ বঞ্চনার মাঝে যারা আজও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে তারাও ভাবছে, এরপর কি। তাদেরও প্রশ্ন, অতঃ কিম্। সবার সামনে রয়েছে বাঁচার প্রশ্ন। অথচ ব্যক্তিগত বাঁচার এই কঠিন পরীক্ষায় ছিন্নভিন্ন হতে চলেছে সমাজ ব্যবস্থা। সবার সামনেই একটি প্রশ্ন এরপর কি? ক্ষমতা ও অর্থের লিপ্সা মানুষকে ধীরে ধীরে পশুর পর্যায়ে টেনে নামাচ্ছে, যাদের বুদ্ধিজীবি খ্যাতি আছে তাদের চিন্তার ক্ষেত্রেও একটি প্রশ্ন, অতঃ কিম্। শুধু ভারতের শোষিত বঞ্চিত অত্যাচারিত নরনারীর সম্মুখে এই ভয়ঙ্কর প্রশ্ন যে ভাবে দেখা দিয়েছে সারা বিশ্বের অনুন্নত দেশের মানুষের সামনেই এই একই প্রশ্ন, অতঃ কিম্।

হতাশবোধ মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় তার স্পষ্ট ছবি ফুঠে উঠেছে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণববাবুর প্রতিবেদনে। ভারতের একান্নজন মন্ত্রীর মধ্যে চল্লিশজন হল হিন্দী বলয়ের লোক। ভারতের বাকি অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে মাত্র এগারজন। যতদিন উনি মন্ত্রী ছিলেন, অথবা কংগ্রেসে ছিলেন ততদিন উনি বুঝতে পারেননি, হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে গোটা দেশকে গ্রাস করার পরিকল্পনা করেছে ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিন থেকেই। জ্ঞানটা কিছু বিলম্বে ঘটেছে কিন্তু হিন্দী সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিরোধ করার কোন চেষ্টাই কেউ করেনি এমন কি বাংলা ভাষাভাষী পশ্চিমবঙ্গেও মাড়োয়ারী তথা হিন্দীভাষী মন্ত্রী নেবার নির্দেশ দেন স্বয়ং গান্ধীজি। হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের প্রকোপ যত বৃদ্ধি পাবে, ভারত ততই সংহতির পথে কণ্টক সৃষ্টি করবে। তবুও পেট দ্যান্ নেভার। প্রণব মুখুজ্যে এবার মুক্তির আস্বাদ পেয়ে সহজ সত্য কথাগুলো বলার সুযোগ পেয়েছে। এটাই সৌভাগ্য। অবশ্য এটা কতটা হতাশাবোধ থেকে জন্মেছে কতটা সদিচ্ছা থেকে জন্মেছে সেটাও ভেবে দেখার। এরপর কি, সে দিকে তাকিয়ে থাকবে দেশের অভাজনরা।

বাংলা আর বিহার রাজ্য দুটিই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। বিহারের বেকার সমস্যা ভয়াবহ। ভূমিহীনদের সংখ্যা অনির্দেয় গৃহহীন আকাশকে আশ্রয় করে দিনরাত অতিবাহিত করে। দারিদ্র্য বঞ্চনা, শোষণ ও অত্যাচার সহ্য করতে করতে অন্ত্যজশ্রেণী ও আদিবাসীরা মুমূর্ষু। এহেন বিহার রাজ্য দুর্নীতির ক্ষেত্রে ভারতের যে কোন রাজ্যকে হার মানায়। ধনবান চাষী, জমিদার, যারা ভূমিহার, কায়স্থ, রাজপুত, যাদব কুর্মী ও কিছু ব্রাহ্মণ এদের করুণার ওপর নির্ভর করে অন্ত্যজ ও আদিবাসী শ্রেণীকে আজও দাসসুলভ জীবন যাপন করতে হয়, এটাই বিহারের সামাজিক চিত্র। অন্ত্যজ শ্রেণীর যুবতীদের উচ্চশ্রেণীর অর্থবানরা ধর্ষণ করাটা চিরাচরিত বিহারী ধনাদের কাজ। পেটের দায়ে

দেহপণ্য যেমন প্রচলিত তেমনি ঋণের জন্য দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয় ধনীদের গৃহে।

এর প্রতিকার দাবী করলেই ধনীদের প্রাইভেট আর্মির বন্দুকের নলে প্রাণ দিতে হয়, প্রশাসনকে অভিযোগ করলে বিনিময়ে পায় গুলি। নকশালী ধুয়া তুলে এদের হত্যা করে ধনীদের প্রাইভেট আর্মি আর প্রশাসনের পুলিশ। অন্ত্যজ-শ্রেণী ও আদিবাসীদের জীবন নির্ভর করে এদের দয়ার ওপর। গড়ে প্রতিবৎসর পুলিশ ও প্রাইভেট আর্মি প্রতিবাদকারী আড়াই হাজার হরিজন ও আদিবাসীদের হত্যা করে, অজুহাত ওরা নকশালপন্থী।

সহ্যেরও একটা সীমা আছে। প্রশাসনের পুলিশ ও ধনীদের প্রাইভেট আর্মির অত্যাচার, বঞ্চনা ও শোষণ এমনভাবে এই সব দরিদ্র অন্ত্যজশ্রেণীদের কণ্ঠরোধ করেছে যার তুলনা নেই। এদের পেছনে আর জমি নেই, পিঠ দেওয়ালে দিয়ে এরা বুঝেছে। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে হবে রক্তের বদলে রক্ত দিয়ে। তাই সংগঠিত দরিদ্র অন্ত্যজরা মরীয়া হয়ে লড়তে নেমেছে। প্রশাসন বলছে, ওরা নকশালপন্থী। যারা জমি চুরি করছে, যারা গরীবের মুখের অন্ন কেড়েছে, যারা গরীব ঘরের নারীর মর্যাদা নষ্ট করছে, যারা গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে শাসকদের প্রশ্রয়ে এবং প্রত্যক্ষ সাহায্যে তারা কোন পন্থী?—কংগ্রেসপন্থী? বিহারে কংগ্রেস মৃত। যে গান্ধীজি অহিংসাকে অস্ত্র করে স্বাধীনতা লাভের যুদ্ধে ভারতবাসীকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, যে অহিংসা হল কংগ্রেসের মূলমন্ত্র, সেই কংগ্রেস শাসনে গোটা ভারতবর্ষে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছে পুলিশের গুলিতে। গান্ধীজি গতায়ু, বেঁচে থাকলে কি করতেন তা বলা কঠিন। গান্ধীজির উত্তরপুরুষরা গান্ধীজির প্রিয় হরিজনদের মাথা নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলবে এটা স্বপ্নেও ভাবা যায়নি। হিংস্রতার স্বাক্ষর বহন করছে বেলচি, বানঝি, বাজিতপুর, ভাগলপুর, পরশবিঘা, পুনপুন, বাসোযার, আমারি, নওযাদা, কাইঘি, নোরিয়া, আড়োয়াল। বহু স্থানে পুলিশ ও প্রাইভেট আর্মির হাতে বহু বহু অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে, তার বর্তমান দৃষ্টান্ত জেহানাবাদের আড়োয়াল। সবাই চিন্তিত। এদেশে মধ্যযুগের ব্রিটিশ নাইটদের মত বিহারে প্রাইভেট আর্মি কিভাবে গায়ে গতরে বৃদ্ধি পেতে পারে তা শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের বুদ্ধির বাইরে। এইভাবে প্রাইভেট আর্মি সারা দেশে গড়ে উঠলে ওরাই সমান্তরাল সরকার পরিচালনা করবে যা কে কদলী প্রদর্শন করে।

রাজীব আমাদের একবিংশ শতাব্দীর প্রগতির বুলি শুনিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে নিয়ে যেতে খোমেনির পথ ধরেছেন। বিহারের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা আরও পিছিয়ে মধ্যযুগের অন্ধকারে নিয়ে চলেছে। এরপর কি, এই চিন্তাই আজকের দিনে বড় চিন্তা।

তবে পরিণতি কোনক্রমেই শান্তিপূর্ণ হবে না।

একদিকে তৈরি হয়েছে জমির মালিকদের প্রাইভেট আর্মি, সহায়ক তাদের

প্রশাসন আর অন্যদিকে একজোট্টা হয়েছে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত মানুষরা। এই লড়াইয়ের শেষ কোথায়? এরপর কি। নকশাল ফোবিয়া প্রশাসনকে হিংস্র করেছে কিন্তু নকশাল আন্দোলন বঞ্চিত লাঞ্ছিত অত্যাচারিত জনসমাজে দৃঢভাবে শেকড গাডছে ধীরে ধীরে। এর পরিণতি যে কি তা আজও বুদ্ধির অগম্য থেকে যাচ্ছে।

অমিয়া বলেছিল, আমাদের সৌভাগ্য বাংলায় জাতপাতের বালাই নেই।

বলেছিলাম, আছে। তবে উগ্রতা কম। সরকার বিশেষ শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুবিধার যে ব্যবস্থা কায়েম রেখেছে তাতে জন্মেছে সাম্প্রদায়িক চিন্তা। একে রোধ করার কিছুমাত্র চেষ্টা হচ্ছে না। এইসব অপচিন্তাকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার প্রয়োজন, সেদিকে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো নজর না দিলে ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখা দিতে পারে।

অমিয়া বলেছিল, সব চেয়ে দরিদ্র রাজ্য বিহার আর উড়িষ্যা। আর এই দুই রাজ্যেই জাতপাতের বিষ সমাজ দেহকে পঙ্গু করে তুলেছে। এখনও সতর্ক হবার সময় আছে।

সময় থাকলেও তা করবে না। কারণ, ভোট। গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় শক্তিশালী ধনীরা ভোট দেবার বড় প্রতিষ্ঠান। তাদের অখুশী করার ক্ষমতা কোন রাজনৈতিক দলের নেই। কিন্তু মানুষের মনের চেহারা বদল হয়েছে। বিহারের বৃদ্ধ জডন্নাথ মুখ্যমন্ত্রী নকশাল ফোবিয়াতে ভুগছে। অশান্তির মূল নির্ণয় না করে ঢালাও নরহত্যার নির্দেশ দিয়ে যে ভুল করেছে তার প্রতিক্রিয়া হল বুলেটের বিরুদ্ধে বুলেট, রক্তের বদলে রক্ত। অথচ মূল সমস্যা ভূমির সমস্যা, সেই সমস্যা মেটাবার কোন চেষ্টাই করেনি প্রশাসন। জমিদারী প্রথা ভারতে উঠে গেলেও বিহারে তা করা হয়নি। চাষীর জমির ঊর্ধ্বসীমা স্থির করে উদ্‌বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের দেওয়া হয়নি।

অশান্ত আসামকে শান্ত করার হাতুড়ে ডাক্তারদের দাওয়াই দেবার পর আরও বেশি অশান্তি দানা বেঁধেছে সেখানে। জোর করে অসমীয়া ভাষা চাপাবার অপচেষ্টা আবার অশান্তির বীজ বপন করেছে। গণপরিষদ তার মন্ত্রীসভার গতর বৃদ্ধি করে এই অশান্তি নিরাসনের যে চেষ্টা করছে তাতে অশান্তি বৃদ্ধি পাবে, কম হবে না। দেখা দেবে ক্ষমতা লাভের জন্য রেষারেষি। তারপর কি হবে তা খোদা মালুম।

আমরা সোনার স্বপ্ন দেখছি একবিংশ শতাব্দীর। তত্ত্বগত ভাবে এ এক মহান প্রচেষ্টা যার কর্ণধার স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। কিন্তু তিনি একা তো কিছুই করতে পারবেন না। তার প্রমাণ আমাদের হাতে হাতে।

অনেক দিন পর মলয়া এসেছে তার স্বামীর সঙ্গে বেজওয়াদা থেকে। বাংলার মেয়ে যে কোন ওয়াদাতেই থাকুক বাংলার প্রতি তার আকর্ষণ বেশি, বিশেষ

করে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভালমন্দ থেকে দূরে থাকতে পারে না। মলয়াও পারেনি। কথাবার্তায় বোঝা গেল, বাংলার কথার সঙ্গে জুড়ে আছে গোটা ভারতের প্রশ্ন।

মলযার শ্বশুর চিন্তাহরণবাবু অশীতিপর বৃদ্ধ। কোন ক্রমেই তাকে বেজওয়াদা নিয়ে যেতে পারেনি মলয়া আর তার স্বামী। চিন্তাহরণবাবু বলেন, আমার জন্য তোমাদের চিন্তা করতে হবে না, আমার চিন্তাহরণ করতে আমিই পারব।

মলয়া জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার চলবে কি করে?

আকাশের দিকে মুখ তুলে বলেছিলেন, যে খায় চিনি জোগায চিন্তামণি। ও বিষয়ে কারও দিবানিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবে না। ভারত সরকার পাঁচশ টাকা করে পেনশন দিচ্ছে। এই তো একার পক্ষে যথেষ্ট।

এবিষযে মলযা অথবা তার স্বামী জবরদস্তি করেনি। এবার কলকাতায় এসে উপকণ্ঠের অখ্যাত কলোনীর দর্মাঘেরা টালির ঘরেই আশ্রয় নিয়েছে মলয়া ও তার স্বামী। তাদের ইচ্ছা, বর্তমান বাসস্থানের আমূল পরিবর্তন করে মনোরম একটি গৃহ তৈরি। এখন পর্যন্ত তার শ্বশুরকে রাজি করতে পারেনি। বাড়িতে এসেই অন্যান্য কথার পর মলযা অনুরোধ করল যাতে আমি গিযে তার শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে রাজি করি।

অগত্যা রাজি হলাম।

একদিন সকালে অমিযার সঙ্গে গেলাম মলযার শ্বশুরের কাছে।

পরিচয় করে দিল মলয়া। অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি করলেন না বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মনে করেছিলাম, সামান্য কিছু আলোচনা করেই ফিরে আসব। কিন্তু আলোচনার সূত্রপাত হতেই বুঝতে পেরেছিলাম অতি অল্প সময়ে এই সমস্যার সমাধান তো হবেই না উপরন্তু আরও অনেক সমস্যা এসে হাজির হবে সম্মুখে যার সমাধান খুঁজতে খুঁজতে কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে যাবে।

চিন্তাহরণবাবু বললেন, আপনার বক্তব্য আর বউমার বক্তব্য এক কিন্তু।

বললাম, এর মধ্যে কিন্তু থাকতে পারে কি?

অবশ্যই। ধরুন আমার যখন পনের ষোল বছর বয়স তখন পড়াশোনা ছেড়ে কংগ্রেসের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেছিলাম। আমাদের আদর্শ ছিল গান্ধীজি। খদ্দর পড়তাম, এখনও পড়ি। মাথায় গান্ধী টুপি। পাযে কোন জুতো ব্যবহার করতাম না। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরেছি। খদ্দর বিক্রি করেছি। কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার করেছি। সব দিন খেতেও পাইনি। হিন্দুদের গ্রামে যাও বা সহানুভূতি পেযেছি, মুসলমানদের গ্রামে সহজ কথায় অবহেলা ও অশ্রদ্ধা পেয়েছি। তাদের কথা, বাদশাহকে সমর্থন করাই ধর্ম। অর্থাৎ বাদশা বদল তারা চায় না। গান্ধীজির আন্দোলনে তারা মোটেই অংশ গ্রহণ করেনি। অথচ দেশকে ভাগ করা হল ধর্মভিত্তিক দুই জাতির ফরমুলায়।

এটার প্রযোজন কি ছিল না? যখন বাংলাদেশে ও পানজাবে গুরুতর দাঙ্গা চলছে। ইংরেজ সরকার প্রতিরোধ করতে অক্ষমতা জানিয়েছে তখন অনর্থক

নরহত্যা রোধ করতে এটাই ছিল প্রকৃষ্ট পন্থা।

আপনার যুক্তি আমি স্বীকার কার না। দাঙ্গাটা করেছিল যারা তারা সামনে রেখেছিল ধর্মের ভণ্ডামি কিন্তু অর্থবান শ্রেণী তাদের স্বার্থ বজায় রাখতে অশিক্ষিত অজ্ঞ সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে খেপিয়ে তুলেছিল। বিশেষ করে মুসলমান পুঁজিপতিরা বুঝতে পেরেছিল ইংরেজ চলে গেলে তারা হিন্দু পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না। তারা শোষণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়বে। তাই দাঙ্গা। দাঙ্গার পরিণতি দেশ বিভাগ, জনসাধারণের অকল্পনীয় দুর্দশা। আমরাও সেই দুর্দশার শিকার। আমাদের দাঁড়াতে হয়েছে নিজেদের চেষ্টায় ও পূর্বপুরুষদের সুকৃতিতে।

বললাম, কংগ্রেস তো সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে।

চিন্তাহরণবাবু হেসে বললেন, সেখানেও নিরপেক্ষতা বজায় থাকেনি। বাংলার মানুষকে দাবার গুঁটি করেছে। ভোটের দালাল তৈরি করেছে/ প্রকৃত পুনর্বাসন কারও করেনি।

বর্তমান সরকার তো এগিয়ে নিতে সচেষ্ট।

ঠিক কথা নয়। বরং পিছিয়ে নিতে সচেষ্ট

প্রধানমন্ত্রীর প্রগতিশীল প্রোগ্রাম নিশ্চয়ই একবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল ভবিষ্যতে দেশবাসীকে নিয়ে চলেছে।

বোধহয় তা নয়। প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা ব্যর্থ করেছে তার চাটুকারেরা। পানজাব সমস্যা সমাধান হয়নি। বরং বেশি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। আসাম সমস্যা সমাধান হয়নি। বরং বেশি সমস্যা সৃষ্ট হয়েছে সেখানে। আসাম সমস্যা গুরুতর পরিণতির-দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মুসলমান মৌলবাদীদের খুশী করতে যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তার পরিণতিতে কোনও মুসলমান মহিলা স্থায়ীভাবে স্বামীর গৃহে স্থান পাওয়ার আশা পরিত্যাগ করে বিয়ের আসনে বসতে বাধ্য হবে। মুসলমান মেয়েদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করবে। এগুলো কি প্রগতির লক্ষণ।

আমি চুপ করে গেলাম।

অমিয়া বলল, ভুল-ভ্রান্তি তো হয়। পরে সংশোধন করবে।

আপনি স্বীকার করছেন এগুলো ভুল। বেশ। কিন্তু কারা রাজীবকে সহযোগিতা করবে? তার পার্শ্বচররা? তাদের চরিত্র কি? তারা কোনকালেই কংগ্রেসের নীতি মেনে চলেনি। অথচ কংগ্রেস হল সাধারণ মানুষের আশ্রয়স্থল। সেই কংগ্রেসও নেই তাদের আশ্রয় করে কেউ এগোতেও পারবে না। গোলাম মহম্মদ শাহকে কাশ্মীরের গদীতে বসাতে হয়েছে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে। গদী রক্ষার তাগিদে কাশ্মীরের দাঙ্গা বাধিয়েছিল কে? এতে গোলাম মহম্মদ শাহ ও রাজ্যপালের ভূমিকা কি?

অমিয়া বলল, আপনার একটা কথা সঠিক। অতীতের কংগ্রেস আর নেই। বর্তমান যাকে কংগ্রেস বলা হয় তা কংগ্রেস নামের অবমাননা মাত্র।

মহারাষ্ট্রের কোন মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল কেন? বিমানে এয়ার হোষ্টেলের প্রতি অশালীন ব্যবহারের জন্য। আদালতে এর বিচার হয়নি কেন? বিমানে অত্যধিক মদ্যপান করে একটি রাজ্যমন্ত্রী যদি মহিলা কর্মীদের প্রতি অসদাচরণ করার পর সবাই তাকে কংগ্রেসী বলে, তা হলে কংগ্রেসের গৌরব বৃদ্ধি হয় না। আমরা কংগ্রেস করেছি ত্যাগ দিয়ে, সততা দিয়ে শালীনতা আশ্রয় করে। এ আবার কি কংগ্রেস, ভাবতেও পারি না। আর কথা নয়। এবার কিছু মুখে দিন। বৌমা, তোমার কাকাকে পরিতোষ করে খাবার ব্যবস্থা কর।

মলয়া চা জলখাবার নিয়ে হাজির।

আমরা হাত পেতে খাবারগুলো নিয়ে সদ্ব্যবহার আরম্ভ করলাম।

চিন্তাহরণবাবু বললেন, আর কি বলব দামোদরবাবু, প্রধানমন্ত্রীর নিকট সহচর হল অর্জুন সিং। অবশ্য মহাভারতের অর্জুন নন। মধ্যভারতের অর্জুন যে কোটি টাকা ব্যয় করে মার্বেল প্রাসাদ করেছে। প্রধানমন্ত্রী কি খোঁজ নিয়েছেন এত টাকা অর্জুন সিং পেল কোথা থেকে। হয়ত নানাভাবে হিসাবের কারচুপিতে আইনের চোখে নির্দোষ হতে পারে কিন্তু সত্যটা উদ্ঘাটন তাতে হয় কি! ভজনলালকে ক্লিন সার্টিফিকেট দিলেও জনমন থেকে তার দুর্নীতি সম্বন্ধে সন্দেহ নিরসন হয়েছে কি। এরফলে দক্ষিণ ও পূর্বভারত থেকে বর্তমান কংগ্রেস প্রায় নির্বংশ হয়েছে। পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরা, আসাম, সিকিম, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কংগ্রেস বিতাড়িত। কেরলে কংগ্রেসকে মুসলীম লীগের মত প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনের দয়াতে গদী রক্ষা করতে হচ্ছে। মহারাষ্ট্র আর বিহারে ঘন ঘন মুখ্যমন্ত্রী বদল তো শুভ সূচনা নয়।

বললাম, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যায় কংগ্রেস বহাল তবিয়তে রয়েছে। সেখানে কোন চিড় ধরেনি।

চিন্তাহরণবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, আপনি যা বলছেন তা স্বীকার করে নিলেও, বিহার-উড়িষ্যায় কংগ্রেসের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়ে আসছে। এই প্রতিবেদনটি পড়ুন।

একটি সংবাদপত্র আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি পড়লাম।

পড়া শেষ করে কাগজখানা ফেরত দিতেই চিন্তাহরণবাবু বললেন, দেখুন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী জানকীবল্লভ পট্টবর্ধনের কীর্তি। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী থাকাকালীন এয়ার হোস্টেসের চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে এক যুবতীকে তার সঙ্গে বিছানায় যেতে বাধ্য করে। পানজাবী এই সুন্দরী যুবতীটির নাম রাণীমানিক। বহুবার দেহদানের পরও তার আর এয়ার হোস্টেসের চাকরি হয়ে ওঠেনি। মেয়েটি অবশেষে আত্মহত্যা করেছিল। এই সব ঘটনা রাণীমানিকের ডায়েরীতে পাওয়া গেছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাও জেনেছিলেন কিন্তু ঘটনাটি অজ্ঞাত কারণে ধামাচাপা পড়ে। এরা যদি কংগ্রেসী হয় তা হলে রাস্তার সমাজবিরোধীরা কি অপরাধ করেছে বলতে পারেন?

আমি ও অমিয়া বিস্মিতভাবে চিন্তাহরণবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

চিন্তাহরণবাবু বললেন এতেই শেষ নয়। এই দেখুন। জানকীবল্লভের এক সাম্প্রতিক শিকার হল এক অসহায় বিধবা যুবতী। তাঁর পরিবার ও ছেলে-মেয়েদের গ্রাসাচ্ছদনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হল। একদিন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি এল মহিলাটির দরজায়। যুবতীটিকে নিয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রীর গৃহে। তারপর যা, তা হয়েছে। বার বার বহুবার শয্যাসঙ্গী হয়েও যুবতীটি কোন সাহায্য না পেয়ে সোনিয়া গান্ধীকে চিঠি দিয়ে তার দুর্ভাগ্যের কথা জানাতে বাধ্য হয়। এটাও ধামাচাপা দিতে যুবতীর বাবাকে একটা চাকরি দিয়ে রফা করা হয়। এদের নিয়ে রাজীব যাবে উজ্জ্বল প্রগতিশীল একবিংশ শতাব্দীতে। কোন মূর্খই বিশ্বাস করবে না। আর বিহার? আরও ভয়ঙ্কর। জানকীবল্লভ যৌনবিলাসী তহবিল তছরূপকারী আর ওরাও হল নরহত্যাকারী, নারীধর্ষণকারী, লুটেরা তা করে চলেছে প্রশাসনের আশ্রয়পুষ্ট বিহারের প্রাইভেট আর্মি যাদের পোষণ করছে জমিদার ও জোতদার শ্রেণী। আর বৃদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী দুবেজি আত্মপ্রসাদ লাভ করছে শৃঙ্খলারক্ষার খোয়াব দেখে। পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে তা খেয়াল রাখতে পারছে না। হিন্দী ভাষাভাষী বলয়ে বর্তমান কংগ্রেস আরও কিছুকাল দাপট দেখালেও, সেখানেও তাদের কবর খোঁড়া চলছে। ভবিষ্যত যে কি তা কেউ জানে না। সবাই ভাবছে, অতঃ কিম্!

এসব তো হল ভারতের দুর্ভাগ্যের কথা।

না, না। এই অনাচার ডেকে এনেছে দুর্ভাগ্য। আর রাজীব সংহতি আর দেশরক্ষার অজুহাতে সামরিক বাজেট বৃদ্ধি করেছেন। লোকের সামনে বিচ্ছিন্নতার জুজু দেখিয়ে গদী কায়েম রাখতে চান অথচ বিচ্ছিন্নতাকে মদত দিচ্ছেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। পাকিস্তান আর মার্কিন জুজুর ভয় দেখিয়ে বিভ্রান্ত করছেন জনসাধারণকে, কারণ নিজের অক্ষমতা এবং অকর্মণ্যতা ও রাজনীতির জ্ঞানের অভাবকে নানাভাবে আচ্ছাদিত করতে চাইছেন। অবশ্য রাজনীতিতে সত্যের মৃত্যু ঘটে সর্বাগ্রে। তাই যখনই কোন অভিযোগ উপস্থিত করে জনসাধারণ তখনই তা অস্বীকার করে রাজনীতির ব্যবসায়ীরা। সত্য মিথ্যা নির্বাচিত হয় আদালতে। আদালতের সত্য সব সময় সত্য হয় এমন কথা বলাও ভুল। বিচারক বিচার করেন, Evidence on record এর ভিত্তিতে। সেজন্য আদালত সুবিচার করলেও Evidence on record তৈরি হয় স্বার্থসম্পন্ন পক্ষের যোগাযোগে, সেজন্য স্বার্থসম্পন্ন লোকেরা নিজেদের প্রয়োজন মত সাক্ষ্য প্রমাণ যে তৈরি করে না এটাই বা কে স্থির করে বলতে পারে।

জানকীবল্লভ পট্টনায়কের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তার ফয়সালা করতে আগ্রহী জানকীবল্লভ স্বয়ং। হয়তো আদালতে এই অভিযোগ প্রমাণিত হবে না। [illegible] হবে কিন্তু জনমনে যে প্রভাব বিস্তার করেছে এই অভিযোগ তা মুছে [illegible]র সাধ্য আছে কি আদালতের। মানুষ অনেক সময় গুজবের দাসত্ব করে। সেজন্য অভিযোগ যাতে কেউ উপস্থিত করার সুযোগ না পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখার মত পরিবেশ তৈরি করা উচিত কিন্তু ক্ষমতা ও অর্থ হাতে এলে এরা

ভুলে যায় নীতিনৈতিকার প্রশ্ন। মানুষ ধাঁধায় পড়ে সঠিক আর বেঠিক নির্ধারণ করতে।

আদালত বলবে জ্ঞানকীবল্লভ নির্দোষ। হয়ত সংবাদ প্রচারক শাস্তি পাবে। তারপর? মানহানির মামলায় মান প্রতিষ্ঠিত হবে কি!

কমলাপতি ত্রিপাঠীর সঙ্গে চিঠির লড়াইতে হারজিত নির্ধারিত হয়নি। বিলম্বিত বুদ্ধির রাজ্য। প্রণব মুখুজ্যে বলছেন, আমি তো বলিনি বার বছর এয়ার লাইন্সের পাইলটগিরি করে যে একটা প্রমোশন পায়নি এমন ব্যক্তি ভারতীয় রাষ্ট্রের পাইলট হয়ে দেশকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন কমলাপতি ত্রিপাঠী বলছেন, আমি যা লিখেছি সব ভুয়ো।

অর্থাৎ রাজনীতি ভারতবর্ষে হয়েছে অসত্যের ডিপো। এই ডিপোর বড় বড় এজেন্ট যারা তারাই আমাদের ভাগ্য বিধাতা।

আমরা ভাবছি এরপর কি? দাম্পত্যকলহ না ক্ষমতার লড়াই? কোনটা? এর ফলাফল কি? সবাই ভাবছে, অতঃ কিম্!

সবার চিন্তার অবসান ঘটল সুজনের ভাষায়, রাজীবের কাছে কমলাপতির আত্মসমর্পণ করল আর দুর্জনের ভাষায়,কমলাপতির কাছেই রাজীবের আত্মসমর্পণ। সুজনে বলছে,পুত্র লোকপতি ও তস্য পত্নীর চাকরি পাকাপোক্ত রাখতে কমলাপতি ল্যাজে গোবরে হয়েছে। আর দুর্জনে বলছে, হিন্দী ভাষাভাষী বলয়ে কমলাপতির বিকল্প না থাকায় রাজীব তাকে খোঁচা দিয়ে অবস্থা ঘোরালো করতে চান না। একেই দক্ষিণে ও পূর্বে কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটেছে, উত্তর ও পশ্চিম ভরসা। তাতে যদি অশান্তি সৃষ্টি করে কমলাপতি তা হলে কংগ্রেসের বাদশাহীও খতম হতে পারে। অতএব, কিল খেয়ে কিল চুরি করেই দুই পক্ষ পিঠে হাত বুলিয়ে মেকি হাসিতে মুখ ভড়াচ্ছে। তারপর? রাজীব বুঝেছেন ইন্দিরা কংগেস ধীরে ধীরে আঞ্চলিক দলে পরিণত হচ্ছে, সর্বভারতীয় ইমেজ স্তিমিত প্রায়।

সেটাই তো ভাবছে সবাই।

মারাঠীরা কংগ্রেসকে মদত দিয়ে আসছে। হঠাৎ ভাষার প্রশ্নে মারাঠা ও কন্নড়ীদের মধ্যে ভাল দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েছে। আবার মারাঠা আর কোঙ্কনীদের ঝগড়া ছড়িয়ে পড়েছে। রক্তপাত ঘটেছে মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটক সীমান্তে। বেশ চঞ্চল হয়েছে গোয়ার কোঙ্কনীভাষীরা। গোয়া ও মহারাষ্ট্র সীমান্তও অশান্ত। কোথায় দক্ষিণের মানুষ হিন্দীকে সাদরে গ্রহণ করবে, তা নয়। হিন্দী তো দূরের কথা পাশের রাজ্যের ভাষাকেই আমল দিতে চাইছে না। আঞ্চলিকতার ধাক্কায় সবাই দম বন্ধ হবার উপক্রম।

একে একে নিভিছে দেউটি।

তারপর?

সবার মুখে একটি প্রশ্ন, অতঃ কিম্!

জোড়াতালি দিয়ে সংসার চালাতে চালাতে সংসারের কর্তা ফতুর হবার উপক্রম, তবুও কারও ঘুম ভাঙছে না। ক্ষমতা ও অর্থের প্রলোভনে ন্যায়ধর্ম

মানবতাবোধকে এরা আর মূল্যই দিতে চাইছে না।

জনতার যোশী আর জনতার হেগড়ে দুই মেরুর লোক। এবার লড়কে লেঙ্গে অবস্থা। আসামেও অগপ আর আমুর ভাষা নিয়ে লড়াই। সিকিমে আর দার্জিলিং-এ নেপালী ভাষার হাঙ্গামা যার পেছনে সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী নরবাহাদুর ভাণ্ডারীর মদত আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সাওতালী অলচিকি হরফ আর বাংলা হরফের ঝগড়াই ঝাড়খণ্ড দলের মোর্চা গড়তে সাহায্য করছে পশ্চিমবাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বসবাসকারী সাঁওতালদের মধ্যে।

পানজাব তো বালুঘড়ার দাপটে শিখরা হিন্দু বিতাড়ণ করছে। আসাম থেকে বিদেশীর দাপটে বাঙ্গালী বিতারণ পর্ব আরম্ভ হয়েছে। রানীগঞ্জে আর মালদহে মৌলবাদী মুসলমানরা হিন্দু বিরোধী জিগীর দিয়ে নির্বাচনে পোস্টার ব্যানার টাঙ্গিযে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কানি দিচ্ছে। অন্যায়কারীদের তোষণ করছে রাজ্য প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন কেবলমাত্র ভোটের আশায়। পরিণতি কেউ-ই চিন্তা করছে না।

কোথাও শান্তি নেই।

তারপর ?

লোকে ভাবছে, সেই চন্দ্রগুপ্ত নাটকের চাণক্যের কথা। কাত্যায়নকে ডেকে চাণক্য যেমন জিজ্ঞেস করেছিল, কাত্যায়ন নাড়ী দেখতে জান? দেখ তো আমি বেঁচে আছি কিনা! তেমনি সাধারণ মানুষ একে অপরের দিকে হাত বাড়িয়ে নাড়ী পরীক্ষা করে জানতে চাইছে, তারা বেঁচে আছে কিনা? যদি বেঁচেও থাকে না হলে তাদের পরমায়ু আর কতদিন!

এই দুর্দিনের হাত থেকে বাঁচার পথ হল মরণকে সাদরে আহ্বান করা। বাঁচার আর দ্বিতীয় পথ খোলা নেই জনসমাজের সম্মুখে।

ক্ষমতা আর অর্থ কি ভাবে ভারসাম্য নষ্ট করে তার বহু নিকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। এরা ন্যায় নীতি বিসর্জন দেয়। মানবতা বোধ হারায় কিন্তু মানব সমাজ কোন দিন তাদের ক্ষমা করে না। তোকে একটা ঘটনা বলছি। আমার নিজস্ব কিছু নয়। ফ্রান্স থেকে প্রচারিত এল প্যারিস পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে ছিয়াশি সালের জুন মাসে। ঘটনাটা পড়ে শোনাচ্ছি। এ থেকে বুঝতে পারবি, মানবধর্মের প্রতি যারা ব্যভিচার ঘটায় তাদের কখনই উত্তর পুরুষরা ক্ষমা করে না।

ঘটনাটা হল: সকলের অগোচরে ইউরোপের দুই প্রান্তে পূর্বতন অপরাধীর ওপর দণ্ডাদেশ জারী হল। একজন পেল মৃত্যুদণ্ড, অপরজন পেল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এই দুইটি ঘটনা ঘটেছে যথাক্রমে যুগোশ্লাভিয়ার জাগ্রেবে ও পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাকাণ্ডে। এদের একজন হল নাৎসী তাঁবেদার ক্রোশিয়া সরকারের প্রাক্তন আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী আন্দ্রিজা আরটুকোভিক। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ হল। এই ঘাতকটি সাতলক্ষ মানুষকে খুন করেছিল। অপরজন হল স্বারক ফুয়েরার

ওলফ্‌গগার অটো। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ, এই লোকটি অবিভক্ত জার্মানীর কমুনিষ্ট নেতা আর্নেস্ট থায়েলম্যান-এর হত্যাকারী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ন্যুরেমবার্গ ট্রায়াল এই দুই প্রাক্তন নাৎসী অপরাধীকে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিয়েছিল। এই দণ্ডাদেশ সুদীর্ঘ ৪৬ বৎসরের পর কার্যকর হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরই অন্যান্য পূর্বতন অপরাধীদের মত আন্দ্রিজা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিল। সে দেশের রথী মহারথীদের সঙ্গে আন্দ্রিজা সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। রিপাবলিক্যান পার্টি'র টিকিটে মার্কিন দেশের হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভের সদস্য পদও লাভ করেছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন-হাওয়ারের প্রিয়পাত্রও হয়েছিল। কেনেডির হত্যাকাণ্ডের পর মার্কিন সরকার সন্দেহ করে কোন নাৎসী নেতার হাত আছে এই হত্যাকাণ্ডে। অনুসন্ধানে তখনই জানা গিয়েছিল আন্দ্রিজা হল প্রাক্তন নাৎসী যুদ্ধ অপরাধী। যুগোশ্লাভ সরকার আন্দ্রিজকে ফিরে পেতে আবেদন জানায় মার্কিন সরকারকে। অনেক টালবাহানার পর মার্কিন ফেডারেল কোর্টের আদেশে আন্দ্রিজকে ফেরৎ পাঠানো হয় যুগোশ্লাভিয়াতে। সেখানে ছিয়াশি সালের তিরিশে মে তারিখে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

অটোকে মার্কিন সরকার সিয়ার খুনীর দলের স্থান দেয়। কিন্তু পশ্চিম জার্মানীতে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয় অটোর বিচারের জন্যে তিরাশী সালে মার্কিন সরকার অটোকে জার্মানীতে ফেরত পাঠায়। তিন বৎসর মামলা চলার পর আদালতও অটোকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

অমিয়া অবাক হয়ে ঘটনা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বললাম, ইহজগতেই শাস্তি পেতে হয় অন্যায়কারীকে। এই পরিণাম থেকে মুক্তি কেউ পায়নি। যারা ক্ষমতা ও অর্থের প্রাচুর্যে ধরাকে সরা জ্ঞান করে, ভারসাম্য হারায় তাদের পরিণতি এইভাবেই হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম হবার সম্ভাবনা মোটেই নেই।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ তোমার কৃতকার্যের ফল তোমাকেই নিতে হবে। আজ অথবা কাল। জানিস অমু। এটা ঘটনা। এই ঘটনার ঘূর্ণনে ঘুরছে সারা বিশ্ব। এশিক্ষা ক্ষমতাদর্পী রাজনীতিবিদরা গ্রহণ করে না। তারা আমলা নির্ভর। আমলানির্ভর প্রশাসন স্বতঃই পেছনে ঠেলে নিয়ে যায়। আমলারাও পারণতি চিন্তা করে না।

আমলারাও একনিষ্ঠ নয়। তারাও পরস্পরকে আঘাত করতে উদ্‌গ্রীব। ব্যক্তি স্বার্থে দুর্বলকে আঘাত করে। অধঃস্তনকে বিপর্যস্ত করে, প্রশাসনকে শিথিল করে, সমাজবিরোধীদের উৎসাহিত করে এর পরিণামে জনমনে অশ্রদ্ধা জন্মায়, বিক্ষোভ দেখা দেয়, বিদ্রোহের বীজ উপ্ত হয়।

চিন্তাহরণবাবুর কথা ভেবেছি। কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। নেতাজীর অনুগামী ছিলেন। তিনিও নেতাজীর অনুগামী মন্ত্রীদের কাছে পেয়েছেন

অবমাননা। স্বাভাবিক ভাবে তিনি বাস্তবকে মেনে নিয়েছেন। তবে তিনিও জানেন, আত্রিজার মত এদেরও দাঁড়াতে হবে জনতার আদালতে, জনতার বিচার ফল মাথায় পেতে নিতে হবে। সেদিন সমাগত প্রায়।

রাত আটটা বাজবার বিশেষ বিলম্ব নেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অমিয়াকে বললাম, আজ তা হলে চলি, কাল সকালে তুই একবার আসিস আমার বাড়িতে।

অমিয়া নিরুৎসাহিত ভাবে বলল, এই তো সবে আটটা। এত তাড়াতাড়ি কেন? খেয়ে দেয়ে যাবি। আমার কয়েকদিন থেকে মনে হচ্ছে, দেহটা যেন খুব বেশি শিথিল হয়ে আসছে। এরপর আর ছুটোছুটি করতে পারব না। এবার পূর্ণ বিশ্রাম নেব।

নিতে চাইলে নেওয়া যায় না বন্ধু। একটা সমস্যার শেষ হতে না হতে আরেকটা সমস্যা মাথা চাড়া দেয়। বুঝলি। আমার মনে হচ্ছে, বাবুরাওয়ের সম্পত্তি দেখা শোনা করতে আমাদের বাঙ্গালোর গিযে থাকা অনেকটা সুখপ্রদ হবে। ছয় মাস তুই থাকবি। ছয় মাস আমি থাকব। সংসারের সব ঝামেলা এড়াতে পারব।

কথায় বলে ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভাঙ্গে। আমাদের ঝামেলা এড়াতে হনলুলু গেলেও ঝামেলা থাকবে। যাও তুমি বঙ্গে কপাল যাবে সঙ্গে। বুঝলি।

হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে দু'জনেই থমকে গেলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম এমন বিকট চিৎকার কে করছে?

জগলা।

সে আবার কে?

গলির মুখে যে মিত্তিরদের বাড়ি, ওই বাড়ির ছেলে। ভদ্রলোকের একটা মাত্র ছেলে। সম্প্রতি মাথায় কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছে।

অকারণে?

কারণ না থাকলে কিছুতো ঘটে না। কোনটা প্রত্যক্ষ করি। কোনটা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। তবুও কারণ থাকে। মিত্তির মশায়ের সহায়-সম্পত্তি নেহাৎ কম নয়। ছেলেটাও লেখাপড়া শিখেছিল। বোধহয় কোন সহপাঠিনীর সঙ্গে প্রেম ভালবাসা জমে উঠেছিল। তার প্রতিবন্ধক হল ওর মা। তারপর থেকেই কেমন যেন উদাস উদাস ভাব। এরপর দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ উন্মাদ তবে মাঝে মাঝে বেশ সহজ ভাবে কথা বলে। কারও বুঝবার উপায় নেই ওর কোন ব্যাধি আছে। এই কয়েকদিন হল লক্ষ্য করছি রাত নটা দশটা নাগাদ ওদের বৈঠকখানার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে। শুধু বলে, হল না, হবে না।

আমি অবাক হয়ে অমিয়ার মুখের দিকে তাকিযে রইলাম। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, তারপর?

তারপর আর কিছু নেই। তবে যখন সহজ সরল থাকে তখন আমার এখানেও কখনও কখনও আসে। এই তো কদিন আগে এসেছিল। স্বাভাবিক-

ভাবে কথা বলল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি ভাবছ জগলা?

জগলা বলছিল এরপর কি?

কিসের?

আমার, আপনার, দেশের এবং সবার।

কি ঠিক করলে?

ভেবে দেখলাম, আর পাঁচ বছরে মধ্যেই দিল্লীর বাদশাহী মাটিতে লুটি পড়বে। যারা আজ বাদশাহ, তারা পাঁচ বছর পর পথে পথে ফেউ ফেউ ক বেড়াবে।

বলেছিলাম, এত বেশি ভাবনা ভাল নয়।

জগলা উত্তেজিত ভাবে বলল, কি বলছেন অমিয়াদি। ভাবনা শেষ হ তো মানুষ আর বাঁচে না। মগজ কাজ করে। তাই মানুষ কাজ করে. এরপর কি হবে ভাবতে ভাবতে বুঝেছি। পাঁচ বছর। সামনের পাঁচ বছ বাদশাহী শেষ। পরের দশ বছরে হিন্দীওলারা লেজগুটিয়ে বিবরে প্রবেশ করবে আর আমাদের সাধের ভারত টুকরো টুকরো হবে। এর জন্য পুরা দায়ি ওই সব হিন্দীওলার। যারা হিন্দীওলা তারাই রাজা। এই রাজার রাজত্ব শে হবার সময় এসে গেছে। তারপর হবে বিচার। চিত্রগুপ্ত প্রস্তুত হচ্ছে।

আমি থমকে গেলাম।

অমিয়া বলল, তুই কি ভাবছিস?

ভাবছি তোর জগলা পাগল বোধহয় বড ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। ভারতের আগামী দিনের ছবি ও যেন দিব্যচক্ষে দেখছে। এমন আশঙ্কা আমারও আছে। এ কঠিন দুঃখজনক পরিণতি থেকে বাঁচার পথগুলোও যেন ওরা স্বেচ্ছায় বন্ধ করে রেখেছে। ভারতের তিনটি রাজ্য মাত্র হিন্দীভাষী, বাকি সবটাই অহিন্দীভাষী। সংহত ভারত চিন্তা যতদিন হিন্দীবলয়ের মানুষ না বুঝবে ততদিন ভারতের কোন ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে না। হিন্দী-অহিন্দী সবাই এক, তবেই সংহতি। এটাই আমরা চাই।

অমিয়া বলল, অতঃ কিম্?

শাসক পরিবর্তন, বিচ্ছিন্ন দেশ, অশেষ দুর্গতি জনসাধারণের। আর? আর?—দরকার নেই এর বেশি কিছু বলার। সবাই যা প্রত্যক্ষ করবে তা জ্যোতিষীর মত বলে নিজেকে মূর্খ বলে প্রমাণিত করতে চাইনা।

অমিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, চল, খাবার টেবিলে বসে কথা হবে।